www.MurchOna.com

আমার মেয়েবেলা

তসলিমা নাসরিন

আমার মা বেগম ঈদুল ওয়ারাকে

সূচী

যুদ্ধের বছর   ৯
জন্ম,আকিকা এসব   ২৪
বড় হওয়া   ৪৫
মা   ৬৪
সাপ   ৭৪
পীরবাড়ি ১   ৮২
ধর্ম   ১০৪
সংস্কার   ১২৬
পীরবাড়ি ২   ১৩৮
ফেভারিট   ১৫৪
প্রেম   ১৭১
প্রত্যাবর্তন ১   ১৮৭
ঋতুস্রাব   ২০০
ফুলবাহারি   ২০৬
কবিতার অলিগলি   ২১৩
মুবাশ্বেরা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে ছিল শাদা বিছানায়   ২১৭
প্রত্যাবর্তন ২   ২২০
উইপোকার ঘরবাড়ি   ২২৬
যুদ্ধের পর   ২৩১

যুদ্ধের বছর

ক.

যুদ্ধ বাঁধছে। এ পাড়ায় গুঞ্জন, ও পাড়ায় গুঞ্জন। লোক জট পাকাচ্ছে উঠোনে, মাঠে, গলির মোড়ে। কারও চোখ কপালে, কারও নাকের তলায়, হাঁ করা মুখের ভেতর, কারও গালে, কানে, মাথায়। চোখ সবার খোলা। চোখের সামনে দৌড়োচ্ছে লোক, দৌড়োচ্ছে আলোয়, অন্ধকারে। কাচ্চা বাচ্চা বোঁচকা বুচকি কাঁখে নিয়ে, ঘাড়ে নিয়ে, দৌড়োচ্ছে। পালাচ্ছে। পালাচ্ছে শহর থেকে গ্রামে। ময়মনসিংহ শহর ছেড়ে ফুলপুর, ধোবাউড়া, নান্দাইল। দালানকোঠা, দোকানপাট, ইস্কুলঘর, অমরাবতী নাট্যমন্দির ছেড়ে নদীর ওপারে, ধানক্ষেতে, ধুধু মাঠে, অরণ্যে। ঘর থেকে যারা দু'পা নড়তে চায় না, হৈ হৈ পড়ে গেল তাদের মধ্যেও, বোঁচকা বাঁধ। শকুনেরা ঠোঁটে করে গন্ধ আনছে মরা মাংসের। গুলির শব্দ ভেসে আসছে কবুতরের অস্থির ডানায় করে। মানুষ পালাচ্ছে পায়ে হেঁটে, রেলগাড়িতে, নৌকোয়। ঘরের মত পড়ে থাকে ঘর, উঠোনে গাছগাছালি, জলচৌকি, দা বটি, কালো বেড়াল।

দুটো তিন চাকার মেশিন চালানো গাড়ি এসে থামে আমাদের বাড়ির দরজায়, সন্ধেয়। ওতে চড়ে আমরাও রওনা দিই পাঁচরুখি বাজারের দক্ষিণে মাদারিনগর গ্রামে। শহর ছেড়ে যেই না ফেরি করে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে শম্ভুগঞ্জে পৌঁছই, কোমরে গামছা বাঁধা, ঝোপ থেকে ঝাঁপিয়ে রাস্তায় নেমে ছ'জন যুবক আমাদের নাকের সামনে দাঁড়ায়। দু'হাতে মা'কে আঁকড়ে বিস্ফারিত চোখে দেখি ছ'টি বন্দুক, ছ'টি কাঁধে। অনুমান করি এরই নাম যুদ্ধ, আচমকা পথ আটকে মানুষ মেরে ফেলা। ছ'জনের একজন, নাকের নিচে চিকন কালো মোচ, বলে, গলা ঢুকিয়ে তিন চাকার খোলা দরজায়, *শহর খালি কইরা যান কই! সব চইলা গেলে আমরা কারে লইয়া যুদ্ধ করুম! বাড়ি ফিইরা যান।*

মা বোরখার ঘোমটা তুলে, এক ছটাক রোষের ওপর দু'ছটাক আকুতি মিশিয়ে বলেন, *এ কি কন! সামনের গাড়ি তো চইলা গেল। আমার ছেলেরা ওই গাড়িতে। আমাদের যাইতে দেন।*

মন গলে না মোচঅলার। কাঁধের বন্দুক মাটিতে ঠুকে চেঁচায়, *এক ইঞ্চিও সামনে নড়ব না চাক্কা। পিছাও।*

গাড়িকে পিছিয়ে ফেরিতে উঠিয়ে বিড়ি ধরিয়ে গন্ধ ছড়িয়ে কাঁচাপাকা চালক বলে, *এরা বাঙালি, আমগোরই লোক, এরা তো আর পাঞ্জাবি না, ডরের কিছু নাই।*

বুক ধুকপুক করে যেন ছ'টি বন্দুক থেকে ছ'জোড়া গুলি এসে লেগেছে বুকে। দু'পাশে ঠেসে বসা কালো বোরখায় ঢাকা দু'জনের সুরা পড়ার বিড়বিড় আর তিন চাকার ঘড়ঘড় শব্দ শুনতে শুনতে পার হতে থাকি জুবলি ঘাট, গোলপুকুর পাড়। আর কোনও শব্দ নেই, কেবল আমাদের ধুকপুক, বিড়বিড়, ঘড়ঘড়। রাতের কম্বল মুড়ে আলো নিবিয়ে ঘুমিয়ে গেছে পুরো শহর।

সে রাতেই তিন চাকার গাড়িকে বাবা আবার পাঠিয়ে দিলেন পুবের বদলে পশ্চিমে, মাদারিনগরের বদলে বেগুনবাড়ি। গাড়ির ভেতর ঘুমিয়ে পড়ে ইয়াসমিন, ছটকু। মা ঝিমোন, জেগে থাকেন আমার সঙ্গে নানি আর নানির হাতে শক্ত করে ধরা নীল প্লাস্টিকের ঝুড়ি।

ঝুড়ির ভিতরে কি গো নানি?

নানি ঠাণ্ডা গলায় বলেন, *চিঁড়ামুড়ি, গুড়।*

বেগুনবাড়ি গ্রামে কলাগাছ ঢাকা যে বাড়িটির কাছে আমাদের বিড়িখোর চালক গাড়ি থামায়, সেটি রুনু খালার শ্বশুর বাড়ি।

পিলপিল করে মানুষ বেরিয়ে উঠোনে কুপি উঁচু করে আমাদের দেখে।

শহর থেইকা ইষ্টি আইছে।

কুয়া থেইকা পানি তুলো।

ভাত রান্দো।

পান সাজো।

বিছনা পাতো।

পাঙ্খা কর।

পাতা বিছানায় আড়াআড়ি করে শুই শহরের ইষ্টিরা। ঘুমে কাদা ছটকুর ঠাং আমার ঠ্যাংএর ওপর, ঠ্যাং সরালে পেটে গুঁতো খাই ইয়াসমিনের হাঁটুর। চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে মিনমিন করি, *কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাইতে পারি না।*

ঘামাচি ওঠা গায়ে পাখার বাতাস করতে করতে মা তাঁর ছিঁদকাঁদুনে মেয়ের ঢং শুনে গলা চেপে ধমকান, *কোলবালিশ লাগব না, এমনি ঘুমা।*

ধমক খেয়ে *চিঁড়ে চ্যাপ্টা* চুপ হয়। চৌকির এক কিনারে গুটিসুটি শুয়ে আছেন নানি, কালো পাড় শাড়িতে ঢাকা তাঁর মুখ মাথা, প্লাস্টিকের ঝুড়ি, চিঁড়ামুড়ি গুড়। চৌকাঠে টিমটিম জ্বলে কুপি, কুপির আলোয় টিনের বেড়ায় পাঁচ হাত পাঁচ পা ছড়িয়ে ভূত নাচে আর হুসহুস ডাকে। দেখে দু'হাঁটুর ভেতর মুখ ডুবিয়ে বলি

মা ও মা, আমার ডর করে মা।

কোনও সাড়া নেই মা'র, ঘুমিয়ে ছটকুর মত কাদা।

ও নানি, নানি গো।

নানিও রা করেন না।

ভূতের বিদ্যেয় আমার হাতেখড়ি শরাফ মামার কাছে। এক রাতে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ফিরে তিনি বলেছিলেন, *পুস্কুনির পাড়ে দেখলাম শাদা কাপড় পরা একটা পেত্নী খাড়োয়া রইছে, আমার দিকে চাইয়া পেত্নী একটা বিজলি দিল, আর আমি লেঙ্গুর ফালাইয়া দৌড়।*

শরাফ মামা ঠিরঠির কেঁপে লেপের তলায় ঢুকে যান, আমিও। শামুকের মত শুয়ে থাকি সারারাত।

পরদিনও এরকম ঘটনা নিয়ে ফেরেন মামা। বাঁশঝাড়ের তল দিয়ে হেঁটে আসছেন, কোথাও কেউ নেই, কিন্তু মামদো ভূতের গলা শুনলেন – *কিরেঁ শরাঁফ যাঁস কঁই? এঁকটু*

থাম। উর্ধ্বশাসে দৌড়ে এসে ঠাণ্ডা পানিতে সেই কনকনে শীতের রাতে গোসল করেন। বাড়িতে শরাফ মামার খাতির বেড়ে যায়। আমি, ফেলুমামা, টুটুমামা তাঁকে ঘিরে বসে থাকি অর্ধেক রাত অবদি। হাত-পাখায় তাঁকে বাতাস করেন পারুল মামি। নানি গরম ভাতের সঙ্গে শিংমাছের ঝোল বেড়ে আনেন ভূত দেখা ছেলের জন্য, পাতের কিনারে নুন।

কানা মামুর বড়শিতে ইয়া বড় বড় মাছ উঠত। আস্তা মাছ লইয়া কুনওদিনও বাড়ি ফিরতে পারে নাই মামু। এক রাইতে দেখে পিছন পিছন এক বিলাই আইতাছে। মামুর কান্ধের উপরে মাছ। মামু হাঁটে বাড়ির পথে, হঠাৎ হালকা হালকা লাগে কান্ধের মাছ। ফিইরা দেখে মাছের অর্ধেকটা নাই, আর বিলাইটাও হাওয়া। আসলে তো বিলাই না, ওইটা ছিল মাউছ্যা ভূত, বিলাইয়ের রূপ ধইরা মাছ খাইতে আইছিল।

শরাফ মামা খেতে খেতে কানা মামুর কিচ্ছা বলেন।

ওসবের পর থেকে আমার রোমকূপের তলায় তলায় ঢুকে গেছে ভয়। বাড়ির পেছনে বাঁশঝাড়, রাতে কেন, দিনের বেলায়ও একা তার ছায়া মাড়াই না। সন্ধে হলেই ঘরে সেঁধিয়ে যাই, গু মুত পেটে চেপে। বেশি বেগ পেলে বড় কাউকে হারিকেন হাতে আগে আগে হাঁটতে হয়, পেছনে আমি ডানে বামে চোখ কান সজাগ রেখে পড়ি কি মরি দৌড়ে সেরে আসি ঝামেলা।

নানিবাড়ি ছেড়ে আমলাপাড়ার বাড়িতে যখন উঠি, আমার বয়স সাড়ে সাত কী আট। বাড়িটির নাম বাবা এক এক করে জিজ্ঞেস করেন তাঁর দুই ছেলেকে, কী হলে ভাল হয়, দাদা বলেন *অবকাশ,* ছোটদা *ব্লু হেভেন।* যদিও জানতে চাওয়া হয়নি, আমি আগ বাড়িয়ে বলেছিলাম, আমার পছন্দ *রজনীগন্ধা।* দাদার বলা নামটিই শ্বেত পাথরে খোদাই করে কালো ফটকের দেয়ালে সেঁটে দেওয়া হয়। বাড়িটি বিশাল, নকশা কাটা থাম, দরজা। ঘরের সিলিংএ তাকালে মনে হয় আকাশ দেখছি, আকাশে সবুজ কড়িকাঠ সাজানো, কাঠের ওপর আড়াআড়ি লোহার পাত, যেন রেললাইন, পুঁ ঝিকঝিক শব্দ তুলে রেলগাড়ি ছুটবে বলে। বেলগাছের তল থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে ছাদে, পেঁচানো সিঁড়ি, ছাদের নকশা কাটা রেলিং ধরে দাঁড়ালে পুরো পাড়া চোখের সামনে। মাঠের কিনার ঘেঁসে নারকেল আর সুপুরি গাছের সারি। উঠোন জুড়ে আমজামকাঠালপেয়ারাবেলআতাজলপাইডালিম। খুশিতে আমার দুই দাদা, আমি আর ইয়াসমিন বাড়িময় গোল্লাছুট খেলি। দু'মাইল দূরে পড়ে থাকে এঁদো গলির ভেতর খলসে মাছে ভরা পুকুর, তার পাড়ে নানির চৌচালা ঘর, পড়ে থাকে কড়ইতলায় আঙুলের গর্ত করে মার্বেল খেলা, ছাই মাখা ত্যানায় চিমনি মুছে হারিকেন জ্বালানো, পড়ে থাকে মামাদের সঙ্গে শীতল পাটিতে বসে সন্ধে হলে দুলে দুলে *আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে* পড়া, পড়ে থাকে ভোরের খেঁজুর রস, ভাপা পিঠে। ও বাড়ি থেকে আর কিছু সঙ্গে না আসুক, ভূতের রোমকাঁটা ভয় ঠিকই এসেছে, এই যুদ্ধের কালে বেগুনবাড়ি অবদিও সে আমার পেছন ছাড়েনি। শরাফ মামা বলতেন —*রাত শেষ হইলেই ভূত পেত্নীরা নিজের দেশে ফিইরা যায়।*

সকালে ঘুম ভাঙলে দেখি পাঁচ পা অলা ভূত নেই ঘরে, টিনের ফুটকি ফুঁড়ে রোদ ঢুকে ঘর তাতাচ্ছে। উঠোনে পিঁড়ি পেতে বসে গল্প করছেন মা, নানি, রুনুখালার শাশুড়ি। শহর ছেড়ে আমার কোথাও যাওয়া হয়নি এর আগে, কেবল একবার রেলের চাকার তালে *ঝিক্কির ঝিক্কির মৈমনসিং ঢাকা যাইতে কত্তদিন* বলতে বলতে ঢাকা পৌঁছেছিলাম, দিগন্ত

ছোঁয়া লালমাটিয়ার মাঠের কাছে বড়মামার বাড়িতে। ইচ্ছে করে খোলা আকাশ জুড়ে ঘুড়ির মত উড়ে উড়ে মেঘবালিকাদের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলি। দাওয়ায় বসে কয়লার গুঁড়োয় দাঁত মাজতে মাজতে ভাবি যুদ্ধ ব্যাপারটি মন্দ নয়, ইস্কুল বন্ধ দিয়ে দিল আচমকা, বাড়ির ছাদে বসে অবিরাম পুতুল খেলে কাটাচ্ছিলাম, কেবল উড়োজাহাজের শব্দ শুনলেই দৌড়ে নামতে হত নিচে, কানে তুলো গুঁজে মা আমাদের পাঠিয়ে দিতেন খাটের তলায় আর বিড়বিড় করে সুরা পড়তেন। পরে লম্বা একখানা গর্ত খোঁড়া হয়েছিল মাঠে, বোমা পড়ার শব্দ হলে বাড়ির সবাই যেন ওতে ঢুকে পড়ি। হাসপাতালে বোমা পড়ার পর শহর আর নিরাপদ নয় বলে বাবা আমাদের গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন দু'গাড়ি ভরে, এক গাড়ি দাদা, ছোটদা, শরাফ মামা, ফেলু মামা, টুটুমামাকে নিয়ে চলে গেল মাদারিনগর, আরেকগাড়ি এল বেগুনবাড়ি, নিজে রয়ে গেলেন শহরের বাড়িতে, অবস্থা আঁচ করে তিনিও, দরজায় তালা ঝুলিয়ে, এরকমই কথা যে, বাড়ি ছাড়বেন। কুয়োর জলে কুলকুচো করে বুক ভরে শ্বাস নিই, বাতাসে লেবুপাতার গন্ধ। এখন আর বাবার রক্তচোখ নেই, উঠতে বসতে ধমক নেই, যখন তখন চড় চাপড় নেই, এর চেয়ে আনন্দ আর কী পেতে পারি জীবনে, আমি হাওয়ার সঙ্গে নাচব আজ গ্রামের রাস্তায়। *গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসি বনের ছায়। মুঠি বাড়ালেই. সীম আর সীম, নাড়ার আগুনে পোড়ায়ে পোড়ায়ে খাব আর যত গেঁয়ো চাষীদের বিলাব নিমন্ত্রণে,* আহা!

ছটকু, চল দোকানে যাই। তেঁতুল কিনা আনি।

ছটকুকে প্রস্তাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও বাঁশের কঞ্চির মত খাড়া হয়ে যায়। তেঁতুল খাওয়ার লোভে জিভে আমার জল গড়াচ্ছে। উঠোন আড়াল করা কলাগাছের বেড়ায়, তার তল দিয়ে বেরিয়ে, ক্ষেতের আল বেয়ে, সামনে আমি পেছনে ছটকু, বড় রাস্তার দিকে যাচ্ছি, কাকতাড়ুয়ার মত সামনে দাঁড়ায় হাসু। তাগড়া ছেলের পরনে মালকোঁচা লুঙ্গি, হাতে বনবন ঘুরছে মরা ডাল।

ছটকু যাইতে পারব, তুমি না। তুমি মেয়ে মানুষ। মেয়ে মানুষের দোকানে যাইতে নাই।

কেন যাইতে নাই? আমি ত সবসময় যাই!

ঠোঁট উল্টে অগ্রাহ্য করতে চাই গেঁয়ো ছেলে হাসুকে।

শহরের দোকানে যাও, এইটা শহর না। গেরাম। গেরামে মেয়ে মানুষেরা ঘরে থাহে। বাইরে বাইরয় না।

বলে কাকতাড়ুয়া আমার দিকে পা পা করে হাঁটে, ওর চোখের গর্ত থেকে মুখ বাড়াচ্ছে দুটো ছাই রঙা ইঁদুর। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা গ্রামের কথা বইয়ে পড়েছি, বড় সাধ ছিল গ্রামে আসার, আর এসে কিনা ধানের শীষের সঙ্গে নাচা হল না, যাওয়া হল না যেদিকে দু'চোখ যায়, বন বাদাড়ে, হাওড়ে বিলে, কোথাও হারিয়ে গিয়ে গিয়ে শোনা হল না কোনও রাখাল ছেলের বাঁশি, বরং সকাল হওয়া মাত্রই দেখতে হল ইঁদুর, তাও চোখে, সে বাড়ির লোকেরই, যে বাড়িতে অতিথি আমি! গলায় এক থোকা কষ্ট জমে আমার। পেছনে সরতে সরতে মা'র একেবারে গা ঘেঁসে থামি, উঠোনে। মা'র পরনে মলিন এক শাড়ি। এলো চুল ঢেকে রেখেছেন ঘোমটায়। মা'র আঁচলের কোণা আঙুলে পেঁচাতে পেঁচাতে কষ্ট-কণ্ঠে বলি — *আমারে দোকানে যাইতে দেয় না।*

মা সাড়া দেন না। দু'হাতে তাঁর চিবুকখানা নিজের দিকে ফিরিয়ে বলি

ওই হাসু আমারে তেঁতুল কিনতে যাইতে দেয় না।

মা চিবুক ছাড়িয়ে ধমকে ওঠেন – *তেঁতুল খাইতে হইব না, শইলের রক্ত পানি হইয়া যায় চুক্কা খাইলে।*

মা'র চিরকালই তেঁতুলের বিরুদ্ধে এই এক অভিযোগ। মা যেন দেখতে না পান, ছাদের সিঁড়িতে বসে, তেঁতুলের গুলি নুনে ডলে, বুড়ো আঙুলে অল্প অল্প তুলে জিভে ট্টা ট্টা শব্দ করে খেতাম। জিভ শাদা করে, দাঁত টক করে, রক্ত পানি করে তবে আমার তেঁতুল ফুরোতো। হাত পা কোথাও কাটলে ভয় পেতাম, এই বুঝি ধরা পড়ে যাব, রক্তের বদলে যখন পানি বেরোবে। কিন্তু না, যখনই কাটে, কাচে বা শামুকে, গোলাপের কাঁটায় বা উঠোনের ভাঙা ইটে পড়ে, রক্তই বেরোয়। রক্ত মুছে ক্ষতে ডেটল মেখে দেন মা, আর ছেঁড়া ত্যানায় বেঁধে দেন আঙুল হলে আঙুল, ঠ্যাং হলে ঠ্যাং। আমি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে রাখি হাসি, রক্ত পানি না হওয়ার হাসি।

বাড়িভর্তি লোক এ বাড়ির। মেয়েদের নামগুলো ফলের, ডালিম, পেয়ারা, আঙুর, কমলা আর ছেলেদের নাম হাসু, কাসু, বাসু, রাসু। রাসু আমার মেজ খালু, থাকেন শহরে, যুদ্ধের গন্ধ পেয়ে কোথায় কোন গ্রামে লুকিয়েছেন কেউ জানে না। রুনু খালার শাশুড়ির দু'গাল ফুলে থাকে পানে, রস গড়িয়ে পড়ে দু'ঠোঁটের কোণ বেয়ে। আঙুলের মাথা শাদা হয়ে থাকে চুনে, পানের বাটা থেকে চুন না লাগা আঙুলে এক চিমটি *শাদা পাতা* তুলে ফুলে থাকা গালে ঢুকিয়ে নানির কানের কাছে মুখ এনে বলেন –*রাসুডা কই আছে কেডা জানে! বাইচা আছে না মইরা গেছে। শুনছি পাঞ্জাবিরা মানুষ মাইরা শহর উজাড় করতাছে।*

পিঁড়িতে বসা নানির ছোট্ট শরীরখানা কাপড়ের একটি পুঁটলির মত দেখতে লাগে। কালো পাড় শাদা শাড়ির পুঁটলি নড়ে না। পুঁটলির ভেতর আরেক পুঁটলি, নীল প্লাস্টিকের ঝুড়ি, শক্ত হাতে ধরা, ঝুড়িতে চিঁড়ামুড়ি, গুড়। নানির চোখে পাথর হয়ে থাকে দুটো তারা। পুঁটলির মত এরাও নড়ে না। তারাদুটো দেখেছে গভীর রাতে দরজায় টোকা দিচ্ছেন হাশেমমামা, নানির মেজ ছেলে। নানি দরজা খুলতেই রেলগাড়ি যাওয়ার শব্দের তলে গুঁড়ো হয়ে যায় হাশেম মামার স্বর – *মা আমি যাইতাছি।*

এত রাইতে ডাকস কেন! হইছে কি! কুপির সলতে উসকে দিয়ে সিঁড়িতে নামেন নানি।

আমি গেলাম।

হাশেম মামা হনহন হাঁটতে থাকেন পুকুর পাড়ের দিকে। নানি পেছনে দৌড়ে বলেন, *কই যাস এত রাইতে? থাম।*

হাশেম মামা হাঁটতে হাঁটতে পেছন না ফিরে বলেন –*যুদ্ধে যাইতাছি। দেশ স্বাধীন কইরা তবে ফিরবাম।*

থামরে হাশেম থাম।

নানি গলা ছেড়ে ডাকেন তাঁর অবাধ্য ছেলেকে যতক্ষণ না অন্ধকারের পেটের ভেতরে ঢুকে যান ছেলে।

নিসাড় দাঁড়িয়ে থাকেন নানি। বুক টনটন করে, যে বুকের ওমে, যে বুকের দুধে পঞ্চাশের মন্বন্তরে জন্ম নেওয়া হাশেম মামাকে তিনি বাঁচিয়েছিলেন। পারুল মামি চৌকাঠে এক পা, আরেক পা চালা ঘরের সিঁড়িতে রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। লোকে বলে হাশেমের বউ পরীর মত সুন্দরী। অন্ধকারে নানি দেখেন পারুল মামির গা থেকে জ্যোৎস্না বেরোচ্ছে। বউটি আস্ত একখানা চাঁদ। এমন চাঁদকে এখন তিনি লুকোবেন কোথায়! ঘরে ঘুমোচ্ছে পারুল মামির ছ'মাসের মেয়ে। সংসার ফেলে এভাবে কেউ আচমকা হারায়! অন্ধকার হাতড়ে কোথায় তিনি খুঁজে পাবেন হাশেম মামাকে, জানেন না। নানি যুদ্ধ কী, মহাযুদ্ধ দেখেছেন, জাপানি বোমা পড়েছে দেশে, কিন্তু এভাবে সংসার ছত্রখান হয়নি।

কাক ডাকা ভোরে পারুল মামিকে তাঁর বাপের বাড়ি রেখে সঙ্গে চার ছেলে আর একটি নীল প্লাস্টিকের ঝুড়ি, এসেছিলেন মেয়ের বাড়িতে, *অবকাশে,* শলাপরামর্শ করতে, টিনের চৌচালা ছেড়ে দালানে। মেয়ের জামাই বললেন – *গ্রামে চইলা যান আম্মা, শহর নিরাপদ না।*

সেই গ্রামে যেতে গিয়েই হাতছাড়া হয়ে গেল তিন ছেলে, এখন থলে ঝাড়া ছেলে, নিজের নাতনিরও ছোট, ছটকু, কেবল হাতের কাছে।

রাসুর খবর না পেয়ে রুনু খালার শাশুড়ি চোখের জল ফেলেন, আর পাশের পিঁড়িতে রোদে পিঠ দিয়ে বসা পুঁটলি-নানি ছেলে যুদ্ধে গেছে জেনেও টুঁ শব্দ করেন না। যুদ্ধে গেলে কেউ কি আর ফেরে! নানির চোখের তারা নড়ে না।

খ.

রুনু খালার শ্বশুর খবর পেয়েছেন মিলিটারি আসছে বেগুনবাড়ির দিকে, ছ'টি মুণ্ডু পড়ে আছে সিকি মাইল দূরে, পাটক্ষেতে। মুণ্ডু দেখতে লোক দৌড়োচ্ছে, আবার উল্টো দিকেও বোঁচকা হাতে ছুটছে লোক। আমাদের, শহরের *ইষ্টি*দের জন্য ঠিক হয় আরও গহন গ্রামের দিকে পালিয়ে যাওয়া। বেগুনবাড়ি থেকে মোষের গাড়ি করে গভীর রাতে রওনা দিই হাঁসপুর। মোষঅলাকে পথ দেখিয়ে নেয় কাসু, হাসুর ভাই কাসু। বন বাদাড়ের ঝিঁ ঝি ঝিঁ ঝি, হুক্কা হুয়া, ভুতুম ভুতুমের মধ্যে এসে আঁতকা থেমে যায় মোষ। কুণ্ডুলি পাকাতে পাকাতে মা'র পাছার তলে সেঁধিয়ে থাকি। শরাফ মামা বলতেন অন্ধকারে ভূতেরা সব বেরিয়ে আসে বাইরে, তারা খপ করে মানুষ ধরে, আর কপ করে খায়। ভূতের প্রিয় জায়গা হল গাছের মগডাল। আর মোষের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে অমাবস্যার রাতে শেওড়া গাছের তলে। সপ সপ করে কার যেন হেঁটে আসার শব্দ শুনি। মোষঅলা চাবুক কষান মোষের পিঠে, মোষ নড়ে না। হাট হাট হাট, সপাং সপাং। বাঁশবনের ভেতর দিয়ে হঠাৎ মোষ দৌড়োয়। ছইয়ের ভেতর মাথায় মাথায় ঠোকর লাগার শব্দ হয় ঠমঠম, ঠমঠম। ভুরু নেই, চোখের পাতা নেই, লোম নেই, চুল নেই, ব্যারামে ভোগা ছটকু পিঁ পিঁ করে কাঁদে। আবার হাট হাট, আবার সপাং। সপ সপ, সপ সপ। ছটকুর লিকলিকে হাত ধরে রাখে নানিকে, নানির হাতে শক্ত করে ধরা প্লাস্টিকের ঝুড়ি। ঝুড়িতে চিঁড়ামুড়ি গুড়।

হাঁসপুরের বাড়িটি কাসুর বোন ডালিমের শ্বশুর বাড়ি। বাড়ির মাঠে বসে মোষদুটো জিরোয়। মোষঅলাও। কাসু আগে আগে হাঁটে, শহরের ইষ্টিরা কাসুর পেছনে, কাসু হাঁটে আর পেছনে তাকায়, হাসুর চোখের ইঁদুর কাসুর চোখে নেই।

হাসুর দুই চোখে দেখেছি দুইটি ইঁদুর,
তাই, বাঁশবন পার হয়ে চলি হাঁসপুর।

লেখাপড়া জানা, দরদালানে থাকা, মটরগাড়ি চড়া শহরের মানুষদের এ বাড়ির সবাই খাতির করে। সবচেয়ে বড় ঘরটি ছেড়ে দেওয়া হয় আমাদের জন্য, আলমারি খুলে রঙিন ফুল পাতা আঁকা কাচের গ্লাস আর চিনেমাটির থালবাটি বার করা হয়। কই মাগুরের ঝোল রাঁধা হয়, ডাক পড়লে আমরা ঝাঁক বেঁধে পিঁড়ি পেতে বসি পাকঘরে। অতিথ খাইয়ে, পোলাপান খাইয়ে, ক্ষেত ফেরা পুরুষদের খাইয়ে, বেলা ফুরোলে বাড়ির মেয়েরা খেতে বসেন। বিছানায় নকশি কাঁথা বিছিয়ে দেওয়া হয়, লাল নীল সুতোয় *ভুলো না আমায়* লেখা ওয়াড় লাগানো হয় বালিশে। মাথা গুনে বালিশ। মাথার বালিশই দু'ঠ্যাংএ চেপে ঘুমোই, কোলবালিশের অভ্যেস মরে না যুদ্ধেও। স্বপ্নের ভেতরে ভাসি হাঁসের মত হাঁসপুরের জলে, উড়ি ছটকু আর কাসুর লাল ঘুড়ির মত হাওয়ায়।

এ বাড়িতে আমার বয়সী মেয়েরা এক প্যাঁচে শাড়ি পরে, কারও কারও শুনি বিয়েও হয়ে গেছে। ভোরে উঠে ওরা হাঁস মুরগির খোঁয়াড় খোলে, উনুনে ফুঁকনি ফোঁকে, মশলা বাটে, ঢেঁকি পাড় দেয়, কুলোয় চাল ঝাড়ে, ওদের ডেকে বলি – *খেলবা এক্কা দোক্কা, কুতকুত?* শুনে ওরা ঠোঁট টিপে হাসে, খেলতে আসে না। ছেলেরা গাছে উঠে আম পাড়ে, গাব পাড়ে, ডাব পাড়ে, ওদের মত আমারও ইচ্ছে করে গাছে উঠতে। ওরা বলে– *মেয়েমানষরা গাছে উঠলে গাছ মইরা যায়।*

ওরা হাডুডু খেলে লুঙ্গি কাছা মেরে। আমি খেলতে চাইলে বলে– *মেয়েমানষের হাডুডু খেলতে হয় না।*

ওরা কাঁধে গামছা ফেলে বিলে যায় মাছ ধরতে। ওদের পেছন পেছন আমিও রওনা হই, পেছন ফিরে বলে ওরা – *মেয়ে মানষের মাছ ধরতে নাই।*

ঘুড্ডি উড়াইতেও নাই?

না, ঘুড্ডি উড়াইতেও নাই।

কে কইছে নাই? আমি কোমরে দু'হাত রেখে বুক টান করে দাঁড়াই।

গায়ে কাদা মাখা, কালো মিশমিশে, মুখ ভর্তি হলুদ দাঁতের ছেলে দু'পা পেছনে এসে বলে, *কও তো কাচা গাব পাকা গাব কাচা গাব পাকা গাব! খুব তাড়াতাড়ি কইতে হইব।*

বলতে পারলে মাছ ধরতে নেবে আশায় বলে দেখি কাচাগাবপাচাবাপকাকাপাপ ধরনের শব্দ বেরোচ্ছে। হলুদ দাঁত খাঁক খাঁক করে হাসে। ওর সঙ্গে বাকিরাও খাঁক খাঁক। আমাকে পেছনে রেখে ওরা চলে যায় বিলের দিকে। আমি একা দাঁড়িয়ে থাকি *রেডিমেড ফ্রক* পরা শহুরে মেয়ে।

দুপুরবেলা পুকুরে নেমে মেয়েরা যখন এক সাঁতারে আরেক পাড়ে চলে যায়, এক ডুবে মাঝপুকুর থেকে ঘাটের কাছে এসে মাথা তোলে, আমি মুগ্ধ চোখে, ঘাটে বসে, দু'পা ভিজিয়ে জলে, ওদের দেখি। আমাকে খালি গায়ে দেখে মেয়েরা বলাবলি করে, *ঢেঙ্গি ছেড়ির অহনো বুনি উডে নাই।*

শরাফ মামা খলসে মাছে ভরা পুকুরে উল্টো সাঁতার, ডুব সাঁতার দিয়ে শাপলা ফুল ছিঁড়ে এনে পাড়ে বসে থাকা আমাকে বলতেন, *সাঁতার শিখবি? বেশি কইরা পিঁপড়া খা, তাইলে সাঁতার পারবি।* পিঁপড়ে ধরা চিনি গুড় খেয়ে পুকুরে নেমে সাঁতরাতে চেষ্টা করেছি অনেকদিন, জল আমার দু'পা টেনে পাকে ফেলে নিয়ে যায় জলের তলে। হাঁসপুর গ্রামের ন্যাংটো পোলাপানও জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরায়, দেখে শরম লাগে, এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে আজও কোমর জলে কলমিলতার মত দাঁড়িয়ে থাকি। মনে মনে ওদের মত সারাপুকুর সাঁতার কাটি, এক পাড় থেকে আরেক পাড়। গা পোড়া দুপুরে ঠাণ্ডা জলে ঢেউ তুলে সাঁতরানোর মত আনন্দ আর হয় না! মা খবর পাঠান, *পুষ্কনিতে বেশিক্ষণ পইরা থাকলে ঠাণ্ডা লাইগা জ্বর আইব।* কোমর জল থেকে শহুরে মেয়েকে উঠে আসতে হয় ডাঙায়। ডাঙা তো নয়, আস্ত একটি চুলো।

ডাঙায় অনেক কাণ্ড ঘটে বটে। পাঞ্জাবিরা পুড়িয়ে দিচ্ছে গ্রামের বাড়িঘর, পোড়া বাড়ির বউঝিরা হাঁসপুরের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কপাল চাপড়ায়। হাঁসপুর থমথম করে, যেন এক্ষুণি বোমা পড়বে হাঁসপুরের চাঁদিতে। গ্রামের দুটো বাড়িতে রেডিও আছে। যে বাড়িতে বেমক্কা উঠেছি আমরা, আমি মা নানি ছটকু ইয়াসমিন, সে বাড়িতে; আরেকটি রেডিও কাসেম শিকদারের বাড়ি। সন্ধের পর দু'বাড়িতে লোক ভিড় করে রেডিওর খবর শুনতে।

রেডিও শুনতে আসা লোকেরা উঠোনের শীতল পাটিতে বসে হুঁকো টানেন, হুঁকো ঘোরে এক মুখ থেকে আরেক মুখে। গেল দু'মাস ধরে টাক মাথা গাল ফোলা সবুজ লুঙ্গি লোকটি বলে আসছেন – *স্বাধীন বাংলার খবরে কইছে মুক্তিবাহিনী আইতাছে, আর দেরি নাই।*

ডালিমের শ্বশুর জলচৌকিতে বসে তাঁর মিশমিশে কালো পিঠে ছপছপ করে গামছা মেরে মশা তাড়ান। আঙুলে থুতনির শাদা দাড়ি আঁচড়ে বলেন – *মিলিটারির লগে কেমনে পারব হেরা? ভারত থেইকা নাকি টেরনিং লইয়া আইতাছে। গেরামের জমিরালি, তুরাব, জব্বর, ধনু মিয়া বেবাকে তো যুদ্ধে গেল। এগো নাক টিপলে দুধ বারয়, এরা কিয়ের যুদ্ধ করব! ঢাকায় তো মানুষ মইরা ছারখার! গেরাম কে গেরাম জ্বালাইয়া দিতাছে, মিলিটারিরা কি মানুষ! ওরা অইল জানোয়ারের জাত। আমারে তো ত্রিশাল বাজারে এক সিপাই জিগায় আপকা নাম কেয়া হায়? আমি কই আমার নাম দিয়া তুমার কাম কি হালা। চানতারা মজজিদের ইমাম দেখলাম, সিপাইএর পিছন পিছন চলে। ইমাম সাইবের মতলব আমার ভালা ঠেকল না।*

হাম করে তারু খলিফা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বুড়ো চোখে ভাল দেখেন না, হাতে বাঁশের লাঠি, পরনের গেঞ্জিখানা ছিঁড়ে ত্যানা ত্যানা, লোকে বলে এ বুড়োর খতিতে আসলে ম্যালা পয়সা, বুড়ো ছিলেন ত্রিশাল বাজারের দরজি, বাঁ চোখ নষ্ট হওয়ার পর দরজিগিরি ছেড়ে ছেলের বাড়িতে, হাঁসপুরে থাকেন, মাঝে মাঝে এ বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যান, কই যান কেউ জানে না, মাস গেলে ফেরত আসেন। যুদ্ধ বাঁধার পর তারু খলিফা হাঁসপুর গ্রাম ছেড়ে আর কোথাও উধাও হননি। সন্ধে হলে রেডিও শুনতে এ বাড়িতে আসেন। তারু খলিফা কথা কম বলার লোক, বেশির ভাগই মাথা ডান কাঁধে ফেলে অন্যের কথা শোনেন, পছন্দ না হলে থেকে থেকে হাম বলেন, এরপর ফাঁক পেলে

নিজের যা মত তা গুছিয়ে বলেন। তারু খলিফার হাম শোনার পর হুঁকোর গড়ড়ড় গড়ড়ড় শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। টাক মাথা গাল ফোলা সবুজ লুঙ্গির পিঠ ছিল তারু খলিফার দিকে, তিনি গা ঘুরিয়ে বসেন। বুড়ো আরও দু'তিনটে হাম বলার পর বলেন, *মুক্তিবাহিনীরা দেশ স্বাধীন করবই। আমগো গেরিলারা আগাইতাছে। দরকার অইলে ভারতের সৈন্য নামব দেশে। এই দেশ আমাগো অইব। শেখ মুজিবর দেশ চালাইব, আয়ুব ইয়াইয়ার আমল যাইব, জম্মের মত যাইব।*

তারু খলিফার কথা শেষ হলে সবুজ লুঙ্গি গলা তুলে বলেন, *এই সিরাজ্যা, একটা পাঙ্খা দিয়া যা।*

হলুদ দাঁতের ছেলেটি ঝাঁ করে উড়ে এসে ঘর থেকে একটি তালপাতার পাখা এনে দেয় সবুজ লুঙ্গিকে। গায়ে ধুলো কাদা নেই, মাছ টাছ ধরে সাফ সুতরো হয়ে ঘরে ফিরেছে হলুদ দাঁত। সবুজ লুঙ্গি এক হাতে গা চুলকোন, আরেক হাতে বাতাস করেন নিজেকে। ঘরের বউ ঝিরা ঘরের বেড়ায় কান পেতে উঠোনে বসা পুরুষের কথা বার্তা শোনেন। বিছানার ওপর পুঁটলির মত বসে থাকেন নানি, নানির চোখের তারা নড়ে না।

ভূতের ভয়ের ওপর মিলিটারির ভয় বুকে বাবুই পাখির মত বাসা বাঁধে আমার।

তারু খলিফার কথাই ঠিক, মুক্তিবাহিনীরা শেষ অবদি স্বাধীন করেছে দেশ। আমরা তখন দাপুনিয়া নামের এক গ্রামে। শীতের সকালে বৈঠক ঘরের দাওয়ায় বসে রোদ পোহাচ্ছি আর মুখ থেকে ফকফক করে ধোঁয়া ছাড়ছি। হঠাৎ শুনি চিৎকার, চিৎকার। চিৎকারের উৎস দেখতে পাকা রাস্তার দিকে দৌড়োয় পোলাপান। কান পেতে থেকে বুঝি উৎস ক্রমে ক্রমে এগোচ্ছে এদিকেই। লোকের চোখে কৌতূহল, কী হল, কী হল, কারা আসে আবার দাপুনিয়ায়! আবার কি ঘর পোড়ার খবর, লাশের খবর! গত সাতদিন ধরে নাগারে গুলির শব্দ শুনে দাপুনিয়া গ্রামের কানে তালা লেগে গেছে। উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে দাপুনিয়া শ্বাসের মত করে শ্বাস নেয়নি। এখন কে আসে চিৎকার করে এই গ্রামে! কে আসে এই সকালে পাকা রাস্তা ধরে? মিলিটারি? না, এ ঠিক মিলিটারির শব্দ নয়। মুখ চাওয়া চাওয়ি করে এ ওর। বাড়ির মেয়েরা জানলার পর্দা ফাঁক করে তাকিয়ে থাকে এখনও না আসা উৎসের দিকে। আমি পর্দা ফাঁকের মধ্যে নেই, ছেলেপিলেদের ভিড়ে মিশে যেতে পারি, এখনও ডাঙর হইনি, *ঢেঙ্গি ছেড়ির বুনি উডে নাই।* উৎসের এ চিৎকার অন্যরকম, রোম দাঁড়িয়ে যায় গায়ের, আশায়। মনে আমার একশ পায়রা ওড়ে ডানা মেলে।

উৎস এগোতে থাকে দাপুনিয়া বাজারের দিকে, বন্দুক হাতে বিশ পঁচিশজন যুবক, শম্ভুগঞ্জে আমাদের তিন চাকার গাড়ি আটকানো যুবকগুলোর মত দেখতে, ট্রাকে দাঁড়িয়ে *জয় বাংলা* বলে চিৎকার করছে। কী তেজি এই রোল, কী বিবশ করা এই উত্তেজনা! দাপুনিয়ার স্তব্ধতা চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়ে। মানুষ যেন আঁধার গুহা থেকে এক যুগ পর বেরিয়েই দেখছে আলো ঝলকানো জগত। হিম-ঠাণ্ডা নদীতে ডুবতে ডুবতে হাতের কাছে পেয়েছে পাল তোলা নৌকো। দাপুনিয়া গ্রামের মানুষ এতকাল মনে মনে, বড়জোর ফিসফিসিয়ে এ ওর কানে কানে বলেছে *জয় বাংলা।* আজ তারা হররা শুনছে জয় বাংলার। ত্রাসের চাদর ছুঁড়ে ফেলে মানুষ গলা ফাটায় *জয় বাংলা* বলে। আমিও। ওদের মত

হাতের মুঠি তুলে চিৎকার করি। মানুষ ছোটে ট্রাকের পেছন পেছন, *জয় বাংলার* পেছন পেছন, *মুক্তির* পেছন পেছন। আমি দৌড়ে বাড়ির ভেতর ঢুকি, মা'কে খবর দিতে। মা জানালায় দাঁড়িয়েছিলেন।

মা জয় বাংলা কও। দেশ স্বাধীন অইছে। দু'পাক নেচে বলি।

মা হাসছেন আর গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে তাঁর। আঁচলে মুছছেন জল, আবারও ঝরছে। আবারও হাসছেন তিনি। একই মুখে হাসি, কান্না দুটোই।

নানির চোখের তারা নড়ে না। সেই কবে থেকে পাথর হয়ে আছেন তিনি, পাথরে টোকা দিলে ঠমঠম শব্দ হয়, নানির গা থেকে সে শব্দও হয় না। নানি কেন তাঁর পান খাওয়া খয়েরি দাঁত মেলে হাসছেন না, মন কি মরে আছে প্লাস্টিকের ঝুড়িটির শোকে, যেটিকে আর তাঁর শক্ত করে ধরতে হয় না, পেটের ভেতর পুঁটলি করে পুঁটলি হয়ে বসতে হয় না!

রাস্তায় এখনও জটলা, মানুষ দৌড়োচ্ছে, *জয় বাংলা জয় বাংলা* বলে দাপুনিয়া মাথায় তুলছে। কাল ছিল গুলির শব্দ, মরাকান্না, আজ হাসি, আজ উল্লাস, আজ হৈ হৈ, আজ *জয় বাংলা। জয় বাংলা* মানে কেউ আর কারও বাড়ি পুড়বে না, আর কেউ কাউকে গুলি করবে না, কোথাও বোমা পড়বে না, কেউ আর কাউকে ধরে নিয়ে যাবে না চোখ বেঁধে, বাতাসে লাশের গন্ধ ভাসবে না, আকাশে ভিড় করবে না শকুনের দল, আমরা ফিরে যাব শহরের বাড়িতে, আমার ফেলে আসা ঘরটিতে ঘুমোব কোলবালিশ বুকে জড়িয়ে, আমার মাপুতুল মেয়েপুতুল এখনও ওদের ছোট্ট খাটে ঘুমিয়ে আছে, গিয়ে ওদের ঘুম ভাঙাব।

উত্তেজনা আমার পেছন পেছন নাকি আমি তার পেছন, নাকি উত্তেজনা আমার কাঁধের ওপর, নাকি আমি তার কাঁধের ওপর, না বুঝেই দৌড়ে যাই আবার সেই জটলার দিকে, মিছিলের দিকে। মিছিলে খালেদকে দেখি সবার সামনে, হাতে বাঁশের কঞ্চির ওপর বাঁধা পতাকা, সবুজের মধ্যে লাল এক গোল্লা, গোল্লার মধ্যে তোবড়ানো হলুদ কাপড়। খালেদের পেছন পেছন গ্রামের ছেলে কী ছোকরা কী যুবক, সব।

ভিড়ের মধ্যে ছটকুর হাতেও দেখি ঠিক ওরকম এক পতাকা। আমারও ইচ্ছে করে একটি পতাকা হাতে পেতে। এ একেবারে নতুন পতাকা। ইস্কুলে সবুজের মধ্যে চাঁদ তারা আঁকা পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের গাইতে হত *পাক সার জমিন সাদ বাদ।* ছোটদা যখন মিছিল করতেন *আয়ুব শাহি ধ্বংস হোক* বলে, একদিন তোশকের তল থেকে চাঁদ তারার সবুজ পতাকাটি নিয়ে গিয়েছিলেন হাতে করে। মিছিল থেকে সন্ধেয় ফিরে এসে ছোটদা বাড়িতে জানিয়ে দিলেন, *আইজকা মিছিলে পতাকা পুড়াইছি।*

মিছিল শেষ করে রাস্তার কিনারের এক কাঁঠাল গাছের ডালে চড়ে হাতের পতাকাটি উড়িয়ে খালেদ বলেন *এইটা হইল জয় বাংলার পতাকা। এখন থেইকা এইটাই আমাদের পতাকা। সবাই বল জয় বাংলা। সবুজ রং হচ্ছে গিয়া আমাদের সবুজ ধানক্ষেত, মধ্যে লাল সূর্য, আর সূর্যের মাঝখানে আমাদের মানচিত্র। নয় মাস যুদ্ধ করে আমরা একটা দেশ পাইছি, দেশের নাম আজ থেইকা পূর্ব পাকিস্তান না, দেশের নাম জয় বাংলা। সবাই বল জয় বাংলা।*

সবাই বলে *জয় বাংলা।* খালেদ নেমে আসেন ডাল থেকে। পরনে তাঁর শাদা লুঙ্গি, শাদা শার্ট। কালো চুল, কালো মুখ, মুখে লাল ব্রণ ওঠা খালেদ। চোখদুটো বড় বড়, দুটো কালো ভ্রমর যেন। রাতে, বাড়ির সব যখন ঘুমিয়ে গিয়েছিল আর আমি বালিশ থেকে মাথা তুলে বেড়ায় হেলান দিয়ে রাখা বন্দুকের দিকে হাঁ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম, কারও পায়ের আওয়াজ পেয়ে আবার কাঁথার তলে ডুবে গিয়েছিলাম, বন্দুকে গুলি ভরার শব্দ শুনে কাঁথা সরিয়ে ভ্রমর চোখদুটো দেখেছিলাম, খালেদ বলেছিলেন — *এইটা কি জানো?*

মাথা নেড়ে বলেছি, *জানি, বন্দুক।*

বন্দুকের এই হচ্ছে বাঁট, আর এইখানে বুলেট থাকে, এইটার নাম হইল ট্রিগার, এইখানে টিপলেই গুলি বার হয়। খালেদ বন্দুকের গায়ে হাত রেখে রেখে বলেন।

আপনে কি মানুষ মারেন? প্রশ্ন করে শুকনো মুখে থাকি উত্তরের তৃষ্ণায়।

খালেদ হেসে বলেন, *আমি শত্রু মারি।*

বন্দুকটি খড়ের নিচে লুকোনো ছিল অনেকদিন, যে খড়ের ওপর বিছানা পেতে আমরা ঘুমোই, তার; কে জানতো! আচমকা বাড়ি ফিরে বিছানা সরিয়ে খড় সরিয়ে বন্দুক বের করে আনেন খালেদ। আর রাত ঘন হলে গা খানা কালো চাদরে মুড়ে বন্দুক হাতে বেরিয়ে যান।

দাপুনিয়ার এ বাড়িতে আসার পর সে রাতেই প্রথম খালেদকে দেখেছি। আর আজ দ্বিতীয়বার। খালেদ দেখতে হাশেম মামার মত। দু'জন নাকি *হরিহর আত্মা।* এক ইস্কুলে পড়েছেন। এক থালায় ভাত খেয়েছেন। হাশেমমামা যুদ্ধে গেছেন শুনে খালেদও গেছেন।

কাঁথা মুড়ে শুয়ে পড়ি খড়ের ওপর, খড় ওম দেবে শীতে। ছটকু ঘুমিয়ে কাদা। ছটকু সেরাতে এভাবেই ঘুমিয়েছিল, মাথায় বালিশ পড়তেই ছটকুর ঘুম এসে যায়। ও না ঘুমোলে নির্ঘাত চেঁচাত, আর ওরা ঠিক গুলি করে মারত ওকে, কেবল ওকে কেন, যারা ঘুমিয়ে ছিলাম ও বিছানায় — আমাকে, ইয়াসমিনকে। আমি অবশ্য ঘুমোইনি, ঘুমের ভান করে পড়েছিলাম, যেন ঘুমের মধ্যে আমি তখন ঘুমরাজ্যের ঘুমপরীর সঙ্গে খেলা করছি, দোলনা দুলছি, যেন আমি আর মানুষের দেশে নেই, যেন আমি কিছুই টের পাচ্ছি না ঘরে অনেকগুলো বুট পরা লোক হাঁটছে, কাঁধে তাদের বন্দুক, তারা যে কোনও সময় হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে ইয়ার্কি করতে করতে গুলি করে মারতে পারে যে কাউকে, কেউ ঘুমিয়ে নেই জানলেই তার খুলি উড়ে যাবে গুলিতে, তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে ক্যাম্পে, ক্যাম্পে নিয়ে চাবকে চাবকে বেয়নেটের গুঁতোয় গুঁতোয় হাড়গোড় গুঁড়ো করা হবে। বুট পরা লোক যা খুশি করুক, তুমি ঘুমিয়ে থাকো মেয়ে, তোমার চোখের পাতা যেন না নড়ে, তোমার গা হাত পা কিছু যেন না নড়ে, হাতের কোনও আঙুল যেন না নড়ে, তোমার বুক যেন না কাঁপে, যদি কাঁপেই যেন বুকের কাঁপন ওরা, যখন মশারি তুলে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, টর্চের আলো ফেলবে তোমার ওপর, তোমার মুখে, তোমার বুকে, তোমার উরুতে, চোখ থেকে লালা গড়াবে, জিভ বেয়ে আগুন ঝরবে আর কথা বলবে এমন ভাষায় যা তুমি বোঝ না, টের না পায়। টের না পায় তোমার এক ফোঁটা অস্তিত্ব, টের না পায় তুমি আছ, তুমি জেগে আছ, যদিও তুমি আছ, জেগে আছ।যদি পায়ই টের, তবে যেন ওরা বলতে বলতে চলে যায়, তুমি *ঢেঙ্গি মেয়ে* কেবল, তুমি কিশোরী হওনি, যুবতী হওনি, এখনও তোমার *বুনি উড়ে নাই।*

আমার গা বেয়ে ঠান্ডা একটি সাপ হাঁটছিল, সাপটি আমার গলা পেঁচিয়ে ছিল, আমার কষ্ট হচ্ছিল নিঃশ্বাস নিতে, তবু আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম, টর্চের আলোয় আমার চোখের পাতা কাঁপতে চাইছিল, তবু আমি চোখের পাতা রাখছিলাম চোখের ওপর, ছটকুর ঠ্যাং একটি তোলা ছিল আমার ঠ্যাংয়ের ওপর, ঠ্যাংটিকে ওভাবেই পড়ে থাকতে দিচ্ছিলাম, আমার হাত একটি পড়ে ছিল ইয়াসমিনের পেটের ওপর, সেটিকে ইয়াসমিনের পেটের ওপরই পড়ে থাকতে দিচ্ছিলাম, কোলবালিশ ছিল আমার পিঠের পেছনে, সেটিকে পিঠের পেছনে দিচ্ছিলাম পড়ে থাকতে।

বুটজুতোর লোকগুলো দাঁড়িয়েছিল খাটের কিনারে, এক হাতে মশারি, আরেক হাতে টর্চ আর চোখগুলো জিভগুলো লালাঝরা আগুনঝরা আমার চুলেচোখেনাকে কানেগলায়বুকেপেটেতলপেটেউরুতেঠ্যাঙেপায়ে। ওদের গা থেকে গড়িয়ে ঠান্ডা সাপ সড়সড় করে নেমে এল আমার শরীরে, সারা শরীর হেঁটে বেড়ালো, পিঠে পেটে তলপেটে, যৌনাঙ্গে, শুঁকল। সাপ ঢুকে গেল আমার মাংসের ভেতর, হাড়ের ভেতর, রক্তে, মজ্জার ভেতর।

বন্দুক নিয়ে, খানিকটা নুয়ে, যেহেতু তাঁর মাথা দরজার মাথা ছাড়িয়ে যায়, খালেদ চলে যাওয়ার পর আমার হাড়ের ভেতর সেই ঠান্ডা সাপটি আবার হাঁটে। আমি চোখ খুলে রাখি যদি দেখতে পাই বুট পায়ে কেউ আসে, মাথায় হেলমেট পরা কেউ, জলপাই রঙের পোশাক পরা। খড়ের ওম, গায়ের কাঁথা, কিছুই আমার ঠান্ডা হয়ে থাকা শরীরকে উষ্ণ করে না। সাপ আমার শরীর ছেড়ে নড়ে না।

ওভাবে কতক্ষণ পড়ে ছিলাম আমি! কতক্ষণ ঘুমের মত করে না ঘুমোনো মেয়ে! মনে হচ্ছে বছর পার হচ্ছে, ওরা তবু টর্চের আলো নিবোচ্ছে না, যুগ পার হচ্ছে তবু মশারি ছাড়ছে না হাত থেকে। মনে হচ্ছে, ঠান্ডা হয়ে হয়ে আমি মরে যাচ্ছি। হালকা হয়ে যাচ্ছে সমস্ত শরীর, কবুতরের গা থেকে ঝরা একটি পালকের মত। আমি আর ঘুমে কাদা ছটকু আর ইয়াসমিনের মধ্যিখানে শোয়া নেই, আমাকে উত্তুরে হাওয়া এসে নিয়ে যাচ্ছে চাঁদের দেশে। সামনে বুট পরা কেউ আর দাঁড়িয়ে দেখছে না, সবার নাগাল ছেড়ে আমি অন্য এক দেশে।

চাঁদের বুড়ি চরকা কাটছে আর হাত নেড়ে আমাকে বলছে *এসো হে এসো।* ও চাঁদের বুড়ি গো আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে, জল দেবে? জল? চাঁদে তো জল নেই। কী বল, চাঁদে জল নেই! আমি যে তবে মরে যাব। তেষ্টায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। বুটের শব্দগুলো দূরে চলে যাচ্ছে, এ ঘর থেকে দূরে, আরেক ঘরে। চাঁদের বুড়ি বলে চোখ খোল মেয়ে, তুমি ঘামছ কেন শীতের রাতে! না বুড়ি আমি চোখ খুলব না, চোখ খুললে আমি আগুন দেখব আর লালা দেখব, ঠান্ডা একটি সাপ দেখব আমার গায়ে, আমি চোখ খুলব না। চোখ বুজেই ছিলাম, ইয়াসমিনের পেটের ওপর আমার হাত, আমার ঠ্যাংয়ের ওপর ছটকুর ঠ্যাং।

দূর থেকে ভেসে আসে বাঁশির সুর, কে বাঁশি বাজায় এত রাতে। কে আমার ঘুম ভাঙাতে চায় অসময়ে, আমি আজ রাতে আর জাগব না, শুনশান রাতে সকলে ঘুমিয়ে পড়, চোখ বোজ সকলে, ঘুমমেঘ তোমাদের ওড়াতে ওড়াতে চাঁদের দেশে নিয়ে যাবে,

চাঁদের বুড়ি কোনও টুঁ শব্দ করবে না, চরকা কাটা ফেলে বুড়িও মেঘের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে যাবে।

এ আসলে বাঁশির মত, বাঁশি নয়। এ আমার মা'র ফোঁপানো কান্না। মা কোথাও কাঁদছেন, ঘরে নয়, ঘরের বাইরে। মা সেই মাটিতে লুটিয়ে কাঁদছেন, যে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন বাবা। রাসু খালু বলছেন *না মরে নাই, বড়বু কাঁইন্দেন না, দুলাভাই মরে নাই।* কিন্তু মরার মত। রাসু খালু নারকেল গাছের পেছনে দু'হাত বাঁধা বাবার বাঁধন খুলে দিলেন আর তাঁর কাঁধ থেকে বাবার মাথা পিছলে গেল, পিছলে যেতে যেতে মাটিতে, ঘাসে, উপুড় হয়ে।

বাবার শরীরখানা টেনে ঘরে তোলেন তিনি। ঘরের মেঝেয় পড়ে থাকে প্রায় নিস্পন্দ শরীর, রক্ত ঝরছে মুখ থেকে, বুক থেকে, পেট থেকে। রাসু খালুর এ বাড়িতে থাকার কথা নয়, এসেছিলেন দরদালানের ফাঁক ফোকরে লুকোতে। আমাদের থাকার কথা দাপুনিয়া। হাঁসপুরে ঘরপোড়া ধোঁয়া ওড়ে, তাই হাসঁপুর থেকে অন্ধকারে পালাতে হয়েছিল দাপুনিয়া। সেখানে, পাকা রাস্তার কিনারে বাড়ি খালেদের, হাশেম মামার *হরিহর আত্মার,* সে বাড়ির ভেতরে গা ঢেকে বসে ছিলাম। শহর থেকে বাতাস ভেসে আসে খবর নিয়ে, *গন্ডোগোল থামছে।* সেই বাতাসের পেছন পেছন তহবনের ফতফত শব্দ তুলে হাত বৈঠার মত নেড়ে হন হন করে হেঁটে এসে নানা, দাপুনিয়া বাজারের দক্ষিণে, খালেদের বাড়িতে, বলেন – *চল চল বাড়ি চল, গন্ডোগোল থামছে।* নানার চিবুকের দাড়ি বাতাসে নড়ে, ডানে বাঁয়ে। শুনে, পুঁটলি-পাঁটলিসহ, প্লাস্টিকের ঝুড়িসহ নানি আমি মা ছটকু ইয়াসমিন রওনা দিই শহরের দিকে। নানি চলে গেলেন এঁদো গলির পুকুর পাড়ে, চৌচালা ঘরে। আর মা তাঁর দু মেয়ে নিয়ে *অবকাশের* কালো ফটক খুলতেই বাবা বলেন – *এ কী করলা, শহরে আইছ কেন, যুদ্ধ শেষ অয় নাই তো!*

যুদ্ধ শেষ হয়নি তা পাড়া দেখেই টের পেয়েছি। অর্চনাদের বাড়ি খাঁ খাঁ করছে, প্রফুল্লদের বাড়িও। বিভাদের বাড়িতে বিভারা নেই, অদ্ভুত সব মানুষেরা, ভিন ভাষায় কথা বলে।

বাবা বলেন, *বিহারিরা সব হিন্দু বাড়ি দখল কইরা রইছে।*

উঠোনে ঘাসগুলো আমার মাথা সমান লম্বা হয়ে গেছে, যেন এ বাড়িতে হাজার বছর ধরে কেউ থাকে না। মুক্তাগাছার জমিদার বাড়ি দেখেছিলাম এমন, দালান থেকে চুনসুরকি ইট খসে পড়ছে, লম্বা ঘাসের ভেতর সড়সড় করে সাপ হাঁটছে আর ঘরগুলোর ভেতর হু হু হু হু করে ভুতের সঙ্গে ডাংগুটি খেলছে বাতাস।

উৎকণ্ঠার গলা-জলে ডুবে বাবা বলেন, *শহরের অবস্থা ভাল না। ডাক বাংলায় মিলিটারি ভর্তি। রাইতটা কাটাইয়া সকালে রওনা দেও।*

হ্যাঁ, তাই কথা ছিল। মা বড়দাদাকে পাঠিয়ে নানিকে ডেকে আনেন *অবকাশে।* চৌচালা ঘরে, টোকা দিলে খসে পড়বে দরজা জানালা, আবার না ডাকাতি হয়ে যায়। নানিও বোরখার তলে দু'হাতে প্লস্টিকের ঝুড়ি চেপে রিক্সা করে পৌঁছে যান দালানে, নিরাপত্তায়। রাত গিয়ে সকাল হলেই দাপুনিয়া রওনা হতে হবে। নিঝুম বাড়িতে নানি পেতেছিলেন জায়নামাজ। জায়নামাজের কিনারে, দেয়াল ঘেঁসে রেখেছিলেন নীল

প্লাস্টিকের ঝুড়ি। চিঁড়ামুড়ি,গুড়। নামাজে বসলেও নানি ক্ষণে ক্ষণে দেখেন ঝুড়িটি, ঠিক ঠিক আছে কি না। ঝুড়ি নড়ে না, নানি নড়েন। হাঁসপুকুরের বাড়িতে ঝুড়ির ভেতর হাত ঢুকিয়েছিলাম চিঁড়ে গুড় খাব বলে, নানি তখন নামাজে দাঁড়িয়ে হাতদুটো হাঁটুতে রেখে নুতে যাচ্ছিলেন, তাঁর আর নোয়া হয়নি, সেজদা হয়নি, চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে নিলেন ঝুড়িটি।

বলেছিলাম, *চিঁড়া খাইতে ইচ্ছা করতাছে।*

নানি ধমকে ওঠেন, *চিঁড়া খাইতে অইব না। ভাগ।*

নামাজ প্রায় পড়া শেষ করে এনেছেন, এমন সময় কালো ফটকে শব্দ হয় ভীষণ। ভীষণ সেই শব্দ, যেন এক পাল বুনো হাতি এসেছে কলাগাছের মত দাঁড়ানো বাড়িটি খেতে।

রাসু খালু দৌড়ে এসে নানিকে বলেন, *পালান পালান মিলিটারি।*

মা বসে কোরান পড়ছিলেন ঘরে, যে ঘরে ছটকু আমি ইয়াসমিন সবে শুয়েছি। রাসু খালুর *পালান পালান* শব্দ কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে কোরান ফেলে, পড়তে গিয়ে কোরানের ওপর রাখা ছিল অনন্ত বালা দুটো, ফেলে, মা ছুট ছুট।

মা আর নানি উঠোনের অন্ধকারে হারিয়ে যান, মেথর ঢোকার দরজা গলে খাঁ খাঁ করা প্রফুল্লদের বাড়ি।

বাবার শরীর পড়ে থাকে মেঝেয়। নানি অন্ধকার থেকে ফিরে জায়নামাজ পাতা জায়গায় হাতড়ান, আবছা আলোয় হাতড়ান আর বিড়বিড় করে বলেন, *আমার ঝুড়ি কই, এই রাসু এই ঈদুন, আমার ঝুড়ি কই?*

রাসু খালু চাপা স্বরে বলেন, *বাড়ি লুট হইয়া গেছে।*

মা ঘর থেকে ঘরে মোমবাতি হাতে ঘোরেন। আলমারি খোলেন, টাকা পয়সা নেই। কোরান আছে, কোরানের ওপর রাখা অনন্ত বালা নেই। নানির ঝুড়ি নেই।

পলকের মধ্যে এত কিছু ঘইটা গেল, নোমানের বাপরে মাইরা ফালাইয়া রাখল, বাড়ি লুট অইল। কী পাপে যে শহরে আইছিলাম! ও মা গো এ কী অইল গো! মা ফুঁপিয়ে বলতে থাকেন।

নানি হাতড়াতে থাকেন সারা ঘর। ঝুড়ি নেই। বাবার মুখ থেকে শব্দ বেরোয় *আহ উহ, পানি দেও।* রাসু খালু পানি ঢালেন বাবার মুখে। বাবার শরীর নড়ে না, ঠোঁট নড়ে। রাসু খালুর গা কাঁপে, ভয়ে। বাড়ির মেয়েমানুষদের বাইরে পাঠিয়ে তড়িঘড়ি তিনি লুকিয়েছিলেন খাটের তলে। মেয়েমানুষের প্রতি এদের বিষম লোভ, দেখলেই, কিশোরী কি মাঝবয়সী, এদের পান্তলুন ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে শক্ত দন্ড। বিছানার চাদরে গা মুড়ে বসেছিলেন তিনি খাটের তলে যেন দেখলে মনে হয় লেপ কম্বলের বস্তা। বিড়বিড় করে কলমা পড়ছিলেন, মরার আগে আগে কলমা পড়লে *ঈমান* মজবুত থাকে। বেরিয়ে এসেছেন কালো ফটকের বাইরে বুটের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ারও পর। গা এখনও কাঁপছে তাঁর, খাটের তলে যেমন কেঁপেছিল। বাবাকে পানি খাইয়ে গায়ের গেঞ্জি তুলে বুকে থু থু দেন রাসু খালু।

মার শরীরখানা ধপাশ করে মেঝেয় পড়ে —*সব্বনাশ অইয়া গেছে। মা'র ঝুড়ির ভিতরে চল্লিশ ভরি সোনা ছিল। বিশ হাজার টাকা ছিল। ঝুড়ি নাই।*

এত সোনা কই পাইছেন আম্মা? রাসু খালু চোখ গোল করে জিজ্ঞেস করেন।

বাড়ির সব বউ ঝিগোর সোনা। পাড়া পড়শির সোনা। পারুলের, ফজলির, রুনুর, ঝুনুর, সোহেলির মা'র, সুলেখার মা'র, আর সাহাব ভাইএর বউএর গয়নাগাটি। মা আমার লক্ষ্মী বইলা মা'র কাছে ওরা রাখতে দিছিল। মা ঘুমায় নাই। এক রাইতও ঘুমায় নাই। মাইনষের আমানত আগলাইয়া রাখছে।

ভূতে পাওয়া চিকন গলায় মা বলেন।

ঘরে মোমবাতি জ্বলে নিবু নিবু। মা বসে থাকেন মেঝেয়, বাবার না নড়া শরীরের কাছে। ফুঁপিয়ে কাঁদেন মা।

রাসু খালু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, *মাইনষে ত মাটির নিচে গয়নাগাটি টাকা পয়সা রাইখা দিছে। আম্মা আবার এইগুলা নিয়া চলতে গেছেন ক্যান? জান বাচানি ফরজ বড়বু। আপনাগোর ইজ্জত বাঁচছে, এইডা বড় কথা।*

নানি হাতড়ান সারাঘর। খাটের তলে, সোফার তলে, জায়নামাজের তলে। ঝুড়ি নেই তবু ঝুড়ি খোঁজেন।

গ.

নানি হাতড়ান হাড়গুলো। শহরের বড় মসজিদের কুয়ো থেকে হাড় তোলা হয়েছে। হাজার হাজার হাড়। হাড় দেখতে ভিড় করেছে অগুনতি মানুষ, হারিয়ে যাওয়া ছেলের হাড়, স্বামীর হাড়। নানি হাড়গুলো হাতড়ান। পায়ের হাড়, বুকের পাঁজর, হাতের হাড়, মাথার খুলি। নানি হাশেমের হাড় খোঁজেন। সন্ধে হয়ে আসে। মানুষেরা রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরে যায়। নানি মসজিদের কুয়োর পাড়ে বসে, হাড়ের পাহাড়ে ডুবে হাশেমের হাড় খোঁজেন।

জন্ম, আকিকা এসব

ক.

আমার জন্মের আগে দুটো ছেলে জন্মেছিল মা'র। ছেলে জন্মেছিল বলে রক্ষে। তা নইলে *বংশের বাতি* কে জ্বালাতো! মেয়েরা তো আর বংশের বাতি জ্বালানোর জন্য নয়। মেয়েরা ঘরের *শোভা* বাড়ানোর জন্য, সংসারের কাজে মা'কে সাহায্য করার জন্য, ঘরদোর সাফ রেখে ঘরের পুরুষের মনোতুষ্টি করার জন্য।

দুটো ছেলে হবার পর বাবা বললেন এবার *মেয়ে* চাই। ব্যস মেয়ে হল। মেয়ে হল উল্টো। ঠ্যাং আগে, মাথা পরে।

মা'র আঁতুড় ঘর ছিল এঁদো গলির ভেতর খলসে মাছে ভরা পুকুর পাড়ে নানির চৌচালা ঘরের পাশে ছোট্ট একটি চালা ঘর, যে ঘর মা'র জন্য বরাদ্দ হয়েছিল পাঁচশ টাকা দেনমোহরে রজব আলীর সঙ্গে বিয়ের পর। রজব আলী মোক্তার বাড়িতে জায়গির থেকে ডাক্তারি পড়তেন, ঈদুল ওয়ারা বেগমের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর শ্বশুর বাড়িতে উঠেছেন, কথা ছিল পাশ দিয়ে আলাদা বাড়িতে উঠে যাবেন। রজব আলীর পাশ হয়, চাকরি হয়, চালা ঘরেই দুই ছেলে হয়, রজব আলীর বউ পোয়াতি হন আবার, তবু চালা ঘর ছেড়ে কোথাও আর যাওয়া হয় না। পড়শিরা বলে *ঈদুনের জামাই দেখি ঘরজামাই হইয়াই রইল।* অপমানে মা'র মুখ বেগুনি হয়ে ওঠে। মা স্বামীকে ফাঁক পেলেই বলেন *ডাক্তার হইছ, টেকা কামাই কর, বউ পোলাপান লইয়া আলদা থাকার জো নাই? আর কতদিন শ্বশুরের বাড়িত থাকবা? মাইনষে ভালা কয় না।*

সরোজিনি ধাত্রী মা'র পেটের ওপর ত্যানা বিছিয়ে তার ওপর আংড়ার হাঁড়ি রেখে সারা পেট বোলান। মা ব্যথায় খামচে ধরেন ধাত্রীর হাত। মা'র হাতে পিয়াঁজের গন্ধ, নখের তলে হলুদ। খাচ্ছিলেন পাকঘরে বসে, খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই ব্যথা ওঠে, থাল ঠেলে পিঁড়ি ডিঙিয়ে চলে এসেছেন শোবার ঘরে, বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে শুরু হয় কাতরানো। নানি তাঁর কাতরানো মেয়ের মাথায় বাতাস করতে করতে বলছিলেন *সহ্য কর,সহ্য কর। মেয়ে মাইনষের সহ্যশক্তি না থাকলে চলে না।* নানা হনহনিয়ে হেঁটে গেছেন সরোজিনি ধাত্রীকে ডেকে আনতে। তিন মাস আগেও সরোজিনি ধাত্রী এ বাড়ি এসেছেন, নানি যেদিন জন্ম দিলেন ফেলুর। নানি নিঃশব্দে বিয়োন। পাড়া পড়শি কেন, বাড়ির লোকও টের পায় না। ব্যথা উঠলে পাকঘরে পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়েন। সরোজিনি ধাত্রী এসে চুলো থেকে মাটির হাঁড়িতে আংড়া তুলে পেটে আলতো করে বোলান। নানিকে আজকাল আর সরোজিনি ধাত্রীর বলতে হয় না *সহ্য করেন মাসি।* নানি নিজেই সহ্য করেন। দাঁতে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকেন পাটিতে। ষোল বাচ্চার জন্ম দিয়ে বাচ্চা হওয়া তাঁর কাছে এখন ডাল ভাত। ডাল ভাত হলেও এই বয়সে বিয়োতে তাঁর আর ভাল লাগে না। নাতি নাতনি বড় হচ্ছে, সংসার লোক বাড়ছে কচুরিপানার মত। এ সময়, সধবা কন্যারা পোঁয়াতি হবে, ছেলের বউ পোয়াতি হবে, তা না, নিজে ফি বছর আঁতুড় ঘরে

ঢুকছেন। সরোজিনি ধাত্রী মা'কে বলেন, *আগুনের তাপটা লাগলে বেদনা কমে, বাইচ্চা নিচের দিকে নামে। আরও একটু সহ্য কর ঈদুন। এইতো হইয়া গেল।*

বাবা বাড়ি ফিরে চামড়ার বাক্স খুলে ছুরি কাঁচি বের করেন। বাবার হাতেই মা'র দুটো ছেলে হয়েছে। এবার মেয়ে হবে, বাবা মেয়ে চেয়েছেন। সরোজিনি ধাত্রী হাত গুটিয়ে বসে থাকেন মা'র শিথানের কাছে। বাবা হাত ঢুকিয়ে দেন মা'র দু'উরু ফাঁক করে, ভেতরে। কলকল করে বেরিয়ে আসে ঘোলা পানি। সরোজিনি বলেন, *এই তো জল ভাঙছে, আর দেরি নাই।*

বাবা হাত ঠেলেন আরও ভেতরে, একেবারে থলের ভেতর। ঘাম জমে কপালে তাঁর। হাত কাঁপে। কাঁপা হাত বের করে কুয়োর পাড়ে যান। বালতি টেনে পানি তোলেন। হাত ধুয়ে ফেলেন পানিতে। নানি তাজ্জব, *রজব আলী হাত ধোয় কেন অসময়ে।*

বাবা বলেন, *আম্মা, ঈদুনরে হাসপাতালে নিতে অইব। বাচ্চা বাড়িতে হইব না।*

নানি স্বর চেপে বলেন, *এ কি কন! দুই বাচ্চা হইল বাড়িতে!*

এই বাচ্চা পেটের মধ্যে উল্টা হইয়া বসা। অপারেশন ছাড়া বাচ্চা হওয়ানো সম্ভব না। হাসপাতালে না নিলে বিপদ। শার্টের হাতায় কপালের ঘাম বাবা মুছে বলেন।

পানি ভাঙার পর গলা কাটা গরুর মত চেঁচান মা, বাড়ির লোক জাগছে, পড়শি জাগছে, নানির তিন মাস বয়সী ছেলে ফেলু জাগছে।

কুয়োর পাড় থেকে আঁতুড় ঘরে ফিরে বাবা দেখেন পা একখানা বেরিয়ে এসেছে আগন্তুকের। *হাসপাতালে নিতে নিতে যদি বাচ্চা পথেই মইরা যায়!* সরোজিনি ধাত্রী বলেন, কপালে ভাঁজ ফেলে। শুনে বাবার কপালেও ভাঁজ পড়ে, সংক্রামক ভাঁজ। কালো বিচ্ছু ভুরুদুটো গায়ে গায়ে লেগে থাকে যমজ ভাইএর মত। কানে নল লাগিয়ে বাচ্চার হৃদপিন্ডের শব্দ শোনেন লাব ডা...ব লা..ব ডাব লা–ব ডা–ব লাব ডা—ব লা–ব ডাব লা——ব ডা——। ভিজে পিঠের সঙ্গে লেগে থাকে পরনের শাদা শার্ট। এনাটমির ডাক্তার তিনি, লিটন মেডিকেল ইস্কুলে হাড়গোড় পড়ান ছাত্রদের, লাশ কাটা ঘরে মরা মানুষ কেটে মাংসের শিরার-ধমনির- স্নায়ুর পথঘাট চেনান। ফরামালিনে ডুবিয়ে রাখা হৃদপিন্ড, যকৃত, জরায়ু ট্রেতে করে এনে যেন চা বিস্কুট, শেখান নাড়িনক্ষত্র। প্রসূতি আর ধাত্রীবিদ্যায় বাবা দক্ষ নন তেমন। কিন্তু ঝুঁকি তাঁকে নিতেই হবে, হাল ছেড়ে দেওয়ার মানুষ নন তিনি। আবার ঢুকিয়ে দেন হাত, থরথর দ্বিধার আঙুল, ভেতর থেকে হাঁটু মোড়া পা খানি বের করে আনেন। দুটো পা ঝুলে থাকে বাইরে। এই আঁতুড় ঘরে, যেখানে একটি ছোট কাঁচি, দুটো ছুরি আর কিছু সুঁই সুতো ছাড়া অন্য কোনও যন্ত্র নেই, কি করে সম্ভব প্রসব করানো! বাবা তাঁর ঘামে ভেজা শার্ট খুলে রেখে উদ্বিগ্ন তাকিয়ে থাকেন বেরিয়ে থাকা পা দুটোর দিকে, আর মা'র ত্রাহি চিৎকারের দিকে, সরোজিনির গুটিয়ে রাখা হাতের দিকে। গলায় যদি নাভির নল পেঁচিয়ে থাকে, বাবা ভাবেন, শ্বাস বন্ধ হয়ে মরবে আগন্তুক। তিনি নিজের হৃদপিন্ডের শব্দ শোনেন টিপটিপ, আগন্তুকের হৃদপিন্ডের খবর নিতে তাঁর সাহস হয় না। সরোজিনি ধাত্রী মা'র শিথান থেকে সরে পৈথানে বসে বলেন, *পা দুইটা ধইরা টান দেন ডাকতার সাব।* টানাটানি করলে আবার কি না কি কান্ড ঘটে! বইয়ে পড়েছেন, বাচ্চা হয় মাথায় আঘাত খেয়ে, নয় গলায় নাভির ফাঁস লেগে মরে। ঝুঁকি

না নিয়ে অপরাশেন কর, *ফরসেপ* নয় *সিজারিয়ান।* দ্রুত তিনি আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে নানিকে ডেকে বলেন – *রিক্সা আনতে পাঠান কাউরে, হাসপাতালে নিতে হইব।*

আবার ঘরে ফিরে তিনি অস্থির হাঁটেন। ঘামে ভিজে হাতকাটা গেঞ্জি সপসপ করছে। মাথায় তাঁর বই পড়া বিদ্যে, তিনি জানেন পা দুটো ধরে সামনে টানলে বেরিয়ে আসবে পিঠ। তাই করেন, পিঠ বেরোতে শুরু করে।

নিচের দিকে চাপ দেও। মুখ বন্ধ কইরা শরীলের সমস্ত শক্তি দিয়া চাপ দেও।

বাবা দাঁত খিঁচে মা'কে বলেন। এবার আগন্তুকের গলা আটকে শরীর ঝুলে থাকে নিচে।

সরোজিনি বলেন, *মেয়ে হইছে। আপনে মেয়ে চাইছিলেন, পাইছেন।*

কিন্তু মেয়ের চাঁদমুখখানা তো আর জগতের আলো দেখে না। ডাক্তারি বিদ্যার ভাল ছাত্রের মাথায় গিজগিজ করা বিদ্যে। এনাটমির নামি শিক্ষক ঘরের বউএর ওপর তাঁর বিদ্যে খাটান। আগন্তুকের বুকের ওপর নল চেপে বেঁচে আছে কি না পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন, এখনও বেঁচে। দু'হাত ঢুকিয়ে মেয়ের মাথার দু'দিকে, আঙুল ঘি তোলে যেমন, তেমন করে ঢিলে করে সরাতে থাকেন গলায় পেঁচানো নাভি। সরোজিনি ধাত্রী মাকে বলেন –*ভগবানের নাম লও ঈদুন।*

দরজার ওপাশ থেকে নানি বলেন – *আল্লাহরে ডাক। আল্লাহরে ডাক ঈদুন।*

মা চিৎকার জুড়ে দেন *ও আল্লাহ ও আল্লাহ* বলে।

শেষ অবদি জগতে অবতরণ করি বটে, শ্বাসকষ্টে ভুগে, যায় যায় হৃদপিন্ড নিয়ে। আমার চিৎকারের তলে মা'র *ও আল্লাহ, ও আল্লাহ* ডাক ম্লান হয়ে যায়। গামলায় কুসুম গরম জলে আমাকে ভেজান সরোজিনি, গা সাফ করেন।

আঁতুড় ঘর থেকে ছোঁ মেরে আমাকে নিয়ে যান রুনু খালা। রুনু খালার হাত থেকে ঝুনু খালা, ঝুনু খালার হাত থেকে বড় মামা, বড় মামা বলেন – *এ তো দেখি আস্ত একটা রাজকন্যা। এই বাড়িতে রাজকন্যা হইছে।*

তখন সুবেহ সাদিক, আকাশ ফর্সা হচ্ছে। উঠোনে খুশির ধুম পড়ে যায়। দু'ছেলের পর এক মেয়ে। রাজকন্যার মুখ দেখতে ভিড় করেন হাশেম মামা, টুটু মামা, শরাফ মামা। ফজলি খালা রাজকন্যার মুখ দেখার আগে আতুঁড় ঘরে ঢুকে বলেন – *বড়বু, কী ভাল দিনে তোমার মেয়ে জন্মেছে গো! বারোই রবিউল আওয়াল, নবীজি এ দিনে জন্মেছিলেন। এ মেয়ে খুব পরহেজগার হবে। তোমার কপাল ভাল বড়বু।*

সকালে খাঁচা ভরে মিষ্টি কিনে আনেন নানা, আশে পাশের বাড়ি থেকে দল বেঁধে লোক আসে রবিউল আওয়াল মাসের বারো তারিখে জন্মানো মেয়ে দেখতে, *রাজকন্যা* দেখতে।

বড় হয়ে মা'র মুখে গপ্প শুনতে চাইলে মা গপ্প কিচ্ছা না বলে প্রায়ই বলতেন *তরে পেডো লইয়া কলপারে পিছলা খাইয়া পইড়া গেছিলাম। ভিতরে লইড়া গেছিলি, উল্টা হইছস। গোল টেবিলটার উপরে তরে শোয়াইয়া রাখছিল, এত বড় যে গোল টেবিল, তার অর্ধেক হইলি তুই। এরম বড় বাচ্চা আর কেউ দেখে নাই। মা কইত বাচ্চারে কাপড় চোপড়ে মুইড়া রাখ, কপালে নজর ফোঁটা দে। মাইনষের চোখ লাগব। দুই দিনের বাচ্চা*

দেইখা সোহেলির মা চোখ কপালে তুইলা কয়, কয় মাসের বাচ্চা এইটা? মনুর মা তর গুল মাথাডা দেইখ্যা কইল, বেলেরও ত এট্টু এবাডেবা আছে, এর কিচ্ছু নাই।

শুয়ে থাকা মা'র পেটের ওপর থুতনি রেখে বলেছিলাম – *বাচ্চা কেমনে হয় মা?*

মা শাড়ি সরিয়ে এঁটেল কাদার মত নরম পেট দেখিয়ে বলেছেন – *এইখানটায়, তুমার বাবা, ডাকতার তো, ব্লেড দিয়া কাইটা বাচ্চা বার করছে।*

তলপেটের শাদা দাগগুলো, একটি একটি করে দেখিয়ে বলেন, *এইটা হইল নোমান হওয়ার, এইটা কামালের, এইটা তোমার আর এইটা ইয়াসমিনের।*

করুণ চোখে তাকিয়ে থাকি শাদা দাগের দিকে। আলতো আঙুল বুলোই। মা'র জন্য বড় মায়া হয় আমার। বলি – *ইস, রক্ত বার হয় নাই?*

মা হেসে আমার চিবুকে টোকা দিয়ে বললেন – *তা হইছে। পরে সেলাই কইরা দিলে আবার ভালা হইয়া গেছি।*

খানিক পর আমাকে টেনে বুকে শুইয়ে মা বললেন – *আমি মইরা গেলে তুমি কানবা, মা?*

আমি ডানে বাঁয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলাম – *তুমি মরবা না। তুমি মইরা গেলে আমিও মইরা যাব।*

মা তাঁর উল্টো-মেয়েকে কোলে নিয়ে আনাজপাতি কোটেন, চুলোয় খড়ি গোঁজেন, ধোঁয়ায় জল জমে চোখে তাঁর। কোলের মধ্যে শুয়ে মেয়ে তাঁর ঘুমোয়, আবার জেগে ওঠে হলুদের, মরিচের, পিঁয়াজের আর তার মা'র ঘামের গন্ধে, কাকের কুকুরের শব্দে। মা কলঘরে গোসলে গেলে উঠোনে হিসির ওপর, ধুলোর ওপর একা বসে মুখে পুরতে থাকে ইটের টুকরো, বালু, কড়ইপাতা। দাদারা ইস্কুল থেকে ফিরে কাঁখে নিয়ে উঠোনে হাঁটেন। ছ'মাসের মেয়েকে কুয়োর ওপর বসিয়ে হাফপ্যান্টের ফিতে বাঁধেন ছোটদা। খানিকটা হেললেই কুয়োর জলে ডুবে টুপ করে মরে যেতে পারে কিন্তু পড়ে না, যে মেয়ে অমন ঝুঁকি নিয়েও জন্মেছে সে কেন কুয়োর জলে মরবে! আদরে, আহলাদে, হেলায় ফেলায় বড় হতে থাকে *রাজকন্যা।*

হ্যাঁ রাজকন্যা বড় হতে থাকে। বড় হতে হতে বয়স যখন এগারো, মা সেলাই মেশিনে ঘড়ঘড় শব্দ তুলে আমাকে পাজামা বানিয়ে দিলেন দু'জোড়া, বললেন এখন থেকে আমার আর হাফপ্যান্ট পরা চলবে না।, আমি বড় হয়ে গেছি। উতল দুটো চোখ জানালার বাইরে পাঠিয়ে মন খারাপ করা দুপুরে মা আমাকে বলেন –*তহন আমার মাথা খারাপ, সারাদিন কান্দি। তর বাপে রাজিয়া বেগমের প্রেমে পড়ছে। তার শার্ট ধুইতে গিয়া প্রায় দিনই বুক পকেটে চিঠি পাই, ওই বেটির লেখা। তুই খাটের ওপর থেইকা ধপাস ধপাস পড়স মাটিতে। মাথা ফাটে। তরে যত্ন করার মন নাই তহন আমার। কুনো কিছুতে মন বসাইতে পারি না। রাত কইরা বাড়ি ফিরে তর বাপ।*

রাজিয়া বেগম দেখতে সুন্দরী, *সুন্দরী* মানে হচ্ছে, মা'র সংজ্ঞায়, গায়ের রং ফর্সা। রাজিয়া বেগমের ফর্সা মুখে গরুর চোখের মত কালো ডাগর চোখ, ঠোঁট কমলার কোয়ার মত ঝুলে থাকে, কোমর অবদি ঘন কালো চুল, খোঁপা করলে মনে হয় মাথায় ডালি নিয়েছেন, স্তনদু'খানা এত বড় যে মনে হয় বইতে কষ্ট হচ্ছে, সিন্ধি গাভিদেরও কষ্ট হয়

বড় ওলান নিয়ে হাঁটতে। রাজিয়া বেগমকে কখনও না দেখে কেবল অনুমান করেই আমার মনে হয়েছিল যে দোয়ালে ঠিক দু'বালতি দুধ বের হবে ওর বুক থেকে। শরীর তো নয়, যেন ছোটখাট একটি পাহাড়। হাঁটলে মাটি কাঁপে। মা'র কালো রং, নারকেলের আর্চির মত এতটুকুন মাথায় ফিনফিনে চুল, ছোট ছোট চোখ, ভোঁতা নাক, ফড়িংএর ঠ্যাঙের মত টিঙটিঙে শরীর থেকে, মা ভাবেন, বাবার মন উঠেছে। মা হাতের কাছে যাকে পান তাকেই বলেন, *সব্বনাশ হইছে, আমার সব্বনাশ হইছে। নোমানের বাপ তো এহন চাকলাদারের বউরে বিয়া করব। আমি পোলাপান নিয়া কই যাই!*

মা'র সেই সব্বনাশের কালে, হেলা ফেলায় আমার মাথার গোল গেল ডেবে, বাসি দুধে, সাগুতে বার্লিতে, দাদার কণে আঙুল চুষে চুষে আমি যখন এগারো মাসে পড়ি, বাবা বদলি হলেন। যেন জাহান্নামের আগুনে পুড়ছিলেন, ফেরেসতা এসে জানালেন মা'কে *জান্নাতুল ফেরদাউসে* পাঠানো হবে, বদলির খবর শুনে মা'র তাই মনে হয়, ফূর্তিতে নাচেন মা। আলাদা একটি সংসারের স্বপ্ন মা'র বহুদিনের। দুর্মুখের মুখে ঝাঁটা মেরে, বাবার *ঘরজামাই* দুর্নাম ঘুচিয়ে, এঁদো গলির ভেতর খলসে মাছে ভরা পুকুর পাড়ের ছোট্ট ঘুপসি ঘর ফেলে, *রাজিয়া বেগম* নামের এক দুঃস্বপ্ন নর্দমায় ছুঁড়ে দূরের একটি শহরের দিকে রওনা হলেন মা।

জেলখানার ভেতর একটি চমৎকার বাড়ি জুটেছিল মা'র। কয়েদিরা জেলের ডাক্তারের বাড়িতে ফুট ফরমাশ খাটে সকাল বিকেল, মেয়ে কোলে নিয়ে বাগানে বেড়াতে বেরোয়, চোর ডাকাতের কোলে চড়েও মেয়ের গলার সোনার মালা গলাতেই থাকে। অবসরে মা চুল বাঁধেন, চোখে কাজল পরেন, মুখে পাউডার মাখেন, কুঁচি কেটে রঙিন শাড়ি পরেন। পাবনায় রাজিয়া বেগম নেই, বাবার রাতে রাতে বাড়ি ফেরা নেই, শার্টের পকেট থেকে টুপ করে কোনও প্রেমের চিঠি পড়া নেই। পড়শিদের সঙ্গে খাতির জমে ওঠে মা'র, বাড়ি বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়ান। সুখের চৌবাচ্চায় ডুবে থাকেন *ডাক্তারের বউ।* সুখ বেঁধে রাখেন চাবির সঙ্গে আঁচলের গিঁটে। তবুও বুকের খুব ভেতরে মা'র অসুখ জমে। সম্মোহের নিচে সংশয়, হর্ষের বাগানে হতাশা। স্বামী তাঁর অসম্ভব সুদর্শন পুরুষ, লাখে একজন, তায় ডাক্তার, আর নিজে তিনি সাত ক্লাস অবদি পড়া কালো কুচ্ছিত মেয়ে। তের বছর বয়সে ইস্কুল বন্ধ করে তাঁকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছে। বড় ছেলে যখন ইস্কুলে যায়, বায়না ধরলেন তিনিও যাবেন। বাবা তাঁকে *হারকিউলাস সাইকেলে* বসিয়ে ইস্কুলে দিয়ে আসতেন। আপত্তি তুললেন নানা, সাফ সাফ বলে দিলেন, *ঘরে বইসা পুলপান মানুষ কর। স্বামীর যত্ন নেও। মাইয়ামানষের অত নেকাপড়া করার দরকার নাই।* ব্যস, ইস্কুল বন্ধ করতে হল আবার। বাবা সাই সাই করে ওপরে ওঠেন, মা যে তিমিরে, সে তিমিরেই, সাত ক্লাসের জ্ঞানে, বুদ্ধিতে। বাবার মোটা মোটা ডাক্তারি বই মা খুলে খুলে দেখেন, ঝেড়ে মুছে গুছিয়ে রাখেন, বোঝেন স্বামীর তুলনায় অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ এক মানুষ তিনি। তাঁর আশংকা হয় বাবা তাঁকে হঠাৎ একদিন ছেড়ে কোথাও চলে যাবেন। আশংকার নীল মুখে মা শাদা পাউডার মাখেন, ছোট চোখজোড়া কাজলে কালো করে রাখেন যেন ডাগর লাগে দেখতে, যেন নিতান্ত কদাকার বলে কিছু না মনে হয় তাঁকে।

বছর পার হলে *জান্নাতুল ফিরদাউসের* পাট চুকোতে হয় মা'র। যেন চুল টেনে কেউ তাঁকে সুখের চৌবাচ্চা থেকে ওঠালো, আঁচলের গিঁট থেকে খুলে নিল স্বপ্নময় সংসার।

রাজিয়া বেগম থেকে দূরে থেকে আলাদা সংসার করা মা'র আর হয়ে ওঠে না, বাবা আপিসে দরখাস্ত করে আবার চাকরির বদলি করিয়েছেন, ময়মনসিংহে। বাক্স পেটরা নিয়ে তাই রওনা হতে হয় পুরোনো শহরে, পুরোনো বাড়িতে। আচমকা ধুলোঝড় এসে উড়িয়ে নেয় একটি তুচ্ছ ক্ষুদ্র মেয়ের নিভৃত স্বপ্ন। এবার আর নানির বাড়িতে মাগনা থাকা নয়, এক চুলোয় রান্না হওয়া নয়, আলাদা উঠোন, আলাদা চুলো। সবচেয়ে পুবের উঠোনে বাবা নগদ টাকা দিয়ে নানির কাছ থেকে দুটো ঘর কিনে নিলেন। মা, বাবাকে ঘরজামাই বলে কেউ ডাকবে না জেনেও খুশিতে উচ্ছল হন না। যেন তিনি সত্যিকার জেলখানায় ঢুকেছেন ফিরে এসে। পাবনার জেলকেই তাঁর মনে হয়েছিল খোলা একটি জগত। বাড়িতে পা দিয়ে হু হু করে কেঁদেছিলেন মা। মামা খালারা ভেবেছেন এ আনন্দাশ্রু। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরেছে, নানা হাঁফ ছেড়েছেন। রুনু আর ঝুনু খালার শুরু হল আমাকে নিয়ে লোফালুফি খেলা। আমি হাঁটছি কথা বলছি দৌড়োচ্ছি – এ যেন অদ্ভুত মজার ব্যাপার। যেন আমার ফিরে আসার কথা ছিল, যেমন গিয়েছিলাম তেমন। বাবা শহরে পা দিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন, মা'র একাকিত্ব বাবার পক্ষে অনুমান করা শক্ত। তাঁর সম্ভবত সময়ও নেই। তিনি মেডিকেল কলেজে ছাত্র পড়ানোর চাকরি শেষ করে বিকেলে *তাজ ফার্মেসি* নামে একটি ওষুধের দোকানের ভেতরে ছোট্ট একটি কোঠায় বসে রাত নটা অবদি রোগী দেখেন। *ডাক্তার* লেখা পর্দা সরিয়ে কোঠায় ঢুকতে হয়। ছ'বছর বয়সে আমাকে বেশ অনেকদিন যেতে হয়েছে বাবার ফার্মেসিতে, পেটে ইনজেকশন নিতে। ইস্কুল থেকে ফিরে বাঘা কুকুরটি আমাদের উঠোনে শুয়ে আছে দেখে আধলা ইট তুলে কুকুরটিকে ছুঁড়েছিলাম। বাঘাটি এমন চোখে তাকিয়েছিল আমার দিকে যেন ছিঁড়ে খাবে, সারা গা ঘাএ ভরা, লোম ওঠা, পাড়ার ছেলেরা কুকুরটিকে দেখলেই ঢিল ছোঁড়ে, তাই আমিও সেদিন। ঢিল ছুঁড়ে হাতের ধুলো ঝেড়ে যেই না সিঁড়িতে পা দেব, বাঘা উড়ে এসে আমার উরু কামড়ে ধরে। ধার-দাঁতে ছিঁড়ে নেয় শাদা মাংস। কুকুরের কামড় খাওয়া আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় বাবার ডাক্তারখানায়। প্রথমদিন দু'হাতে দুটো আর নাভির কিনারে একটি ইনজেকশন দিয়ে দেন বাবা, এরপর প্রতিদিন একটি করে চৌদ্দটি। ইনজেকশন দেওয়ার পর বাবা আমাকে *শ্রীকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভান্ডার* থেকে রসগোল্লা কিনে খাওয়াতেন। চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসে পিরিচ থেকে রসগোল্লা চামচে তুলে খেতাম। বিকেলের ফুরফুরে হাওয়ায় রিক্সায় চড়ে বাবার কাছে যাওয়ায় আমার বিষম আনন্দ হত। সুইঁ ফোঁড়ানোর ব্যথাও মনে হত নিতান্ত পিঁপড়ের কামড়। স্বদেশী বাজারে ওষুধের গন্ধঅলা দোকানটিতে বসে বাবার অপেক্ষায় রোগিদের বসে থাকা দেখতাম, বাবাকে দেখতাম রোগির নাড়ি টিপতে, রোগীকে শুইয়ে কানে নল লাগিয়ে রোগির বুক পেট পরীক্ষা করতে, কাগজে খচখচ করে ওষুধ লিখতে। বাবার অন্য এক রূপ আমার দেখা হয় তখন, রাতে ঘরে ফেরা ক্লান্ত বিরক্ত অস্পষ্ট অচেনা মানুষ নন তিনি আর। বাবাকে আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করত। কিন্তু তাঁকে ভালবাসা আমাদের কারও জন্য সহজ ছিল না।

বাবা হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে আসেন খোলস ছেড়ে। আলাদা বাড়িতে সংসার সাজানোর জিনিসপত্র কিনে গুছিয়ে বসার পর মা'কে বললেন *কী এখন খুশি হইছ ত? এখন ত আর তুমার জামাইরে কেউ ঘরজামাই কইত না।*

মা সস্তা লিপস্টিক মাখা ঠোঁটজোড়া ফুলিয়ে রঙিন কাচের চুড়িতে রিনিঝিনি শব্দ তুলে বলেন —*হ, কইত না। তাতে আমার কি! আমারে ত কইবই কালা পচা। লেখাপড়া নাই। বিদ্যাবুদ্ধি নাই।*

— *তুমি হইলা তিনজনের মা। মায়ের দায়িত্ব ছেলেমেয়ে মানুষ করা। এদেরে ভাল কইরা লেখাপড়া করাও, এতেই শান্তি পাইবা। তুমি কালাপচা হইলেও বিয়া ত আমি তুমারে করছি, করি নাই?* মা'র খোলা কোমর আঙুলে টিপে টিপে বাবা বলেন।

বাবার কথায় আর আদরে মা'র মন ভরে না। মা'র আবারও ভয় হতে থাকে রাজিয়া বেগম এই বুঝি বাবার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবেন। বাবার বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় রাত জেগে বসে থাকেন মা। বাইরে ঝিঁ ঝি ডাকে। কুকুর কাঁদে। রাত বাড়তে থাকে হু হু করে। দরজায় কড়া নড়ার শব্দ আবার নিজের শ্বাসের শব্দে হারিয়ে যাবে ভয়ে তিনি শ্বাস আটকে রাখেন। এক অমাবস্যার রাতে বাবা ফেরেন না, দু'উঠোন পেরিয়ে এসে নানিকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে মা বলেন —*ও মা, নোমানের বাবা ত এহনও ফিরতাছে না। এগারোডা বাইজা গেছে। না জানি কই গেল। না জানি ওই বেডির বাসাত রাইত কাটাইতাছে।*

নানি ধমকে থামান মা'কে —*যা ঘুমা গা। জামাইএর লাইগা ত কাইন্দা মরলি। নিজের স্বার্থডা দেখ। নিজের কথা ভাব। কানলে তর লাভ কি! তুই কি কাইন্দা বেডাইনরে ফিরাইতে পারবি?*

মা'র মনে পড়ে নানি কী মরা কান্না কেঁদেছিলেন যেদিন এক মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে নানা বাড়ি এলেন। দিব্যি বউএর সঙ্গে বিছানা পেতে শুতে শুরু করলেন, আর নানি পাশের বিছানায় শুয়ে সারারাত না ঘুমিয়ে কেঁদে বালিশ ভেজাতেন। মা জিজ্ঞেস করেছিলেন *এত কান্দো ক্যান মা?* নানি বলেছিলেন *বড় হ, বুঝবি। বুঝবি বেডাইনরে কুনো বিশ্বাস নাই। এগোর জাতটা বড় খারাপ।*

সে রাতে বাবা বাড়ি ফেরেন রাত দুটোয়। মা জেগেই ছিলেন। বাবা বললেন *এক রোগির বাড়িতে দেরি হইয়া গেল। রোগীর শ্বাস যায় যায় অবস্থা। তারে নিয়া আবার হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি।*

পরের রাতও ঘন হতে থাকে। বাবা বাড়ি ফেরেন না। মা ছোটদাকে ঘুম থেকে তুলে বললেন *চল। যেমনে আছস, চল।*

ছোটদার হাত ধরে টর্চ জ্বেলে অন্ধকার পুকুরঘাটের দিকে হনহন করে হাঁটেন মা। বড় রাস্তায় একটি রিক্সা জোটে, সেটি করেই পনেরো নম্বর পচা পুকুর পাড়ের বাড়িতে মাঝরাতে এসে থামেন। এক বুড়ো, খালি গা, লুঙ্গি পরা, বারান্দার চেয়ারে বসে হাওয়া খাচ্ছিলেন বাইরের, খনখনে গলায় বললেন — *এত রাইতে কেডা?*

— *এইডা কি চাকলাদারের বাড়ি?* মা জিজ্ঞেস করেন।

— *আমিই চাকলাদার। আপনে কেডা?* খনখনে গলা আবারও।

মা বারান্দায় উঠে এসে বলেন—*ভাইসাব, আপনের বাড়িতে কি আমার স্বামী আইছে? ডাক্তার রজব আলী?*

চাকলাদারের বুকের বেরিয়ে হয়ে থাকা হাড়গুলো নড়ে। তিনি দরজা আগলে বলেন

— *না আসে নাই।*

চাকলাদারের কঙ্কাল এক ধাক্কায় সরিয়ে ভেতরে ঢোকেন মা। বসার ঘর পেরোলেই শোবার। ঘরের বাতি নেবানো, জানালা গলে আসা ল্যাম্পোস্টের আবছা আলোয় দেখেন বিছানায় মশারি টাঙানো। মশারি তুলে মা টর্চ জ্বাললেন হাতের। শুয়ে আছেন বাবা, সঙ্গে রাজিয়া বেগম। রাজিয়া বেগমের বুকের *জাম্বুরা* দুটো খোলা। বাবা ধড়ফড়িয়ে বিছানা ছেড়ে ওঠেন। কোনও কথা না বলে দ্রুত কাপড় চোপড় পরলেন, জুতো পরলেন। মা বললেন — *চল।*

মা আর ছোটদার পেছন পেছন হেঁটে বাবা রিক্সায় উঠলেন। কেউ কারও সঙ্গে কোনও কথা বলেননি সারা পথ। সারা পথ রিক্সায় মা'র কোলে বসে ছোটদা কেবল হাতের টর্চটিকে একবার জ্বালাতে লাগলেন, একবার নেবাতে।

বাড়িতে আমি তখন ঘুম থেকে জেগে *মা মা* করে কাঁদছি। কান্না থামাতে দাদা তাঁর বাঁ হাতের কণে আঙুল ঢুকিয়ে রাখেন আমার মুখে, সেটি চুষতে চুষতে আমার কান্না থামে। ছোটদার হাতে তখনও টর্চ, জ্বলছে নিবছে।

খ.

নান্দাইল থানার পাঁচরুখি বাজারের দক্ষিণে মাদারিনগর নামের অজপাঁড়াগাঁয়ে জনাব আলী কৃষকের ঘরে বাবার জন্ম। কৃষকের কিছু ধানি জমি ছিল, কিছু গরু ছিল। আমার কৃষক বড়দাদা, খাটুরে জোয়ান, বলদ জুড়ে ক্ষেতে লাঙল দিতেন, বাবাকে সঙ্গে যেতে হত ফুট ফরমাশ খাটতে, বাবাও লাঙল দেবেন, কৃষকের ছেলে কৃষক হবেন, ক্ষেতে বীজ ছড়াবেন, বীজ থেকে চারা হবে, চারা বড় হয়ে ধান হবে, ধান পাকবে, ধান কেটে গোলায় তুলবেন কিন্তু এক রাতে বাড়ির দাওয়ায় হুঁকো টানতে টানতে জাফর আলী সরকার, বড়দাদারও বাবা, বলেন — *ও জনাব আলী, ছেড়ারে পাঠশালায় দেও।*

পাঠশালায় দিতাম কেরে, বাড়িত কাম নাই! খাটুরে জোয়ান গামছায় পিঠের মশা তাড়াতে তাড়াতে বলেন।

পাঠশালায় গেলে বিদ্বান অইব। দশটা লুকের খাতির পাইব। লেকাপড়া শিইখা চাকরিবাকরি করব। দেহ না, খুশির বাপ লেহাপড়া করছে, শহরে চাকরি করে, গেরামের বেবাক জমি কিইনা লইতাছে। জাফর আলী সরকার, মাদারিনগর পাঠশালার মাস্টার, ছেলের কাছে নরম স্বরে কথাটি পাড়েন।

— *আছিলাম বর্গা চাষী। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুড়াইত। দিন রাইত খাইটা আইজ নিজের কিছু জমি করছি। রজব আলী কাইম কাজ শিখতাছে। এই তো আর কয়দিন পরে নিজেই লাঙল ধরব। বাপ বেটায় মিইলা কাম করলে আরও কিছু জমি কিনন যাইব।* জনাব আলী ছাউনি খসে পড়া গোয়াল ঘরের দিকে চেয়ে বলেন।

— *জনাব আলী, দিন বদলাইতাছে। গেরামের শশীকান্ত, রজনীকান্ত, নীরদ, জোতির্ময় কইলকাতা গেল লেকাপড়া করতে। লেকাপড়া জানা মানুষরে লুকে মান্য গইন্য করে।*

ছেড়া তুমার লেকাপড়া জানলে লুকে তুমারেও মান্য করব। রজব আলী পাঠশালা থেইকা দুফুরে ফিইরা গরু চড়াইল, ফুট ফরমাইস খাটল।ওরে তো আর কইলকাতা দিতাছ না।

জাফর আলী হুঁকো দিয়ে জনাব আলীর হাতে, পিঠে হাত বোলান ছেলের

– *জনাব আলী, দুইডা দিন চিন্তা কর।*

ফকফকে জ্যোৎস্না উঠোনে। রজব আলী গরুর গামলায় নুন পানি ঢালেন আর আড়ে আড়ে দেখেন বাপ দাদাকে। খুশিতে মন নাচে তাঁর।

জাফর আলী হাঁক ছাড়েন –*কইরে, রজব আলী কই!*

রজব আলী দৌড়ে এসে সামনে দাঁড়ান, নুন মাথা হাত লুঙ্গিতে মুছে।

–*কি রে, পাঠশালায় পড়বি?*

সজোরে মাথা নেড়ে রজব আলী বলেন – *হ।*

জনাব আলীর হুঁকো টানার শব্দ হয়, ফরৎ ফরৎ।

পাঁচরুখি বাজার থেকে শাদা জামা, নতুন একখানা ধুতি, বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় কিনে আনেন জাফর আলী নাতির জন্য। নাতি পরদিন সকালে পেট ভরে পান্তা খেয়ে, গাভির দুধ দুইয়ে, খড় কেটে গামলায় ভরে, পুকুরে নেয়ে এসে নতুন ধুতি জামা পরে হাতে কলাপাতা আর বাঁশের কলম নিয়ে ক্ষেতের আল বেয়ে খালি পায়ে পাঠশালায় যান। মাস্টার বলেন *একে এক এক,* ছাত্ররা তারস্বরে বলে *একে একে এক। দুইয়ে একে দুই, তিনে একে তিন।* রাতে চাটাই পেতে বসে বর্ণপরিচয় বইয়ের পাতা ওল্টান রজব আলী, তাঁর একদমে পড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে পুরো বই। কাঠাঁল পাতার ওপর সর্ষের তেল ঢেলে কুপির ওপর ধরে রাখেন, কুপির কালো ধোঁয়া বেরিয়ে তেল জমাট করে, সেই জমাট তেলকালি পানিতে গুলে রজব আলী কালি বানান, বাঁশের কলম ওই কালিতে ডুবিয়ে কলাপাতায় *অ আ* লেখেন। পরদিন কখন সকাল হবে, কখন আবার পাঠশালায় যাবেন, এই উত্তেজনায় তিনি ছটফট করেন। জনাব আলী ধমক লাগান – *কুপি নিভা রজব আলী, তেল খরচা অইব।*

মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের মাস্টারি জাফর আলীর। পাচরুখি বাজার থেকে এক শিশি কেরোসিন তেল কিনে বাজারের তাবৎ লোককে বলে আসেন, *নাতিরে পাঠশালায় দিলাম, নাতি লেকাপড়া করে রাইতে, কুপ্পিতে বাড়তি তেল লাগে। রজব আলী দেখবা বড় হইয়া ইংরেজের অপিসে কেরানি হইব।*

জাফর আলীর আশকারায় রজব আলীর পড়া দ্রুত এগোয়, চাটাইয়ের ওপর পা ছড়িয়ে বসে রজব আলী বর্ণপরিচয় শেষ করে বাল্যশিক্ষা পড়েন, *গোপাল বড় সুবোধ ছেলে, তাহাকে যাহা দেওয়া যায়, সে তাহাই খায়।* জাফর আলী উঠোনে বসে হুঁকো টানেন আর নাতির পড়ার শব্দ শোনেন। তাঁর ইচ্ছে করে পাঠশালা শেষ করিয়ে রজব আলীকে চন্ডিপাশা ইস্কুলে পড়াতে।

তিন মাইল হেঁটে রজব আলী চন্ডিপাশা ইস্কুলেও যান। ইস্কুলে কালিচরণ, বলরাম, নিশিকান্তকে ছাড়িয়ে যান। মেট্রিকের ফল হাতে দিয়ে পন্ডিতমশাই বলেন *রজব আলী, লেখাপড়া চালাইয়া যা, ছাড়িস না।*

রজব আলী লেখাপড়া ছাড়েননি। শহরে যাওয়ার অনুমতি মেলে না, পন্ডিতমশাই নিজে বাড়ি এসে জনাব আলী সরকারকে বলে যান — *ছেলে আপনের জজ ব্যারিস্টার হইব। গুষ্ঠির ভাগ্য ফিরব। ছেলেরে যাইতে দেন।*

সেই রজব আলী হাতে দুটো জামা, একখানা পাজামা, আর এক জোড়া কালো রাবারের জুতো, এক শিশি সর্ষের তেল ভরা পুঁটলি নিয়ে আসেন ময়মনসিংহ শহরে। পকেটে চার আনা পয়সা সম্বল। বাড়ি খোঁজেন জায়গির থাকার, চেনা এক লোক এক মোক্তারের বাড়িতে জায়গির থাকার কাজ দেন। ভাল ফল দেখিয়ে *লিটন মেডিকেল ইস্কুলে* ভর্তি হন। আত্মীয় বন্ধুহীন শহরে জায়গির বাড়ি থেকে লেখাপড়া করতে করতে শহরের নতুন বাজারে মনিরুদ্দিন মুন্সির সঙ্গে দেখা হয় বাবার একদিন। দরাজ দিল মুন্সির, দোকানের গদিতে বসে রাস্তার ফকির খাওয়ান বিনে পয়সায়। দেখে বাবার চোখ চকচক করে কি? মা বলেন *হ চকচক করে। বড় টাকার লোভ মানুষটার। একটা পুইল্যা খেঁতা লইয়া শহরে আইছিল, আমার বাপে তারে ডাক্তারি পড়াইছে। আমার বাপের টেকা দিয়া ডাক্তারি পইড়া হে ডাক্তার হইছে। এহন পুরানা কথা বেবাক ভুইলা গেছে। এহন আমারে শাতায়।* বাবা কি ভেবেছিলেন মনিরুদ্দিন মুন্সির করুণা জুটলে গ্রাম থেকে ধান বেচা টাকা এনে মেডিকেল ইস্কুলের খরচ পোষাতে হবে না, সে কারণেই তিনি পিছু নিয়েছিলেন মনিরুদ্দিন মুন্সির?

আরে না, মা বলেন, *বাড়ি থেইকা তর বাপে কিছুই আনে নাই। বরং টেকা আরও বাড়িত পাডাইছে। তর বাপের আর খরচ কি ছিল, বিড়ি সিগারেট খায় নাই, পান জরদা খায় নাই। মেডিকেলে বৃত্তি পাইছে, লেখাপড়ার অত খরচ লাগে নাই।*

তাহলে বৃত্তির টাকায় লেখাপড়ার খরচা চলেছে বাবার, আর জায়গির বাড়িতে চলেছে থাকা খাওয়া। ব্যস। কারও কাছে হাত পাতার দরকার পড়েনি!

হাতখরচ আছে না? আমার বাজানে তারে কত খাওয়াইছে। বাজান একটা নাপিতের দুকান কিনছিল, হেইডার ভাড়াডা তর বাপেই নিত। বিয়ার পরে বাজান তারে ঢাকা লইয়া গিয়া স্যুটের কাপড় কিইনা দিছে। নাস্তা পানি খাওয়ার টেকা বাজানে তারে কম দিছে! বৃত্তির টেকা হে দেশের বাড়িতেই পাডাইছে। বইখাতা যা লাগে আমার বাজানই তারে কিইনা দিছে।

আমার বাজানরে দুইবেলা কদমবুসি কইরা তর বাপে কইত — আপন বলতে আমার কেউ নাই। দূর গেরামে বাবা থাকেন, বড় গরিব। যদি কিছু না মনে করেন, আপনেরেই আমি বাবা ডাকব।

মনিরুদ্দিন মুন্সি অনুমতি দেন তাঁকে বাবা ডাকার। রজব আলীকে বাড়িতে এনে মাছ ভাত খাওয়ান, খাইয়ে দাইয়ে পকেটে টাকা গুঁজে দিয়ে বলেন — *ভাল মন্দ খাইও।* সম্পর্ক গড়াতে গড়াতে এমন হয় যে, মুন্সির বাড়িতে রজব আলীর আনাগোণা বেড়ে যায়। ঈদুল ওয়ারা সন্ধেয় যখন গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া করেন, রজব আলী জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখেন তাঁকে। হারিকেনের চিমনির ওপর কাগজ আটকে রাখেন গৃহশিক্ষক, যেন অন্ধকারে জানালায় দাঁড়িয়ে রজব আলী মুখে আলো পড়া ঈদুল ওয়ারাকে মনের আশ মিটিয়ে দেখতে পারেন। রজব আলী দেখেনও। ঈদুল ওয়ারার লেখাপড়া করার বিষম শখ, গড়গড়িয়ে পড়েন, গোটা গোটা অক্ষরে মুখস্ত করা ইতিহাস- বিদ্যা লেখেন খাতায়।

লিকলিকে মেয়েটিকে বিয়ে করার প্রস্তাব রজব আলীই পাড়েন সরাসরি মুন্সির কাছে। ছেলে দেখতে শুনতে ভাল, আদব কায়দা জানেন, ডাক্তারি পড়েন, মনিরুদ্দিন মুন্সি রজব আলীর আবেদনে সাড়া দেন। মেয়েকে লাল সিল্কের শাড়ি পরিয়ে কিছু পড়শিকে পোলাও মাংস খাইয়ে, বিয়ে পড়িয়ে দেন। নাক ভোঁতা কালো মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় এক নাক খাড়া ফর্সা ছেলের সঙ্গে।

মোক্তার বাড়ির পাট চুকিয়ে রজব আলী এসে ওঠেন মুন্সির বাড়িতে। মুন্সি তাঁর মেয়ে আর ঘর জামাইর জন্য চালা ঘর, যে ঘরটিতে জায়গির ছেলেরা থাকতেন, গুছিয়ে দেন। ঈদুল ওয়ারাকে পড়াতেন ওঁরা, বিয়ে হওয়ার পর পড়ালেখার পাট চুকেছে, ওঁরাও বিদেয় হয়েছেন। রজব আলীর এ বাড়িতে এসে একধরনের স্বস্তি হয়, জায়গির বাড়ির আর এ বাড়ির খাওয়া দাওয়ায় আদর যত্নে বিস্তর তফাৎ। ও বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে থাকা খাওয়া মিলত। ক্ষিদে কমত বটে, তৃপ্তি হত না। এ বাড়িতে শাশুড়ি কোরমা, কালিয়া, দোপিঁয়াজা পাতে দিয়ে নিজে হাতপাখায় বাতাস করেন। শ্বশুর শাশুড়ি আর বাড়ি ভর্তি শালা শালির আদর পেলে, বউ যেমনই হোক, চলে। শহরে এক ঘর আত্মীয়ের দরকার ছিল রজব আলীর। শরীর ভাল থাকে, মনও। যে চালা ঘরটি ছেড়ে দিয়েছিলেন মনিরুদ্দিন মুন্সি একদা তাঁর মেয়ে জামাই হবু ডাকতার খাঁড়া নাকের রজব আলীকে, সে ঘরেই জন্ম হয় আমার দাদার, ছোটদার, আমার। দাদারা জন্মালে ঘরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে *আল্লাহুআকবর* বলে পাড়া শুনিয়ে আযান দিয়েছেন নানা। আমার বেলায় আযানের দরকার পড়েনি, *মেয়ে জন্মালে আযান দিতে হয় না।* সাত দিনের দিন জাঁক করে *হাইট্টারা* হল আমার। দাদারা দেয়ালে মোমবাতি জ্বেলে বাড়ি আলো করেছিলেন। বাবার বন্ধুরা নানা রকম উপহার নিয়ে এসে আয়না বাবুর্চির হাতের চমৎকার খাবার খেয়ে গেলেন। *হাইট্যারার* দিন আঁতুড় ভাঙেন মা, ঘরদোর কাপড় চোপড় ধোয়া হয়, গোসল টোসল করে পয় পরিষ্কার হয়ে আগের জীবনে ফেরেন।

হাইট্যারার পর আকিকাও হবে। দাদাদের আকিকা হয়েছিল গরু জবাই করে, আমার হল একটি খাসিতে। মেয়ের বেলায় খাসি, ছেলের বেলায় একটি গরু নয়ত দুটো খাসি, এরকমই নিয়ম। আকিকার আগে আগে আমার নাম রাখা হবে কি এই নিয়ে বাড়িতে বৈঠক বসেছিল। বড়মামা বলেন *নাম রাখ উষা।* রুনু খালা বলেন *শোভা,* ঝুনু খালা *পাপড়ি।* দরজায় দাঁড়িয়ে দাদা বুড়ো আঙুল খোঁটেন চৌকাঠে। কোনও নামই তাঁর পছন্দ হয় না। ঘর ভরা মানুষের সামনে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থেকে দাদার ঘাড়ের রোম ফুলছে তা কারও নজরে পড়েনি। না পড়ারই কথা, নাম রাখার দায়িত্ব বড়দের, ছোটরা নামের বোঝে কী! তো বাদাম চিবুচ্ছিলেন দাদা, হঠাৎ হাঁ করলেন সারস পাখির মত, জিভ নড়তে লাগল যেন ঝড়ে কাঁপা বাঁশপাতা, ছিটকে বেরোতে লাগল বাদাম মুখ থেকে, বাদামের সঙ্গে শব্দও। বাড়ির কুকুর বেড়ালের ডাক, কাকের ডাক, বাচ্চার ট্যাঁ ট্যাঁ, উঠোনে এর ওর তারস্বরে চিৎকার, খেলার মাঠে ছেলেদের চেঁচামেচি সবকিছুর সঙ্গে দাদার বাদাম ভরা মুখের শব্দ ঠিক ঠাহর করা যায় না, এটি ওসব শব্দেরই একটি নাকি আলাদা। রুনু খালা অনুমান করেন চিকন চিৎকারটি দরজার কাছ থেকেই আসছে।

খপ করে দাদার কাঁধ ধরে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকা রুনুখালা দাদাকে ঘরের মাঝখানে কাঠের থামের কাছে দাঁড় করান। বড় মামার, ঝুনুখালার, নানির, মা'র,. হাশেম মামার চোখ তখন দাদার আলজিভ বের হয়ে থাকা মুখে, মুখের বাদামে। কান শব্দে।

কী কান্দস ক্যান? কেডা মারছে? রুনুখালা দাদার চিবুক উঁচু করে ধরে জিজ্ঞেস করেন।

দাদার গাল বেয়ে যে পানি ঝরছে তা হাতের তেলোয় মুছে, কান্নার দমক থামিয়ে বললেন — *আমার বইনের নাম রাখতে হইব নাসরিন।*

মামা খালারা এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ঘর কাঁপিয়ে হাসেন। যেন সার্কাসের ক্লাউন মঞ্চে এসে লোক হাসাচ্ছে।

এবার দাদাকে বৃত্তের ভেতরে নিয়ে আসা হল। বৃত্তটি রচনা করলেন বড়মামা, হাশেম মামা, রুনু আর ঝুনু খালা।

নাসরিন নাম রাখবি ক্যান? কোত্থেকা শুনলি এই নাম? কে কইছে এই নাম রাখতে?

প্রশ্নের বাণের সঙ্গে দাদার হাতে এক ঠোঙা বাদামও দেওয়া হল। তিনি দাঁতে বাদাম ভাঙতে ভাঙতে বলেন, বাদামের দিকে তাকিয়ে, *আমার ইস্কুলে একটা খুব সুন্দর মেয়ে আছে। নাসরিন নাম।*

এবার বৃত্তে হাসি চেপে রাখা হল যার যার পেটের ভেতর আরও তথ্যের আশায়।

নাসরিন কই থাকে? বাড়ি কই? হাশেম মামা জিজ্ঞেস করেন।

দাদা উত্তর দেওয়ার আগেই বড় মামা বলেন — *তর ওই নাসরিন নাম টাম চলব না। নাম রাখা হইব উষা।*

দাদা বাদামের ঠোঙা দূরে ছুঁড়ে ফেলে, ঠোঙা গিয়ে ঠেকল বাঁশের ব্যাংকে, বৃত্ত থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যান। ঘর থেকে নিজের জামা কাপড়ের এক পুঁটলি বেঁধে নিয়ে বলেন তিনি, *গেলাম।*

এই কই যাস, থাম। মা পেছন থেকে বলেন।

যেই দিকে দুই চোখ যায়। দাদা যেতে যেতে বলেন।

কাঁধে পুঁটলি নিয়ে ঠিকই তিনি বেরিয়ে যান বাড়ির বাইরে। পুকুর ঘাট থেকেই দাদা ফেরত আসবেন ভেবে বৃত্ত ভেঙে মামা খালারা বসে থাকেন খাটে পা ঝুলিয়ে কিন্তু ফেরেন না দাদা।

সন্ধে শেষ হয়ে রাত ঘন হলে মা বিলাপ শুরু করেন। বড়মামা আর হাশেম মামা বেরিয়ে যান দাদাকে ধরে আনতে। খবর পেয়ে নানাও।

রাত দশটায় হাশেম মামা হাজিবাড়ির জঙ্গল থেকে পাগল ছেলেকে ধরে এনে বাড়িতে হাজির করেন। দাদাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে মা বলেন— *যে নাম রাখতে চাও তুমি, সেইটাই হইব বাবা।*

ছেলে যা বলেছে তাই হবে, বাবা পরদিন সকালে জানিয়ে দেন বাড়িতে, নাম নাসরিনই। মামা খালারা বিষন্ন মুখে বসে থাকেন। রাজকন্যার এমন গেঁয়ো নাম রাখার কোনও মানে হয় না, যে নামের কোনও অর্থ নেই।

দাদা পরদিন ইস্কুল থেকে ফিরে উঠোনে দাঁড়িয়ে বৃত্তের মানুষদের দিকে তাকিয়ে বুড়ো আঙুল চুষতে চুষতে মিটমিট হাসেন।

—*তর বইনের পুরা নাম কি দিবি রে হাগড়া গাড়ি?* ঝুনুখালা *কুটা* দিয়ে কলপাড়ের দক্ষিণের গাছ থেকে আম পাড়তে পাড়তে বললেন।

—*নাসরিন জাহান তসলিমা।* দাদা বুড়ো আঙুল বের করে আকর্ণ হেসে বলেন।

ফক করে হেসে ওঠেন ঝুনু খালা।

রুনু খালা উঠোনে বসে বটিতে কুচি কুচি করে আম কাটছিলেন ভর্তা বানাবেন, বলেন *তর যে ইস্কুলের মেয়ে নাসরিন, তারে তর পছন্দ হয়?*

দাদা দাঁত ছড়িয়ে হেসে বলেন — *হয়।*

—*তারে বিয়া করবি?*

দাদা বুড়ো আঙুল মুখে পুরে শরমের হাসি হেসে মাথা কাত করে রাখেন ডানে। তাঁর হাফপ্যান্টের দড়ি ঝুলে থাকে হাঁটু অবদি।

ঝুনু খালা কুটা ফেলে দাদার মাথায় ঠোনা মেরে বলেন —*তরে তো বিয়া করব না ওই মেয়ে। তুই যে ইস্কুলে হাইগা দিতি প্যান্টের মধ্যে, এই খবর তো তর সুন্দরী মেয়ে নাসরিন পাইয়া গেছে।*

দাদা দৌড়ে ঘরে ঢুকে মা'র আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। চোখে টলটল করে জল।

—*কী হইছে, কান্দ কেন?* মা জিজ্ঞেস করেন দাদার মাথায় হাত বুলিয়ে।

—*ঝুনু খালা আমারে হাগড়া গাড়ি ডাকছে।*

মা উঠোনে নেমে কপট ধমক লাগান ঝুনু খালাকে।

—*বেচারারে কান্দাইছ না তো। জন্মের পর থেইকা এর পেট খারাপ। কত ওষুধ খাওয়াইলাম, পেট আর ভাল হয় না। সেই যে শুরু হইছে, আইজও পাতলা হাগে।*

আকিকা হবে বলে নাম ঠিক হল আমার, আকিকার দিন পিছিয়ে দিলেন বাবা। কেন, মাদারিনগরে সে বছর ধান হয়নি ভাল, বাবার মন খারাপ। মাস কয় পর ধান হল ভাল কিন্তু বদলির কাগজ এল বাবার, পাবনায়। বাবার আবার মন খারাপ, পিছোতে হল আকিকার দিন। পাবনা থেকে ফিরে এসে আবার আকিকার প্রসঙ্গ। সে হতে হতে আরও দু'বছর গেল। আকিকার উৎসবে সকাল থেকে খালারা ঘরের মেঝেয় শাদা রঙের আল্পনা আঁকেন, রঙিন কাগজে মালা বানান, কাগজের শেকল বানিয়ে এক থাম থেকে আরেক থামে ঝুলিয়ে দেন। আকিকায় লোক আসে সোনার মালা, আংটি, পিতলের কলসি, সবুজ সাথী বই, জামা জুতো, কোরান শরিফ, থাল বাটি, সুটকেস উপহার নিয়ে। আয়না বাবুর্চি মাঠে গর্ত করে চুলো বানিয়ে খড়ি জ্বেলে বড় বড় ডেকচিতে পোলাও কোরমা রান্না করেন। সুগন্ধে বাড়ি ম ম করে। পাতিল পাতিল দই মিষ্টি কিনে আনেন নানা। আকিকার দিন দাদা ছিলেন সবচেয়ে ব্যস্ত। ধোয়া জামা কাপড় পরে নতুন জুতো পায়ে দিয়ে চুলে টেরি কেটে অতিথিদের সামনে ঘুরঘুর করতে করতে যাঁকেই দেখেছেন তাঁর দিকে প্রশ্রয়ের হাসি হাসতে, তাঁর কাছেই রহস্য ফাঁস করেছেন এই বলে যে বোনের নামটি রেখেছেন একা তিনিই, বাড়ির অন্যরা নানারকম নামের প্রস্তাব করেছিল, মন্দ বলে বাদ দেওয়া হয়েছে।

আকিকায় পাওয়া চারটে ছোট সুটকেস মা তুলে রাখলেন আলমারির ওপর। পিতলের কলসি চলে গেল রান্নাঘরের কাজে। আলমারির ভেতর জামা জুতো, থাল বাটি আর কোরান শরিফ। সোনার আংটি, মালা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে রাখলেন মা,

চাবি বাঁধা আঁচলের কোণায়। আমার নাগালের ভেতর পড়ে থাকে কেবল বইখানা। আমার মাস্টার তখন বাড়িসুদ্ধ সবাই। বইয়ের ওপর ঝুঁকে আছি দেখলে *ক* থেকে *চন্দ্রবিন্দু* পর্যন্ত আমাকে উচ্চারণ করিয়ে ছাড়েন।

তাঁরা যা বলতে বলেন, বলি। পড়ে শ্লেটে পেনসিল ঠেসে অক্ষর আঁকার আগেই বলেন *পড়, ময়আকার মা।*

আমি বলি *ময়আকার মা।*

—ক ল ম কলম।

—ক ল ম কলম।

উঠোনের খাঁচায় বাঁধা ময়না পাখিকেও যা বলতে বলা হয়, বলে। শরাফ কিম্বা ফেলু মামা তখনও হাতে বই ধরেননি, আর আমার সবুজ সাথী শেষ।

আকিকার উৎসবের পর পরই কাউকে না জানিয়ে বসিরুদ্দিন নামের এক লোকের কাছে পুরো বাড়ি বিক্রি করে দেন নানা। বসিরুদ্দিন এসে বাড়ির দখল চাইলেই নানির *মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।* আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম আকাশ আকাশের জায়গায় আছে। অত বড় আকাশ ভেঙে নানির মাথায় পড়লে নানি কি আর বাঁচতেন! যা হোক, নানা টাকা কি করেছেন, কাকে দিয়েছেন এর কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। নানি বসিরুদ্দিনকে বাড়ির ভাল চেয়ারটিতে বসিয়ে চা নাস্তা সামনে দিয়ে নরম গলায় বললেন *—ভাইজান, একজনে পাগলামি কইরা সংসারের সবাইরে ভুগাইব, এইডা কি সইয্য হয়! আমার এতগুলা ছেলেমেয়ে। সবাইরে নিয়া আমারে পথে বইতে হইব। আপনেরে আমি টেকা শোধ কইরা দিয়াম। আপনে এই বাড়ি আমার কাছে বিক্রি কইরা দেন। আমি টেকা কিস্তিতে শোধ করাম।*

বসিরুদ্দিন গলা কেশে বললেন *—কিস্তিতে পুষাইব না। আমি, ঠিক আছে, আপনে যহন কইতাছুইন, আমি বাড়ি বিক্রি করাম, কিন্তু কিস্তিতে না। টেকা আমারে একবারে দিতে হইব।*

নানি পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে বলেন — *এত টেকা একবারে আমি পাই কই! আমার দিকটা দেহেন। আমি অসহায় মেয়েছেলে! কয়ডা দিন তাইলে সময় দেন আমারে।*

চায়ে চুমুক দিয়ে বসিরুদ্দিন বলেন — *না না না। সময় আমি কেমনে দেই! সময় কি বানানো যায়! আল্লাহ মাইপা যে সময় দেন আমাগো হাতে, সেইডাই খরচা করি। আমারে টেকা কাইল পরশুর মধ্যে দিলে আমি বাড়ি বেচাম, নাইলে আমারে মাপ করুইন।*

শরাফ মামার হাতে ভেতর ঘর থেকে পানের খিলি পাঠিয়ে দেন বসিরুদ্দিনকে, চা খেয়ে মুখে পান পুরে আঙুলে চুন তুলে বসিরুদ্দিন উঠোনের হাঁসমুরগির দিকে তাকিয়ে বললেন — *আমি তাইলে কাইল বিকালে আসতাছি।*

বসিরুদ্দিন চলে গেলে নানি পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। বাঁশের ব্যাংক ভেঙে, আনাচে কানাচে যেখানে যত টাকা ছিল, বার করে দেখলেন মাত্র পাঁচশ।

বোরখা চড়িয়ে চলে গেলেন বাড়ির বাইরে। সুলেখার মার বাড়ি, মনুর মা, সাহাবউদ্দিনের বাড়ি ঘুরে এসে রাতে এসে আমাদের ঘরে উঠলেন। বাবা তখন ডাকতারখানা থেকে সবে রোগি দেখে ফিরেছেন।

—খবর পাইছুইন? এহন কি করি কন। নানি ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন।

খবর বাবা পেয়েছিলেন, বাবা বাড়ি ফিরতেই মা বলেছেন — *বাজান বাড়ি বেইচা দিছে বসিরুদ্দিন নামের এক লোকের কাছে। বাড়ির দখল লইতে আইছিল লোকে। মা কইল বাড়ি কিইনা লইব তার কাছ থেইকা। কিন্তু কেমনে কিনব কে জানে। এত টেকা মা পাইব কই। বসিরুদ্দিন একবারে টেকা চায়। কাইল পরশুর মধ্যে দিতে হইব।* কিন্তু খবর না জানা স্বরে বাবা বললেন — *কি খবর! কি হইছে কি!*

দু'জন খাটের দু'কিনারে বসলেন। নানি বললেন — *বাড়ি ত বেইচা দিছে সিদ্দিকের বাপে।*

বাবার পরনে লুঙ্গি। লুঙ্গির নিচে পা দুলতে থাকে বাবার, বললেন — *কোন বাড়ি? কার বাড়ি?*

—*কোন বাড়ি আবার, এই বাড়ি!* নানি বিরক্ত গলায় বলেন।

—*ক্যান, বেচছে ক্যান?* বাবা প্রশ্ন করেন।

—*এইডা কি আর আমি জানি! আমারে ত কিচ্ছু কয় নাই। মানুষটা আস্তা পাগল। বুদ্ধি সুদ্ধি নাই। টেকাগুলা কি করছে তাও কয় না।*

বাবার পা দুলতে থাকে লুঙ্গির নিচে।

—*বসিরুদ্দিনরে কইলাম তার কাছ থেইকা বাড়ি আমি কিইনা ...*

নানির কথায় ঠোকর দেন বাবা,

— *বসিরুদ্দিন কেডা?*

— *যে বেডার কাছে সিদ্দিকের বাপে বাড়ি বেচছে।* নানি বলেন।

—*বসিরুদ্দিন থাহে কই?* বাবা জিজ্ঞেস করেন দোলা হাঁটু চুলকোতে চুলকোতে।

—*নতুন বাজার নাকি কই জানি।* নানি হাতের রুমাল খুলে পানের একটি খিলি মুখে পুরে বলেন।

—*বসিরুদ্দিন করে কি?* বাবা জিজ্ঞেস করেন।

—*সেইডা জানি না। বসিরুদ্দিন বাড়িতে আইছিল। টেকা চাইল। আমি কইলাম টেকা কিস্তিতে দিয়াম। বাড়ি আমার কাছে বেইচা দেন।* নানি থেমে থেমে বলেন।

—*ভাল কথা। কিস্তিতে টেকা তাইলে দিয়া দেন।* বাবা নিরুত্তাপ স্বরে বলেন।

—*কিন্তু বসিরুদ্দিন মানে না। কয় একবারে তারে টেকা দিতে।* নানির স্বরে উদ্বেগ।

—*তাইলে একবারেই দিয়া দেন।* বাবা মধুর হেসে বলেন।

—*টেকা কি গাছে ধরে? ছয় হাজার টেকা আমি পাই কই!*

নানি অসহায় চোখে ফেলেন বাবার চোখে। পা দোলানো বন্ধ করে বলেন বাবা

—*ঈদুন চা টা কিছু দেও। আম্মা চা খাইয়া যাইন।*

নানি মাথা নাড়েন, চা খাবেন না তিনি।

—*তাইলে কি খাইবাইন? কিছু একটা খাইন?* বাবা বলেন।

—*না না আমি কিছু খাইতাইম না।* নানির স্বরে বিরক্তি।

—*এই বিস্কুট চানাচুর কিছু দেও ত।* বাবা মা'কে তাড়া দেন।

—*না। না। না।* নানি হাত উঁচিয়ে মা'কে থামান।

বাবা আর নানি বসে থাকেন খাটের দু'কিনারে। মা আর আমি আরেক খাটের মধ্যিখানে। কেউ কারও সঙ্গে আর কথা বলছেন না।

–আপনে কি আমারে অন্তত পাঁচ হাজার টেকা কর্জ দিতে পারবাইন নুমানের বাপ? বাড়িঘর না থাকলে পুলাপান লইয়া থাকবাম কই? নানি ভাঙা স্বরে বলেন।

বাবা কোনও উত্তর দেন না।

নানি কাতর স্বরে বলেন – *আমি আপনেরে যেমনেই হোক মাসে মাসে টেকা শোধ কইরা দিয়াম।*

বাবার নীরবতায় মা ছটফট করেন, বলেন – *বাজান কি এই সংসারের লাইগা কম করছে? এহন মা'র এই বিপদের দিনে সাহায্য করার কেউ নাই। রাজশাহি পড়তে গেল গা, বাচ্চাগোর দুধ ছিল না। বাজান বড় বড় দুধের টিন কিইনা দিছে। বিয়ার পর থেইকা ত বাপের বাড়িতই থাকলাম।*

নানি শাড়ির আঁচলে চশমার কাচ মুছে নিয়ে আবার পরেন। আবার ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন – *একটা কিছু উত্তর দেইন নুমানের বাপ। বসিরুদ্দিন কাইলকা আইব।*

বাবা সে রাতে কোনও উত্তর দেননি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নানি যখন দরজার বাইরে চলে গেলেন, বাবা ঘাড়ে হাত ঘসতে ঘসতে বললেন *আম্মা, কাইল রাইতে আপনের সাথে কথা কইয়াম নে।*

বাবা টাকা দিয়েছিলেন। নানি মাসে মাসে তিন বছরে সে টাকা শোধ করেছিলেন। নানা শুনে একগাল হেসে বলেছেন –*খায়রুন্নেসা ফুঁ দিলে তুষের আগুনও ঠান্ডা।*

নানা বেহিসেবি লোক। আমুদে লোকও। খেয়ে এবং খাইয়ে তাঁর যত আনন্দ। নানি সংসারের হাল না ধরলে অবশ্য আমোদ আহলাদ সব ভেস্তে যেত নানার। বিক্রমপুরের বাউন্ডুলে ছেলে নানা। বাপের সিন্দুক ভেঙে জমানো টাকা পয়সা চুরি করে তের বছর বয়সে পালিয়ে গিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। এ শহর সে শহর ঘুরে ময়মনসিংহে এসে একসময় ফতুর হয়ে পড়েন। মসজিদে মসজিদে বিনে পয়সায় ঘুমোন, খান আর রাস্তার পাগল ফকির জড়ো করে আরব দেশের কিচ্ছা শোনান। মসজিদের লোকেরা নানাকে এক পয়সা দু'পয়সা দেয়। পয়সা পকেটে নিয়ে বাবর বাদশাহর মত নিজেকে মনে হয় তাঁর। রাস্তায় কাউকে ভিক্ষে করতে দেখলেই নানা জিজ্ঞেস করেন –*বাড়ি কই? পেটে দানা পানি পড়ছে?* ভিখিরির ক্ষিধে যায় না, ভিখিরির অভাবের গল্প শুনে নানা আহা আহা করেন, চোখ বেয়ে বর্ষার জলের মত জল ঝরে। পকেটের কানাকড়ি যা আছে, ভিখিরির হাতে দিয়ে বলেন – *ভাল মন্দ কিছু খাইও।*

জিলাইস্কুল মোড়ের চানতারা মসজিদের নতুন ইমাম প্রায়ই লক্ষ করেন নানা জুম্মার নামাজ পড়তে একপাল ভিখিরি নিয়ে মসজিদে আসেন। ওদের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েন নানা। একদিন ডাকলেন

–এই মিয়া তুমার নাম কি?

নানা একগাল হেসে বলেন – *নাম আমার মনিরুদ্দিন।*

–বাড়ি কই?

–বাড়ি নাই।

–বাপের নাম কি?

–ভুইলা গেছি।

—থাকো কই?

—এত বড় দুনিয়ায় থাকনের কি অভাব!

—লেখাপড়া জানো?

মনিরুদ্দিনের ফর্সা মুখে শাদা হাসি। কোনও উত্তর নেই।

বাউন্ডুলে ছেলেকে সংসারি করার ইচ্ছে জাগে ইমামের। ঘরে তাঁর বারো বছরের এক মেয়ে আছে বিয়ের বয়সী। ইমাম তক্কে তক্কে থাকেন মনিরুদ্দিনকে খপ করে ধরবেন একদিন। মসজিদের ভেতর এক শীতের রাতে কম্বলকাঁথা ছাড়া হাত পা গুটিয়ে মনিরুদ্দিনকে ঠান্ডা মেঝেয় শুয়ে থাকতে দেখে ইমাম বললেন

—চল মনিরুদ্দিন, আমার বাড়িত লেপ আছে বিছনা আছে, ঘুমাইবা।

মনিরুদ্দিন নড়েন না।

—চল মনিরুদ্দিন, গরম ভাত খাইবা গুসতের ছালুন দিয়া।

মনিরুদ্দিন উঠে বসেন।

—তা বাড়ি আপনের কতদূর ইমাম সাইব? মনিরুদ্দিন জিজ্ঞেস করেন আড়মোড়া ভেঙে।

মনিরুদ্দিনকে সে রাতে বাড়ি নিয়ে *গুসতের ছালুন* দিয়ে *গরম ভাত* খাইয়ে বারবাড়ির বিছানায় গরম লেপের তলে শুইয়ে দিলেন। মনিরুদ্দিন ঘুমোলেন পরদিন দুপুর অবদি টানা। এমন আরাম তিনি বহু বছর পাননি। সৎ মায়ের যন্ত্রণায় ঘর ছাড়তে হয়েছে তাঁকে। তাঁর মনে পড়ে নিজের মা বেঁচে থাকতে দুধভাত খাইয়ে তাঁকে এমন শুইয়ে রাখতেন। আড়মোড়া ভেঙে বিছানা ছেড়ে মনিরুদ্দিন দেখেন উঠোনে বদনির পানিতে অযু করছেন ইমাম। তাঁর বাবাও এমন বদনি কাত করে পানি ঢালতেন পায়ে। বদনিখানা ইমামের হাত থেকে নিয়ে নিজে তিনি পানি ঢালতে লাগলেন, যেন তাঁর বহু বছর না দেখা বাবার পায়ে ঢালছেন পানি। পানি ঢালতে ঢালতে মনিরুদ্দিন হঠাৎ হু হু করে কেঁদে উঠলেন।

—কান্দো ক্যান, মনিরুদ্দিন? কান্দো ক্যান?

ইমাম অবাক হয়ে বললেন।

মনিরুদ্দিন কোনও উত্তর না দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রায় একমাস পর এক খাঁচা মিষ্টি নিয়ে ইমামের বাড়ি এসে হাসতে হাসতে বললেন — *ইমাম সাইব, খুব ভাল মিষ্টি, খাইয়া দেখেন। গরম গরম রসগোল্লা। কলিকাতা থেইকা আনা।*

মিষ্টি ইমামের বাড়ির সবাই খেলেন। খেয়ে দেয়ে ইমাম বাইরের ঘরে বসা মনিরুদ্দিনকে বললেন *আমার মেয়ে খায়রুন্নেসারে তুমি বিয়া কর।*

— *বিয়া?* মনিরুদ্দিন আঁতকে ওঠেন। *বিয়া কইরা বউ তুলমু কই। মসজিদে?*

— *সেই চিন্তা কইর না। আমার জাগা জমির অভাব নাই। একটা কিছু ব্যবস্থা হইব।* ইমাম কাঁধে হাত রেখে বললেন তাঁর।

মনিরুদ্দিন মন সেদিন ফুরফুরে। রাজি হতে বেশি সময় নিলেন না। রাত ঘন হওয়ার আগেই কাজি ডেকে বিয়ে পড়িয়ে ভাত গোসত রান্না করে খাইয়ে দাইয়ে লেপের তলে শুইয়ে দেওয়া হল মনিরুদ্দিনকে। খায়রুননেসা জানলেন না মনিরুদ্দিন দেখতে কেমন, তাঁর স্বভাব চরিত্র কেমন। লেখাপড়া জানা মেয়ে খায়রুন্নেসা, সুর করে পুঁথিও পড়তে

জানেন অথচ দিব্যি এক *ক অক্ষর গোমাংসের* সঙ্গে হুট করে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল, *গোমাংসের* রসগোল্লা পেটে হজম হওয়ার আগেই। খায়রুননেসার আরও ভাল জামাই জুটতে পারত। কিন্তু ইমামের বদ্ধ ধারণা, মনিরুদ্দিনের বাড়ি ঘর টাকা পয়সা না থাক, বড় একখানা হৃদয় আছে। আর সারা জীবনে এই অভিজ্ঞতাই তিনি অর্জন করেছেন যে হৃদয়ের চেয়ে বড় কিছু জগতে নেই।

ইমামের এক ছেলে আছে, নামে মাত্র। সে ছেলের জঙ্গলের নেশা। ভারতবর্ষের সব জঙ্গল চষে শিকার করে বেড়ান। বাড়ি ফেরেন বছরে একবার, মাস দু'মাস থেকে আবার উধাও। ছেলের ওপর ভরসা হারিয়ে মনিরুদ্দিনের হাতে সম্পত্তির সব ভার দিয়ে শয্যা নেওয়ার পর ইমাম বলেছিলেন *তুমি হইলা আমার ছেলে।* মনিরুদ্দিন ছেলে বনতে পারেন, কিন্তু স্বভাব ফেরাবেন কি করে! বছর না যেতেই ইমামের আধেক জমিজিরেত বিক্রি করে ভিখিরিদের বিলিয়ে সারা। বাকি যেটুকু রইল, কিছুটা সরকার নিয়ে নিল ইস্কুলের বোর্ডিং করবে বলে আর কিছুটাতে এসে খায়রুননেসা টিনের ক'টি ঘর তুলে গাছগাছালি লাগিয়ে নিজের শেকড় গাড়লেন, অনেকটা মাটি কামড়ে পড়ে থাকার মত। বড় হৃদয়ে পোষায় না আর খায়রুনেনসার। বছর বছর ছেলে পিলে হয়, ক্ষিধেয় সারস পাখির বাচ্চার মত ওরা হাঁ করে থাকে। বাড়ি ঘর করে না হয় মাথা গোঁজার ঠাঁই হল, কিন্তু সংসারের খরচ যোগাবে কে! মনিরুদ্দিনের সেদিকে মোটে নজর নেই, তিনি ফূর্তিতে শহর বন্দর ঘুরে বেড়ান। টাকা ফুরিয়ে গেলে অবশ্য বাড়ি ফেরেন। ফিরে *কই খায়রুননেসা খাওন দেও। এই পুলপান কে কই আছ, সব আসো, খাইতে বও* বলে ঝিমিয়ে থাকা বাড়িকে কিলঘুসি মেরে জাগান। খায়রুননেসা মুখ বুজে মনিরুদ্দিন আর ছেলেমেয়েদের খাওয়ান। কিন্তু একবারই বলেছিলেন *না খাওন নাই।* মা'র তখন তিন কি চার বছর বয়স। নানা চমকে উঠলেন *কি কইলা? খাওন নাই?*

খায়রুননেসা ঠান্ডা চুলোর পাশে ঠান্ডা পিঁড়িতে বসে ঠান্ডা গলায় বললেন *নাই। চাইল ডাইল কিচ্ছু নাই। পুলাপানরে পুস্কুনি থেইকা শাপলা তুইলা সিদ্ধ কইরা দিছি কয়দিন।*

মনিরুদ্দিন শুনে মন বিষ করে ঘরে শুয়ে পড়লেন। দু'দিন শুয়ে থাকলেন।

খায়রুননেসা গাছের নারকেল কুড়িয়ে তকতি বানিয়ে মনিরুদ্দিনকে শোয়া থেকে উঠিয়ে বললেন – *যাইন বাজারে নিয়া এইগুলান বেইচা চাইল ডাইল কিইনা আনেন।* নারকেলের তকতি ভরা কাঠের বাক্সে মাথায় করে নানা দিব্যি কাচারির সামনে নাড়ু বেচতে গেলেন।

প্রতিদিন খায়রুননেসা তকতি বানিয়ে বাক্স ভরে রাখেন। তকতি বেচার টাকা কিছুটা রেখে কিছুটা বউএর হাতে দেন মনিরুদ্দিন। প্রতিদিন এক সিকি দু'সিকি গোপনে জমিয়ে, ঈদুল ওয়ারার যখন বয়স পাঁচ, বাঁশের ব্যাংক ভেঙে এক পুঁটলি টাকা মনিরুদ্দিনের হাতে দিয়ে খায়রুননেসা বলেন – *একটা দুকান কিনুইন। দুকানে ভাত মাছ বেচবেন।*

মনিরুদ্দিন বাধ্য ছেলের মত দোকান কেনেন। চেয়ার টেবিল বসান। বাবুর্চি রাখেন। নতুন বাজারের মধ্যিখানে দোকান তখন হু হু করে চলছে। ইংরেজের আমল তখন। ইংরেজের ওপর লোকের রাগ অনেক। মনিরুদ্দিনের কারও ওপর রাগ হয় না। জগতের

সবাইকে তাঁর বড় ভাল মানুষ বলে মনে হয়। এমন কি তাঁর সৎ মা'কেও। দোকানে যেই খেতে আসে, তাকেই গদিতে বসিয়ে গপ্প করেন তিনি। চোর ছ্যাঁচোরও মনিরুদ্দিনের ভাল বন্ধু হয়ে ওঠে। রাস্তার কুকুর বেড়ালও এসে দোকানে ভিড় করে, ক্ষিধে লাগলে রান্নাঘরে ঢুকে এঁটোকাঁটা খেয়ে নেয়। পাগল ভিখিরি ডেকে দোকানে খাইয়ে দেন, কারও কষ্টের কথা শুনলে ক্যাশবাক্স খুলে মুঠো ভরে টাকাও দিয়ে দেন, ঘাম ঝরা কোনও হাটুরেকে রাস্তায় দেখলে চেঁচিয়ে ডাকেন, *ও ভাইসাব, দৌড়ান কই, আহেন আহেন, এট্টু জিড়াইয়া যাইন।* হাটুরেরা জিরিয়ে এক গ্লাস শরবতও মাগনা খেয়ে যান। *মন্যা মুন্সির এইডা ত আর ব্যবসা না, মুসাফিরখানা* — লোকে মন্তব্য করে। খায়রুননেসা ঈদুল ওয়ারাকে পাঠাতেন দোকান ঝাড়ু দিতে, টেবিল চেয়ার সাফ করতে। সিদ্দিকের পেছন পেছন ঈদুল ওয়ারা দোকানে পৌঁছে যখন দোকান ঝাড়ু দিতেন, মনিরুদ্দিনের সঙ্গে গদিতে বসে গরম জিলিপি খেতেন সিদ্দিক। সন্ধের আগে ছেলে মেয়ে দু'টিকে মাছ ভাত খাইয়ে মনিরুদ্দিন পাঠিয়ে দিতেন বাড়িতে। তাঁর নিজের বাড়ি ফিরতে রাত হত। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেলে হারিকেনের আলো টিমটিম করে রেখে খায়রুননেসা বসে থাকতেন অপেক্ষায়। মনিরুদ্দিন ফিরলে তাঁর অবাধ কামের তলে আত্মাহুতি দিতেন, চাইতেন বুনো পাখিটি আটকা পড়ুক সমৃদ্ধি, সন্তান আর সম্ভোগের এই সংসারখাঁচায়। নিজে তিনি মেয়েমানুষ বলে সম্ভব ছিল না বাড়ির বাইরে বেরিয়ে ব্যবসায় নজর করা। ঘরে বাঁশ পুতে সে বাঁশে ছিদ্র করে পয়সা ফেলতেন খায়রুননেসা। রাতে রাতে মনিরুদ্দিনের তৃপ্ত শরীরের পাশে কালো ঘন চুল ছড়িয়ে শুয়ে তাঁকে হিশেবি হতে পরামর্শ দেন। মনিরুদ্দিনের টাকা গোণার অভ্যেস নেই, টাকার হিশেব করেন তিনি মুঠো ধরে, গুনে নয়। তাঁর জন্য আর যা কিছু হওয়াই সম্ভব, হিশেবি হওয়া নয়।

পঞ্চাশ সনে আকাল নামল। আকালে চোখের সামনে মরতে লাগল মানুষ না খেয়ে। এক বাটি ফ্যান চাইতে দুয়োরে দাঁড়ায় মানুষ! মনিরুদ্দিন দোকানে বিক্রিবাটা বন্ধ করে লঙ্গরখানা খুললেন, নিজে হাতে চালে ডালে সবজিতে লাবড়া রেঁধে খাবার বিলোতে লাগলেন না খেতে পাওয়া মানুষদের। পকেটে টাকা নিয়ে সারা শহরের বাজার ঘুরে লঙ্গরখানা চালাতে চাল খুঁজেছেন কিনতে, বাজারে চাল নেই। দিশেহারা হয়ে মসজিদে মসজিদে দৌড়োলেন, মোনাজাতের হাত তুলে আল্লাহর দরবারে — *তুমি ছাড়া কোনও মাবুদ নাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তুমি ছাড়া কোনও আপন নাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,* বলে হাউমাউ করে কাঁদলেন, চোখের পানিতে ভেসে গেল মনিরুদ্দিনের বুক। পুরো আকালের বছর তিনি কেঁদে পার করেছেন, উড়োজাহাজ থেকে চাল আর *বিলাতি দুধ* ফেলা শুরু হলে হাসি ফুটেছিল মুখে।

খায়রুননেসা আকাল বুঝতে দেননি, মাচায় কিছু চাল জমিয়ে রেখেছিলেন অভাবে অনটনে কাজে লাগবে বলে, তাই মেপে রাঁধতেন। কোলের বাচ্চা বেঁচেছিল কেবল বুকের দুধেই। খায়রুননেসা হাল না ধরলে সংসার ঝড়ে উড়ে যেত অনেক আগে। মনিরুদ্দিনকে সবটুকু না পারলেও সংসারে যেমন তেমন টিকে থাকার মত মায়ায় জড়িয়েছিলেন খায়রুননেসা। ভয় ছিল, কখন না আবার উড়ে যায় পাখি।

আকিকার উৎসবে মেতে ছিল সবাই, কেউ লক্ষ করেনি রান্নাঘরে চুপচাপ মরে গেছেন নানির মা। নানির বাবা মরে যাওয়ার পর তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন এ বাড়িতে নানি। শিকারি ছেলের চেয়ে খায়রুননেসার কাছেই তিনি থাকতে পছন্দ করতেন। সমাজের নিয়মে অবশ্য শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী, বয়সকালে পুত্রের আশ্রয়ে থাকতে হয় মেয়েমানুষের। নানির মা'কে কাঠ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে মেঝেয় লুটিয়ে কেঁদেছিলেন নানা, যেন নিজের মা'কে হারিয়েছেন সেদিন।

সংসারে দুঃখ আছে, অভাব আছে, কিন্তু সুখও আছে নানা রকম। দাহে বেশিদিন কারও পোড়া হয় না, বর্ষার জল এসে সব ধুয়ে নেয়। জানলায় দাঁড়িয়ে পুকুরের পানিতে টুপটুপ করে ঝরা পানির খেলা দেখেন ঝুনু খালা। টিনের চালে রিমঝিম শব্দ হয় বৃষ্টির। জলের ভেতর জলের খেলা, রিমঝিম সুর সবার মন ভাল করে দেয়। মনের ভেতর পেখম মেলে ময়ূর নাচে। সেই শব্দের সঙ্গে গান করেন রুনু খালা। উঠোনের বৃষ্টিতে ভিজে দৌড়োদৌড়ি খেলেন টুটুমামা, শরাফমামা, ফেলুমামা। চৌচালা ঘরের থামে হেলান দিয়ে, আল্পনা আঁকা ঘরের মেঝেয় পাতা জলচৌকিতে বসে থাকেন মা'র মৃত্যুশোক ঝেড়ে ওঠে কানা মামু।

কানা মামু, দেখে মনে হয় উঠোনের রোদের দিকে তাকিয়ে, বলেন –*খালি গান গাইলে হইব রুনু? নাচো।*

ঝুনু খালা প্রায় বলতে চান *আপনি তো অন্ধ কানামামু, নাচ দেখবেন কেমনে?*

বলেন না। রুনু খালা কোমরে আঁচল গুঁজে পায়ে ঘুঙুর পরে নাচেন – *নীল পাহাড়ের ধারে আর মহুয়া বনের ধারে, মন ভোলানো বংশী কে গো, বাজায় বারে বারে ও মহুয়া বনের ধারে, বনের ধারে ডাকছে পাখি, ব্যথায় আমার ভিজল আঁখি।*

কানা মামু মেঝেয় লাঠি ঠুকে তাল দেন।

কেবল বাবাকে দেখি কোনও সুখের দোলনায় দোলেন না। তিনি ক্লান্ত বিরক্ত। তাঁর কাছে খরা বর্ষা সব এক। খরায় ক্ষেত ফেটে চৌচির হয়ে যায়, ফসল ফলে না, বর্ষায় ক্ষেত ডুবে ফসল নষ্ট হয়। বাবা বেতনের টাকা পুরোটাই মাদারিনগর পাঠিয়ে বড়দাদাকে চিঠি লেখেন – *বাজান, দক্ষিণের জমিটা খুশির বাপের কাছ হইতে কিনিয়া লইতে দেরি করিবেন না। আগামী মাসে অধিক টাকা পাঠাইব।* বাবার তখন উপার্জন অনেক। ছিলেন এল এম এফ ডাক্তার, হয়েছেন এম বি বি এস। জাতে উঠেছেন। নামের একটি নতুন রাবারস্ট্যাম্প বানিয়েছেন *ডাঃ মোঃ রজব আলী, এম বি বি এস।* নানিকে বাড়ি কেনার পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিলেন, নিজেও মাঝের উঠোন জুড়ে পাঁচটি ঘর ভাড়া নিলেন সে বাড়িতে, একটি বৈঠক ঘর, একটি শোবার, একটি পাকঘর, একটি খড়ি রাখার, একটি এমনি পড়ে থাকার। ঘরগুলোয় পাকা মেঝে, টিনের চাল, টালির চাল, ইটের দেয়াল। কোনওটি আবার আগপাশতলা টিনের। আগের কেনা ঘরটি দাদা আর ছোটদাকে গুছিয়ে দেওয়া হল।

বাবার কাছে নাচ, গান, খেলা এসব অনর্থক হল্লা। বৃষ্টিতে ভিজে খেলতে দেখলে ঘাড় ধরে টেনে আমাকে ঘরে ঢোকান তিনি। সারা গা আমার কাঠ হয়ে থাকে ভয়ে। মা'কে যেমন রূপকথার গল্প শোনাতে বলি, বাবাকে কখনও পারি না, মুখের কাছে শব্দ এলেও

ঢোঁকের সঙ্গে পেটে ঢুকে যায় আবার। বাবার চোখের দিকে তাকানো হয় না আমার, ভয়ে। যোজন দূরত্ব তাঁর সঙ্গে আমার।

এত দূরত্ব শুনেছি বাবার সঙ্গে আমার ছিল না। রাজশাহীতে বাবা পড়তে যাওয়ার আগে আমাদের বিষম ভাব ছিল। পাবনার জেলখানা থেকে সবে ফিরেছি। বাবা বাড়ি এলে বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতাম — *বাবা আমালে বেলাইতে নিয়া দাও নদিল পালে।*

নদীর পাড়ে আজ নেবেন কাল নেবেন বলে বলে বাবা আমাকে কোনওদিনই নেন না। বাবার কোলে ওঠা আমার গাল টিপে আদর করে দিয়ে মা বলেন — *নদিল পালে যাইতে হয় না বাচ্চাদের। ছেলেধরা ধইলা নিয়া যাবে তুমালে।*

— *ছেলেধলা আমালে ধলবে না। আমি ত মেয়ে।* বাবার কোলের ওপর জেঁকে বসে মা'কে বলি।

বাবা শুনে হো হো করে হাসেন।

—*নদিল পালে ফটিং টিং থাকে। তিন মানুষের মাথা কাটা, পায়ে কথা কয়।* যেন বাবাকেই ভয় দেখাচ্ছি, অমন করে ফটিং টিংএর শোনা গল্পটি একদিন বলি।

ফটিং টিং প্রসঙ্গে না গিয়ে আমার মাথায় কপালে গালে চুমু খেয়ে বাবা বললেন

—*কও তো তুমি আমার কি হও মা?*

—*আমি তুমাল মা।*

এ বাবার শেখানো। গালে আবারও চকাশ করে চুমু খান বাবা। এলোচুলগুলো আঙুলে আচড়ে কানের পেছনে ঠেলে দেন। আমি তখন বাবা বলতে দুহাত পা ছোঁড়া এক পাগল মেয়ে। বাবা দু'ছেলের পর মেয়ে চেয়েছিলেন। সেই মেয়ে আমি, টুকটুকে মেয়ে, ফুটফুটে মেয়ে, আমার বাবার মা। অথচ সেই আমিই, দু'বছর পর যখন রাজশাহি থেকে *কনডেন্সড* পরীক্ষা দিয়ে *এম বি বি এস* পাশ করে ফেরেন বাবা, তাঁকে আর বাবা বলে চিনিনি, যেন এক অচেনা অদ্ভুত লোক আমাদের ঘরে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন। বাবা আমাকে কোলে নিতে ডাকেন, আমি দৌড়ে পালাই। বাবাকে আর *বাবা* বলে ডাকি না। *তুমি* না, *আপনি* না। বাবাকে আজও আমি *বাবা* বলি না, *তুমি* না, *আপনি* না। বাবা আমার কাছে তখন সম্পূর্ণ বাইরের লোক, কিম্ভুত। নানি, রুনু খালা, ঝুনু খালা, হাশেম মামা, শরাফ মামা, ফেলু মামা, এমন কি বাউন্ডুলে নানাকেও আমার আপন বলে হয়, বাবাকে নয়। যেন বাবা এ বাড়িতে না এলেই ভাল ছিল, আমার, মা'র আর দাদা-ছোটদার সংসার চমৎকার চলছিল। যেন শান্ত একটি পুকুরে হঠাৎ এক ঢিল পড়েছে। যেন এক হিংস্র ফটিংটিং এসে আমাদের খেলাঘর ভেঙে দিয়েছে। বাবার সঙ্গে সেই যে আমার এক দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল, তা থেকেই গেছে। বাবা আমাকে *ও মা, মা গো* বলে কাছে ডাকেন, আমি পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়াই সামনে। আমাদের মাঝখানে অদৃশ্য এক দেয়াল থাকেই, এমনকি তিনি যখন আমাকে বুকে জড়িয়ে আদর করেন।

এক পবিত্র দিনে জন্ম আমার, বারোই রবিউল আওয়াল, সোমবার, ভোর রাত। এমন মেয়ের জন্মেই *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহা মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ* বলার কথা, আল্লাহর ওলিরা নাকি জন্মেই তা বলেন। ফজলিখালা বলেছিলেন, *আহা কি নুরানি মুখ মেয়ের, হবে না কেন, কী পবিত্র দিনে জন্মেছে!*

কিন্তু মেয়ের মুখের নূর রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে যায়। শরাফ মামা, ফেলু মামা আর টুটু মামার পেছনে দৌড়োতে দৌড়োতে। কড়ই গাছকে *পাক্কা* করে চোর চোর খেলার ধুম পড়ে বিকেল হলেই। চোর দৌড়ে যাকে ছোঁবে, সে হবে চোর, গাছের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে চোরকে বলতে হবে *এক দুই তিন চার পাঁচ*, তারপরই ভোঁ দৌড়, যাকে কাছে পায়, তার পেছনে। মামারা আমার থেকে বড়, দৌড়োতে পারেন আমার চেয়ে দ্রুত। আমাকেই বেশির ভাগ সময় চোর হয়ে থাকতে হয়। টুটু মামা কেড়ি কেটে দৌড়োন, চোর আমি ধন্দে পড়ি। খরগোসের মত দৌড়োন ফেলুমামা, সারাদিন তাঁর পেছনে দৌড়োলেও তিনি আমার নাগালের বাইরে থাকেন।

ডাংগুটি খেলতে গেলেও আমাকে খাটতে হয়। আমি গুটি ছুঁড়ি, শরাফ মামা নয়ত ফেলু মামা ডাং পিটিয়ে সে গুটি মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দেন। আমার ইচ্ছে করে আমি ডাং হাতে খেলি, কেউ খাটুক, গুটি ছুঁড়ুক আমার ডাংএর দিকে। তা হঠাৎ খানিকক্ষণের জন্য ঘটে বটে, আবার ডাংএর গায়ে গুটি না লাগায় ডাং ফেরত দিতে হয়।

মার্বেল খেলতে গেলেও জিতে আমার সব মার্বেল মামারা নিয়ে নেন। শরাফ মামা কাচের বয়ামে মার্বেল রাখেন। প্রায়ই বিছানায় বয়াম উপুড় করে ফেলে মার্বেল গোণেন তিনি। আমি মুগ্ধ চোখে দেখি চকচক করা মার্বেলগুলো। আমার কেবল তাকিয়ে থাকার অধিকার আছে, ছোঁবার নেই। একবার হাত বাড়িয়েছিলাম বলে শরাফ মামা ধাম করে পিঠে কিল বসিয়েছিলেন।

সিগারেটের প্যাকেটগুলোও আমার হাতছাড়া হয়ে যায়। বগা, সিজার, ব্রিস্টল আর ক্যাপস্টেনের প্যাকেট রাস্তা থেকে কুড়িয়ে চ্যাড়া খেলতাম। উঠোনের মাটিতে চারকোণা ঘর কেটে ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে চ্যাড়া ছুঁড়তে হয়, এরপর যত ইচ্ছে প্যাকেট হাতের মুঠোয় নিয়ে দু'উরুর তলে লুকিয়ে অন্যপক্ষকে বলতে হয় *পুটকির তল*। মানে বাজি, তোমার চ্যাড়া আমার চ্যাড়ার চারআঙুলের সীমানায় এলে আমি পুটকির তলে যা আছে দিয়ে দেব, না হলে তুমি দেবে গুনে গুনে। আমাকেই দিতে হত।

চোর চোর, ডাংগুটি, মার্বেল, চ্যাড়া খেলে খেলে রং তামাটে হয়ে গেছে, মুখের নূরানি গেছে, ফজলি খালা তবু আশা ছাড়েননি, তাঁর তখনও ধারণা আমি বড় হয়ে *আল্লাহর পথে* যাব।

নন্দিবাড়ি থেকে আমার ঘুরে আসার পর ফজলিখালার ধারণা আরও পোক্ত হয়। রুনুখালার বান্ধবী শর্মিলার বাড়ি নন্দিবাড়ি নামে এক এলাকায়, হাজিবাড়ি জঙ্গলে যেতে গেলে হাতের বাঁদিকে। ও বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন রুনু খালা আমাকে নিয়ে।

শর্মিলার বাড়িটি, চুন সুরকি খসা পুরোনো দালান। পোড়ো বাড়ির মত, যেন দেয়ালের ভেতরে সাপ বসে আছে মোহরের কলসি নিয়ে। যেন বটগাছ গজাচ্ছে বাড়িটির ফোকরে। বাড়িটি দেখলেই মনে হয় বাড়ির ছাদে গভীর রাতে কোনও রূপবতী মেয়ে পায়ে নূপুর পরে নাচে আর বাতি জ্বাললেই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। বাড়িটি ঘিরে লিচু গাছ, লিচু পেকে ঝুলে আছে গাছের সবগুলো ডাল। নন্দিবাড়ির লিচুর বেশ নাম, কিন্তু লিচুর দিকে হাত বাড়াতে আমার ভয়, যদি পোড়োবাড়ির দালান থেকে উঁকি দেয় কোনও পদ্ম গোখরা। সিঁড়ির সামনে অদ্ভুত সুন্দর এক পুকুর, জলে তাকালে তলের মাটি দেখা যায়, আর জলের আয়নায় ভেসে ওঠে মুখ, জল নড়ে, মুখও নড়ে এলোমেলো হয়ে। আমি হাসি না, অথচ জলের মুখ হাসে আমাকে দেখে।

সন্ধেয় নিবু নিবু হারিকেন জ্বেলে শর্মিলা আমাদের মিস্টান্ন খেতে দিয়েছিলেন, আমি মাথা নেড়ে বলেছি খাবো না। খাবো না তো খাবোই না।

— *কেন খাবে না?* শর্মিলা জিজ্ঞেস করল।

ঠোঁট চেপে বসে থাকি। সাপের, জিনের, ভূতের ভয়ে গলার স্বর বেরোয় না।

শর্মিলা অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে, যে মেয়ে ছাদে গভীর রাতে নাচে বলে মনে হয়, ও ঠিক শর্মিলার মত দেখতে। শর্মিলার কোনও যমজ বোন নয়ত আগের জন্মে ও শর্মিলাই ছিল। শর্মিলার কালো চুল সাপের মত নেমে এসেছে হাঁটু অবদি। বাড়িতে তখন একা সে, পরনে শাদা শাড়ি, বেতের চেয়ারে বসেছেন গা এলিয়ে চুল এলিয়ে, হু হু করে সন্ধের বাতাস জানলা গলে এসে আরও এলো করে দেয় চুল, আবছা আলোয় দেখি তাঁর কাজল না পরা চোখও কালো, উদাস।

শর্মিলা ঠোঁট খুললে মনে হয় আকাশ থেকে ডানা করে এক শাদা পাখি বয়ে আনছে শব্দমালা — *খুব মিষ্টি মেয়ে তো, নাম কি তোমার?*

কান পেতে থাকলে শর্মিলার কথার সঙ্গে নূপুরের শব্দ শোনা যায়। আমি শুনি, অন্তত।

রুনু খালা বলেন — *ওর নাম শোভা।*

—*মিষ্টি খাও শোভা।* শর্মিলা হেসে বলেন।

আমার নাম শোভা নয় কথাটি বলতে চেয়েও আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। শোভা নামটি আমার সত্যিকার নামের চেয়ে ভাল তা সত্যি কিন্তু নামটি আমার নয়। নামটি বলে আমাকে কেউ ডাকলে কেমন অস্বস্তি হয় আমার, ওই নামের ডাকে সাড়া দিলে নিজেকে মিথ্যুক মনে হয়, মনে হয় চোর, অন্যের নাম চুরি করে নিজের গায়ে সেঁটেছি। শর্মিলাকে হঠাৎ, হঠাৎই, আমার শর্মিলা বলে মনে হয় না, বসে আছে চুল খুলে শাদা শাড়িতে, যেন ও শর্মিলা নয়, ওর মরে যাওয়া যমজ বোন নয়ত আগের জন্মের ও বলছে। শব্দগুলো আসছে পাখির ডানায় করে। ও যখন কথা বলে নূপুরের শব্দ ভেসে আসে। মিষ্টি এক গন্ধ ঘরে, বেলি ফুলের। ঘরে কোথাও বেলি ফুল নেই, বাগানে বেলি ফুলের গাছ নেই, গন্ধ কোত্থেকে আসে আমি বুঝি না। ফুলের গন্ধ কি শর্মিলার গা থেকে আসছে! বোধহয়।

রুনু খালার হাত চেপে বলি — *চল, বাড়ি যাই।*

হারিকেনের আলো ম্লান হতে হতে দপ করে নিবে যায়। শর্মিলার গায়ের আলো সারাঘর আলো করে দেয়।

সারাঘরে আলো ছড়িয়ে বেলি ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে শর্মিলা বলেন – *এখনই চাঁদ উঠবে। ফুটফটে জোৎস্না হবে। জোৎস্নায় বসে আমরা গান গাইব আজ জোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে। তুমিও গাইবে।*

বলে রিনরিন করে হেসে ওঠেন। আমি রুনু খালার গা ঘেঁসে ভাঙা গলায় বলি

–*রুনুখালা, চল। বাড়ি চল।*

সেদিন বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেখি, চাঁদ ছিল শর্মিলাদের বাড়ির ওপর, উড়ে উড়ে আমাদের বাড়ির আকাশ অবদি এল। রুনুখালাকে পথে বলেছি *দেখ দেখ চানটা আমগোর সাথে সাথে আইতাছে।* রুনুখালা মোটে অবাক হলেন না দেখে। মা'কে বাড়ি ফিরেই বলেছি – *জানো মা, চান আমরা যেইদিকে গেছি সেইদিকে গেছে। নন্দিবাড়ি থেইকা চানটা আমগোর সাথে আকুয়ায় আইছে।*

মাও আমার কথায় অবাক হন না, জিজ্ঞেস করেন –*কি খাওয়াইল শর্মিলাগোর বাড়িত?*

গর্বে ফুলে রুনুখালা বললেন – *কিচ্ছু মুহে দেয় নাই। হিন্দু বাড়ি ত, এইল্লিগা।*

হিন্দু বাড়িতে আমি কিছু মুখে দিই না। কপালে কমুকুমের টিপ পরাতে চাইলে মুখ ফিরিয়ে নিই— মা'র ধারণা পবিত্র দিনে জন্মেছি বলেই আমি এমন করি। শর্মিলাদের বাড়ি থেকে ফেরার দু'চারদিন পর ফজলিখালার কাছে প্রথম কথাটি পাড়েন মা – *দেখ ফজলি, অমন দিনে জন্মাইছে বইলাই তো মেয়ে আমার হিন্দু বাড়িতে খায় না, কপালে ফুটা দিতে চাই, দেয় না।*

ফজলিখালা প্রায়ই হাজি বাড়ি জঙ্গল পেরিয়ে চলে আসেন নানির বাড়ি। এসেই আপাদমস্তক ঢেকে রাখা বোরখাটি গা থেকে খুলে বেরিয়ে পড়েন উঠোনে, পাকঘরে ঢুকে পাতিলের ঢাকনা খুলে দেখেন কি রান্না হচ্ছে বা হয়েছে, যে রান্নাই হোক, ইলিশ মাছ ভাজা বা চিতল মাছের কোপ্তা, নাক কুঁচকে ফেলেন। দেখে ধারণা হয় তিনি বিশ্রি গন্ধ পাচ্ছেন ওসব থেকে, অথবা আদৌ এসব খাবার তিনি পছন্দ করেন না। খেতে বসলে ফজলিখালার পাতে নানি দেখে শুনে ভাল পেটিটি, তলের না ওপরের না, মাঝের ভাত দেন, না পোড়া না থ্যাবড়ানো বেগুনের বড়াটি দেন। বড়ার ওপর ভাজা পেঁয়াজও দিয়ে দেন এক মুঠো। তিনি যতক্ষণ খান নাক কুঁচকেই রাখেন, যেন এ বাড়িতে এসে শ্বশুরবাড়ির চমৎকার খাবার থেকে ভীষণ বঞ্চিত হচ্ছেন তিনি আর নিতান্তই ভদ্রতা করে যা তা কোনওরকম গিলছেন এখানে যেহেতু এসেই পড়েছেন আর দুপুরও গড়িয়েছে। খেতে বসে কেবল নাক কুঁচকে থাকা নয়, ফজলিখালা বলেন *শাকটা কে রেঁধেছে, বালু বালু লাগে। মাংসটায় গরম মশলা দেওয়া হয়নি নাকি! মাছ ভাজায় মনে হয় তেল কম হয়েছে।* এসব।

সেদিনও, যেদিন মা আমার কপালে টিপ না পরা আর হিন্দু বাড়িতে না খাওয়ার খবর শোনালেন, তিনি খেয়ে দেয়ে মুখে পান পুরে শুয়ে শুয়ে চিবোচ্ছেলেন, সেদিন ফজলিখালার আপত্তি ছিল রসুন নিয়ে, কবুতরের মাংসে নাকি রসুন কম হয়েছে। কাঁচা চারটে রসুন ফজলিখালার পাতে দিয়ে বলেছিলেন নানি *দেখ তো ফজলি এহন স্বাদ লাগে কি না।*

—আবার পাতে রসুন দিতে গেলেন কেন মা! ফজলিখালা শুকনো হেসে বলেন, *কাঁচা রসুন কি আর মাংসের ঝোলে মিশবে! মাংস সিদ্ধ হয়েছে তাই তো যথেষ্ট। ক্ষুধা মেটাতে আল্লাহ বলেছেন কোনওরকম সামান্য কিছু খেলেই চলে, খাবার নিয়ে বিলাসিতা আল্লাহতায়ালা পছন্দ করেন না। নবীজিও অল্প খেতেন।*

ফজলিখালার ফর্সা কপালে কোঁকড়া ক'টি চুল ঝুলে থাকে। দুর্গা প্রতিমার মত তাঁকে দেখায়। শুয়ে থাকা পান চিবোনো ফজলিখালা ঘটনাটি ফাঁস করেন ভরা ঘরে, দুপুরের পর বিছানায় শুয়ে বা বসে যারাই জিরোচ্ছিল, শোনে — *বলছিলাম না, এই মেয়ে ঈমানদার হবে। দেখ, হিন্দুর বাড়িতে ও কিছু খেলো না। কপালে টিপও পরাতে দেয় না, কারণ হিন্দুরা কপালে টিপ পরে। ওকে তো কেউ শেখায়নি এসব, ও জানল কি করে! আসলে আল্লাহ ওকে জানাচ্ছেন। ছোটবেলায় ঘুমের মধ্যে ও কি যে মিষ্টি করে হাসত, ফেরেসতাদের সঙ্গে ও খেলত কি না। বড়বুর কপাল ভাল।*

যে যত বলুক *বড়বুর* কপাল ভাল, মা ভাবেন তাঁর কপাল খারাপ। তাঁর পড়ালেখা করার শখ ছিল খুব, সম্ভব হয়নি। ভাল ছাত্রী বলে ইস্কুলে নাম ছিল। নানা চাইতেন মেয়ে বোরখা পরে ইস্কুলে যাক। মা বোরখা পরেই যেতেন, দেখে ইস্কুলের মেয়েরা মুখ টিপে হাসত। বিয়ে হয়ে গেল বলে ইস্কুল ছাড়তে হল। ইস্কুল থেকে শেষদিন বিদায় নেওয়ার দিন মাস্টাররা চুক চুক করে দুঃখ করে মা'কে বলেছিলেন *তর মাথাডা ভালা আছিল, বিএ এমএ পাশ করতে পারতি। বিয়ার পর দেহিস পড়ালেখা যদি চালাইয়া যাইতে পারস।* বিয়ের পর বাবার কাছে মা একটি আবদারই করলেন *আমি লেখাপড়া করাম।* দাদাকে ইস্কুলে পাঠিয়ে নিজেও তিনি যেতে শুরু করেছিলেন, বাবার আপত্তি ছিল না। আপত্তি ছিল নানার। মা'র তবু লেখাপড়ার শখ যায়নি। বাবা রাজশাহী পড়তে গেলে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে মা নিজে ইস্কুলে ভর্তি হলেন। তখন দাদা পড়েন সেভেনে, জিলা ইস্কুলে। মহাকালি ইস্কুলে মাও সেভেনে। ইস্কুলে মাস্টাররা জানতেন মা'র বিয়ে হয়েছে, বাচ্চাকাচ্চা আছে। খবরটি গোপন রাখা হল ছাত্রীদের কাছে যেন মা কোনওরকম কুণ্ঠা ছাড়াই বয়সে ছোট মেয়েদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারেন, এক কাতারে বসে লেখাপড়া করতে পারেন। ক্লাস সেভেনের ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় সবচেয়ে ভাল ফল করলেন তিনি। গোপন ব্যাপারটি শেষ অবদি বাড়িতে গোপন থাকেনি। খবর জেনে বার্ষিক পরীক্ষার আগে মা'কে সাফসাফ বলে দিলেন নানা, সেই আগের মতই, *মাইয়া মানষের অত নেকাপড়ার দরকার নাই। ঘরে বইসা পুলাপান মানুষ কর।* বাবাও রাজশাহী থেকে চিঠি লিখে ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করে মা'কে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে পরামর্শ দিলেন। পায়ে অদৃশ্য এক শেকল পরিয়ে দিল কেউ। মা'র স্বপ্নসাধ ভেঙে চুরমার হল আরও একবার।

মা'র বিশ্বাস হয় না তাঁর কপাল ভাল।

কপাল ভাল হলে নানাকে বেড়ালের মত পা টিপে টিপে মা'র ঘরে ঢুকে আশে পাশে কেউ আছে কি না পরখ করে পকেট থেকে বের করতে হয়েছিল কেন কাগজে মোড়ানো কৌটো! মা'র ডান হাতে কৌটোটি রেখে আঙুলগুলো বুজে দিয়েছিলেন তিনি যেন কাকপক্ষীও না দেখে! বলেছিলেন কেন *জিনিসটা লুকাইয়া রাখিস,* যেহেতু দেয়ালেরও কান আছে, ফিসফিস করে — *আর রাইতে রাইতে মুখে মাখিস।*

মা'র কালো মুখ ফর্সা করার ওষুধ দিয়ে দিয়েছিলেন নানা যেন বাবার চোখে মা অসুন্দরী না ঠেকেন যেন বাবা বউছেলেমেয়ে ফেলে আবার না কোথাও চলে যান। সেই কৌটোর ওষুধ মা রাতে রাতে মুখে মাখতেন, মুখের রং কিন্তু পাল্টাত না। চোখ আরও কোটরের ভেতরে যেতে থাকে, চোখের নিচে পড়তে থাকে কালি, নাক যেমন ভোঁতা, তেমন ভোঁতাই থেকে যায়। রূপ না থাক, গুণ তো আছে তাঁর, সেলাই জানেন, রান্না জানেন, মা নিজেকে স্বান্ত্বনা দেন। কিন্তু আদৌ কি গুণবতী তিনি! মা'র বিশ্বাস তাঁর চেয়ে নিখুঁত রান্না সেলাই অন্য অনেক মেয়েই জানে। রূপ গুণ না থাক, মা আবার নিজের কাঁধে মনে মনে চাপড় দিয়ে নিজেকেই বোঝান তিনি তো আস্ত একটি মানুষ, খোঁড়া নন, অন্ধ নন, পাগল নন। সোহেলির মা'র এক মেয়ে বদ্ধ পাগল, সত্য গোপন করে এক ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে মেয়েকে। সে পাগল মেয়ের চেয়ে সংসারে নিশ্চয় এক ধাপ ওপরে মা, যে যত নিন্দা করুক মা'কে। মা পাগল না হলেও মাঝে মাঝে পাগল পাগল লাগে মা'র। বাবা যখন রাজশাহী চাকরি করছিলেন, তিনি দাদাদের নানির কাছে রেখে রওনা হয়েছিলেন একা। মা'র ভয়, বাবা তাঁকে ভালবাসেন না। নানা রং ফর্সা করার ওষুধ দিলে মা'র আরও ভয় ধরে। লাল রঙের ফ্রক মা'কে আর নীল রঙের ফজলিখালাকে যখন কিনে দিতেন নানা, মা খেজুর গাছের তলে দাঁড়িয়ে কাঁদতেন একা একা, সেই ছোটবেলায়। বিয়ের পর বাবা তাঁর জন্য শাড়ি কিনতে গেলে দোকানিকে বলতেন কালো রঙের মেয়েকে মানাবে এমন শাড়ি দিতে। শাড়ি পেয়ে মা কাঁদতেন না, ভয় পেতেন। সেই ভয় মা'র কখনও যায়নি। রাজশাহির পথে যেতে যেতে বুক ফুঁড়ে সে ভয় বেরিয়ে আসে, মা সামাল দেন। কখনও এর আগে একা একা ময়মনসিংহ ছেড়ে কোথাও যাননি মা, তা যাননি, তাই বলে কেন যাবেন না আজ, তিনি স্বামীর কাছে যাচ্ছেন, তাঁর দু'ছেলের বাবার কাছে, কোনও অবৈধ পুরুষের কাছে যাচ্ছেন না, কলমা পড়ে যে লোক তাঁকে কবুল করেছেন, তাঁর কাছে, ন্যায্য দাবিতে যাচ্ছেন। বাবা বলেননি যেতে, কিন্তু তাঁর সমস্ত শরীরে মনে তিনি বাবার কাছে যাওয়ার তীব্র আকাংখা অনুভব করছেন। বাবা ড্রাম ভরে চাল আর হাতে টাকা পয়সা দিয়ে গেছেন সংসার খরচ। কিন্তু সংসারে মন বসে না মা'র। সংসারে চাল ডালই তো সব নয়! টিঙটিঙে বোকাসোকা মেয়েরও যে মন থাকে, মন উথালপাথাল করে, কে বোঝে! বাড়ির কাউকে বোঝানো যায় না এ কথা।

বাবার বদলির চাকরি, সারাদেশ ঘুরে ঘুরে চাকরি করতে হয়। রাজশাহি এসে অবদি চেষ্টা করছেন আবার বদলি হয়ে যেতে ময়মনসিংহ। কিন্তু আপিসের বাবুরা তা মানেন না। এমন সময় হঠাৎ দেখেন বউ এসে হাজির। ঠোঁটে কড়া লাল লিপস্টিক, মুখ শাদা হয়ে আছে পাউডারে। হাতে চামড়ার সুটকেস, সুটকেসে রঙিন শাড়ি, নানার দেওয়া রং ফর্সা হওয়ার কৌটো, আর একখানা তিব্বত পাউডারের ডিব্বা।

বাবা ভূত দেখার মত চমকে বলেছিলেন — *তুমি এইখানে কেন? কেমনে আসছ? কে নিয়া আসছে?*

—*আসছি একলাই।* মা শুকনো হেসে বলেন।

—*একলা? এতদূর? কি ভাবে সম্ভব? বাচ্চারা কেমন আছে?* বাবা একদমে জিজ্ঞেস করেন।

—ভালা আছে। তুমি কেমন আছ? চিঠি পত্তর দেও না। তুমি কি আমারে ভুইলা গেছ? মা'র স্বর বুজে আসে। চোখ ছলছল করে।

বাবা অস্থির পায়চারি করে ডক্টরস কোয়ার্টারের পুরোনো লোহার চেয়ারে বসে বলেন *—তোমার কি মাথা টাথা খারাপ হইয়া গেছে? কোলের বাচ্চা ফালাইয়া আইছ?*

—বাচ্চাগোর অসুবিধা নাই। দেখার মানুষ আছে।

বলে মা এক পা এক পা করে এগিয়ে আসেন বাবার দিকে।

—টাকা যা দিয়া আইছি, আছে তো! বাবা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন।

—ফুরাইয়া গেছে। বাচ্চাগোর দুধ কিইনা দেন বাজান আর মিয়াভাই।

কাছে এসে বাবার চেয়ারের হাতলে হাত রেখে মা বলেন। গা থেকে তাঁর মিষ্টি সুবাস ছড়ায়।

—আমারে জানাইলে তো আমি টাকাপয়সা যা লাগে নিয়া যাইতাম!

আগামীকালই টাকা নিয়া ময়মনসিং ফিরো।

বাবা চেয়ার ছেড়ে ঝট করে উঠে প্যান্টের দু'পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে বলেন।

—তুমার রান্ধাবাড়া কেডা কইরা দেয়? কি খাও? শইলডা তো শুগাইয়া গেছে।

বাবার পিঠে কোমল একটি হাত রাখেন মা। ভারি নরম হাত। হাতেও মিষ্টি গন্ধ।

বাবার মুখে উত্তর নেই, কালো ঘন ভুরু দুটো কুঁচকে থাকে। ক্লান্ত বিরক্ত।

দু'বছরের কনডেন্সড করতে যখন বাবা আবার যান রাজশাহি, মা'কে বলেন *দেইখো তুমি আবার বাচ্চাকাচ্চা ফালাইয়া কুথাও রওনা দিও না।* মা কেঁদে বুক ভাসান। বাবা কেশে সাফ গলা সাফ করে বলেন — *টাকা পয়সা যা লাগবে রাইখা গেলাম, চারছয়মাস পরে আইসা দিয়া যাব আরও।*

যে দু'একটি চিঠিপত্র লিখতেন বাবা, তা এরকম — *নোমান কামাল নাসরিন কেমন আছে? চাল ফুরাইয়া গেলে নতুন বাজারের চালের আড়ত থেকে তোমার বাবাকে পাঠাইয়া চাল কিনিয়া লইও। সদাই পাতি যা লাগে মনু মিয়ার দোকান থেকে আনাইয়া লইও। নোমান কামালের লেখাপড়ার খোঁজ খবর লইও। মন দিয়া পড়ালেখা করতে বলিও। সুলেখার মা'র কাছে যে টাকা ধার লইয়াছ তাহা আগামি মাসে পাঠাব। টাকা পয়সা বাজে খরচ করিও না। অদরকারি কোনও জিনিস কিনিও না। সাবধানে থাকিও। ইতি রজব আলী।*

মা'র চিঠির ভাষা অন্যরকম। শহুরে মেয়ে, বাবার সঙ্গে বিয়ের পর পর দু'তিনটে দিলীপ কুমার মধুবালার সিনেমা দেখা মেয়ে গোটা গোটা অক্ষরে পাতা ভরে চিঠি লেখেন

প্রিয়তম, কেমন আছ? কবে আসবে তুমি? তোমাকে ছাড়া আমার ভাল লাগে না। আমি তীর বেঁধা পাখির মত ছটফট করি। তুমি আমাকে নিয়ে যাও। আমরা এক সঙ্গে আমাদের ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখে থাকব। তুমি রাজশাহি থেকে বড় ডাক্তার হয়ে ফিরবে। আমি কত মানুষকে যে বলি, গর্বে আমার বুক ভরে যায়। আমি তোমার যোগ্য নই জানি। তোমার মত জ্ঞান, বুদ্ধি আমার নেই। আমার কিছু না থাক, আমার তো তুমি আছ। তুমিই আমার সুখ। আমার শান্তি। এই পৃথিবীতে আমি আর অন্য কিছু চাই না।

উত্তরে বাবা লেখেন – *প্রতিদিন দুই আড়াই টাকার বেশী বাজার করিও না। টাকা শেষ হইয়া গেলে মনু মিয়ার দোকান হতে বাকিতে জিনিস কিনিও। ছেলে মেয়ের যত্ন লইও। যাহা যাহা সদাই করিবে, জমা খরচের খাতায় লিখিয়া রাখিবে।*

মা খাতায় লিখে রাখেন না, ইচ্ছে হয় না। আঁচলের খুঁটে পয়সা বেঁধে রাখেন, ছেলেমেয়েরা চানাচুর খেতে চায়, মালাই আইসক্রিম খেতে চায়, খুঁট থেকে পয়সা খুলে ওদের দেন। সকালে দাদাকে পাঠিয়ে ঠান্ডার বাপের দোকান থেকে গরম ডালপুরি কিনে আনেন, তা দিয়ে নাস্তা হয়। কোনওদিন সর্ষের তেল থাকে তো নুন থাকে না, নানির কাছ থেকে ধার করে রান্না চলে। কোনওদিন হারিকেনে সলতে থাকে তো কেরোসিন ফুরিয়ে যায়। সুলেখার মা'র কাছ থেকে ধার করে সে রাত চালিয়ে দেন। কোনওদিন ছোটদা টাকা হাতে বাজারে বেরোন, ফেরেন না ফেরেন না, চুলোয় আগুন ধরানো হয় না। হাশেম মামা তিন রাস্তার মোড় থেকে ধরে আনেন ছোটদাকে, কি, রাস্তায় বসেছিল, কেন, বাজারের টাকা নেই, কেন নেই, ফালতু কাগজ মনে করে পকেটের টাকা ফেলে দিয়েছে।

দু'বছর পর রাজশাহি থেকে বড় পাশ দিয়ে বাবা ময়মনসিংহে ফিরে আসার পর বাড়ির সবার সঙ্গে বাবার দূরত্ব আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। আমার বয়স তখন দুয়ে দুয়ে চার। আমি তাঁর কাছ ঘেঁসি না আগের মত আর। মা'র সঙ্গে বাবার সম্পর্ক গড়ে ওঠে চাল ডালের, আনাজপাতির। মাও ধীরে ধীরে মুখে স্নো পাউডার মাখা কমিয়ে দিয়ে বাবার হাতে লিস্টি দিতে শুরু করেন *সরিষার তেল তিন ছটাক, পিঁয়াজ এক সের, লবণ দেড় পোয়া, মশুরির ডাল আধা সের।* বাবা লিস্টি পড়ে থলে ভরে সদাই কিনে বাড়ি নিয়ে আসেন। মা রান্না করে বাবাকে খাবার বেড়ে দেন দুপুরে, রাতের খাবার থালা উপুড় করে ঢেকে রাখেন। রাতে ঘরে ফিরে কুয়োর তোলা জলে হাত মুখ ধুয়ে, খেয়ে ঢেকুর তুলে বিছানায় শুয়ে পড়েন বাবা। বাবা ক্লান্ত বিরক্ত। তাঁর কাঁধে কেবল বউবাচ্চার দায়িত্ব নয়, মাদারিনগর বলে এক গ্রামের গরিব কৃষকের ছেলে তিনি, তা তিনি ভোলেন না। জাফর আলী সরকার মরে যাওয়ার পর বাবার ছোট দু'ভাই রিয়াজউদ্দিন আর ঈমান আলীকে পাঠশালায় পাঠানোর উৎসাহ কেউ দেখাননি। বড়দাদা ওঁদের ঢুকিয়ে দিয়েছেন হালচাষের কাজে। বাবার ইচ্ছে অন্তত বাকি ভাইদের লেখাপড়া করানোর দায়িত্ব তিনিই নেবেন, তিনিই হবেন সংসারের জাফর আলী সরকার। আমানুদ্দৌলা আর মতিন মিয়াকে শহরে এনে লেখাপড়া করানোর স্বপ্ন খেলা করে বাবার মনে। মাদারিনগরের জন্যও তাঁর স্বপ্ন অনেক, অন্তত সে স্বপ্ন তৈরি করেন সবুজ লুঙ্গি আর রাবারের জুতো পরে প্রায়ই শহুরে ভাইএর কাছে চলে আসা রিয়াজুদ্দিন, ঈমান আলী।

পুস্কুনির উত্তরের জমিডা কিইনা লইলে ভালা হয় ভাইসাব,

খুশির বাপে জমি বেচতাছে। এইডা এহন না কিনলে জমির মুন্সি ঠিহই কিইনা লইব।

বাজান কইছে বলদ আরও দুইজোড়া কিইনা লইলে চাষের সুবিধা।

গরু চড়াতে গিয়ে দিগন্ত অবদি যে জমি দেখতেন, তিনি এ বয়সে মনে মনে বালক হয়ে সবুজ সেসব ধানক্ষেতে ছুটে বেড়ান। রিয়াজউদ্দিনের হাতে কাড়ি কাড়ি টাকা দিয়ে বলেন – *ঠিক আছে, কিইনা ল।*

মা'র চোখ এড়ায় না বাবার *উদার হস্ত।*

জমি কিনতে টাকা দেওয়ার পরই তিনি লম্বা লিস্টি তৈরি করে বাবাকে দেন

১.দুইটা ঘরে পরার শাড়ি,

২.শায়া (শাদা)

৩. ব্লাউজ (লাল)

৪. এক জোড়া সেন্ডেল (বাটা)

৫.কানের দুল(ঝুমকা)

৬.কাচের চুড়ি(রেশমি)

৭.গায়ের সাবান।

৮.জবা কুসুম তেল।

৯.কাপড় ধোয়ার ৫৭০ সাবান।

১০. সোডা।

লিস্টি পেয়ে *কী ব্যাপার, দুইমাস আগে না শাড়ি কিইনা দিলাম!* চোখ কপালে তুলে বলেন বাবা।

মা ঠান্ডা গলায় বলেন –*ছিঁইড়া গেছে। এক কাপড় পইরা রান্ধাবাড়া, ধোয়া পাকলা, বাড়ির বেবাক কাম, আর কত! শাড়ি তো আর চটে বানানি না।*

–*কই দেখি, কই ছিঁড়ছে!* বাবা ভুরু কুঁচকে বলেন।

মা দু'আঙুল ছেঁড়া শাড়িকে এক টানে দু'হাত লম্বা করে ছিঁড়ে এনে বাবাকে দেখিয়েছিলেন। মা'র চোখ পাথরের মত স্থির। এক থোকা কষ্ট দলা পাকিয়ে গলার ভেতর আটকে ছিল।

–*সেইদিন না নারিকেল তেল কিনলাম, শেষ হইয়া গেল?* বাবা জেরা করেন।

–*সেইডা ত কবেই শেষ।* মা বলেন।

চোখের চশমা একটানে খুলে বাবা বলেন – *কই শিশি কই, শিশিডা আনো।*

–*শিশি ফালাইয়া দিছি।* মা'র উদাসীন স্বর।

বাবা চোখে আবার চশমা লাগিয়ে লিস্টির দিকে তাকিয়ে বলেন – *কাপড় ধোয়ার সাবান কিননের লাইগা এই নেও এক টেকা রাখো। বাকি জিনিসের দরকার নাই।* বাবা একটি টাকা রেখে গিয়েছিলেন টেবিলে। মা সেই টাকা ছোঁননি। টেবিলে পড়েই ছিল। টাকাটির দিকে তাকালে সংসারে নিজেকে বড় অপাংতেয় মনে হত মা'র।

মা'র তাই বিশ্বাস হয় না তাঁর কপাল ভাল। বারোই রবিউল আওয়াল তারিখে মেয়ে জন্মে তাঁর কপাল আর কতটুকু ফিরিয়েছে! দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলেন –*আমার কপালের কথা কইস না ফজলি। কপালে আমার সুখ নাই।*

ফজলিখালা মা'র হাতের পিঠে হাত রেখে বলেন – *আল্লাহর নাম লও। দেখবে মনে শান্তি আসছে। দুলাভাইরে বল নামাজ পড়তে।*

ফজলিখালার ফর্সা হাতের দিকে তাকিয়ে মা বলেন – *তর দুলাভাই উঠতে বইতে আমারে কালা পেঁচি কয়। হে আল্লাহর নাম লইলে কি আমার কালা রঙ শাদা হইব!*

–*বড়বু,* ফজলিখালা দ্রুত তাঁর ভারি শরীরখানাকে তুলে যেন শাসন করছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন – *রঙ আল্লাহ দিয়েছেন। আল্লাহ যা দিয়েছেন আমাদের তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।*

খরনদীতে মা খড়কুটো পেলেন একটি ধরার। রঙ আল্লাহর দান। কালো রঙকে নাক সিঁটকেলে আল্লাহকেই নাক সিঁটকোনো হয়।

আমার দুয়ে দুয়ে চার চলছে তখনও, পর পর দুটো ভ্রুণ ঝরে পড়ার পর মা আবার পোঁয়াতি হন। বাবা বদলি হন ঈশ্বরগঞ্জ। বাক্সপেটরা গুছিয়ে বাবার সঙ্গে তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে ঈশ্বরগঞ্জ রওনা হলেন মা। নানি তখন সবে ছটকুর জন্ম দিয়েছেন। মা মেয়ে এ বাড়িতে প্রায় একই সময় পোয়াতি হন।

ঈশ্বরগঞ্জে বাবাকে একটি জিপ দেওয়া হল হাসপাতাল থেকে। জিপে করে দাদাদের ইস্কুলে দিয়ে বাবা কাজে যান। আমার তখনও ইস্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি। বাড়িতে বসে মা'র কাছে যুক্তাক্ষর শিখি।

মা'র প্রসবের আগে আগে বাবা জিপে করে ময়মনসিংহ গিয়ে ঝুনু খালাকে নিয়ে এলেন ঈশ্বরগঞ্জ। ইস্ত্রি করা পাজামা জামা আর ওড়না পরে একখানা সুটকেস নিয়ে বাড়িতে নামলেন ঝুনু খালা। কী আনন্দ সেদিন তাঁর! দাদাদের নিয়ে তিনি গপ্পে বসে গেলেন, যেন ছ'মাসে এত কিছু ঘটে গেছে ছ'বছরেও গপ্প ফুরোবে না। ঝুনুখালাকে পড়াতে এক নতুন মাস্টার আসেন, সেই মাস্টার কি করে বোয়াল মাছের মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন ঝুনুখালার দিকে, তারই বর্ণনা করেন তিনি অর্ধেক রাত অবদি। নতুন মাস্টারের নাম রাসু। ঈশ্বরগঞ্জে আমাদের বড় দালানবাড়িটি ঝুনুখালা এসে সাজিয়ে গুজিয়ে চমৎকার বানিয়ে ফেললেন। বাবা দেখে বললেন –*তুমার বইনরে শিখাইয়া দিয়া যাইও ঘরদোর কি কইরা গুছাইতে হয়।* শুনে মা তেতো হেসে বলেন – *আমার কোনও কামই তার পছন্দ হয় না। কয়না যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।*

বাবা ঝুনুখালাকে টেনে কোলে বসিয়ে পেটে কাতুকুতু দিয়ে বলেন – *এই তুই ত দিনে দিনে সুন্দর হইতাছস। তরে যে বেটা বিয়া করব কপাল ভাল তার।*

ঝুনুখালা ওড়নায় মুখ ঢেকে বাবার হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ান। কান নাক লাল হয়ে থাকে তাঁর শরমে। বাবা ফজলিখালার সঙ্গে আরও সরস হতেন, তাঁকে টেনে বিছানায় বসিয়ে বলতেন– *এই যে সুন্দরী, আমার কাছে এট্টু আয় ত, প্রাণডা জুড়াক। জানডা কোরবান কইরা দিতে ইচ্ছা করে তর লাইগা।*

ফজলিখালা হাসতে হাসতে বলতেন —-*খালি ফাজলামি করেন দুলাভাই।*

শালিদের সঙ্গে এমন ঠাট্টা, বুক টিপে দেওয়া পেটে কাতুকুতু এসব, দুলাভাইদের জন্য হালাল। কথাও যৌনরসে ভিজিয়ে তোলা, কেউ আপত্তি করে না। মা'র তবু মনে হয় বাবা সীমা ছাড়িয়ে যান। রং ফর্সা দেখলে বাবা শালি কি চাকলাদারের বউ কারও গা ছাড়েন না।

ঝুনুখালা আসার ছ'দিন পর মা'র ব্যথা উঠল। খবর পেয়ে দুপুরে হাসপাতাল থেকে ডাক্তারি ব্যাগ আর একজন নার্স সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে বাবা বললেন *এইবার একটা ছেলে চাই আমি।* মা'র চিৎকারে আর ডেটলের গন্ধে তখন সারা বাড়ি সয়লাব। মা'র ঘরের বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছোট্ট এক ছিদ্রে চোখ রেখে ঝুনুখালা মুখে কাপড় গুঁজে হাসছিলেন আর আর পেছনে দাঁড়িয়ে আমি *ও ঝুনুখালা বাচ্চা কেমনে হয়!* জিজ্ঞেস

করছিলাম। উত্তেজনায় বুক ঢিপঢিপ করছিল আমার। ঝুনুখালা ছিদ্র থেকে চোখ সরিয়ে বারবারই হাসতে হাসতে লাল হয়ে যাচ্ছিলেন আর আমাকে বলছিলেন *বাচ্চা কেমনে হয়, এইডা তরে কওন যাইব না।*

ঝুনুখালার হাসি তখনও কমেনি, বাচ্চার কান্নার শব্দ এল। দরজার ছিদ্র আমি নাগাল পাই না বলে ঝুনুখালা আমাকে দু'হাতে উঁচু করে ধরলেন দেখতে। ছিদ্রে চোখ রেখে দেখলাম বাবার হাতে গ্লাবস পরা, গ্লাবসে রক্ত, নার্স বাচ্চাকে গামলার জলে ডুবিয়ে ধুচ্ছেন। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। দেখে আমার গা কেঁপে ওঠে ভয়ে। এত ছুরি কাঁচি নিয়ে বাবা কি মা'র পেট কেটে ফেলেছেন! রক্ত বেরোচ্ছে মা'র কাটা পেট থেকে!মা ব্যথায় কঁকাচ্ছেন! ঝুনুখালা নানির পাঠানো ছোট ছোট কাঁথা হাতে অপেক্ষা করছিলেন বাচ্চা কোলে নিতে। বাবা দরজা খুলে বেরোতেই ঝুনুখালা লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলেন – *কি হইছে দুলাভাই? ছেলে না মেয়ে?*

বাবা বললেন – *যেইটা চাইছিলাম হইল না। মেয়ে হইছে।*

–*ফর্সা না কালা?* ঝুনুখালা জিজ্ঞেস করেন।

–*কি আবার,* বাবা মুখ ঝামটে বললেন – *কালা মায়ের মেয়ে কালা হইব না তো শাদা হইব!*

–*হাসপাতালে কাজ ফালাইয়া আইছি, আমি গেলাম।* বলে বাবা চলে গেলেন।

বাবা চলে গেলে আমরা বাচ্চাকে কাঁথা দিয়ে মুড়ে কোলে নিই। গায়ে সর্ষের তেল মেখে শুইয়ে রাখি বিছানায়। ছোট বালিশে মাথা, ছোট কাঁথায় শরীর, ছোট মশারি খেটে মাথার কাছে রেখে নৌকোর মত দেখতে দুধের ফিডার, বসে থাকি। ঝুনুখালাও। মা বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদেন। দাদা আর ছোটদা ইস্কুল থেকে ফিরে বাচ্চাকে চোখ গোল করে দেখেন।

রাতে বাবা ফিরে এলে ঝুনুখালা ভাত তরকারি বেড়ে দেন, খেয়ে শুয়ে পড়েন। বাচ্চা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কেঁদে উঠলে চেঁচিয়ে বলেন – *এই চুপ থাকো ত সবাই। আমারে ঘুমাইতে দেও!* ঝুনুখালা শুনতে না পায় কেউ, এমন গলায় *না না কাঁদে না* বলে বলে বাচ্চার কাঁথা বদলে দেন, মুখে পানি নয়ত দুধ দেন। আমি শুয়ে শুয়ে বিমর্ষ বাড়িটির শব্দ শুনি। বাবার জন্য, মা'র জন্য, বাচ্চার জন্য, ঝুনুখালার জন্য আমার মায়া হতে থাকে।

ঈশ্বরগঞ্জ থেকে আবার বদলি হয়ে ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহ থেকে ঠাকুরগাঁ। ঠাকুরগাঁ থেকে আবার ময়মনসিংহ। দেড় বছরের মধ্যে বদলির ঘোরাঘুরি শেষে আবার সেই পুরোনো বাড়িতে থিতু হই। জন্মের চেনা বাড়ি। বাবা বলে দেন দাদাদের লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে, এরপর থেকে বদলি হলে বাবা একাই যাবেন, আর বউছেলেমেয়ে নিয়ে নয়। আমি অনেকটা লম্বা হয়ে গেছি। বাড়িতে বলাবলি হচ্ছে আমাকে ইস্কুলে ভর্তি করাতে হবে। মা ইয়াসমিনকে, আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে বাবা নাম রেখেছেন ইয়াসমিন, দুধ খাওয়ান, গোসল করান, গায়ে সর্ষের তেল মেখে শুইয়ে রাখেন রোদে। সন্ধে হলে আমাকে টেবিল চেয়ারে বসে হারিকেনের আলোয় পড়াতে বসান দাদা। আমি ততদিনে অনর্গল পড়ে যেতে পারি ছড়া কবিতা। ছোট ছোট গল্প। ছোটদের রবীন্দ্রনাথ। দাদা মাস্টারি করলে আমার সব গোল বেঁধে যায়।

ক রবীন্দ্রনাথের কত সনে জন্ম?

বানান কর— মুহূর্ত।

কাজলা দিদি কবিতা কার লেখা?

দাদার প্রশ্নের উত্তর দিতে ভয় হয় আমার। কখন আবার কি ভুল বলি, চটাশ করে চড় দেবেন গালে নয়ত সারা বাড়ির লোক ডেকে আমার পড়া শুনিয়ে হাসবেন। ঈশ্বরগঞ্জ যাওয়ার আগে, একদিন শখের মাস্টারি করতে বসে দাদা বলেছিলেন *বানান কইরা কইরা পড়।* তখন স্বরে অ স্বরে আ ছেড়ে যুক্তাক্ষর ধরেছি। অক্ষরের চেয়ে বেশি দেখি ছবি। দাদার আদেশে কত ছবি কত কথা বইটি নিয়ে অক্ষরে আঙুল রেখে বলেছিলাম *হ, লয় হ্রস্য উকার দ।*

দাদা বললেন — *কি হইল, ক।*

ছবির দিকে তাকিয়ে দেখি, আদার ছবি। বলি *আদা।*

—*কয় ওইকার,* ছবি দেখে নিশ্চিন্তে বলেছিলাম — *মাছ।*

আমার তের বছর বয়সের শিক্ষক মা'কে ডাকেন, রুনু খালা, ঝুনু খালা, নানি, হাশেমমামা, টুটমামা সবাইকে ডেকে শীতলপাটির চারদিকে বসালেন। বললেন —*শুন সবাই, ও কেমনে পড়ে। পড় দেখি এইবার।*

আমি বুঝে পাচ্ছিলাম না আমার সামান্য পড়া দেখাতে এত সবাইকে ডাকার মানে কি! বোধ হতে থাকে খুব ভাল পড়েছি বলে আমাকে বাহবা দিতে এসেছেন ওঁরা। চমৎকার পড়তে পারলে আমাকে কোলে নিয়ে নাচবেন রুনু খালা, টুটুমামা লজেন্স দেবেন খেতে, নানি গাছের বড় পেয়ারাটি পেড়ে হাতে দেবেন। শুদ্ধ উচ্চারণে পড়ি, অক্ষরে আঙুল রেখে — *হ, লয় হ্রস্যউকার,দ;* এবার ছবির দিকে তাকিয়ে, *আদা।* ঘরে হুল্লোড় পড়ে হাসির। ঝুনু খালা হাসতে হাসতে মেঝেয় বসে পড়েন, তাঁর ওড়না খসে পড়ে গা থেকে। রুনু খালা হি হি হি হি। দাদা আর টুটুমামা হা হা হা। নানি আর মাও সশব্দে হেসে ওঠেন। আমি সকলের মুখের দিকে তাকাই, আমার মুখেও হাসি ফোটে, হাসি সংক্রামক কি না। সংসারের ছোটখাট এক রঙ্গমঞ্চে আমি একাই অভিনেত্রী, আর সবাই দর্শক শ্রোতা। নানি হাসতে হাসতে আমাকে বলেন —*হ লয়হ্রস্রউকার দ, হলুদ। হলুদের আর আদার ছবি দেখতে এক রকম বইলা তর কি হলুদরে আদা পড়তে হইব!*

ছবি আমার মনে গাঁথা, শব্দ নিয়ে আদৌ মাথা ব্যথা নেই। আসলে আমি ছবি পড়ি, শব্দ নয়। অক্ষর আঁকার আগে এঁকেছি গাছ, ফুল, নদী, নৌকো।

ঠাকুরগাঁয়ের পিটি আই ইস্কুল আমাকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন ছোটদা, কোলে করে নিয়ে ঠেসে বসিয়ে এসেছিলেন ক্লাসঘরে। সে কী চিৎকার আমার! মাস্টার তাঁর কোলে বসিয়ে আমার কান্না থামাতে গান গেয়েছিলেন সেদিন, *খৈয়া খৈয়া চাঁদ খুলা আসমান।* কান্না থামলে আমাকে আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসিয়ে দিয়ে মাস্টার বলেছিলেন — *খোকা, খুকি, একটা কলস এঁকে দেখাও তো।*

দিব্যি দু'তিন টানে কলস এঁকে ফেলি। কলসের গলায় মালা পরিয়ে দিই ফুলপাতার। ছেলে মেয়েরা নিজেদের আঁকা থামিয়ে আমার কলসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পিটিআই ইস্কুলে সেই প্রথম দিনই *নাম* হয়ে যায় আমার। মাস্টার দু'হাতে আমার কোমর ধরে উঁচু করে তুলে বলেছিলেন — *এই খুকিকে দেখ, এ খুব বড় শিল্পী হবে একদিন।*

পড়াতে বসে দাদা বললেন *চল চল কবিতাটা মুখস্ত ক।*

—চল চল চল
উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চলরে চল।

এটুকু অবদি বলতেই প্রশ্ন *অরুণ অর্থ কি?*

আমি মুখ বুজে থাকি। দাদা কাঠের পেনসিল দিয়ে আমার আঙুলে জোরে টোকা মেরে মেরে বলতে লাগলেন — *বান্দরের মত খালি মুখস্ত করলেই হইব? অর্থ না জাইনা!*

দাদার মাস্টারির শখ যেদিন হয়, সেদিন পেনসিলের ঠোকর, গালে চড়, পিঠে ঘুসি এসবেই আমার সন্ধে পার হয় যতক্ষণ না মা রাতের খাবার খেতে ডাকেন। বাকি সন্ধেগুলো নানির ঘরের উঠোনে পাটি বিছিয়ে টুটু মামা, শরাফ মামা, ফেলু মামার সঙ্গে এক সারিতে বসে পাঠশালার ছাত্রদের মত শব্দ করে পড়তে হয়। শব্দ করে, যেন ঘর থেকে বড়রা শুনতে পান পড়ছি। এক হারিকেনের আলোয় দু'জন করে, দুলে দুলে। শরাফ মামা আর আমি শব্দ করে ছড়া পড়তে থাকি, ফেলু মামা তখনও *মা কলম কলায়।* *তুফান আসিল প্রচন্ড বেগে। টিনের চাল উড়িয়া যাইতে লাগিল বাতাসে। গাছপালা গুড়িসুদ্ধ উপুড় হইয়া পড়িল। মানুষ আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল* পড়ে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবদি হাসে টুটু মামার। ফেলু মামা আর শরাফ মামাও হেসে কুটি কুটি। তুফান এলে টিনের চাল উড়ে গেলে, মানুষ আছাড় খেয়ে পড়তে থাকলে দুঃখের বদলে ওঁদের হাসি কেন আসে আমি ঠিক বুঝে পাই না। হাসি শুনে নানি ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলেন —*পড়তে বইয়া হাসি কিয়ের!* টুটু মামার এই নিয়ম, প্রতিরাতে একবার করে তুফানের গল্পটি না পড়লে তাঁর চলে না। রাত আটটায় পাকঘরে ডাক পড়ে আমাদের। পিঁড়িতে বসে মাছ ডাল যা দিয়েই ভাত খাওয়া হোক, শেষে কবজি ডুবিয়ে দুধ নিতে হয় পাতে। মা বাবার সঙ্গে এক খাটে ইয়াসমিন ঘুমোয় বলে জায়গার অভাবে নানির চৌচালা ঘরে পাশাপাশি তিনটে খাটে পাতা লম্বা বিছানায় শরাফ মামা ফেলু মামা, নানা, নানির সঙ্গে ঘুমোতে হয় আমাকে।

ঠাকুরগাঁ থেকে ফেরার দু'মাস পর নানা আমাদের, শরাফ মামা, আমাকে আর ফেলুমামাকে ভর্তি করে দেন রাজবাড়ি ইস্কুলে। আমি আর শরাফ মামা টুতে, ফেলুমামা ওয়ানে। ইস্কুলে যাওয়ার জন্য কালো তিনটে ছাতাও কিনে দেন নানা। শাদা কালিতে যার যার নাম লিখিয়ে আনেন ছাতায়। সকালে ঘি চিনি মাখা ভাত খেয়ে রওনা হই, হেঁটে, ছাতা মাথায়। দুপুরে ইস্কুলে টিফিন খেতে দেয়। বিকেলে ফিরে এসে ভাত খেয়ে খেলতে যেতে হয় বাড়ির লাগোয়া মাঠে। খেলে সন্ধের মুখে গায়ের ধুলোবালি ঝেড়ে কলপাড়ে হাত মুখ ধুয়ে হারিকেন জ্বেলে পড়তে বসতে হয়। আমার জীবন দু'আঙিনায় কাটে, নানির বাড়ির আর আমাদের বাড়ির। দু'ঘরে আমার বই পত্তর, জামাজুতো, কোনওদিন এ ঘরে খাওয়া, কোনওদিন ও ঘরে। সুখ দুঃখ দুইই তখন ঘন ঘন আসে আর যায়, যেন এরা পাশের বাড়ি থাকে। ইস্কুলে যাওয়া শুরু করা অবদি আমি লক্ষ করি টিফিনে টিনের রঙিন

থালা পেলে মনে আমার সারাদিন সুখ থাকে। ফুল ফল আঁকা কিছু থালা আছে, আছে কিছু শাদা থালাও। টিফিনের ঘন্টা পড়লে ক্লাসের একজন সবার সামনে থালা রেখে যায়, পরে দপ্তরি এসে থালার ওপর এক এক করে টিফিন দিয়ে যায় কখনও কলা ডিম রুটি, কখনও খিচুড়ি। পপি, ক্লাসের প্রথম বেঞ্চে বসা ভাল ছাত্রী, দিব্যি ছবিআঁকা থালা বেছে নেয় নিজের জন্য। পপির মা খালা আবার ইস্কুলের মাস্টার। সে যতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করে, তা পেছনের বেঞ্চে মাথা নুয়ে বসে থাকা *ক্যাবলাকান্ত* আমার সাধ্য নেই করি। কখনও কখনও কারও হাত ফসকে আমার ভাগে ছবির থালা পড়ে। চোখ পড়ে থাকে থালার ছবিতে, খাবারে নয়।

রাজবাড়ি ইস্কুল ছিল একসময় শশিকান্ত রাজার বাড়ি। সে বাড়ি থেকে রাজা গেল, রাণী গেল, রাজপুত্র রাজকন্যা সব গেল, টেবিল চেয়ার বসিয়ে বিশাল খালি বাড়িটিতে বেঞ্চ আর টুল পেতে খোলা হল ইস্কুল। পুরোনো বটগাছে ঘেরা বাড়ি, বাড়ির সামনে মীরাবাঈএর নগ্ন শাদা মূর্তি। ভেতরে হাঁসের চোখের মত কালো জলের এক পুকুর, পুকুরে শ্বেত পাথরে বাঁধানো ঘাট। বাড়িটির সিঁড়ি নেমে গেছে বাগানে অনেকদূর অবদি। লম্বা দারোয়ানও তাঁর লাঠিখানা ছোঁয়াতে পারে না এমন উঁচু দরজার মাথা, সিলিং তো সিলিং নয়, যেন আকাশ, জানালায় রঙবেরঙের কাচ, ছবি আঁকা। ইস্কুলে ঢুকলে নিজেকে আমার রাজা রাজা মনে হত। ও পর্যন্তই। ক্লাসঘরে গিয়ে দাঁড়ালে একঘর ছেলেমেয়ের মধ্যে আমি একা, বোকা। ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে সবাইকে শুনিয়ে গলা ছেড়ে ছড়া বলতে পারি না, ভয়ে শরমে আমার মাথা মাটির দিকে ঝুঁকে থাকে, গলা দিয়ে মিনমিন শব্দ বেরোয় অর্থহীন। মাথায় ডাস্টার মেরে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পেছনের বেঞ্চে। ইস্কুলে আমার *নাম* হয় না, *নাম* হয় পরীর মত সুন্দর দেখতে মেয়ে পপির। ড্রইং ক্লাসে হাতির ছবি, ঘোড়ার ছবি, নদী নৌকোর ছবি আঁকতে গেলে হাত কাঁপে আমার। পপি যা আঁকে, তাতেই নম্বর পায় একশয় একশ। আমি ইস্কুলের দুষ্টু ছেলে শরাফের ভাগ্নে। শরাফ আর নাসিমের দু'হাত পেছনে বেঁধে, দু'চোখে কালো পট্টি বেঁধে পেটানো হয়েছিল এক বিকেলে ইস্কুল ছুটির পর। ঘটনা এরকম, নাসিম তার বাবার পকেট থেকে টাকা চুরি করে শরাফকে দিয়েছে, আর শরাফ নাসিমকে দিয়েছে চুম্বক। সিঁড়িতে ওদের দাঁড় করিয়ে যেদিন সন্ধিবেত দিয়ে সপাং সপাং পেটানো হল, আমি আর ফেলু মামা ইস্কুলের আর সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাগানে দাঁড়িয়ে মুখ চুন করে দেখেছি। দু'জন একা বাড়ি ফিরেছি সেদিন। শরাফ মামাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল ইস্কুলে। সন্ধেয় বেদম মার খেয়ে পড়ে থাকা শরাফ মামাকে বাড়ি ফেরত এনে ঘরের থামের সঙ্গে বেঁধে আরেক দফা পিটিয়েছিলেন নানা।

ইস্কুলের মেয়েরা বইএর ভেতর ফার্ন পাতা ভরে রাখে। ফার্ন পাতাকে ওরা বলে *বিদ্যা পাতা।* বিদ্যা পাতা বইয়ে রাখলে নাকি ভাল *বিদ্যা* হয়। আমিও বইয়ের পাতায় পাতায় বিদ্যা পাতা ভরে রাখি তবু বোর্ডে অঙ্ক কষার ডাক পড়লে বা ছড়া বলতে গেলে, মাথা মাটির দিকে ঝুঁকে যায়, ছড়া ঝরে পড়ে মাথা থেকে মাটিতে, ধুলোয়।

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি,

দুই ধার উঁচু তার ঢালু তার পাড়ি।
চিকচিক করে বালি কোথা নাই কাদা,
একধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।
কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।

এত জানা ছড়াটির একটি শব্দও আমার মনে থাকে না, মনে কেবল ছবি, নদীর ছবি, নদী পার হচ্ছে এক ঝাঁক রাখাল। মনে মনে বলি আহা আমাকে যদি ছড়াটির ছবি আঁকতে দিত! পুরো ক্লাস হো হো করে হেসে ওঠে মাস্টারের কানমলা খেয়ে শব্দহীন দাঁড়িয়ে থাকা আমাকে দেখে। খেলার ঘন্টা বাজলে ওরা দৌড়ে যায় দলবেঁধে মাঠে, খেলে। আমাকে কেউ খেলায় নেয় না। রাজবাড়ির সিঁড়ির এককোণে আমি বসে থাকি, জড়সড়, একা। ইস্কুলের সবার সঙ্গে যেন আমার আড়ি। কেউ তাই কথা বলে না, কেউ ফিরে তাকায় না।

আমি নিজেকেই নিজে আড়ি দিই
আড়ি আড়ি আড়ি,
কাল যাব বাড়ি
পরশু যাব ঘর
কি করবি কর।

একা আমি বাড়ি ভর্তি লোকের মধ্যেও। শরাফ মামারা আমাকে খেলায় নেন তখনই, যখন ভাল খেলে এমন কাউকে হাতের কাছে না পান। ওঁদের সঙ্গে দৌড়ে মার্বেল খেলায় লাটিম খেলায় চ্যাড়া খেলায় আমি কিছুতে পেরে উঠি না। ওঁরা গাছে ওঠেন, সাঁতার কাটেন, আমি খেজুর গাছের তলে দাঁড়িয়ে ওঁদের হৈ হৈ আনন্দ দেখি। দাদা এখন আর ক্রিকেট খেলেন না মাঠে, তাঁর নতুন এক বাতিক হয়েছে ছবি তোলা। এক বন্ধুর কাছ থেকে ক্যামেরা ধার করে নদীর ধারে, পার্কে, টেডি প্যান্ট, টেডি জুতো পরে নানা কায়দার ছবি তোলেন আর নিজে হাতে কাগজ কেটে অ্যালবাম বানিয়ে সে সব ছবি সাঁটেন অ্যালবামে। অ্যালবাম দাদা দেখতে দেন দূর থেকে, ছুঁতে দেন না। সকলে ব্যস্ত যার যার খেলায়। সন্ধেবেলা ত্যানায় বালু মেখে হারিকেনের চিমনি মুছে, সলতেয় আগুন ধরিয়ে ঘরে ঘরে রেখে আসার কাজ জোটে আমার, আসলে কাজটি আমি শখ করেই নিই। হারিকেন বাহুতে ঝুলিয়ে, যেন আইসক্রিমঅলা আমি, ঘর থেকে ঘরে যেতে যেতে ডাক ছাড়ি *হেই মালাইআইসক্রিম!*

রুনু খালা থামান আমাকে প্রথম, *এই আইসক্রিম এদিকে আয়। এই নে পয়সা, দুইপয়সা দামের একটা আইসক্রিম দে।*

আমার কী যে আনন্দ হয় কেউ ডাকলে! আমি মিছিমিছি পয়সা নিয়ে হারিকেনের মাথা মিছিমিছি খুলে আইসক্রিম বার করে দিই। এ আমার একার খেলা, হার নেই, জিৎ নেই। আমার এই খেলায় ফেলু মামা শরাফ মামা কেউই মজা পান না। বরং টিপ্পনি কেটে বলেন, *তুই বরং ছটকুর সাথে খেল।* ছটকুর তখন আড়াই বছর বয়স।

আমি বড় হতে থাকি মিছিমিছি। আমার বুদ্ধি হয় না, জ্ঞান হয় না। অন্যের সামনে ছড়া বলতে গেলে ছড়া ঝরে যায় মাথা থেকে মাটিতে। শরাফ মামা ফেলু মামা চোর চোর খেলা ছেড়ে ফুটবল খেলেন, ক্রিকেট খেলেন, আমি তখনও কড়ই গাছের তলায় ছটকুদের সঙ্গে *চোর চোরে।* আমি তখনও হারিকেনের ওপর গোল করে কাগজ ছিঁড়ে রুটি ভাজার মত কাগজ ভাজি। নামতা লেখার বদলে কাগজ ভরে রঙ পেনসিলে ছবি আঁকি। শনের ঘর, ঘরের পেছনে কলা গাছ, কলা গাছের পেছনে আকাশ, আকাশে পাখি উড়ছে, পাখির পেছনে লাল সূর্য, ঘরের কিনার ঘেঁসে চলে গেছে নদী, নদীতে নৌকো, নৌকোর গলুইয়ে বসা মাঝি, কলস কাঁখে নদীতে জল আনতে যাচ্ছে লাল টুকটুক শাড়ি পরা এক বউ।

বারোই রবিউল আওয়ালে জন্ম হওয়া মেয়ের এত ছবি আঁকায় মন কেন বুঝে পান না ফজলি খালা। আমাকে মানুষের ছবি আঁকতে দেখে তিনি বলেন *এত পবিত্র দিনে জন্ম হয়েছে, মানুষের ছবি আঁকিস কেন! মানুষের কি প্রাণ দিতে পারবি!* মানুষের ছবি আঁকলে আবার প্রাণ দেওয়ার দরকার কি আমি বুঝে পাই না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি ফজলিখালার অপ্রসন্ন মুখে।

নিষিদ্ধ কাজে কেবল আমি নই, মা'ও মাতেন। বাবার শার্টের বুক পকেটে আবার রাজিয়া বেগমের চিঠি পাওয়ার পর মা'র পাগল পাগল লাগে। খাওয়া দাওয়া গোসল সব ভুলে গেলেন, চুলে তেল দেন না, বাঁধেন না, শাড়ির আঁচল খুলে মাটিতে গড়ায়। সংসার চুলোয় ফেলে মা দুয়োর বন্ধ করেন ঘরের। মা'র এমন দুঃসময়ে সোহেলির মা এসে একদিন *সারাদিন ঘরে বইসা স্বামীর লাইগা কানলে তুমি মরবা। চল, মনডা অন্যদিকে ফিরাও* বলে মা'কে শাড়ি পরিয়ে, মা'র চুল আঁচড়ে নিয়ে গেলেন অলকা হলে সিনেমা দেখাতে। প্রথম প্রথম সোহিলির মা, এরপর আর কারও জন্য অপেক্ষা নয়, মা নিজেই রিক্সা করে অলকা হলে চলে যান। ভিড়ে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটেন। হলের ভেতরে বসে বাদাম চিবোতে চিবোতে ছবি দেখেন। কালো কুৎসিত মা, এলোমেলো, আলুথালু শাড়ি পরা, সস্তা সেন্ডেল পায়ে মা। মা'র আর শাড়ি গয়নায় মন নেই। সোনার গয়না গড়িয়ে দিয়েছেন বাবা বউ আর দু'কন্যার জন্য, মা ওসব ফেলে রাখেন গোসলখানায়, চুলোর কিনারে, বালিশের নিচে। মন নেই। যে মা বারো বছর বয়স থেকে বোরখা পরেন, সে মা বোরখা ছাড়াই দৌড়োন সিনেমায়। দু'পায়ে দু'রঙের চটি পরে। মন নেই। মা'র মন *উত্তম কুমারে।* রাতে রাতে স্বপ্ন দেখেন, উত্তম কুমার এসে গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছেন মা'র, আবেগে চোখ বুজে আছেন মা।

আমি কখনও সিনেমায় যাইনি। আমার প্রথম ছবি, শীতের দুপুরে মাঠে বায়োস্কোপ অলা এসেছিল, কাঠের বাক্সের ফুটোয় চোখ রেখে বায়োস্কোপ দেখা, ছবি আসে আর যায়। আর বায়োস্কোপ অলা সুর করে ছবির গল্প বলেন। বায়োস্কোপের ছবি মন থেকে মুছতে না মুছতেই একদিন সারা পাড়ায় হৈ হৈ, সাহাবউদ্দিনের বাড়ির মাঠে পাবলিসিটির বোবা ছবি দেখাবে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা সন্ধে হতেই ইট বিছিয়ে বসে গেল মাঠে, বড় পর্দায় ছবি দেখানো হল, ছবি বলতে মানুষ হাঁটল, দৌড়োলো, ঠোঁট নাড়ল। আমি ইটে বসে হাঁ করে ছবি গিলে ছবির মাথা লেজ কিছুই না বুঝে বাড়ি ফিরেছি। মামারা বলেছেন *–ঢেঙ্গি ছেড়ির মাথায় খালি গুবর।*

তা ঠিক, মাথায় আমার গোবর। তা নইলে সে কথা তো বাড়িতে আমি জানিয়ে দিতে পারতাম। পারিনি। মুখ বুজে ছিলাম। কখনও কেউ জানেনি বাড়ি ভর্তি লোকের মধ্যে কী ঘটে গেছে অলক্ষে। সেদিন ষোলই আগস্ট, উনিশশ সাতষট্টি সন, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস পার হয়েছে দুদিন হল, ইস্কুল থেকে ফিরে মা'র জন্য অপেক্ষা করছি। বাড়ি ফিরে মা আমাকে খেতে দেবেন। নানির চৌচালা ঘরে প্রায় বিকেলে যেমন বই পড়ার আসর বসে, তেমন বসেছে। কানা মামু থামে হেলান দিয়ে জলচৌকিতে বসা, নানি পান চিবোচ্ছেন শুয়ে, ঝুনুখালা আধশোয়া, হাশেম মামা এক চেয়ারে বসে আরেক চেয়ারে পা তুলে হাতপাখায় বাতাস করছেন, আর রুনুখালা বালিশে বুকের ভর দিয়ে পড়ছেন *দস্যু বাহরাম।* এরকম দৃশ্য নানির চৌচালা ঘরে গরমের দীর্ঘ লম্বা দিনগুলোয়, দুপুরের খাবারের পর ছোট এক ঘুমের পর, বিকেলে, বাঁধা। রুনুখালা পড়েন, সবাই শোনেন। শুনতে শুনতে কেউ *খিক খিক* হাসেন, কেউ *আহা আহা* বলেন, কেউ বলেন *ধুর।* ঘরে ঢুকে পড়ার মধ্যে ছোটদের গোল করা নিষেধ। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, মা নেই, একা। হাশেম মামা বললেন – *যা যা মাঠে খেল গিয়া।*

মাঠে খেলার ইচ্ছে করে না আমার, ক্ষিধে পেটে, মা মিটসেফে তালা দিয়ে গেছেন। নানির উঠোন থেকে কুয়োর পাড় ঘেঁসে নারকেল গাছের তল দিয়ে আমাদের খাঁ খাঁ আঙিনায় ঢুকে একা বসে ছিলাম সিঁড়িতে, গালে হাত, পা ছড়ানো, তখন শরাফ মামা আসেন। ডাংএর গুটি উড়ে নাকি ক্রিকেটের বল এসে আমাদের উঠোনে পড়ল যে শরাফ মামা নিতে এসেছেন নাকি মার্বেল ফেলে গেছেন এ উঠোনে কে জানে! এক হাত লম্বা আমার চেয়ে শরাফ মামা, শরাফ মামার বাদামি চোখের তারা একবার গাছের পাতায়, একবার ঘরের দরজায়, একবার উঠোনের কালো বেড়ালে, একবার বৈঠকঘরের খালি চেয়ারে। পরনে তাঁর হাত কাটা গেঞ্জি আর শাদা হাফপ্যান্ট। জিজ্ঞেস করেন – *বড়বু কই?*

গালে হাত রেখেই মাথা নেড়ে বলি – *নাই।*

–*কই গেছে?* যেন তাঁর বিষম দরকার এখন মা'কে, এমন স্বরে প্রশ্ন করেন।

শরাফ মামা সিঁড়িতে আমার পাশে এসে বসে পিঠে দুটো চাপড় মেড়ে বললেন

–*তুই এহানে একলা বইয়া কি করস?*

–*কিচ্ছু না।* শুকনো মুখে বলি।

শরাফ মামা *বড়বু কহন আইবরে?* বলে আমার গাল থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ চুপ থেকে নরম গলায় বলেন – *গালে হাত রাহিস না। অমঙ্গল হইব।*

আমার ইচ্ছে করে বলতে *আমার খুব ক্ষিদা লাগছে, খাই কি? মা মিটসেফ তালা দিয়া গেছে।* বলি না বরং বলি *মা কই গেছে জানো?* আরও কাছে সরে বসে, *কও কাউরে কইবা না?*

কইতাম না ক। শরাফ মামা বলেন।

–*সত্যি?*

–*সত্যি।*

–*বিদ্যা?*

–*বিদ্যা।*

–*আল্লাহর কসম?*

—*আরে ক না, কারও কাছে কইতাম না ত।* শরাফ মামা অস্থির হয়ে বলেন।

—*আগে আল্লাহর কসম কও।*

আল্লাহর কসম বললে কথার নড়ন চড়ন করার সাহস কারও নেই, এমনই বিশ্বাস আমার।

শরাফ মামা মুখ গম্ভীর করে বলেন – *ঠিক আছে, আল্লাহর কসম।*

ফিসফিসিয়ে বলি – *মা সিনেমা দেখতে গেছে।*

শরাফ মামা শুনে এতটুকু চমকালেন না। বললেন *ও।* যেন ব্যাপারটি এমন কোনও মারাত্মক নয়, মা পেশাবখানায় গেছেন বা সুলেখার মা'র বাড়ি গেছেন এমন। সিনেমা দেখা মা'র জন্য কড়া নিষেধ। ওসব দেখলে গুনাহ হয় এ কথা বলে নানা মা'কে হুমকি দিয়েছেন *আবার যদি মাইয়া তুমি বাড়ির বাইরে যাও তাইলে তুমার রক্ষা নাই।* তারপরও যে মা নানার নিষেধ অমান্য করে দিব্যি চলে গেলেন এরকম একটি রোমহর্ষক ঘটনা জেনেও শরাফ মামা মোটে কিছু আশংকা না করে বললেন – *আমিও একটা সিনেমা দেখছি কাইলকা!*

আমি অবাক হয়ে বলি – *তুমি একলা গেছ সিনেমাত?*

শরাফ মামা চোখ নাচিয়ে বলেন – *হ।*

—*নানা যদি জানে তাইলে কি হইব?* আমি ভয়ে ভয়ে বলি।

—*আয় একটা মজার জিনিস দেইখা যা।* বলে হঠাৎ শরাফ মামা উঠে হাঁটতে থাকেন পুবের উঠোনে দাদাদের ঘরের দক্ষিণে এ বাড়ির শেষ সীমানায় কালো টিনের ঘরের দিকে। পেছনে আমি। ঘরটির সামনের দরজা বন্ধ। পেছনের দরজা কায়দা জানলে খোলা যায়। বাড়িটির এ দিকটায় কোনও কোলাহল নেই। ভূতুড়ে স্তব্ধতা। ঘরের পেছন দিকটা ছেয়ে আছে বুড়ো সিম গাছে, গুল্ম লতায়, মরা পাতায়। এদিকটায় আমি কখনও আসি না সাপের ভয়ে, ছোটদা একবার ঢোঁড়া সাপ দেখেছিলেন এই ঝোপে। শরাফ মামার পেছন পেছন হেঁটে ঝোপে পা ফেলার আগে বলি *শরাফ মামা এই জঙ্গলে সাপ আছে।*

– *ধুর ডরাইস না। তুই আসলেই একটা বুদ্ধু, একটা বিলাই। আয়, তরে একটা মজার জিনিস দেখাইয়াম, কেউ জানে না।* শরাফ মামা এমন নিশ্চিন্তে ঝোপে গা ডুবিয়ে দেন যেন তিনি জানেন সাপ খোপ সব ঘুমিয়ে আছে গর্তে।

—*কি জিনিস, আগে কও।* যেতে ইতস্তত করে বলি।

—*আগে কইলে মজাই ফুরাইয়া যাইব।* শরাফ মামা বলেন।

বাইরে থেকে আঙুল ঢুকিয়ে দরজা খুলে শরাফ মামা ভেতরে ঢোকেন, এক দৌড়ে ঝোপ পার হয়ে আমিও পেছন পেছন। মজার জিনিসটি দেখতে *আত্মা হাতে নিয়ে* সাপের ঝোপ পার হয়ে এসেছি, এমনই লোভ আমার শরাফ মামার গোপন জিনিসে। ঘরে ঢুকতেই মরা ইঁদুরের গন্ধ নাকে লাগে। শব্দও শুনি ইঁদর দৌড়োনোর। ঘরের একপাশে খড়ি ঠাসা, আরেকপাশে ছোট একটি চৌকি পাতা কেবল। আমি ভয় পাচ্ছি বললে শরাফ মামা যদি বলেন, *তুই একটা বুদ্ধু, একটা বিলাই,* এই ভয়ে ভয় পেয়েও বলি না ভয় পাচ্ছি। শরাফ মামার বড় সাহস, একা একা সারা শহর ঘুরে বেড়ান, নদীর পারেও চলে

যান। তাঁর সাহসের দিকে মুগ্ধতায় আর ভেতরের ভয় ভেতরে লুকিয়ে বিষম কৌতূহলে শরাফ মামাকে জিজ্ঞেস করি

—নদীর পারে কি ফটিং টিং আছে মামা?

চৌকিতে পা ঝুলিয়ে বসে বলেন তিনি *—না।*

—আমারে নিয়া যাইবা একদিন? কাতর কণ্ঠ আমার।

—তুই ডরাইবি না? আমার পেটে খোঁচা মেরে আঙুলের, বলেন।

—না। ভয় লুকিয়ে বলি।

—তুই ডউর‍্যা। ডরাইবি। মাথায় আমার চাটি মেরে বলেন তিনি।

—বিশ্বাস কর আমি ডরাইতাম না। আমি তো বড় হইছি এহন, এহন আমি ডরাই না। ঝোপ পার হতে পেরেছি আমি , আমি কেন ভয় পাব, এরকম একটি বিশ্বাস উঁকি দেয় বলে বলি।

—না তুই ডরাইবি। শরাফ মামা খোলা দরজাখানা পা দিয়ে ঠেলে বন্ধ করে বলেন।

শরাফ মামার হাত ছুঁয়ে বলি — *সত্যি বিদ্যা আল্লাহরকসম, আমি ডরাইতাম না।*

— *জায়গাটা ভালা। কেউ নাই। কেউ বুঝব না আমরা কই।* শরাফ মামা বলেন।

তাঁর এরকম অভ্যেস, হঠাৎ হঠাৎ আড়াল হয়ে যান সবার। একবার রান্নাঘরের পেছনে আমাকে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন *একটা মজার জিনিস খাইবি?*

পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটি চিকন পাটশুলার মাথায় আগুন ধরালেন। আগুনে পাটশুলার মুখ জ্বলল আর শরাফ মামা সিগারেট টানার মত টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে জ্বলন্ত পাটশুলাটি আমার হাতে দিয়ে বললেন — *খা।*

আমিও ধোঁয়া টেনে মুখে নিয়ে ফুঁ করে ছেড়ে দিই বাতাসে।

বলেন — *কাউরে কইবি না তো!*

কেশে মাথা নাড়তে নাড়তে — *না* বলি।

শরাফ মামা এরকম, বাড়ির কাউকে তোয়াক্কা করেন না। যা করার ইচ্ছে লুকিয়ে চুকিয়ে করে যান।

—নাসিমের টাকা দিয়া কি করছ মামা? অনেকদিনের ইচ্ছে আমার জানার,

—মাটির তলে পুঁইতা রাখছি। আমাকে প্রতিজ্ঞা না করিয়েই ফট করে বলে ফেলেন তিনি।

আমি এই সুনসান জায়গায়, বাড়ির কেউ জানে না শরাফ মামা আমাকে কথা দিচ্ছেন নদী দেখাতে নেবেন, বলছেন মাটির তলে পুঁতে রাখা টাকার গল্প, যা কেবল আমাকেই বলছেন তিনি, আর কাউকে নয়, নিজেকে আর মাথায় গোবর অলা *ঢেঙ্গি ছেড়ি* বলে মনে হয় না।

—কুন মাটির তলে? এই বাড়ির?

ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করি।

—হ। যহন বড় হইবাম, এই টাকা দিয়া একটা জাহাজ কিনবাম। মামা বলেন।

—জাহাজ? আমারে চড়াইবা? মন খুশিতে লাফায়। আমার চোখের সামনে তখন বিশাল এক জাহাজ, নদী পার হয়ে সাগরের দিকে যাচ্ছে। আমি জাহাজে ভেসে জলের

খেলা দেখছি, রোদে চিক চিক করছে রূপোলি জল। এরকম একটি ছবি দেখেছিলাম ওষুধ কোম্পানির এক ক্যালেন্ডারের পাতায়।

শরাফ মামার চোখের তারা আবার নাচে। হাতে তাঁর পাটশুলাও নেই, দেশলাইও নেই। পকেটে কোনও চুম্বক আছে কি না কে জানে। আমাদের চুম্বকের খেলা দেখাতেন মামা। তখনও চুম্বক কি জিনিস আমি জানি না। *যাদু দেখবি আয়,* বলে হাতে লোহার একটি শাদামাটা পাত *ছুঃ মন্তর ছুঃ* বলে তিনি দরজার কড়ায়, টিউবয়েলের ডান্ডায়, বালতিতে, জানালার শিকে ছোঁয়াচ্ছেন আর বসে যাচ্ছে। আমি হাঁ হয়ে মুগ্ধ চোখে যাদু দেখছিলাম। আমিও শরাফ মামার মত *ছুঃ মন্তর ছুঃ* বলে কুড়িয়ে পাওয়া একটি লোহা দরজায় কড়ায় লাগাতে চেয়েছিলাম, লাগেনি। শরাফ মামা আমার কান্ড দেখে হাসতেন।

চোখের বাদামি তারা নাচছে শরাফ মামার আর ঠোঁটের কিনারে একরকম হাসি, যার আমি ঠিক অনুবাদ জানি না। *মজার জিনিসটা এই বার তরে দেখাই* বলে একটানে আমাকে চৌকির ওপর শুইয়ে দেন মামা। আমার পরনে একটি কুঁচিঅলা রঙিন হাফপ্যান্ট শুধু। শরাফ মামা সেটিকে টেনে নিচে নামিয়ে দেন।

আমি তাজ্জব। হাফপ্যান্ট দু'হাতে ওপরে টেনে বলি – *কি মজার জিনিস দেখাইবা, দেখাও। আমারে ল্যাংটা কর ক্যা?*

শরাফ মামা তাঁর শরীরকে হাসতে হাসতে আমার ওপরে ধপাশ করে ফেলে আবার টেনে নামান আমার হাফপ্যান্ট আর নিজের হাফপ্যান্ট খুলে তাঁর নুনু ঠেসে ধরেন আমার গায়ে। বুকে চাপ লেগে আমার শ্বাস আটকে থাকে। ঠেলে তাঁকে সরাতে চেষ্টা করি আর চেঁচিয়ে বলি – *এইটা কি কর, সর শরাফ মামা, সর।*

গায়ের সব শক্তি দিয়ে ঠেলে তাঁকে একচুল সরাতে পারি না।

–মজার জিনিস দেহাইতে চাইছিলাম, এইডাই মজার জিনিস।

শরাফ মামা হাসেন আর সামনের পাটির দাঁতে কামড়ে রাখেন তাঁর নিচের ঠোঁট।

–এইটারে কি কয় জানস, চোদাচুদি। দুনিয়ার সবাই চোদাচুদি করে। তর মা বাপ করে, আমার মা বাপ করে।

শরাফ মামার তাঁর নুনু ঠেলতে থাকেন বিষম জোরে। আমার বিচ্ছিরি লাগে। শরমে চোখ ঢেকে রাখি দু'হাতে।

হঠাৎ ইঁদুর দৌড়োয় ঘরে। শব্দে শরাফ মামা লাফিয়ে নামেন। আমি এক দৌড়ে হাফপ্যান্ট ওপরে টেনে দৌড়ে বের হয়ে যাই ঘর থেকে। ঝোপ পার হতে আমি আর সাপের ভয়ে ইতস্তত করি না। আমার বুকের মধ্যে সড়াত সড়াত শব্দ হয়, যেন একশ ইঁদুর দৌড়োচ্ছে। শরাফ মামা পেছন থেকে অদ্ভুত গলায় বলেন – *কাউরে কইবি না। কইলে কিন্তু সব্বনাশ।*

পাড়ার ছেলেরা মিছিল স্লোগান দিতে দিতে বড় রাস্তা ধরে যায় *লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, বীর মুজাহিদ নও জোয়ান, কবুল মোদের জান পরান, আনতে হবে পাকিস্তান, আনতে হবে পাক কোরান।* মা এক্কা দোক্কা খেলা ফেলে দৌড়ে যান মিছিল দেখতে। মিছিল চলে গেলে মাও লাফিয়ে বলেন *লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।* কিছু না বুঝেই বলেন। হঠাৎ এক সকালে উঠে তিনি শোনেন, ভারত থেকে ইংরেজ চলে গেছে, পাকিস্তান নামের একটি দেশ মিলেছে মুসলমানের। পাড়ার ছেলেরা নেচে নেচে মিছিলে গায় *পাকিস্তান জিন্দাবাদ।* ইস্কুলে পাকিস্তানের জয়গান শেখানো হয়।

জীবন যেমন ছিল, পাকিস্তান হবার পর তেমনই থেকে যায় মা'র। নাসিরাবাদ মাদ্রাসায় *মিয়াভাই* আগেও যেমন যেতেন, এখনও যান; বাড়িতে মা'কে কোরান শরিফ পড়াতে সুলতান ওস্তাদজি আগেও যেমন আসতেন, এখনও আসেন; তফাৎটা কি হল তিনি দেখতে পান না। *বাজান* মসজিদে নামাজ পড়তে যেতেন পাঁচবেলা, এখনও যান। কেউ তো এসবে বাধা দেয়নি, তবে *আল কোরান* নতুন করে আনার জন্য লোক ক্ষেপেছিল কেন! মাঝখান থেকে কী হল, অমলারা কাঁদতে কাঁদতে হিন্দুস্তান চলে গেল। ওরা চলে যাওয়ার দিন মা কড়ইগাছ তলায় হতবাক দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাড়ি ঘর জমিজমা জলের দরে বিক্রি করে চলে গেল অমলারা। মা অমলার সঙ্গে সই পেতেছিলেন। সই চলে গেলে কার না বুক খাঁ খাঁ করে! মা'রও করেছে। মা ফেরাতে পারেননি কিছু, কারও চলে যাওয়া। ইস্কুল খালি হয়ে গেল দেখতে দেখতে, কোনও হিন্দু মেয়ে আর ইস্কুলে আসে না। খালি ক্লাসঘরে দু'চারটে মুসলমান মেয়ে তখন ইতিহাস বইএর নতুন অধ্যায়ে *পাকিস্তান আমাদের দেশ, কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আমাদের জাতির জনক* মুখস্ত করে। ছড়া কবিতার নতুন নতুন বই আসে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচির কবিতার বদলে আসে গোলাম মোস্তফা, বন্দে আলী মিয়ার কবিতা। রবীন্দ্রনাথের বদলে কাজী নজরুল ইসলাম। মা কিন্তু থেকে থেকেই আওড়ান আগের পড়া কবিতা। অমলার দিদির কাছে শেখা *একবার বিদায় দে না ঘুরে আসি, হাসি হাসি পরবো ফাঁসি মাগো দেখবে জগতবাসী* অমলারা চলে যাওয়ার পরও, গান মা। যেমন জীবন, তেমনই চলে, ছোটছোট দুঃখ সুখে। পুকুরের কচুরিপানা সরিয়ে আগেও সাঁতার কাটতেন, এখনও। আগেও পিঁড়ি পেতে বসে মাছের ঝোল মেখে ভাত খেতেন, এখনও। দেশ বদলে যায়, মানুষ বদলায় কই! ইংরেজের বদলে কাবুলিঅলা হাঁটে রাস্তায়, পরদেশি বলেই ওদের ডাকেন মা। মা'র নিভৃত জগতে পুতুলগুলো আগের মত শুয়ে থাকে। কেবল মা'র পুতুলের সঙ্গে বিয়ে হওয়া অমলার পুতুলটিকে বড় দুঃখী দুঃখী লাগে। মা'র বুকের জলে এক মিহি কষ্ট গোপনে সাঁতরায়।

পুতুল খেলার বয়সেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় মা'কে। বাবার কাছে আবদার করতেন রথের মেলায় তাঁকে নিয়ে যাওয়ার, পুতুল কিনে দেবার। অবশ্য পুতুলের শখ মিটে যায়, যখন রক্তমাংসের একটি ছেলে জন্মায় মা'র। যে বছর ছেলে জন্মায়, সে

বছরই,বায়ান্ন সন, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার করার দাবি নিয়ে যারা মিছিল করছিল, তাদের গুলি ছোঁড়ে উর্দুভাষীরা। *মুসলমানরে যদি মুসলমানই মারে, তাইলে আর কি দরকার আছিল মুসলমানের আলদা একটা দেশ বানানির!* মা ভাবেন।

ছেলেরা ছয় দফার দাবি নিয়ে রাস্তায় মিছিল করে। যে রাস্তা ধরে লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের মিছিল যেত, সে রাস্তায় *রাস্ট্রভাষা বাংলা চাই, উর্দুভাষী নিপাত যাক* বলে মিছিল যায়। কি আশ্চর্য, মা ভাবেন, এঁদো গলির ভেতর, খলসে মাছে ভরা পুকর পাড়ে তাঁর বসে থাকতে থাকতেই মিছিলের চরিত্র পাল্টে গেল।

বাড়ি থেকে মনুমিয়ার দোকানে সদাই কিনতে যেতে আসতে আমাদের গলিতে লিকলিকে একটি লম্বা ছেলেকে দেখতাম প্রায়ই। পাড়ার সবচেয়ে মিষ্টি বড়ই গাছটির তলে ছিল তার ছোট এক টিনের ঘর। পেছনে অবশ্য বড় বাড়ি। ওখানে ওর মা আর বাকি ভাই বোনেরা থাকে। তখন বাড়ির বড় হয়ে যাওয়া ছেলের জন্য বারবাড়ির ঘরটি ছেড়ে দেওয়াই নিয়ম। দাদা আর ছোটদার জন্যও তাই হয়েছিল। ছোটদা একদিন বললেন লিকলিকে ছেলেটি খোকনের বড় ভাই, মিন্টু। খোকন ছিল ছোটদার বিষম বন্ধু। এমনই, যে, প্রেমেও পড়তেন ওঁরা একসঙ্গে, এক মেয়ের। মিন্টুকে আমার বড় একা মনে হত। তাকে দেখতাম ফিনফিনে শার্ট আর নীল লুঙ্গি পরে একা একা গলিতে হাঁটতে, ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আনমনে শিস বাজাতে। এত পাকা পাকা বড়ই ঝুলে থাকত যে আমি জিভে জল নিয়ে বড়ই গাছের তলে যেতে আসতে কিছুক্ষণ দাঁড়াতাম। বড় ইচ্ছে হত পড়ে থাকা কিছু বরই কুড়িয়ে নিই। মিন্টু যদি দেখে আবার আমার কান মলে দেয়, সেই ভয়ে আমি জিভের জল জিভে নিয়ে বাড়ি ফিরতাম। পাড়ার ছেলেপিলেরা আমাকে দেখলে *কী কই যাও? গাড়িঘোড়া দেইখ্যা হাইট্যো* এরকম শাদামাটা কিছু হলেও বলত। মিন্টু আমাকে দেখত কেবল, কিছু বলত না। ও সম্ভবত খুব লাজুক ছিল। পাড়ায় থাকে, অথচ পাড়ার ছেলেদের মত ওকে দেখতে লাগে না, যেন অন্য কোনও দেশের, অন্য কোনও শহরের, অন্য কোনও পাড়ার ছেলে মিন্টু। এ পাড়ার কারও সঙ্গে তার মেলে না। সে একা নিজের সঙ্গে কথা বলে নিঝুম দুপুরে। চাঁদনি রাতে খালি গায়ে কামিনী গাছের নিচে শুয়ে থাকে একা।

উনসত্তরে রাজবাড়ি ইস্কুল ছাড়িয়ে আমাকে বিদ্যাময়ী ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হল। বিদ্যাময়ী ইস্কুলটি শহরের মধ্যিখানে, ইস্কুলের ডানে গাঙ্গিনার পাড়, বাঁয়ে নতুন বাজার। এ ইস্কুলে আগের ইস্কুলের চেয়ে দূর। রিক্সা করে ইস্কুলে যেতে চার আনা, আসতে চার আনা, বাবা গুনে আটআনা পয়সা দিয়ে যান মা'র হাতে। মা সে পয়সা সকাল দশটা অবদি বেঁধে রাখেন আঁচলের খুঁটে। সাড়ে দশটায় আমার ইস্কুল বসে। যেতে আসতে দেখি শহর যেন উল্টে পড়ে আছে রাস্তায়। কিল ঘুসি খেয়ে শহরের চেহারা এবড়ো থেবড়ো। রাস্তায় ইটপাটকেল, গাছের গুঁড়ি। মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে পুলিশের গাড়ি। ছোটদা প্রায়ই ইস্কুল কামাই করে মিছিলে চলে যান। আমারও ইচ্ছে করে ছোটদার মত মিছিলে যেতে। ছোটদা রাত করে বাড়ি ফেরেন, তাঁর বাড়ি না ফেরা অবদি বাবা পায়চারি করেন উঠোনে। মা হারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন বৈঠকঘরের দরজায়। ছোটদাকে বলা হয়েছে মিছিলে না যেতে। তিনি বাবা মা'র মোটে বাধ্য ছেলে নন, দাদা

যেমন। দাদাকে ধমকে বসিয়ে রাখা যায় ঘরে, কিন্তু ছোটদাকে বাগে আনা মুশকিল, ফাঁক পেলেই তিনি পালান।

সেদিন চব্বিশে জানুয়ারি। সকাল থেকেই মিছিলের শব্দ শুনছি। কাকেরা পাড়ার আকাশ কালো করে চেঁচাচ্ছে। এত কাক ওড়ে কেন, মানুষই বা ছোটে কেন এত মিছিলের দিকে! মা যেমন ছিলেন রান্নাঘরের পিঁড়িতে বসা খালি পায়ে, এলো চুলে, আলুথালু শাড়িতে, নখে পিঁয়াজের গন্ধ, হাতে মশলার দাগ, তেমনই দৌড়ে গেলেন গলি পেরিয়ে ঘুমটিঘরের উল্টোদিকে বড় রাস্তার ওপর মুকুলদের বাড়ি। বাড়ির খোলা বারান্দায় দাঁড়াতেই দেখেন জিলা ইস্কুলের বোর্ডিং এর পাশ দিয়ে, ঠান্ডার বাপের জিলিপির দোকান পার হয়ে রেললাইনের দিকে দৌড়োচ্ছে মানুষ। মা, মুকুলের মা, শাহজাহানের মা, শফিকের মা ছুটতে থাকা পাড়ার ছেলেদের থামালেন। বারান্দায় জড়ো হতে লাগল পায়ে হাতে কাঁধে গুলি লাগা ষোল সতেরো বছর বয়সী ফারুক, রফিক, চন্দন। বাড়ির ভেতর থেকে আসতে লাগল বালতি ভরা পানি, ডেটলের শিশি, তুলো। মা'রা ছেলেদের ক্ষত মুছে দিয়ে পরনের শাড়ি ছিঁড়ে বেঁধে দিচ্ছিলেন ব্যান্ডেজ। কাউকে কাউকে পাঠিয়ে দিলেন রিক্সা করে সোজা হাসপাতাল।

দুপুরের দিকে বাবা ফিরে এলেন। কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে তিনি ঢুকলেন মিন্টুদের বাড়িতে। বাবার পেছন পেছন মা, মা'র পেছন পেছন আমি। আমাদের পেছনে পাড়ার আরও লোক। মিন্টুর মা'র মুখের দিকে বাবা করুণ চোখে তাকিয়েছিলেন, মিন্টুর একলা পড়ে থাকা টিনের ঘরখানার দিকেও।

কী হইছে, মিন্টুর কিছু হইছে? মিন্টুর মা বাবার হাত ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তিনি খবর পেয়েছেন আগেই যে মিছিলে মিন্টু ছিল সবার সামনে, গায়ে পুলিশের গুলি লেগেছে বলে লোকেরা হাসপাতালে নিয়ে গেছে ওকে। বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন খানিক পর পর, কিছু বলছিলেন না। আমরা ছিলামই ও বাড়িতে দাঁড়িয়ে। মিন্টুর বোন, মনু, পাড়া কাঁপিয়ে কাঁদছিল। মাথার ওপর ছিলই কাকের কা কা কা। পাড়ার মায়েরা মুকুলদের বারান্দা থেকে ফিরে এসে পানি ঢালছিলেন কেঁদে বেঁহুশ হয়ে পড়া মিন্টুর মা'র মাথায়। মনু থেকে থেকে মা'কে বলছিল *ও ঈদুন আপা, আমার ভাইরে যারা মারছে, তাগোরে আমি খুন করুম।* মনু বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিল বাড়ির বাইরে। মা তাকে ফেরাচ্ছিলেন দু'হাতে। মনু কি করে খুন করবে খুনীদের। খুনীদের হাতে বন্দুক, কেউ কি পারে খালি হাতে সশস্ত্র কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে!

পাড়ার লোকেরা মিন্টুর ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে বলাবলি করছিল কী করে মিছিল এগোচ্ছিল পশু হাসপাতালের পাশ দিয়ে, তখন বলা নেই কওয়া নেই, কারও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ড্রিম ড্রিম, ছেলেরা উল্টো দিকে দৌড়োল, কেবল মিন্টু পারেনি। মিন্টুদের বাড়িতে তখন ভিড় আরও বাড়ছে। খোকন, বাচ্চু, হুমায়ুন মিন্টুর ভাইগুলো ভিড় ঠেলে বাড়িতে ঢুকল। মিন্টুকেও আনা হল, খাটিয়ায় শাদা কাপড়ে ঢেকে।

আমি বরই গাছের তলে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম মিন্টুর গা মাথা ঢাকা। চুপচাপ লাজুক ছেলেটি, যে ছেলে সকালেও দরজায় দাঁড়িয়ে থেকেছে উদাসীন, নাস্তা খেতে বাড়ির ভেতর ডাক পড়লে মা'কে বলেছে যে সে বাইরে বেরোচ্ছে খানিকক্ষণের জন্য, এই

ফিরছে। রান্নাঘরে ঢেকে রেখেছিলেন মা তাঁর ছেলের নাস্তা। মিন্টু যখন ফিরে এল, তখনও তার নাস্তা ঢাকা।

বরই পড়ে তলাটি ভরে ছিল, পাড়ার সবচেয়ে মিষ্টি বরই। একটি বরইও আমার কুড়োতে ইচ্ছে করেনি সেদিন। সেদিন কেউ কান মলে দেবে বলে ভয় ছিল না, তবু ইচ্ছে করেনি। মা'কে দেখেছি মিন্টুর মা'র মাথায় হাত বুলিয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলছেন *কাইন্দেন না। মিন্টুর রক্ত ছুঁইয়া কত ছেলেরা কইতাছে এর শোধ তারা নিবই নিব। দিন পাল্টাইব, দিন ঠিকই পাল্টাইব।* মিন্টু লাশ হয়ে বাড়ি ফিরে আসার পর পাড়ার মানুষও, কেবল মিন্টুর আত্মীয়রা নয়, কেঁদেছে। লিকলিকে ছেলেটিকে মানুষ এত ভালবাসত আমার জানা ছিল না।

ছোটদাও গুম হয়ে বসে থাকলেন। তিনি ছিলেন মিছিলে মিন্টুর ঠিক ডানে দাঁড়ানো। গুলি তাঁর ডান বাহু ঘেঁসে উড়ে গেছে মিন্টুর বুকে। গুলি ছোটদার বুকেও লাগতে পারত। সেদিন ছোটদাও মরতে পারতেন।

মিন্টুকে আকুয়ার কবরখানায় কবর দেওয়া হল সেদিন। পাড়ায় এত বিষাদ এর আগে আমি কখনও দেখিনি। বিকেলে বাচ্চারা খেলতে গেল না মাঠে। বড়রা গলির রাস্তার কিনারে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিচু গলায় কথা বলল। যেন পুরো পাড়া সেদিন আর খাবে না, দাবে না, হাসবে না, খেলবে না, ঘুমোবে না।

ক'দিন পর শেখ মুজিব এলেন মিন্টুদের বাড়িতে। সে কী ভিড় শেখ মুজিবকে দেখতে। ছোটদা বলেছিলেন *আহা সেদিন আমি মরলে আমগোর বাড়িতে ভিড় হইত, দেখতে শেখ মুজিব আসত।* পুলিশের গুলিতে সেদিন মিন্টুর বদলে নিজের মরণ হলেই তিনি খুশি হতেন। মৃত্যু হল না বলে কাউকে এমন হা পিত্যেশ করতে আমি আর দেখিনি।

আমিও দেখতে গিয়েছিলাম শেখ মুজিবকে। হাজার লোকের ভিড়ে শেখ মুজিবকে দেখা চাট্টিখানি কথা নয়। প্রথম পায়ের আঙুলের ওপর ভর রেখে, এরপর ইটের ওপর ইট রেখে তার ওপর, এরপর দেয়ালে, প্রথম নিচু দেয়াল পরে পড়ে মরার ভয় তুচ্ছ করে উঁচু দেয়ালে দাঁড়িয়ে শেষ অবদি দেখেছিলাম শেখ মুজিবকে। গায়ে কালো কোট, চশমা পরা লম্বা একটি লোক। দেখতে আমাদের পাড়ার সাহাবউদ্দিনের মত। সাহাবউদ্দিনকে দেখতে তো এত লোকের ভিড় হয় না! শেখ মুজিব নামের মানুষটি যেন সাত আসমান থেকে নেমে এসেছেন এ পাড়ায়, যেন তিনি ঠিক আর সবার মত মানুষ নন। শেখ মুজিব মিন্টুর মা'র মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। বরই তলায় সেদিনও পড়ে ছিল মিষ্টি মিষ্টি বরই। বরই কুড়োনোর কোনও ইচ্ছে আমার হয়নি সেদিনও।

মানুষের নিয়মই এই, মানুষ বেশিদিন শোক বইতে পারে না। মাস পার হয়নি, আবার যে যার জীবনে ফিরে গেল। মাঠে খেলতে শুরু করল বাচ্চারা, পুরুষেরা থলে ভরে বাজার করতে লাগল, উনুনে ফুঁকনি ফুঁকতে লাগল বাড়ির মেয়েরা। আমিও সন্ধে নামলে উঠোনে পাটি পেতে হারিকেনের আলোয় দুলে দুলে পড়তে থাকলাম *আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।*

কেবল কবরখানার পাশ দিয়ে যেতে, ওটিই ছিল আমার ইস্কুলে যাওয়ার, মনু মিয়ার কিম্বা ঠান্ডার বাপের দোকানে যাওয়ার পথ, মা যেমন বলেছিলেন, দু'হাত মুঠো করে মাথা নিচু করে নিঃশব্দে হেঁটেছি। মা বলেননি, কিন্তু কোথাও ফুল ফোটা কোনও গাছ

দেখলে, সে যার বাড়ির ফুলই হোক, ছিঁড়ে দৌড়ে দিয়ে এসেছি মিন্টুর বাঁধানো কবরে। আমার মনে হত মিন্টু ঘ্রাণ পাচ্ছে সে ফুলের।

এই ঠুনকো পাকিস্তানও ভাঙবে বলে মা'র মনে হয়, লোকের কথাবার্তার ধরনও মা দেখেন পাল্টে গেছে, আয়ুব খানের গুষ্ঠি তুলে লোকে বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে গাল দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ব শাসনের দাবি তুলে ছেলেরা রাস্তায় নামছেই। পাকিস্তান সরকার ক'দিন পর পরই সারা দেশে কারফিউ দিচ্ছে, বাইরে বেরোনো মানা, *ব্ল্যাকআউট* ঘোষণা করছে, বাড়িঘর অন্ধকার করে বসে থাকতে হয়। সব শাসকের এক চরিত্র, মা ভাবেন। ইংরেজের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিরা কম অনাচার করছে না! পূবের ধন পশ্চিমে পাচার হয়ে যাচ্ছে, এ ঠিক ভারতের ধন ইংরেজ যেমন জাহাজ ভরে নিয়ে গেছে নিজেদের দেশে। পাকিস্তান দিয়ে মা'র হবে কি! দেশ ভেঙে আরও টুকরো হোক, দেশ কাকে খাক, চিলে নিক, কিছু তাঁর যায় আসে না, তিনি তাঁর ছেলেদের মিছিলে মরতে দিতে চান না। ছেলে মেয়ে ছাড়া তাঁর আর আছে কি! এদের নিয়ে দাঁড়াবার মাটি যদি তিনি পান, তাই যথেষ্ট। লেখাপড়া জানলে তিনি কোনও চাকরি পেতে পারতেন, যে কোনও একটি চাকরি, তাহলেই নিরুত্তাপ বাবাকে তিনি মুক্তি দিতেন, অথবা নিজে মুক্তি পেতেন। ছোটদাকে নিয়ে একবার রেলে চড়ে ঢাকা চলে গিয়েছিলেন চাকরি খুঁজতে, ঢাকা শহরের বাতাসে নাকি ভূরি ভূরি চাকরি ওড়ে, হাত বাড়ালেই ধরা যায়। ঢাকার এক হাসপাতালে নার্সের চাকরি চাইলে কর্তৃপক্ষ বললেন *হুট করে তো আর নার্সের চাকরি জোটে না, আরও লেখাপড়া জানতে হবে, নার্সিং ইস্কুলের সার্টিফিকেট লাগবে।* মা ফিরে এলে বাবা ফোঁড়ন কেটেছিলেন — *কয় না, সুখে থাকলে ভুতে কিলায়!*

ছোটদাকে চোখের আড়াল করতে ভয় হয় মা'র। মিন্টুর মত ছোটদাও যদি গুলি খেয়ে মরেন একদিন! নিমপাতার তেতোয় দুধ ছাড়ানো ছেলের জন্য মা'র বুকের ভেতর টনটন করে মা'র। পাঁচ ছ' বছর বয়সেও ছোটদার বুকের দুধ খাওয়ার অভ্যেস যায়নি। নানি বলেছিলেন *বুনিত নিমপাতা বাইটা দে, তাইলেই ছেড়া বুনি খাওয়া ছাড়ব।* তাই করেছেন মা, নিমপাতার রস মেখে রেখেছেন বোঁটায়, যেন জিভে তেতো স্বাদ পেতে পেতে দুধ খাওয়ার শখ যায় ছেলের। ছোটদা কথা বলেছেনও দেরি করে, দু'বছর পার করেও *বা আ বা আ* করতেন *বাবা* বলতে গিয়ে। ক্লাস সিক্সে ভর্তি হতে গেলে ইস্কুলের হেডমাস্টার একটি প্রশ্নই করেছিলেন *বানান কর তো পুরস্কার,* ছোটদা *পুস পাস পাস, পাস পাস পুস, স্পু স্পা পুস* বলে হাঁপিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। হেডমাস্টারের সঙ্গে বাবার খাতির ছিল বলে ছোটদাকে ভর্তি করে নেন ইস্কুলে। ছোটদাকে হাতঘড়ি আর *জ্যামিতি বক্স* কিনে দিয়ে বাবা বলেছিলেন *লেখাপড়ায় ভাল করলে একটা সাইকেল পাইবা।* ছোটদা হাতঘড়ি হারিয়ে ফেললেন তিনদিনের দিন, আর কাঁটাকম্পাস ব্যবহার করতে লাগলেন বাড়ির সবার দাঁতে আটকা মাংস তোলার কাজে। দাদাকে দেখে তাঁরও একদিন শখ হয়েছিল আমার মাস্টার সাজার। বই খুলে আমাকে বললেন

পড়, পিঁড়া পিঁড়া কয়টা ডিম
একটা দুইটা তিনটা ডিম।

দাদা শুনে হাঁ হয়ে থাকেন। কপালে ভুরু তুলে বলেন *এই এই কি পড়াস, পিঁড়া পিঁড়া কস ক্যান, এইডা ত পিঁপড়া পিঁপড়া কয়টা ডিম।*

ছোটদা লকলক করে বড় হয়ে যাওয়ার পরও মা তাঁকে কোলের ছেলেই মনে করতেন। ছোটদাই, মা আশংকা করতেন, হবেন গবেট গোছের কিছু। কিন্তু দাদাই হলেন শান্ত শিষ্ট, সাত চড়ে রা নেই। ছোটদা উল্টো। ইস্কুল থেকে নালিশ আসে, *ছেলে ডিসিপ্লিন মানে না।*

—কি রে ডিসিপ্লিন মানস না শুনলাম!

ছোটদার কানের লতি ধরে টেনে ঘরে এনে চোখের তারার ওপর তারা রেখে জিজ্ঞেস করেন বাবা।

—*মানি মানি।* ছোটদা রাগে সশব্দে শ্বাস ছেড়ে বলেন।

—তর স্যারেরা তাইলে মিছা কথা কয়! বাবা বলেন।

ছোটদা দিব্যি বলে দিলেন — *হ।*

গালে কষে থাপ্পড় মেরে বাবা বলেন — *ইস্কুলের রেডিও ভাঙছস ক্যান?*

ছোটদা ফুঁসে উঠে বলেন — *আমি রে রে ডিও শুনতাছি, এক ছেড়া আইয়া রেডিও কাকাইড়া লইতে চাইছিল। তাই ভাঙছি।*

—বা বা, সুন্দর যুক্তি দিছ! এত সুন্দর যুক্তি আমার ছেলের, ছেলেরে এহন মাথায় তুইলা নাচতে হয়। আমি রাইতদিন পরিশ্রম করি, ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জইন্য। ছেলেমেয়েরা যেন লেখাপড়া কইরা মানুষের মত মানুষ হয়। আর এরা যদি অমানুষই হয়, কিসের এত খাটাখাটনি! ছোটদার ঘাড় ধাক্কা দিয়ে পড়ার টেবিলে পাঠিয়ে বাবা বলেন — *মায়ের আশকারা পাইয়া ছেলেডা নষ্ট হইয়া যাইতাছে।*

এ বাড়িতে কেউ একবার মার খেলে তার জন্য চমৎকার উপঢৌকন অপেক্ষা করে থাকে। ছোটদা বাবার হাতের মার খাওয়ার পরদিনই বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে মা ক্রিকেটের ব্যাট বল কিনে দিলেন ছোটদাকে। সেই ব্যাট অবশ্য তিনি বলে মারার চেয়ে ঘরের চেয়ার টেবিলে মেরে আনন্দ পেতেন বেশি। ছোটদার মিছিলে যাওয়ার খবর পাওয়ার পর থেকেই মা'র নতুন আবদার ছেলেকে গিটার কিনে দিতে হবে, গান বাজনা নিয়ে পড়লে মিছিল মিটিং থেকে ছোটদার মন উঠবে, এই আশা। বাবা একখানা হাওয়াইন গিটার কেনার টাকা দেন, গিটার কিনে গিটারের হলুদ একখানা জামাও নিজের হাতে বানিয়ে দেন মা। ছোটদার প্রতি মা'র আদর দাদার চোখে পড়ে, তিনি মা'কে বলেন *আমারে একটা বেহালা কিইনা দিতে কন।*

—*তুই ক। তর কি মুহে রাও নাই?* মা'র স্বরে বিরক্তি।

দাদা চুপসে যান। বাবার কাছে বেহালা চাওয়ার সাহস দাদার নেই। তিনি হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসে আঙুলে টেবিল ঠুকে তাল দেন নিজেই নিজের গানে। গান দাদার একটিই, চার বছর বয়সে যেটি শিখেছিলেন মা'র কাছে*একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি।* ছোটদা গিটারে *সা রে গা মা* শিখে চলতি সিনেমার গান বাজাতে শুরু করেন। প্রতিমাসে ছোটদার গিটারের মাস্টারের বেতনের টাকার জন্য হাত পাতেন মা। প্রতিমাসেই টাকা দেওয়ার আগে বাবা বলেন — *লেহাপড়া কতদূর করতাছে খবর নিছ? নাকি গান বাজনা নিয়া থাকলে ওর জীবন চলব? তিনটা প্রাইভেট মাস্টার রাইখা দিছি–*

অঙ্কের, ইংলিশের, সাইন্সের। ঠিকমত মাস্টারের কাছে যায় কি না জানো? রাইত কয়টা পর্যন্ত পড়ে? সুলেখার মা'র ছেলেগুলা রাইত দশটা পর্যন্ত পড়ে।

গিটারের মাস্টারের টাকা প্রতিমাসেই বাবা ছুঁড়ে দেন টেবিলে, বিছানায়, মেঝেয়। আর তিন মাস্টারের টাকা মাস্টারদের বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসেন।

বাবাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না মা। এত জটিল চরিত্র আর কোনও সংসারে আছে বলে মা'র মনে হয় না। এই মনে হয়, সংসারের জন্যই তাঁর খাটাখাটনি, সন্তানের মঙ্গলের জন্য সব উজাড় করে দিচ্ছেন আবার মনে হয় সংসারের কারও জন্য তাঁর কোনও মায়াই নেই, লোকে মন্দ বলবে বলে তিনি সংসার নামের একটি লোক দেখানো জিনিস হাতে রেখেছেন, আসলে রাজিয়া বেগমকে জীবন সঁপেছেন বাবা। আবার, বাবা যেদিন আমানউদ্দৌলাকে মাদারিনগর থেকে এনে আমাদের বাড়িতে ওঠালেন, চটের থলে করে এক সেরের জায়গায় দু'সের খাসির মাংস নিয়ে বাড়ি ফিরলেন, চেম্বার থেকে সকাল সকাল ফিরে মা'কে বললেন – *গোসতটা বেশি কইরা পিঁয়াজ দিয়া ভুনা কর, আর লাউশাক রান্ধো সিম দিয়া, পাইন্যা ডালের বদলে ডাইল চচ্চড়ি কর* – মা'র মনে হল যেন সকল খাটাখাটনি আসলে মাদারিনগরের মানুষদের জন্য।

সে রাতে দাদাদের কাছে ডেকে বাবা বলেছিলেন – *তোমাদের লেখাপড়ার খবর কি? মাস্টারের কাছে পড়তে যাও ঠিকমত?*

দাদার মাথা ঝুলে থাকে ঘাড়ে, মেঝেয় বুড়ো আঙুল ঘসতে ঘসতে বলেন – *হ যাই।*

–*খেলা বেশি না পড়া বেশি, কুনটা কর?* বাবা জিজ্ঞেস করেন।

যে উত্তরটি তিনি শুনতে চান, দাদা তাই শোনান – *পড়া।*

লেখাপড়া করে যে, সে কি করে?

–*গাড়িঘোড়া চড়ে।* দাদা উত্তর দেন, চোখ মেঝেয়।

–*আর তুমি?* ছোটদার দিকে চোখ ফেরান।

ছোটদা বলেন – *গা গাড়িঘোড়া চড়ে।*

শুনে আমি বলতে চেয়েছিলাম – *বাবা ত লেখাপড়া করছে। বাবা তো ঘোড়াতেও চড়ে না। মটর গাড়িতেও না। চড়ে রিক্সায়।*

বলা হয় না। শব্দ গিলে ফেলার স্বভাব আমার, গিলে ফেলি।

– *হুম। আমাদের বাড়িতে একটা নতুন লোক আইছে, আমানুদ্দৌলা নাম। সে তোমাদের কি হয়? কাকা হয়। তোমাদের কি হয় সে?*

ছোটদা ঘরের থামে হেলান দিয়ে বললেন – *কাকা হয়।*

–*কাকা হয়, ঠিক।* বাবা ছোটদাকে টেনে সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন – *এইভাবে দাঁড়াইতে হয়, সোজা হইয়া।*

–*আর এই যে, তুমি এইদিকে আসো* বলে আমাকে ডাকেন।

–*তুমি তোমার কাকারে দেখছ? আমার ভাইরে?*

মাথা নাড়ি আমি। হ্যাঁ দেখেছি।

–*ঠিক আছে, সবাই পড়তে বও গিয়া। ভাত রান্ধা হইলে খাইবা। কাকারে লইয়া খাইবা। কাকা আপন লোক। বুঝছ কি কইছি?*

দাদা ভাল ছাত্রের মত মাথা নেড়ে বলেন — *বুঝছি।*

আমান কাকার জন্য খড়ির ঘরের খড়ি সরিয়ে চৌকি আর টেবিল চেয়ার পেতে দিলেন বাবা। তাঁকে শহরের এক কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়ে বাবা বাড়িতে জানিয়ে দিলেন এখন থেকে কাকা এ বাড়িতে থাকবেন। তাঁর খরচপাতি সব বাবাই দেবেন।

—*নিজের ছেলে মেয়ে আছে। এত খরচ পুষাইবা কেমনে তুমি?* বাবার আয়োজন দেখে বলেছিলেন মা।

বাবা বলেছেন — *পুষাইতে হইব। নিজের মায়ের পেটের ভাই যখন। আমি ত আর ভাইরে ফেলাইয়া দিতে পারি না। আর ও থাকলে তুমারও লাভ হইল। বাজার সদাইটা ওরে দিয়াই করাইতে পারবা।*

—*বাজার সদাই তো নোমান কামালই, বড় হইছে, করতে পারে।* মা ঠান্ডা গলায় বলেন।

পরদিন মা'র জন্য একটি ছাপা সুতি শাড়ি কিনে আনেন বাবা। মা খয়ের ঘসে একটি পান খান সেদিন। ঠোঁট লাল টুকটুক করে, নতুন শাড়িটি পরে বাবার গা ঘেঁসে বিছানায় বসে বলেন — *কাপড়ের বাইনটা খুব ভালা।*

শাড়িটি মা'কে কেমন মানাচ্ছে এসব কথায় না গিয়ে বাবার ব্যাকুল প্রশ্ন। —*আমানরে খাওন দিছ?*

মুহূর্তে মা'র বুকে একটি কাঁটা এসে বেঁধে। আসলে কি বাবার এই আদর, সোহাগ সবই আমান কাকার যেন ভাল দেখাশোনা করেন মা, সে কারণে! লোকে চাকর বাকরকে মাঝে মাঝে এটা ওটা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখে যেন চাকর ভাল রাঁধে বাড়ে, যেন বিশ্বস্ত থাকে মনিবের! নিজেকে এ সংসারে এক দাসী ছাড়া মা'র আর কিছু মনে হয় না। মা'র সুখ কিসে, কিসে অসুখ বাবা তার খবর রাখেন না। আমান কাকা বাড়িতে আসার দিন সাতেক পর মা একবার বলেছিলেন —*সুলেখার মা'র বাড়িতে তোমারে আর আমারে দাওয়াত দিছে, সুলেখার বিয়া। চল যাই।*

বাবা সাফ বললেন — *না।*

মা পীড়াপিড়ি করলে বিরক্ত স্বরে বললেন — *টেকা রাখো, যা উপহার কিনার, কিইনা তুমি একলা যাও।*

এরকম এক অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে জীবন যাপন করেন মা। লোকে জানে তিনি ডাক্তারের বউ, লোকে জানে সুখে টইটম্বুর তাঁর জীবনের চৌবাচ্চা। কেবল তিনি জানেন বাবার শরীর থেকে ভেসে আসা অন্য এক নারীর গন্ধ তাঁর সব সুখ স্বপ্ন ধুলোয় উড়িয়ে দিয়েছে, তিনিই জানেন শরম লজ্জা থুয়ে শরীর মেলে দেওয়ার পরও বাবা বিছানায় পাশ ফিরে ঘুমোন, তাঁর নির্ঘুম রাতের সঙ্গী হয় কেবল দীর্ঘশ্বাস।

ছোটদাকে সঙ্গে নিয়ে সুলেখার বিয়ে খেয়ে আসেন মা। মা সারা বাড়ির ভিড়ের মধ্যে বড় একা বোধ করেন। বাবা রাতে ফেরেন গুনগুন গান গাইতে গাইতে, জিভ লাল পানের রসে। টেবিলের বাড়া ভাত সে রাতে ছোঁন না বাবা। *কুন বেডির বাড়িত থেইকা খাইয়া আইছ যে ভাত খাইতে বও না?* মা কথার তীর ছোঁড়েন বাবার দিকে।

বাবা হেসে বলেন — *দাওয়াত আছিল এক রুগির বাড়িত।*

—*পুরুষ রুগি নাকি মেয়ে রুগি?* বিছানায় দ হয়ে শুয়ে মা বলেন।

— *রুগি রুগিই। পুরুষ আর মেয়ে কী!* বাবা ধমকে বলেন।

— *অইতা চালাকি আমি বুঝি। রাজিয়া বেগম তুমার রুগিই আছিল। আছিল না? হের বিছনা থেইকা তুমারে আমি তুইলা আনি নাই? আনছি। আমারে সরল সহজ পাইয়া তুমি যা ইচ্ছা তাই কইরা যাইতাছ।* বলে মা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

মা'র পাশে সটান শুয়ে বাবা বলেন — *যা ইচ্ছা করতে পারলে ত ভালই ছিল। করতে পারি কই!*

সকালে ছোটদার গিটারে *তুমি কি দেখেছ কভু, জীবনের পরাজয়! দুখের দহনে করুণ রোদনে তিলে তিলে তার ক্ষয়,* গানের সুর শুনে বাবা লাফিয়ে বিছানা ছাড়েন। ভেসে আসা সুরের সঙ্গে তিনি গাইতে থাকেন — *প্রতিদিন কত খবর আসে যে কাগজের পাতা ভরে, জীবন পাতার অনেক খবর রয়ে যায় অগোচরে।*

মা থালায় করে হাতগড়া রুটি আর ডিম-পোচ নিয়ে ঘরে ঢুকে বাবাকে গান গাইতে দেখে চমকান। *ওহ,* মাকে আরও চমকে দিয়ে বাবা বলেন, *কামাল ত ভালই বাজায়। গানটাতে একেবারে আমার মনের কথা কইছে। শুনছ!*

সেই সকালে হাসপাতালে যাওয়ার আগে বাবা ছোটদাকে ডেকে বললেন — *কুন মাস্টারের কাছে গিটার শিখ তুমি! মাস ত শেষ, টাকা লাগব না মাস্টারের! কত টাকা!*

বলে মানিব্যাগ খুলে টাকা বের করে দিলেন ছোটদার হাতে। ছোটদার সারা মুখে উপচে পড়ে খুশি। বাবা বললেন — *ভাল কইরা লেখাপড়া না করলে, খালি গান বাজনা লইয়া থাকলে চলব! গান বাজনা কি তোমারে খাওন দিব! সকালে ব্রেনডা পরিষ্কার থাকে। সকালে পড়তে বসবা। একটা রুটিন কইরা লও। খাওয়ার সময় খাওয়া। পড়ার সময় পড়া। গান বাজনার সময় গান বাজনা।*

কোথায় এক অজপাড়াগাঁয়ের রাখাল ছেলে শহরের বড় হাসপাতালের সরকারি ডাক্তার হয়ে গেল! জীবনে এত সফল হয়েও পরাজয়ের, দুঃখের এই গানটি বাবার ভাল লাগল, মা বুঝে পান না, কেন। মা'র হিশেবে মেলে না কিছুই। মানুষটি পাথরে গড়া, আবার মনে হয়, কাদায়।

সেরাতে বাবা বাড়ি ফিরলে মা কুঁচি কেটে শাড়ি পড়েন, পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে বাবাকে হাতপাখায় বাতাস করতে করতে, বাবা যখন রাতের খাবার খান, আমাকে বললেন *যা তর নানির ঘরে ঘুমা গিয়া।*

নানির ঘরে যাওয়ার কথায় লাফিয়ে ওঠা মেয়ে আমি, মা তাই জানেন। কিন্তু অবাক হন শুনে যখন বলার পরও আমি ও ঘরের দিকে ছুটি না।

মা আবার বলেন —- *যা তর নানির ঘরে ঘুমাইতে যা।*

আমি মাথা নেড়ে বলি — *না।*

মা চকিতে ঘাড় ফেরান আমার দিকে — *কি রে, যাইবি না তুই!*

আমি স্পষ্ট স্বরে *না* বলি।

—কি হইছে তর? কেউ মারছে? টুটু, শরাফ, ফেলু কেউ?

খাটের রেলিংএর কাঠ থেকে পুডিং তুলতে তুলতে নখে, বলি — *না।*

—না, তাইলে যাস না ক্যা?

মা আমাকে দরজার দিকে ঠেলেন।

আমি দরজার পাল্লা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে থাকি। সামনে অন্ধকার উঠোন।

মা বলেন — *ছেড়িডারে লইয়া আর পারা গেল না। ও মুটেই কথা শুনে না। কই, ঘরো বইসা থাক। না বাইরে খেলবো। সারাদিন খেলা খেলা। খেলার মধ্যে মাইর খাইয়া প্যানপ্যান কইরা কান্দে। শইলে মাংস নাই, পাখির দানা মুহে দেয়। ছুটবেলায় তিনজনে হাত পা ঠাইসা ধইরা দুধ খাওয়াইতে হইছে। দুধ খাইব না, ডিম খাইব না। দিন দিন বেয়াদ্দব হইতাছে। কইতাছি তর নানির ঘরে গিয়া ঘুমা। যায় না। অইন্যদিন তো খুশিতে লাফ দিয়া দৌড় লাগাস।*

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি দরজায়, এক পাও নড়ে না আমার।

মা কাছে এসে পিঠে হাত বুলিয়ে নরম কণ্ঠে বলেন — *যাও, মামারা কিচ্ছা শুনাইব, যাও। ফিতা লইয়া যাও, ঝুনু তুমার চুল বাইন্ধা দিব।*

আমি নড়ি না। বাবা বলেন — *থাক, যাইতে যহন চাইতাছে না।*

—*বড় বেয়াদ্দপ।* মা বলেন।

আমি, মা ভাবেন, হয়েছি অদ্ভুত। বাড়িতে কোনও অতিথি এলে দৌড়ে গিয়ে লুকোই মা'র পেছনে। এত ভয়, এত লজ্জা, এত দ্বিধা আমার কোত্থেকে এল মা বোঝেন না। আমার মুখ দিয়ে রা শব্দ বেরোয় না, গল্প বলতে বললেও শব্দ হাতড়াই, কিন্তু শুনতে বেলায় কান খাড়া। নানা জনের নানা গল্প শুনি, কিন্তু নিজে গুছিয়ে গল্প বলতে পারি না। পড়তে বেলায়ও। এর মধ্যেই ব্যঙ রাজকুমার, ঠাকুরমার ঝুলি, সোনার কাঠি রূপোর কাঠি নানারকম রূপকথার বই পড়ে সারা। আমি পড়ি না তো, গিলি, গোগ্রাসে। আমি মুখচোরা গোছের, মনের কথা খুলে বলি না খুব, এই যে নানির ঘরে আমি ঘুমোতে গেলাম না, মামাদের সঙ্গে শুয়ে কিচ্ছা শোনার মত লোভনীয় ব্যাপারটিকে দিব্যি বাতিল করে দিলাম, কেন, কি কারণ, তা মুখ ফুটে বলি না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি ধমকালে। কানমলা, গুঁতো, চড় চাপড় সারাদিনই খাচ্ছি, তারপরও মুখে শব্দ নেই। কাঁদিও না প্রাণ খুলে। রবিউল আওয়াল মাসের বারো তারিখে জন্ম। শর্মিলার বাড়িতে কোনও খাবার খাইনি শর্মিলা হিন্দু বলে, কপালে হিন্দু মেয়েদের মত টিপও পরতে চাই না, হয়ত আমার খুব অন্যরকম হবার কথা ছিল, ঈমানদার। কিন্তু আরবি পড়তে গেলে আমি খুব খুশি হই না, কায়দা সিফারা ফেলে কখন রূপকথার একটি বই হাতে নেব, ছবি আঁকব, দৌড়ে রেললাইনে যাব, মাঠে খেলব, সেই তালে থাকি। কত বলা হয়েছে মানুষের ছবি আঁকিস না, মানুষের ছবি আঁকলে গুনাহ হয়, *মানুষের যদি প্রাণ দিতে পারস, তাইলেই সে ছবি আঁক,* তবু মানুষের ছবি আঁকার প্রচন্ড উৎসাহ আমার মরে না।

ফজলিখালার শ্বশুরবাড়ি থেকে মা লাল রঙে আঁকা হযরত মহাম্মদের জুতোর ছবির ওপর আল্লাহর আয়াত লেখা একটি কাগজ, মা বলেন নাল শরিফ, তাবিজের খোলে পুরে *অকারণ ভয়* দূর করতে আমার গলায় পরিয়ে দেন।

মানুষের ছবি আঁকা পাপ জেনেও আমি বুঝি না কেন আমার ভাল লাগে মানুষের ছবি আঁকতে।

আমাকে ছবি আঁকতে দেখলেই মা বলেন — *গাছপালা আঁক, ফুল আঁক , ক্ষতি নাই। মানুষের প্রাণ দিতে না পারলে মানুষের ছবি আঁকিস না। এক আল্লাহ ছাড়া মানুষের প্রাণ কেউ দিতে পারে না।*

সেদিন আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় — *গাছ যে আঁকতে কইলা, গাছেরও তো প্রাণ আছে।*

মা ঠোঁটজোড়া মুখের ভেতর ঠেসে টাসেল বাঁধতে বাঁধতে চুলে, বলেন — *যা কইছি, তাই কর। বেয়াদ্দপি করিস না।*

মা যা বলেন তাই করতে হবে, যেহেতু মা বলেছেন। মা আমাকে গু খেতে বললেও গু খেতে হবে, ব্যাপারটি এরকম। ছবি আঁকলে প্রাণ যে দিতেই হবে এমন কি কথা! আমি তো মানুষ বানাচ্ছি না, আঁকছি। দুটোর মধ্যের তফাৎটুকু মা বোঝেন না। যুক্তিহীন কথা বলেন, অনেকটা গায়ের জোরে, নাকি মায়ের জোরে কে জানে। নিষেধ করার পরও মানুষের ছবি আমি এঁকেছি সে মানুষের ছবি আঁকব বলে নয়, এঁকেছিলাম নৌকো, নৌকোর প্রাণ নেই বলে সে ব্যাপারে কারও কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু দোষ হয়েছে নৌকোয় মাঝি বসিয়েছি। নৌকোর কি নদীতে একা একা ভাসা মানায়! বৈঠা হাতে নৌকোর গলুইতে একটি মাঝি না বসিয়ে পারিনি। নানিবাড়ি বেড়াতে এসে হুমায়রা সে ছবি দেখে ছি ছি করে যাওয়ার পর মা সন্ধে বেলা আমার রঙপেনসিল আর ছবি আঁকার কাগজ কেড়ে নিয়ে বললেন — *আঁকাআঁকি থইয়া লেখাপড়া কর।*

ভ্যাঁ করে কাঁদার মেয়ে আমি নই, ঝিম ধরে বসে থাকি।

খোলা জানলার পাশে শুয়ে গায়ের ব্লাউজ খুলে বাঁ হাতে বুকের ঘামাচি মারেন আর ডান হাতে হাতপাখা নাড়েন মা। আমার কাগজ পেনসিল কেড়ে নেওয়াটা মা'র কাছে উঠোনের আবর্জনা কুড়িয়ে পাগারে ফেলার মত তুচ্ছ ঘটনা।

জোরে পড়। পড়া ত শুনা যায় না। মা'র ধমকে ঝিম ভাঙে আমার।

গলার স্বর বুজে এলে কি চড়া স্বরে পড়া যায়! সেটিও আমার দ্বারা হয় না।

সে রাতেই মা যখন মাথায় আমার হাত বুলিয়ে আদুরে গলায় বললেন *আসো মা, আমার সাথে নামাজে দাঁড়াও।*

মা'র ওইটুকু স্পর্শে আমার সব ক্ষোভ উড়ে যায় দখিনা বাতাসে। মা এরকম, মেরে ধমকে আবার কোলে নিয়ে আদর করতে বসবেন। দাদাকে সকালে কঞ্চি দিয়ে পিটিয়ে পিঠ লাল করে দুপুরে সে পিঠে নিজের হাতে সর্ষের তেল মালিশ করে দিয়েছিলেন।

নামাজ পড়লে মা বলেন *আল্লাহ তোমারে ভালবাসবেন, তুমি যা চাইবা আল্লাহ তুমারে তাই দিবেন।*

যা চাইব তাই আল্লাহ দেবেন, এর মত মজা আর হয় না। মা ওঠবস করেন, সেটিই অনুসরণ করে মোনাজাতের হাত তুলে চোখ মুদে মনে মনে বলি যেহেতু আল্লাহ মনে মনে

বলা কথাও শুনতে পান, *আল্লাহগো আমারে দুইটা পোড়াবাড়ির চমচম দেও।* মোনাজাত শেষ করে চোখ খুলে দেখি কোথাও পোড়াবাড়ির চমচম নেই। জায়নামাজের তলেও খুঁজি, নেই। মা'কে পরে প্রায় কেঁদে বলি – *কই যা চাইছি আল্লাহ তো দিল না।*

মা বলেন – *মন দিয়া চাস নাই, তাই পাস নাই।*

এরপর প্রায় রাতেই মা'র সঙ্গে নামাজে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে আল্লাহর কাছে নানা জিনিস চেয়েছি –চাবি দিলে ঘোরে এমন গাড়ি, মুক্তাগাছার মন্ডা, বয়াম ভর্তি মার্বেল, বাঁশিঅলা বেলুন, পাইনি। এর চেয়ে বেশি মন কি করে দিতে হয় আমি জানি না। নিজেকে আমার বিষম এক পাপী মানুষ বলে বোধ হতে থাকে। তবে কি সেটিই আমার পাপ ছিল যে শরাফ মামা আমাকে ন্যাংটো করেছিলেন একা ঘরে! সেই পাপের কারণে কি আল্লাহ আমাকে ঘৃণা করছেন! হবে হয়ত। মন ভরে থাকে বিষাদে। বিষাদাচ্ছন্ন আমাকে মা যেদিন নানির ঘরে গিয়ে ঘুমোতে বললেন, আমার যেতে ইচ্ছে করেনি, মামাদের সঙ্গে ঘুমোতে আমার ভয় হয়। মা জানেন না আমার ভয়ের কারণ। আমাকে ন্যাংটো করার কদিন পরই চুম্বকের খেলা দেখাতে পুকুর ধারে ডেকেছিলেন তিনি, যাইনি। মাথায় আমার চাটি মেরে চলে গেছেন শরাফ মামা। টুটু মামা ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রায় বিকেলেই সিরাজউদ্দোলার অভিনয় করেন। বাড়ির ছেলেমেয়েরা সে ঘরে বসে টুটু মামার যাত্রা দেখে হাত তালি দেয়। দরজায় উঁকি দিয়ে যখন দেখেছি ঘর অন্ধকার, ঢুকিনি। অন্ধকার কোনও ঘরে আমার ঢুকতে ইচ্ছে করে না। চাঁদনি রাতে উঠোনে বসে কানা মামু হরিণ শিকার করতে করতে কি করে একদিন তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে গেল, সে গল্প বলেন। বাড়ির লোকেরা জলচৌকিতে নয়ত শীতল পাটিতে শুয়ে বসে কানা মামুর শিকারের গল্প, আমির হামজা, সোহরাব রুস্তমের পালা শোনে। আমি শুনি মা'র গা ঘেঁসে বসে। গা এত ঘেঁসে বসি যে মা বলেন –*শইল ছাইড়া ব। গরম লাগে।*

আমার তবু শরীর ঘেঁসে থাকি। মা নিজে দূরে সরে বসেন। মা দূরে গেলে আমার ভয় হয়, এক্ষুণি কেউ বুঝি আমার হাফপ্যান্ট ধরে টান দেবে।

মা যখন আমাকে ঘরে একা ফেলে সিনেমায় যান, আমি বলি – *মা যাইও না। আমার ডর লাগে।*

মা ধমক লাগান – *সারা বাড়ি ভর্তি মানুষ, তর ডর লাগব ক্যা?*

আমাকে নানির ঘরে রেখে সিনেমায় চলে যান মা। নানি সারাদিন রান্না করেন। পাকঘরের চৌকাঠে মন খারাপ করে বসে থাকি, নানি কুকুর তাড়ানোর মত আমাকে বলেন – *দূর হ দূর হ। কামের সময় ভেজাল ভাজাইস না।*

রোদ নিচের সিঁড়িতে এলে মা বাড়ি ফিরবেন। আমি রোদের দিকে তাকিয়ে থাকি আর মনে মনে রোদকে বলি রোদ তুই নিচের সিঁড়ি নাম। রোদ এত দেরি করে নিচের সিঁড়ি নামে কী বলব!

উঠোনে নেড়ি কুকুর হাঁটে, কালো বেড়াল হাঁটে, গাছে বসে কা কা কা ডাকে দাঁড়কাক, পাতিকাক। দরজায় ফেরিঅলা হাঁকে, *লাগব শিলপাটা ধার,* আসে কটকটি অলা, পুরোন জামা কাপড় জুতোর বদলে কটকটি দেয়, হাঁকে চুরিফিতাঅলা, কাঠের চিকন বাক্সে কাচ বাঁধানো ঢাকনার নিচে চুরি ফিতা, ঝুনু খালা ফেরিঅলা দেখলেই নিমতলায় বসে চুরি ফিতা দেখেন, কানের দুল দেখেন, আসে বেদেনিরা মাথায় ঝুড়ি

নিয়ে রঙিন কাচের চুরির, আসে হাওয়াই মিঠাই অলা, গোলাপি হাওয়াই মিঠাই মুখে পুরলেই হাওয়া, আসে ভালুক অলা, ভালুক খেলা দেখায়, বাঁদর অলা, বাঁদর নাচাতে নাচাতে আসে, আসে লাল রঙের জামা পরা, মাথায় লম্বা টোপর পরা চানাচুরঅলা, হাতের ঘুঙুর বাঁধা লাঠি ঝাকিয়ে গান গায় আর বলে *হেই চানাচুর গরররম।* গান শুনে রুনু খালা ঝুনু খালা দৌড়ে ঘরের বার হন, ঠোঙায় করে চানাচুর কেনেন। আসে বাদাম অলা, আসে ঝালুমড়িঅলা, *হেই ঝালমুড়ি।* বিকেল হলেই মামা খালাদের মধ্যে ধুম পড়ে বাদাম আর ঝালমুড়ি কেনার। শরাফ মামা এক ঠোঙা গরম বাদাম নিয়ে বাড়ি ঢোকেন। ফেলু মামার হাতে আইসক্রিম। জিভে জল চলে আসে দেখে। কুয়োর পাড়ে অসহায় দাঁড়িয়ে থাকি। একা। হঠাৎ বেদেনি ঢোকে বাড়ির ভেতর, ঝুড়ি মাথায় নিয়ে। মামারা সাপ খেলা দেখবেন। ঝুড়ি নামিয়ে বসে বেদেনি উঠোনে, উঠোন ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে মামা খালারা, নানি রান্নাঘরের দরজায়। ঝুড়ি থেকে সাপ নেমে আসে কালো সাপ, হলুদ সাপ, পদ্মগোখরা, নেমে আসে মস্ত এক অজগর। অজগর সারা উঠোন এঁকে বেঁকে চলে। এমন ভয়ংকর, বিভৎস জিনিস এর আগে কখনও আমি দেখেনি। কুয়োর পাড় থেকে দৌড়ে যাই ফুলবাহারির কাছে, ও বসে বিড়ি টানছিল রান্নাঘরের দাওয়ায়। বলি –*ও ফুলবাহারি আমার ডর লাগে।*

ফুলবাহারি কালো মুখে শাদা হাসি –*ডরানির কি আছে? এইতা সাপের বিষ নাই। বিষ দাঁত ফালাইয়া আনছে বাইদ্যানিরা।*

আমার তবু ভয় হয়। বেদেনি চলে গেলেও আমার ভয় যায় না। পা ফেলতে ভয় হয় উঠোনে, মাঠে, যেন পায়ের কাছে এক্ষুণি এক সাপ ফণা উঁচু করে দাঁড়াবে। রাতে বিছানায় শুয়ে মনে হয় সাপ কুন্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে আছে খাটের নিচে, সাপ উঠে আসছে ধীরে ধীরে বিছানায়, বালিশের তলায়, গায়ের ওপর। ঘুমিয়ে রাতে স্বপ্নও দেখি শয়ে শয়ে সাপ ফণা তুলে আছে আমার চারদিকে, আমি একা, একা কোথাও, রেললাইনে অথবা বড় রাস্তার মাঝখানে অথবা কোনও পুকুরঘাটে, কোনও গাছতলায়, বা কোনও বন্ধ ঘরে আমি ঠিক মনে করতে পারি না। চারদিকে কারও কোনও শব্দ নেই, কেবল সাপের হিসহিস ছাড়া। আমি মা মা বলে চিৎকার করছি, মা নেই। ওই সাপের রাজ্যে গা মুচড়ে নিজেকে গুটোতে গুটোতে, নিজের ভেতরে নিজেকে ঠেলতে ঠেলতে, ঘুম ভেঙে যায়, শুনি বুকের ধুকপুক শব্দ।

তখনও সাপের আর মানুষের ভয় আমাকে কেঁচো করে রাখে আর মা কি না বলেন মামাদের সঙ্গে ঘুমোতে! মা'কে আমার বলা হয়নি শরাফ মামা আমাকে যে ন্যাংটো করে নুনু ঠেসেছিলেন। কে যেন আমার ঠোঁটদুটো অদৃশ্য সুতোয় সেলাই করে রাখে।

গলায় নাল শরিফের তাবিজ ঝোলে আমার, তবু ভয় দূর হয় না।

নানির কাছ থেকে আড়াই কাঠা জায়গার ওপর ঘর ভাড়া নেওয়ার পর আমাদের পাকঘরে পাতা হয়েছে টেবিল চেয়ার, দিব্যি সাহেবদের মত তিনবেলা খেতে বসি। বাবা আবার সাহেবি ব্যাপার বেশ পছন্দ করেন। জুতো পরে মচমচিয়ে হাঁটেন। সেই পাজামা ফতুয়া পরা হারকিউলিস সাইকেল চড়া চিকন শরীরের বাবা দ্রুত বদলে যাচ্ছেন। তিনি প্যান্টে শার্ট গুঁজে পরেন, টাই পরেন গলায়, সময় সময় আবার শার্টের ওপর কোটও

পরেন। *সাহেব বাবা* পিঁড়ি বা মাদুর পেতে বসে খাবেন কেন! বৈঠক ঘরের জন্য বাবা বেতের সোফা কিনেছেন। চেকনাই বেড়েছে এ বাড়ির, নানির বাড়ি সে তুলনায় মরচে ধরা। রুই কাতলার ঝোল খায় ওরা যদিও, মাদুর পেতেই খায়। কেবল খাবার নয়, পড়ালেখা করার জন্যও টেবিল চেয়ার এসেছে এ বাড়িতে, মামাদের সঙ্গে এক মাদুরে বসে এক হারিকেনের আলোয় ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ার পাট তবু চুকি চুকি করে চুকছে না।

একা একা শুয়ে ছিলাম, চোখ ছিল জানালার ওপারে, হঠাৎ হট্টগোল শুনে দৌড়ে নানির উঠোনে দাঁড়াতেই ফেলুমামা বলেন ঝুনুখালার সোনার কানের দুল চুরি গেছে। কে নিয়েছে, কেউ জানে না। এ ওর দিকে সন্দেহ-চোখে তাকায়। ঝুনুখালা আমাকে টেনে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে ফিসফিস করে বললেন *নিয়া থাকলে দিয়া দে, কাউরে কইতাম না তুই যে নিছিলি।*

আমি মাথা নেড়ে না বলি। কিন্তু আমার ভয় হতে থাকে ঝুনুখালার সন্দেহে, মনে হতে থাকে সম্ভবত আমিই চুরি করেছি দুল। আমিই সম্ভবত কোথাও কোনও মাটির তলে লুকিয়ে রেখেছি। ঝুনু খালা বলে যাওয়ার পর থেকে নানিবাড়ির কেউ আমার দিকে তাকালেই আমার বুক ধড়ফড় করে। শুনি *চাল পড়া* খাওয়ানো হবে সবাইকে, যে চুরি করেছে চাল পড়া খেলে তার রক্তবমি হবে, এভাবেই ধরা পড়বে চোর। আকুয়া মসজিদের ইমাম খতিবুদ্দিন এসে চাল পড়ে দিল। চাল পড়া মানে বিড়বিড় করে কি সব বলে এক বাটি চালের মধ্যে ফুঁ দেওয়া। সেই ফুঁ দেওয়া চাল বাড়ির সবার হাতের তালুতে একমুঠ করে দিয়ে খেতে বলা হল। সকলে চাল চিবোয় আর এর ওর দিকে তাকায় রক্তবমি কার হয় দেখতে। আমার গা কাঁপছিল চাল চিবোতে গিয়ে। মনে হচ্ছিল এই বুঝি বমি করব, এই বুঝি সকলে উবু হয়ে আমার বমি পরীক্ষা করে বমিতে রক্তের কণা পাবে। এই বুঝি বাড়ির সব গাছ থেকে সব ডাল ভেঙে এনে উঠোনের কাদায় ফেলে পেটানো হবে আমাকে। কোনও এক মাটির তল থেকে বের করে দিতে হবে ঝুনুখালার দুল। আমি কি নারকেল গাছের তলে নাকি খড়ির ঘরের সিঁড়ির কাছে নাকি বারবাড়ির পায়খানার পেছনে লুকিয়েছি দুল! কোথাও হয়ত। ঝুনুখালার চোখের দিকে তাকালে নিজেকে চোর মনে হয়, ঝুনুখালা হয়ে আমি আমাকে দেখি তখন। তখন আমি নিজের আলাদা কোনও অস্তিত্ব টের পাই না।

চাল পড়া না খাওয়ার দলে নানা, শরাফ মামা আর ফুলবাহারি। নানা আর শরাফ মামা বাড়ি ছিলেন না, আর ফুলবাহারি বাড়ি থেকেও তার কালো গ্রীবা শক্ত করে দাঁড়িয়ে থেকে কোমরে শক্ত করে আঁচল গুঁজে বলেছে *আমি চুরি করি নাই, আমি চাইল পড়া খাইতাম না। যে বেডা চাইল পইড়া দিছে, বেডারে আমি চিনি, বেডা একটা আস্তা বদমাইশ। মোলবি বেডার বাড়িত আমি কাম করছি, বেডার চরিত্র আমার জানা আছে। হে পড়ব চাইল পড়া, আর আমি তা মুহো দিমু! জীবনেও না।*

ফুলবাহারি থুতু ছোঁড়ে মাটিতে। সে খাবে না তো খাবেই না।

মা ধমকান – *মৌলবিরে বদমাইশ কও ক্যা ফুলবাহারি, গুনাহ হইব।*

ফুলবাহারির শরীর তেলমাখা বাঁশের মত, কালো, ছিপছিপে। মুখে বসন্তের দাগ। বিড়ি খাওয়া কালো ঠোঁট। কানের ওপর বিড়ি রেখে সে মশলা বাটে, বাসন মাজে,.ঘর

মোছে, উঠোন ঝাট দেয়, দিয়ে পাকঘরের দেয়ালে পিঠ ঠেস দিয়ে বসে বিড়িতে আগুন ধরায়।

ফুলবাহারি চাল পড়া না খাওয়ায় কানের দুল চুরি করেছে যে সে ই, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয় সকলে। ও চাল পড়া খাবে না ঠিক আছে বাটি চালানের আয়োজন হোক। এরকম একটি প্রস্তাব দেন রুনুখালা। বাটি চালান দেবে জবেদা খাতুন, কানা মামুর বউ। উঠোনে এঁটেল মাটি লেপে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে কাসার বাটি, এই বাটিতে তুলা রাশির কেউ হাত রাখলে বাটি আপনা মতে চলবে, চোরের সামনে গিয়ে থামবে বাটি। বাটি চালান হচ্ছে বাড়িতে, জবেদা খাতুন তুলারাশি, বাটি তার হাতে চলছে, এ ঘরের আঙিনা ওঘরের কোণা পেরিয়ে আমাদের পাকঘরে বাটি এসে থামে, একেবারে ফুলবাহারির পাছার তলায়। ফুলবাহারি তখন মশলা বাটছে। বাটির পেছনে পেছনে বাড়ির লোক এসে জড়ো হয়।

হাশেম মামা চড়া গলায় বলেন –*ফুলবাহারি দুল বাইর কইরা দেও।*

ফুলবাহারি ফুঁসে উঠে পদ্ম গোখরার মত, ওর কানে ঝিলমিল করে সস্তা সোনালি দুল, বলে – *আমি চুরি করি নাই। আমি গরিব বইলাই আপনেরা মনে করতাছুইন আমি চুর। মানুষ গরিব অইলেই চুর অয় না। চুর অইলে চুরিই করতাম, খাইটা খাইতাম না। আপনেগো বাটি ভুল চলে।*

রুনু খালা ফুলবাহারির গায়ে ঠোনা মেরে বলেন –*যে নারী ঝনঝনাইয়া কয়রে কথা, ধপধপাইয়া হাঁটে সেই নারীর খসমের জাতি মরে হাটে ঘাটে।*

বাটি ভুল মানুষের কাছে গেছে এ কথা কেউ মানে না। নানি বলেন –*ফুলবাহারি, দুল জুড়া দিয়া দেও। যেহানে রাখছ কও, আমরাই বাইর কইরা লই।*

ফুলবাহারির হাত ভরা হলুদ, দাঁড়িয়ে আছে হলুদ হাত শূন্যে ধরে, শুকিয়ে চড়চড় করা বিড়ি খাওয়া কালো ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলবাহারি বলে – *আপনেগো মদ্যেই কেউ চুরি করছুইন দুল। আমি করি নাই।*

কথা শেষ হওয়ার আগেই মা ঝাঁপিয়ে চুলের গোছা ধরে টেনে ওকে নিয়ে আসেন পাকঘরের বাইরে উঠোনে, আমগাছ তলায়। ফুলবাহারির চুল যায় আগে আগে, শরীর যায় পেছনে, পা পারে না আঁকড়ে রাখতে চেয়েও মাটি। টুটু মামা চুলো থেকে আধপোড়া খড়ি এনে বেদম পেটাতে শুরু করেন ফুলবাহারিকে। ওর কানের   বিড়ি মাটিতে পড়ে গায়ের নিচে চিপসে যায়,   সারা উঠোন গড়াতে গড়াতে গলা ছেড়ে চেঁচায় – *ফুলবাহারি চুরি করে না।*

ফুলবাহারিকে সেদিনই কাজ ছেড়ে চলে যেতে হল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল ফুলবাহারি। ওকে দেখে আমার মনে হয়েছিল ঝুনুখালার দুল ও চুরি করেনি। ও ঠিকই বলেছে যে বাটি ভুল চলেছে।

ফুলবাহারি চলে যাওয়ার পরদিনই বস্তির মাঝবয়সী মেয়েমানুষ তইতইকে কাজে রাখা হল।   তইতইএর নাম আসলে নূরজাহান। নূরজাহানের কিছু পোষা হাঁস আছে, হাঁসগুলোকে সন্ধে হলে সে বাড়ি নিয়ে যায় *আয় আয় তই তই* বলে ডেকে ডেকে। হাঁসেরা পুকুরঘাট থেকে প্যাঁক প্যাঁক করে উঠে এসে নুরজাহানের পেছন পেছন হেঁটে বাড়ি ফেরে। গোঁধুলির আলস্য ভেঙে পুকর পাড়ে দাঁড়িয়ে নুরজাহানের তই তই ডাক শুনে

টুটুমামা নূরজাহানকে তইতই বলে ডাকা শুরু করল। সেই থেকে তাকে তইতই বলেই সবাই ডাকে, এক নানি ছাড়া। তইতই ওরফে নুরজাহান ওরফে আলেক খালেকের মা, বেটে, পান খাওয়া লাল দেঁতো, আমাদের তখন *ছুটা কামের বেটি।* তইতই সকাল দুপুর বাড়ির মশলা বাটার, থাল বাসন ধোয়ার, ঘর দোর ঝারু দেওয়ার কাজ করে। আমাদের আলাদা সংসারের চুলোয় রান্নাবান্না করে। মাসিক পাঁচ টাকা বেতন তইতইএর, ভাত পায় এক বেলা।

বাড়িতে *ছুটা বা বাঁধা কামের বেটি* পাওয়া মোটে মুশকিল নয়। পা বাড়ালে বস্তি, হাত বাড়ালে মেয়েমানুষ। একটিকে বিদেয় করলে জোটে আরেকটি। ফুলবাহারি কানের দুল চুরির দায়ে চেলা কাঠের মার খেয়ে বাড়ির বার হল, তইতই এল। তইতইকে ছাঁটাই করা হল কাজে ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে। কি রকম ফাঁকি, না, সন্ধের আগেই তড়িঘড়ি বাড়ি ছাড়ে সে, ঘরে তার আলেক খালেক আছে, আছে ছ'জোড়া হাঁস। মা নানিকে বললেন — *তইতইর কামে মন নাই। রাইতের রান্ধাবাড়া আমারে একলা করতে হয়। বান্ধা কামের বেটি ছাড়া আমার পুষাইত না।*

নানি বললেন — *দেখ আর কয়ডা দিন। নুরজাহানের স্বভাব টভাব ত ভালাই। চুরি টুরি করে না।*

মা নানির কথায় গললেন না। আধা মাসের আড়াই টাকা হাতে ধরিয়ে তইতইকে বলে দিলেন — *যতদিন কাম করছ, হিশাব কইরা বেতন লইয়া যাও। আমি নতুন কামের বেডি রাইখ্যা লইয়াম।*

তইতই বিদেয় হলে কারও কোনও আফসোস নেই।

বস্তিতে কি আর মেয়েমানুষের অভাব!

তইতই নেই, মাকে একাই রান্নাঘরে বসতে হয়, চুলো ধরাতে হয়, আনাজপাতি কুটতে হয়, মাছ মাংস ধুয়ে রান্না চড়াতে হয়। চুলোয় আগুন ধরাতে মা দেশলাই খোঁজেন, ফুলবাহারি বা তই তই চুলো ধরাতো, দেশলাই ওরাই জানে রেখেছে কোথায়।

— *যা আমানুদ্দৌলার কাছ থেইকা একটা ম্যাচ লইয়া আয় তো।*

তইতই যেদিন গেল, সেদিনই মা ফরমাশ দেন আমাকে। মা জানেন কাকার কাছে দেশলাই আছে, তাঁকে সিগারেট ফুঁকতে দেখেছেন তিনি। আমার কাকার ঘরটি সেটি, যে ঘরে খড়ি থাকত, যে ঘরে *মজার একটি জিনিস* দেখাবেন বলে শরাফ মামা এক মরা বিকেলে আমাকে নিয়ে এসেছিলেন। ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে দেখি কাকা শুয়ে আছেন চৌকিতে। কাকা দেখতে বাবার মত। কোঁকড়া চুল, খাড়া নাক, বড় বড় চোখ, ঘন কালো ভুরু, ফর্সা গায়ের রং। বাবাকে ইটের তলে চেপে খানিকটা চ্যাপ্টা করে মাথা চেপে লম্বায় খানিকটা খাটো করে দিলে আমান কাকাই দাঁড়াবে। ঘরটির চেহারা পুরো বদলে গেছে। খড়ি নেই, ইঁদুর নেই। টিনের বেড়ায় লাগানো একটি বাঁধানো ছবি, চুলে ঢেউ তোলা পায়ে পাম্পসু পরা কাকার ছবি। ছবির ডান পাশে মেয়েমানুষের মুখের ছবি অলা ক্যালেন্ডার। বেড়ায় গোঁজা আয়না, চিরুনি। আলনায় অভাঁজ কাপড় চোপড়।

—*কাকা, মা ম্যাচ চাইছে।* ক্যালেন্ডারের ছবি দেখতে দেখতে বলি।

—*তুমার মা ম্যাচ দিয়া কি করব?* বিছানা থেকে নেমে বুকের লোমে আঙুল ঘসতে ঘসতে আমান কাকা প্রশ্ন করেন।

বলি — *চুলা ধরাইব। ভাত রানব।*

কাকা বলেন — *আমার কাছে ত ম্যাচ নাই।*

দেশলাই নেই শুনে পা বাড়াই ঘরের বাইরে।

কাকা টেনে আমাকে ঢোকান ভেতরে। দাঁত মেলে হাসতে হাসতে বলেন

—*আরে খাড়ও, খাড়ও, ম্যাচ লইয়া যাও। ম্যাচ আছে।*

যাদু দেখানোর মত হঠাৎ একটি দেশলাইএর বাক্স চোখের সামনে ধরেন আমার। হাত বাড়াতে গেলে তিনি সরিয়ে নেন হাত। আবার ধরতে যাই, আবার সরিয়ে নেন। এই ভেসে ওঠে চোখের সামনে দেশলাই, এই নেই। জোনাক পোকার মত, এই আলো, এই আঁধার। দেশলাই ধরতে কাছে যাই কাকার, কাকা টেনে আমাকে আরও কাছে নেন। আরও কাছে গেলে কাকা দেশলাই না দিয়ে পেটে বগলে কাতুকুতু দিতে দিতে আমাকে বিছানায় ফেলেন চিৎ করে। আমি কুঁকড়ে থাকি শামুকের মত। আমার শামুক শরীরটি কাকা শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দেন, কাকা ডাং, আর আমি যেন তাঁর ডাংএর গুটি। আমার শরীর বেয়ে কাকার হাত নেমে আসে আমার হাফপ্যান্টে, হাতটি নামাতে থাকে হাফপ্যান্ট নিচের দিকে। গড়াতে গড়াতে আমি বিছানা থেকে নেমে যেতে থাকি। আমার পা মেঝেয়, পিঠ বিছানায়, হাফপ্যান্ট হাঁটুর কাছে, হাঁটু বিছানাতেও নয়, মেঝেতেও নয়। *গলায় আমার নাল শরিফের তাবিজ।* কাকা তাঁর লুঙ্গি ওপরে তোলেন, দেখি কাকার তলপেটের তল থেকে মস্ত বড় এক সাপ ফণা তুলে আছে আমার দিকে যেন এক্ষুণি ছোবল দেবে। ভয়ে আমি সিঁটিয়ে থাকি, আমাকে আরও ভয় পাইয়ে দিয়ে আমার দু'উরুর মাঝখানে ছোবল দিতে থাকে সেই সাপ। এক ছোবল দুই ছোবল তিন ছোবল।

ভয়ে আমার গা হাত পা কাঠ হয়ে থাকে। আমার বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে কাকা বলেন — *লজেন্স খাইবা? তুমারে কালকা লজেন্স কিইনা দিমু। এই নেও ম্যাচ। আর শুন মামনি, কাউরে কইও না তুমি যে আমার নুনু দেখছ আর আমি যে তুমার সুনা দেখছি। এই সব খারাপ জিনিস, কাউরে কইতে হয় না।*

আমি দেশলাই হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। দুউরুর মাঝখানে ব্যথা হয়, পেচ্ছাব পায়, আবার দেখি পেচ্ছাবে ভরে গেছে আমার হাফপ্যান্ট। জানি না কি নাম এই ন্যাংটো-খেলার। আমি বুঝে পাই না কি কারণে শরাফ মামা বা আমান কাকা আমার ওপর চড়ে বসেন। কাকা বলেছেন এসব কাউকে বলতে হয় না। আমারও তাই মনে হয়, এসব কাউকে বলতে নেই। সাত বছর বয়সে হঠাৎ এক বোধ জন্ম নেয় আমার ভেতর, যে, এসব বড় শরমের কাজ, এসব কথা কখনও কাউকে বলা ঠিক নয়, বড় গোপন ব্যাপার এসব।

কেন আমি বাড়ির কাউকে জানাইনি অমন দুটো ঘটনার কথা সে আজও ভাবি। মামা কাকাদের লোকে মন্দ বলুক আমি চাইনি বলে! সংসারে ওঁদের মান রক্ষা করার দায় কি কেউ আমাকে দিয়েছিল! যেহেতু ওরা আমার কাকা মামা, যেহেতু বাল্যশিক্ষায় পড়েছিলাম *গুরুজনকে সর্বদা মান্য করিবে!* যেহেতু ওঁদের আমি ভাল মানুষ বলে জানি, সেই জানাই যেন সত্য হয়! যেন যা ঘটে গেছে সেটি সত্য কোনও ঘটনা নয়, সর্বৈব

মিথ্যে, আসলে সে আমারই দুঃস্বপ্ন, অথবা কাকা বা মামার রূপ ধরে ওরা অন্য কেউ, ছিল জন্মের শত্তুর কেউ! কে আমাকে বোবা করে রেখেছিল, গোপনে পুষতে বলেছিল সব যন্ত্রণা একা একা! বাড়ির সবাই আমার অভিযোগকে হাওয়ায় উড়িয়ে বলবে আমাকে জিনে ভূতে ধরেছে, অথবা আমি পাগল, অথবা আমি মিথ্যুক, আমি একটা পিঁচকে শয়তান, আমাকে কেউ কোলে নিয়ে চুমু খাবে না উল্টে চড় চাপড় লাগাবে এই ভয়ে বা দ্বিধায় কি মুখ খুলিনি! নাকি কাউকে আপন বলে আমার মনে হত না, যার কাছে মন খুলে কাঁদতে পারি, যার কাছে শুরু থেকে শেষ অবদি খুলে খুলে বলতে পারি, দেখাতে পারি ক্ষত, মা'কেও এমন আপন মনে হয়নি আমার যে মা'র আঁচলের তলে আমার জগত, যে মা একটি বৃক্ষের মত, যার ছায়ায় আমি প্রাণ জুড়োই, যে মা স্বচ্ছ জলের পুকুর, যার জল পান করে আমি বাঁচি, সেই মা'কেও যদি আপন মনে না হয় তবে আর কাকে হবে!

আমার ভেতরে তখন দু'জন আমি, এক আমি দল বেঁধে অপেনটো বায়োস্কোপ খেলি, গোল্লাছুট গোলাপপদ্ম খেলি। আরেক আমি উদাস বসে থাকি একা, পুকুর ঘাটে, রেললাইনের ধারে, ঘরের সিঁড়িতে। হাজার মানুষের কোলাহলে একা। একা এই মেয়ের সঙ্গে ক্রোশ ক্রোশ দরত্ব তৈরি হয় সবার। মেয়েটির হাত এই দূরত্ব ডিঙিয়ে কারুকে ছুঁতে পারে না, এমনকি মা'কেও নয়, হাত বাড়ালে হাতের ভেতর মুঠো মুঠো শূন্যতা জমা হয়।

উনসত্তরের শেষ দিকে আমাদের চলে আসতে হয় আকুয়ার পাট চুকিয়ে। এঁদো গলির ধারে খলসে মাছে ভরা পুকুর, তার পাশে, কড়ই নিম খেঁজুর আর সুপুরি গাছের বেড় দেওয়া নানির চৌচালা ঘর, উঠোনে কুয়ো ছাড়িয়ে নারকেল গাছের সার, তার ওপারে আরেক ফালি উঠোন, উঠোনের উত্তরে বৈঠক ঘর, দক্ষিণে শোবার, শোবার ঘরের সিঁড়ির কাছে পেশাবখানা, পশ্চিমে খাবার ঘর আবার আরেক ফালি উঠোন আরও পূবে, দাদাদের আর খড়ির ঘরের মাঝখানে, যে ঘর পরে কাকার ঘর হয়ে ওঠে, খড়ি রাখা হয় বৈঠকঘরের পাশে ঘুমটি ঘরের মত লাল একটি ঘরে – সব ফেলে আমরা, আমি, দাদা, ছোটদা, বাবা, মা, ইয়াসমিন উঠি এসে আমলাপাড়ায় বিশাল বাড়িতে। বাড়িতে বোতাম টিপলে বাতি জ্বলে, পাখা ঘোরে। বড় বড় ঘর, মস্ত মস্ত থাম বসানো বারান্দা। যেন রাজার বাড়ি এটি, রাজা নেই উজির নাজির নেই, বাড়ি খালি পেয়ে উঠে এসেছি। বাড়ির লাল নীল হলুদ বেগুনি কাচ লাগানো জানালাগুলো আমার চেয়ে মাথায় লম্বা। আটত্রিশটি সিঁড়ি নেমে গেছে ঘর থেকে উঠোনে। মন্দিরের দেয়ালে যেরকম খোপ থাকে, সে রকম খোপে ভরা ঘরের দেয়াল। খোপগুলো পরে বুজে ফেলেছিলেন বাবা, সিঁড়িগুলো ভেঙেও টানা ইস্কুলঘরের মত বারান্দা বানিয়ে ফেলেছিলেন। এম এ কাহহার নামে পাড়ার এক বিত্তবানের বাড়িতে বাবা দেখেছেন খোপহীন দেয়াল, টানা বারান্দা – আমি অনুমান করি, বাবা এ বাড়িটিকেও সেরকম আদল দিতে কিছু টেনেছেন, কিছু বুজেছেন। বড়লোক দেখলে, বাবাকে দেখেছি, একেবারে মিইয়ে যান। যেন বড়লোকের সব ভাল, তাদের বেঢপ বারান্দাও। তবু বাবা কখন কি করবেন কেউ জানে না, হঠাৎ হয়ত একদিন ট্রাক ভরে বালু এল বাড়িতে, সিমেন্ট এল, ইট এল – দেখে ধারণা হয় সম্ভবত ভাঙা গড়া কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, না ঘটা অবদি কারও সাধ্য নেই বোঝার কী ঘটতে যাচ্ছে। বাবার ইচ্ছের কথা কার সাধ্য আছে বোঝে! আমাদের বাড়িটিই পাড়ার আর সব বাড়ি থেকে উঁচু, হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারি নীল আকাশ রকম উঁচু। বাড়িটিতে আসবাব পত্র ঢোকানোর আগের রাতে আমি আর ছোটদা এসে এক রাত থেকেছিলাম, ছোটদা তাঁর গিটারখানা নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে, অনেক রাত অবদি গিটার বাজালেন ছোটদা, আর আমি গিটারের হলুদ জামাটির ওপর শুয়ে *ছোটদা* বলে ডাকলে গমগম করে সাতবার *ছোটদা* শোনা যেত, তা শুনেছি যেন রাজার সাত ছেলে বাড়ির সাত দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে আছে আর আমাকে ভেঙচি কাটছে আমি যা বলি তাই বলে। আমি কোথায় বললে সাতটি *কোথায়, তুমি* বললে সাতটি *তুমি* ভেসে আসে কোত্থেকে যেন। বাড়িটির চারদিক জুড়ে নারকেল আর সুপুরি গাছ। উঠোনে তিরিশ রকম ফুল ফলের গাছ। এমন বড় বাড়ি, আমার বিশ্বাস হয় না, আমাদের। নতুন বাড়িতে আসার পর পর পর কিছু ঘটনা ঘটে, এক নম্বর জানলার শিক ভেঙে বাড়িতে চোর ঢুকে গয়নাগাটি টাকা পয়সা নিয়ে যায়। দু'নম্বর বাবাকে একদিন রিক্সায় সঙ্গে রাজিয়া বেগম, অলকা হলের সামনে দিয়ে যেতে দেখেন মা। তিন নম্বর দাদা আর তাঁর বন্ধুরা *পাতা* নামে একটি পত্রিকা বের করেন, কবিতা গল্প ধাঁধা নিয়ে পাঁচমিশেলি পত্রিকা। সেই *পাতা* পত্রিকায় *রামধনু* নামে একটি

কবিতা লিখে আমার নামে ছেপে দেন দাদা। কবিতার রচয়িতার নাম *নাসরিন জাহান তসলিমা,* যদিও বিদ্যাময়ী ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় ইস্কুলের খাতায় ঝুনুখালা খানিকটা ছোট করে আমার নাম *তসলিমা নাসরিন* লিখেছিলেন।

দাদা বললেন –*সামনের সংখ্যায় তর নামে আরেকটা কবিতা ছাপাইয়াম।*

মহানন্দে বলি – *তাইলে আমি নিজে লিখবাম আমার কবিতা!*

দাদা ফ্যাক করে হেসে ফেলেন – *যা যা। তুই আবার লেখতে পারস নাকি!*

মুহূর্তে বিষাদ আমাকে ছেয়ে ফেলে। ফ্রকের কোঁচড় ভরে জাম কুড়িয়ে দৌড়ে চলে যাই ছাদে। জামের রস লেগে বেগুনি হয়ে থাকে ফ্রক। আমার মন পড়ে থাকে কবিতায়।

এর পর থেকে দাদা বাড়ি না থাকলে তাঁর পড়ার টেবিলের ড্রয়ার খুলে কবিতার খাতা বের করে গোগ্রাসে পড়ি। আহা, এরকম আমিও যদি লিখতে পারতাম!

নতুন বাড়িতে আসার পর বাবা দেড় মণ ওজনের একটি গানের যন্ত্র কিনে আনলেন জার্মানি থেকে আসা এক লোকের কাছ থেকে। বন্ধুদের ডেকে এনে যন্ত্রটি দেখাতে লাগলেন দাদা আর বলতে লাগলেন *মেইড ইন জার্মানি।* হিটলারের বীরত্বে দাদা সবসময়ই বড় অভিভূত। হিটলারের দেশ থেকে আসা জিনিস নিয়েও। বন্ধুরা দু'চোখ ভরে যন্ত্র দেখে যায়। তারা এ যাবৎ হিজ মাস্টারস ভয়েজের কলের গানই দেখেছে, এমন যন্ত্র দেখেনি, বড় বড় ডিস্কে ফিতে লাগানো, একটির ফিতে আরেকটিতে ঘুরে ঘুরে জমা হয়। দেখে যাওয়ার পর পর নারায়ণ সান্যাল তার একক নাটিকা, পিন্টু তার গিটারের বাজনা, মাহবুব তার গলা ছেড়ে গাওয়া নজরুল গীতি ফিতেবন্দি করতে আসে। সবকিছুই আমাকে দেখতে হয় দরজার পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে, কাছে যাওয়ার কোনও অনুমতি আমি পাইনি। দাদা ভরাট গলায় নিজের আবৃত্তি করা রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের কবিতাও ফিতেবন্দি করেন। দাদার রাতারাতি নাম হয়ে যায় শহরে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখার্জি, মান্না দের গান বাজে, দাদা আর ছোটদা দিনের বেশির ভাগ সময় বাদন যন্ত্রটির ওপর ঝুঁকে থাকেন। বড় ইচ্ছে করে ছুঁয়ে দেখতে। দাদা বলেন – *কিছু ধরবি না। দূরে দাঁড়াইয়া দেখবি।*

দাদা বাড়ি না থাকলে আমি সে যন্ত্রও ছুঁয়ে দেখি। ইয়াসমিন ছুঁতে চাইলে বলি –*দূরে দাঁড়াইয়া দেখ। কিছু ধরবি না।* ও দূরে দাঁড়িয়ে দেখে। আমি যন্ত্রের দু'তিনটে বোতাম টিপলেই গান বাজতে শুরু করে। পায়ের ওপর পা তুলে শুয়ে শুয়ে গান শুনি। আমার বড় দাদা হতে ইচ্ছে করে।

বাড়িতে চুরি হওয়ার কারণে এরকম নিয়ম দাঁড়ায় জানালা দরজা সব বন্ধ রাখতে হবে। সে গরমে গা সেদ্ধ হলেও জানালা খুলে হাওয়া খাওয়া চলবে না। ভাঙা জানালায় বাবা আরও তিনটে করে শিক লাগিয়ে দিলেন, জেলখানার শিকের মত, লম্বা আর পাথারি। ঘরগুলো অন্ধকার হয়ে রইল। দিনের বেলাতেও আলো জ্বেলে লেখাপড়া খাওয়াদাওয়া করতে হয়। স্যাঁতসেঁতে ঘরে নিজেদের ইদুঁরের মত মনে হতে থাকে।

রাজিয়া বেগমের সঙ্গে বাবাকে রিক্সায় দেখার পর থেকে মা শয্যা নিয়েছেন। রাঁধাবাড়া, নাওয়া খাওয়া ছেড়ে, শুকনো মুখে সারাদিন শুয়ে থাকেন। বাবার ঘর থেকে

নিজের কাপড় চোপড় বিছানা বালিশ সরিয়ে অন্য ঘরে ঢুকেছেন। মা'কে দেখলে যে কেউ মনে করবে কঠিন এক ব্যারাম হয়েছে মা'র। চুলে তেল পড়ে না, চিরুনি পড়ে না। ঘামাচিতে গা ভরে গেছে, ঘামে শরীরের কাপড় লেপ্টে থাকে শরীরে। সারাদিন রা শব্দ নেই., বাবার বাড়ি ফেরার শব্দ শুনলে কেবল ছুটে এসে চিকন গলায় বিলাপ শুরু করেন –*ওই তো, বেটির সাথে সারাদিন কাটাইয়া আইলা। বুঝি, এত বড় বাড়ি কিনছ, ওই বেটিরে বিয়া কইরা এই বাড়িতে তুলবা বইলা।* মা'র বিলাপের কোনও জবাব কখনও দেন না বাবা। যেন কারও কোনও কথা তাঁর কানে ঢুকছে না। যেন কেউ তাঁকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলছে না। যেন যে শব্দগুলো ভাসছে ঘরে, সেটি কিছুই না, বেড়ালের মিঁয়াও মিঁয়াও বা চুলোয় খড়ি পোড়ার শব্দ। মা যে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, অনর্গল চেচিয়ে যাচ্ছেন, বাবা তাঁর উপস্থিতি বা স্বর যেন টের পাচ্ছেন না এমন ঢঙে হাঁটাহাঁটি করেন উঠোনে ঘরে, বাচ্চাদের চাকরবাকরদের কুকুরবেড়ালের খবরটবর নেন, নানির বাড়ির পেছনের বস্তি থেকে নিয়ে আসা নতুন কাজের মেয়ে মণিকে ডাকেন ভাত দিতে, ভাত খেয়ে ঢেকুর তুলে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সর্ষের তেল মাখা চুল আঁচড়ে চলে যান বাইরে। মা পেছনে দাঁড়িয়ে বাবার গুষ্ঠি তুলে গাল পাড়েন – *আমার বাবা ডাক্তারি পড়াইছে বইলা ডাক্তার হইছস, নাইলে তো চাষার ছেড়া চাষাই থাকতি। টেকার লুভে বিয়া করছিলি আমারে, এহন নিজের টেকা হইছে, আমারে ফালাইয়া আরেক বেডার বউ লইয়া রঙতামাশা করস। আল্লায় তরে ধ্বংস করব, তর এই বাবুগিরি থাকব না, দেমাগ কই যাইব! আমি তরে অভিশাপ দিতাছি, আমার বাপের নিমক যদি খাইয়া থাকস, তাইলে আমারে যন্ত্রণা দেওনের বিচার আল্লায় করব। তর চৌদ্দ গুষ্ঠি মরব কুষ্ঠ হইয়া।*

মা'র ধারণা বাবা আজ রাতে বা কাল সকালে রাজিয়া বেগমকে বিয়ে করে ঘরে তুলবেন। রাগে ফাটা মা'র সামনে কেউ দাঁড়াবার সাহস করে না। আমার মুখ ফসকে একদিন বেরিয়ে যায় –*এত চিল্লাও ক্যা? এই ডা তো আর আকুয়া পাড়া না।*

মা ঝড়ের মত উড়ে এসে আমার চুল ধরে এমন হেঁচকা টান দেন যে আমি চেয়ারে বসা ছিলাম সেটি উল্টে পড়ল পেছন দিকে, আর আমি গিয়ে ঠেকলাম দেয়ালে, মা আমাকে লাটিমের মত ঘোরালেন। দু'গালে কষে থাপ্পড় দিয়ে কর্কশ গলায় বলেন – *হারামির বাচ্চা কস কি তুই! বাপে কুনওদিন ফিইরা চাইছে তগোর দিকে! বাপের পক্ষ লস! তা তো লইবিই! এক রক্ত তো! বদমাইশের রক্ত। রাক্ষুসি মাগি, তুই আমারে জন্ম থেইকা জ্বালাইতাছস! তই জন্মাইবার পর থেইকাই আমার কপাল পুড়ছে। তরে যে কেল্লিগা আমি ছডিঘরে নুন খাওয়াইয়া মাইরা ফেললাম না!*

মা আক্ষেপ করেন আমাকে কেন লবণ খাইয়ে আঁতুড় ঘরেই মারেননি। আমার চোখ ভিজে যায় জলে। মা ফিরেও তাকান না আমার চোখের জলের দিকে।

মা'র ভাষা দিন দিন অশ্লীল হতে থাকে, দিন দিন মা'র গায়ে ঘামাচি বাড়তে থাকে, চোখের নিচে কালি পড়তে থাকে। কেবল বাবাকে নয়, বাড়িসুদ্ধ সবাইকে সকাল সন্ধে গালাগাল করেন। ছেলেমেয়েরাও নাকি তাঁর জন্মের শত্তুর। চাকরবাকররা দুধ কলা দিয়ে পোষা কালসাপ। মণি যা ভাত তরকারি দিয়ে যায় মা'র ঘরে তা থালসুদ্ধ ছুঁড়ে মারেন উঠোনে আশংকা ক'রে যে ষড়যন্ত্র করে কেউ তাঁকে বিষ খাওয়াতে চাচ্ছে। নানির বাড়ি

থেকে মামা খালারা এলে মা তাঁদের ঘরে বসিয়ে বাবা আর রাজিয়া বেগমকে কেমন গায়ে গা লাগিয়ে রিক্সায় বসা দেখেছেন বর্ণনা করেন আর বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদেন। মা'র স্বপ্ন ছিল নতুন বাড়িতে নতুন করে সংসার সাজিয়ে তিনি নতুন জীবন শুরু করবেন।

এরকমই দিন যাচ্ছিল, আমাদেরও অনেকটা গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল *সাত চড়ে রা নেই বাবার* দিকে মা একটির পর একটি ছুঁড়ে দেবেন যা ইচ্ছে তাই। কফ থুথু গু মুত। আমরা যে যার পড়ার টেবিলে মুখ গুঁজে বসে থেকে ভান করব যে কিছুই দেখছি না বা শুনছি না। আমি সাধারণত সেসময় জটিল অঙ্ক কষতে বসি, অঙ্ক কষার এই এক সুবিধে, মার্জিনে কাটাকুটি করার স্বাধীনতা জোটে, তাই করি আমি, যে কেউ দেখলে ভাববে অঙ্ক আমাকে বিষম দাবড়াচ্ছে। কিন্তু আমি যে জটিলতার অনেক বাইরে মনে মনে মেঘলা কোনও দুপুরে, কোনও এক ধুধু মাঠের কিনারে এক শান্ত পুকুরের ধারে বসে গাঙচিলের ওড়াওড়ি দেখি, তার ছবি আঁকি আর কারও পায়ের শব্দ পেলেই তা কেটে দিই অঙ্কের কাটাকুটির মত তা আমি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। বাবা না, মা না। এরকমই একসময়, মা যখন বাবা বাড়ি ফিরতেই বললেন *দুষমনডা আইছে, বেডির সাথে যা কাম করনের তা কইরা আইছে। মাগিবাজ কুথাকার! চরিত্রহীন!* বাবা, তখনও হাত মুখ ধোননি, শার্ট প্যান্ট খুলে লুঙ্গি পরেননি, টাই ঢিলে হয়ে আছে, ধেয়ে গেলেন মা'র ঘরের দিকে বলতে বলতে *পাইছস কি বেডি, আমার বাড়িতে থাকস, আমার খাস, অত জ্বালাস কেন আমারে, পাইছস কি!* বাবার হুংকার শুনে আমি রুদ্ধশ্বাস বসে থাকি। মার্জিনে কাটাকুটি করার কলমটি কাঁপে, কলম ধরা আঙুলগুলোও। মা'র *ও বাবাগো* চিৎকার শুনে চেয়ার ছেড়ে উঠে মা'র ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বিভৎস এক কান্ড দেখি। দেখি বাঘের মত, বাঘ ঠিক কেমন করে লাফিয়ে মানুষের গায়ে কামড় দেয় তা নিজের চোখে কখনও না দেখেও আমার বিশ্বাস বাবা ঠিক বাঘের মতই মা'র গায়ে লাফিয়ে মা'র চুল টেনে এক ঝটকায় মাটিতে ফেলে লাথি কষাতে থাকেন বুকে পেটে। বাবার পায়ে বাটা কোম্পানির শক্ত জুতো, আগের চেয়ে আরও ঢিলে হয়ে আছে গলার টাইখানা। মা খাটের তলে সেঁধিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও পারেন না। আমার পেছনে দাদা এসে দাঁড়ান, ছোটদা, ইয়াসমিনও। আমরা, কয়েকটি ইঁদুর, নির্বাক দেখতে থাকি মা'র নাক মুখ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে, শুনতে থাকি মা'র চিৎকার *আমারে মাইরা ফেলল রে, আমারে বাঁচাও।* আমাদের কারও সাহস হয় না দু'পা সামনে এগোতে। মা গোঙরাতে থাকেন, মেঝে ভেসে যায় মা'র পেচ্ছাবে।

আরও কইবি এইসব, ক? তরে আইজ আমি মাইরাই ফালাইয়াম। বাবা বলতে থাকেন হাঁপাতে হাঁপাতে।

আর কইতাম না, পায়ে ধরি আমারে ছাইড়া দেইন। মা কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করেন পেচ্ছাবের ওপর আধন্যাংটো বসে।

কয়েকটি ইঁদুরকে দূর দূর তাড়িয়ে বাবা চলে যান নিজের ঘরে, গটগট করে জুতো ফেলতে ফেলতে মেঝেয়। মা সারারাত মেঝেয় শুয়ে কাঁদেন। আমার ইচ্ছে করে মা'র কাছে বসে পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে যে *মা আর কাইন্দ না, দেইখ এর শোধ আমি একদিন তুলাম,.* আমার সাহস হয় না। অর্ধেক রাত অবদি অঙ্কের খাতার ওপর ঝুঁকে থেকে রাতে না খেয়ে শুয়ে পড়ি। শুয়ে শুয়ে ঘুমহীন চোখে স্বপ্ন দেখতে থাকি এ বাড়ি

থেকে জন্মের মত চলে যাচ্ছি অন্য কোথাও। দূরে কোথাও, কোনও এক অমল ধবল জীবনে।

এই ঘটনার পর হাশেম মামা রাস্তায় বাবাকে পিটিয়ে আধমরা বানিয়ে বাড়ি এনে বালুর বস্তার মত ছুঁড়ে দিয়ে বলেন –*আমার বইনের গায়ে আরেকদিন হাত তুলছ কি তুমার লাশ কুত্তা দিয়া খাওয়াইয়াম।*

ইস্পাতের মত শক্ত মানুষকেও সাতদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছে। বাবার ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়েছে মণি। বাবা সাতদিন আমাকে সকাল দুপুর কাছে ডেকে ডেকে বলেছেন *লেখাপড়া কইরা বড় হও মা।*

শেষের দিন, যে দিনটি পার হলেই তিনি গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াবেন, সেদিন ছুটির দিন, আমাকে দুপুরবেলা কাছে ডেকে বললেন *তোতাপাখির মত মুখস্ত কইরা ফালাও সবগুলা বই। ক্লাসে ফার্স্ট হইতে হইব। যারা তুমার ক্লাসে ফার্স্ট হয়, তারা যা খায় তুমিও ত তাই খাও, তাইলে হইবা না কেন? তুমার মাথায় কি ওগোর চেয়ে ঘিলু কিছু বেশি? কও বেশি কি না!*

বাবার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে বলি– *না।*

যদিও আমার বরাবরই মনে হয়েছে ঘিলু খানিকটা কমই আমার মাথায় তবু বাবা যা শুনতে ইচ্ছে করেন তাই বলি। তা বলাই নিরাপদ কি না।

মা গো আমার মাথার চুলগুলায় হাত বুলাইয়া দেও তো মা। বাবা কোমল গলায় বলেন।

খাটের রেলিং ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বাবার মাথায় আঙুল ডুবিয়ে দিই। যেন আঙুলগুলো আমার আঙুল নয়। যেন আমি দাঁড়িয়ে আছি এ আসলে আমি নই, অন্য কেউ। উদাস তাকিয়ে থাকি খোলা দরজার ওপাশে রোদ পড়ে কলপারের চৌবাচ্চার জল ঝিকমিক করছে, সেই জলের দিকে। ইচ্ছে করে হাত পা ছুঁড়ে জলে সাঁতার কাটি। আড়াইফুটি চৌবাচ্চার জলে সাঁতরে কতদূরই বা যাওয়া যায়। ঘুরে ফিরে চৌবাচ্চাতেই, কলপাড়েই, রোদ মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকা পেয়ারা গাছের তলেই, এ বাড়িতেই, যে বাড়িতে বেচারা আমাকে মুখে খিল এঁটে কারও না কারও ফরমাশ খাটতে হয়। আঙুলগুলো বাবার চুলে বেড়ালে মারা ইঁদুরের মত খুঁড়িয়ে হাঁটে।

বাবা ডাকেন *মা, ও মা।*

আমাকে সাড়া দিতে হয় *জী* বলে।

মুরব্বীরা ডাকলে *জী* বলতে হয়, মা তাই শিখিয়েছেন। *জী* না বলে *হুঁ* বা *কী* বলে উত্তর করলে মা বলেন, নেহাত বেয়াদবি করা। আদব কায়দা আমি কম জানি বলে মা'র অবশ্য বদ্ধ ধারণা। ঈদের সকালে মুরব্বিদের পা ছুঁয়ে সালাম করতে হয় ছোটদের। সে আমার দ্বারা কিছুতে হয় না। মা ধাক্কা দিয়ে পাঠান যেন বাবার পা ছুঁই। আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি চৌকাঠে, তবু কারও, সে বাবা হোক মা হোক, পা ছুঁই না।

চুলগুলা জোরে টাইনা দেও। বাবা কাতর স্বরে বলেন।

বাবার মাথা ভরা ঘন কালো কোঁকড়া চুল। জোরে টানতে গিয়ে চুলের গোড়া থেকে আঙুলে উঠে আসে জমাট রক্ত। শুকিয়ে কালো বালির মত দেখতে। বাবা কি মরে যাবেন,

আমার ভয় হতে থাকে। কি হবে মানুষটি চিৎ হয়ে মরে পড়ে থাকলে এই বিছানায়! আমি চুল টানতে টানতে দেখব বাবা আর শ্বাস ফেলছেন না, শিয়রের পাশে দাঁড়িয়েই থাকব দিন পার হলে রাত, বাবা আর বলবেন না *অনেক হইছে মা, এইবার পড়তে বস গিয়া। লেখাপড়া কইরা মানুষের মত মানুষ হও।*

চৌবাচ্চা থেকে রোদ সরে পেয়ারা গাছের মগডালে ওঠে। বাবা এরমধ্যে নাক ডাকতে থাকেন। নাক ডাকা লোকের মাথায় হাত বুলোলেই কি না বুলোলেই কি, পা টিপে টিপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাই। দরজার বাইরে শরবতের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে আছেন মা। কেউ যেন শুনতে না পায় বলেন *যা তর বাবারে শরবতটা দিয়া আয়।*

বাবা ঘুমাইয়া পড়ছে। আমিও স্বর নামিয়ে বলি।

গ্লাসটি হাতে ধরিয়ে মা বলেন *তবু রাইখা আয়, ঘুম থেইকা উইঠা খাইবনে। লেবুর শরবত তর বাবার খুব পছন্দ।*

ফরমাশ খাটা মেয়ে আমি, বাবার বিছানার পাশের টেবিলে ঠান্ডা লেবুর শরবত রেখে আসি। মা'র পরনে লাল একটি ছাপা শাড়ি। হাতখোঁপা করা চুল ঢাকা ছাপা শাড়ির আঁচলে। দরজায় দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকা বাবার দিকে মায়া-চোখে তাকিয়ে থেকে মা দিব্যি ঘরে গা গলিয়ে খাটের কিনারে দাঁড়িয়ে বাবার মাথার চুলে হাত বুলোতে থাকেন।

এই সুযোগে আমি লাপাত্তা। ছাদে দাঁড়িয়ে পেয়ারা চিবোতে চিবোতে প্রফুল্লদের বাড়ির উঠোনে পাড়ার মেয়েদের গোল্লাছুট খেলা দেখি। এ বাড়ির মাঠে সম্ভব নয় খেলাধুলো, অন্তত বাবা যদ্দিন বাড়িতে লাগাতার আছেন। বাবা বাড়ি থাকলে তাঁর নাগালের ভেতর থাকতে হয় বাড়ির সবাইকে। হাতের পেয়ারা তখনও শেষ কামড় পড়েনি, বাবার ডাক শুনি। দৌড়ে নিচে নেমে বাবার সামনে দাঁড়াই ফরমাশ পালন করতে। বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞেস করেন *শরবত কেডা দিছে?*

মা। আমি চোখ নামিয়ে উত্তর দিই।

ক্যান দিছে? শরবত কি আমি চাইছি? বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে আমার বেয়াদবির জন্য দু'গালে চড় কষাবেন এমন হাত নিশপিশ করা গা জ্বলা স্বরে বলেন।

আমি নিরুত্তর।

শরবত নিয়া উঠানে ফালাইয়া দে। বাবার নিরুত্তাপ কণ্ঠ।

নিঃশব্দে হুকুম পালন করি। পেয়ারা গাছের তলে গ্লাসখানা উপুড় করে ধরি।

কেউ যেন আমার ঘরে না আসে। বইলা দিস আমি কারও চেহারা দেখতে চাই না। কারও হাতের কিছু খাইতে চাই না। আমারে বিষ খাওয়াইয়া মারবার মতলব আমি বুঝি। কোনও শত্তুর যেন আমার বাড়িতে না থাকে।

আমি এবারও নিরুত্তর।

পরদিন ফজলিখালা বাড়ি এসে মা'র গায়ে হাত বুলিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেন —*দুনিয়াদারি ছাড় বড়বু। সিনেমা দেখা ছাড়। গুনাহর কাম আর কইর না। সংসারের মায়া ছাড়, স্বামী সন্তানের মায়া ছাড়, আল্লাহর পথে আস। এটাই শান্তির পথ।*

মা সেই থেকে শান্তি খুঁজতে সিনেমায় নয় আর, আল্লাহর পথে পা বাড়ালেন। আল্লাহর পথ হচ্ছে নওমহলের পথ, ফজলিখালার শ্বশুর বাড়ির পথ। শ্বশুরের নাম আমিরুল্লাহ। অবাঙালি মুসলমান। ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষক। ছেলেমেয়ে নিয়ে দেশ ভাগের পর ভারতের

মেদেনিপুর থেকে পূর্ববঙ্গে চলে এসে নওমহলের হাজিবাড়ি জঙ্গল সাফ করে একতলা একটি বাড়ি তুলে পাকাপাকি থাকতে শুরু করেছেন। প্রথম কিছুদিন কেরানিগিরি করেছেন পৌরসভার আপিসে। এরপর চাকরি ছেড়ে পাড়া পড়শিকে কোরান হাদিস পড়ে শোনান, পড়শিরা হাদিয়া তুলে দেন হাতে, ওরকমই ইঙ্গিত দেওয়া আছে যে আল্লাহ রসুলের কথা যিনি বলেন তাঁকে হাদিয়া দিলে আল্লাহ খুশি হন, বান্দার জন্য বেহেসত নসীব করেন। আমিরুল্লাহর সংসারে ফজলিখালার প্রবেশ অনেকটা উল্কা পতনের মত। ঘটক, আমিরুল্লাহর বিয়ের যোগ্য ছেলে মুসার জন্য কন্যা দেখতে এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে শেষে এঁদো গলির ভেতর খলসে মাছে ভরা পুকুর পাড়ে নানির বাড়ি পৌঁছে। এবাড়িই, উঠোনের লোহার চেয়ারে বসে ঘটক সিদ্ধান্ত নেয়, শেষ বাড়ি।

ঘটকের কাছে কন্যার রূপের বর্ণনা শুনে আমিরুল্লাহ মুসাকে বগলে নিয়ে হাতে এক হাড়ি রসগোল্লা নিয়ে পরদিনই হাজির নানির বাড়িতে। কী ব্যাপার, কাকে চাই? চাই ফজিলাতুননেসাকে। সে তো ইস্কুলে। বাড়ির লোকেরা টিনের ফুটোয় চোখ রেখে শাদা আলখাল্লা পরা ভিন ভাষায় কথা বলা অদ্ভুত মানুষদুটোকে দেখেন। ইস্কুল থেকে ফিরে ফজিলাতুননেসা দেখে ঘরের চেয়ারে বসা অচেনা দুই লোক তার পা থেকে মাথা অবদি গোগ্রাসে গিলছেন। কী কান্ড। কী কান্ড! ফজলিখালা দৌড়ে পগার পার। আমিরুল্লাহর চোখের তারা ফজলিখালাকে দেখে ঝলসে আছে তখনও। এমন সোনার বরণ মেয়ে তিনি আর দু'টি দেখেননি। নানার কাছে আমিরুল্লাহ হাত জোড় করে আবদার করেন —*আপনি যদি রাজি হন, আজই, এখনই শাদি হয়ে যাক, পরে অনুষ্ঠানাদি করে না হয় মেয়ে তুলে নেব।*

নানি শুনে আপত্তি করেন পর্দার আড়াল থেকে। ইশারা করেন নানাকে কাছে আসতে, ইশারা দেখেও চোখ ফিরিয়ে রাখেন নানা, জানেন পর্দার আড়ালে কি উত্তর অপেক্ষা করছে। নানি বেহিশেবি মানুষ নন, হুজুগে নাচেন না, *উঠ ছেড়ি তর বিয়া লাগছে* বলে মেয়েকে, ইস্কুল থেকে ফিরেছে সবে, জানে না কি হতে যাচ্ছে, ধরে বেঁধে কবুল বলাতে রাজি নন। নানির আপত্তির দিকে মোটে ফিরে না তাকিয়ে নানা *জী হা জী হা* বলে আমিরুল্লাহর কথায় মত দিয়ে বসলেন —*তা যখন কইছেন, বিয়া অখনই করাইবেন, আপনের কথায় না করতে পারি কি! আপনে হইলেন আলেম মানুষ।*

ফজলিখালাকে পাড়া খুঁজে বাড়ি এনে ঘাড় ধরে ভেতরের ঘরে একটি লাল শাড়িতে মুড়ে বসিয়ে দেওয়া হল। বড় মামা মন খারাপ করে বসেছিলেন সরতাআলু গাছের নিচে। নিজে তিনি ফজলিখালাকে পড়াতেন। আর বছর তিন পরেই মেট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হতে পারতেন ফজলিখালা। আর এমন সময় হুট করে *মাইয়া মানসের এত নেকাপড়া লাগব না* বলে নানা বাড়ির সবার মুখে খিল এঁটে বিয়ের ব্যবস্থা করছেন। খুশিতে বাগবাগ আমিরুল্লাহ সামনে রাখা চা বিস্কুট মুখে না তুলেই সূর করে সুরা গেয়ে ছ'শ টাকার কাবিনে দু'ঘরে দু'জনের মুখে কবুল শুনলেন। নানি অগত্যা বলেছিলেন — *কাবিনের টেকাটা বাড়াইতে কন।*

—*আরে রাখো, আলেম মানষের লগে দর কষাকষি ঠিক না।* নানা ধমকে থামিয়েছেন নানিকে।

ফজলিখালার বিয়েতে লোক নেমন্তন্ন করে পোলাও মাংস খাওয়ানো দিন কয়েক পরে ধুমধাম করেই হয়। পালকি চড়ে তিনি বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুর বাড়ি চলে যান, কাঁদতে কাঁদতে। বড় মামা গলা ছেড়ে কাঁদছিলেন। বড়মামাকেও যেদিন হুট করে বেড়াতে নিয়ে যেয়ে হালিমা নামের শাদা ধবধবে ধুমসি এক গেঁয়ো মেয়েকে দিয়ে বিয়ে করিয়ে এনেছিলেন নানা, ফজলিখালার বিয়ের বছর তিন পরে, নানি কেঁদেছিলেন গলা ছেড়ে। বড় মামা ছিলেন বাড়ির সবচেয়ে লেখাপড়া জানা ছেলে। ছেলে আরও লেখাপড়া করে জজ ব্যারিস্টার হবে, নানির ইচ্ছে ছিল। বড়মামাকে বিয়ে করিয়ে আচমকা বাড়ি ওঠার পর উঠোনের সরতা আলু গাছটি নানা এক কোপে কেটে ফেলেছিলেন, শাদা বউকে আবার জ্বিনে ভূতে না ধরে। আমার অবশ্য দেখা হয়নি এসব, ঘটেছে আমার জন্মের অনেক আগে।

ফজলিখালা ছিলেন *পাড়া বেড়াইন্যা* মেয়ে। সারাদিন টই টই করে ঘুরতেন পাড়ায় পাড়ায়। সেই মেয়েকে মেদেনিপুরি আমিরুল্লাহ হাতে তসবিহ ধরিয়েছেন, মাথায় ঘোমটা পরিয়েছেন। বাড়ির চারদিক জুড়ে দেয়াল তুলেছেন যেন বাইরের লোকের বাড়ির বউএর দিকে চোখ না পড়ে, শ্বশুর শাশুড়ি আর স্বামীর সেবা করলেই যে আল্লাহকে খুশি করা যায় তা তিনি কিতাব খুলে পড়ে পড়ে ছেলেবউকে শুনিয়েছেন। ছেলেবউ মাথা নেড়ে *জী আচ্ছা আব্বাজি* বলে সবই মেনে নিয়েছেন।

ওলিআল্লাহর বাড়ি, আল্লাহতায়ালা স্বয়ং হাজিরা দেন বাড়িতে তাঁর পেয়ারা বান্দার সঙ্গে *বাতচিত* করতে। বাড়ির গাছে গাছে জিনও থাকে। বাড়িটিতে ঢোকার পর থেকে ফজলিখালাকে প্রায়ই জিনে ধরেছে, জিন একদিন দু'দিন থাকে, কখনও সাতদিন, আমিরুল্লাহ নিজে যখন জিন ছাড়ান ফজলিখালা ধপাশ করে পড়েন মেঝেয়, জিনেরা এভাবেই মানুষের শরীর ছেড়ে বের হয়।

জিনে ধরলে ফজলিখালা মাথার ঘোমটা ফেলে দেন, বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যান একা একা বোরখা ছাড়া, রাস্তায় এর ওর সঙ্গে হেসে হেসে হাবিজাবি কথা বলেন, নওমহলের মোড়ে নিজের স্বামীকে দেখে ফজলিখালা নাকি একদিন বলেছিলেন *কি মুসা ভাই কই যাইন? বাদাম খাইবাইন।*

জিন ছাড়ানো এক বিষম ব্যাপার। ফজলিখালাকে রাস্তা থেকে সাড়াশির ধরে মত টেনে আনা হয় বাড়িতে। বাড়ির সবচেয়ে অন্ধকার ঘরে তাঁকে বন্দি করে আমিরুল্লাহ লাঠি হাতে ঢোকেন সে ঘরে। প্রথমে জিজ্ঞেস করেন — *কি কারণ তোমার এইসব করার?*

ফজলিখালা বলেন — *আমার কিছু ভালা লাগে না। আমার শহর সুদ্ধা ঘুইরা বেড়াইতে ইচ্ছা করে। আমার বাদাম খাইতে, পোড়াবাড়ির চমচম খাইতে ইচ্ছা করে। হি হি হি।*

আসলে ফজলিখালা তো আর কথা বলেন না, বলে শরাফত নামের জিন। তাঁর শরীরের মধ্যে শরাফত বসা, যা কিছু করছে ঘোমটা খুলে, বুকের কাপড় ফেলে সব শরাফতই। বিচ্ছিরি নাচ নাচছে, লাগামছাড়া কথা বলছে, সব শরাফত। ফজলিখালা তো আর এমন বেপর্দা বেশরম হতে পারেন না।

আমিরুল্লাহ নরম স্বরে বলেন —*শোন, তোমার তো আমরা কোনও ক্ষতি করিনি। তুমি কেন আমাদের এত ঝামেলা করছ বাপু। ছেড়ে যাওনা ছেলেবউকে। ছেলে বউ আমাদের*

কত সতীসাধ্বী। এমন আর কটা বউ হয়। এই বউকে তুমি আর জ্বালিও না বাপু। ছেড়ে যাও।

ফজলিখালা লাফিয়ে ওঠেন বিছানায়, নাচতে শুরু করেন গান গেয়ে — *আয় তবে সহচরি হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান।*

আমিরুল্লাহ চোখ নামিয়ে নেন ছেলেবউএর উদ্বাহু নৃত্য দেখে।

—তোমাকে কি করে বিদেয় করতে সে কিন্তু আমি জানি বাপু।

আমিরুল্লাহ কঠিন স্বরে বলেন।

শুনে লাফ দিয়ে নামেন বিছানা থেকে ফজলিখালা। শাড়ি তুলে পায়ের গোড়ালির ওপর নিজেকে লাটিমের মত ঘোরান। খিলখিল হেসে বলেন — *তুমি আমার কচু করবা।*

আমিরুল্লাহ মুখের পেশি কঠিন হতে থাকে।

— তুমি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

— হ্যাঁ তাই যামু। আমার যেমন ইচ্ছা করে তাই করুম। বাধা দিবি তো তোদেরে মাইরা ফালামু কইলাম। বটি দিয়া কুবাইয়া মারুম। আমারে চিনস নাই! ফজলিখালা হাত পা ছুড়তে ছুঁড়তে বলেন।

আমিরুল্লাহ এবার হাতের লাঠিটি শক্ত করে ধরেন। ছেলেবউ হাত পা ছোঁড়ে যেমন, তিনি লাঠিও ছোঁড়েন ছেলেবউএর পিঠে, ঘাড়ে, মাথায়। এমন মার কখনও খাননি ফজলিখালা, নানা তাঁকে এক চড় কষিয়েছিলেন পিঠে সন্ধেয় পড়তে বসে বইএর ওপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলেন বলে, পরদিনই তাঁকে মিষ্টির দোকানে নিয়ে পেট ভরে পোড়াবাড়ির চমচম খাইয়েছিলেন।

ফজলিখালার মনে হয় হাড়গোড় তাঁর সব ভেঙে যাচ্ছে। তিনি কাতর স্বরে বলতে থাকেন — *আর করুম না, ছাইড়া দেন আমারে।*

—ছেড়ে যাবি তো! আমিরুল্লাহ হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন।

—হ। ছাইড়া যামু। সত্যি কইলাম ছাইড়া যামু।

ফজলিখালা উপুড় হয়ে পড়েন শ্বশুরের পায়ে।

—নাম কি তোর?

—শরাফত।

—থাকিস কোথায়?

—নিম গাছে।

ফজলিখালার ক্লান্ত শরীর হেলে পড়ল মেঝেয়। চোখ অনেকক্ষণ তিনি খুললেন না। হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে বসলেন, সামনে শ্বশুরকে দেখে তড়িঘড়ি ঘোমটা মাথায় দিয়ে বললেন — *আব্বাজি আপনি এখানে? ঘর এত অন্ধকার কেন!*

ফজলিখালা উঠে সোজা কলতলায়, বলতে বলতে — *আব্বাজির অযুর পানি তো এখনও দেওয়া হয়নি, বেলা কম হল নাকি!* উঠোনে দাঁড়িয়ে আমিরুল্লাহ বউ ছেলে মেয়ে সবাই দেখল জিন ছেড়ে যাওয়ার পর ফজলিখালা কি করে আগের সেই ফজলিখালা হয়ে উঠলেন। সকলে হাঁফ ছাড়লেন।

শরাফত নামের জিনটি প্রায়ই আছড় করে ফজলিখালার ওপর। কিন্তু জিন ফিনের ঝামেলা না হলে তিনি বেশ আল্লাহভক্ত, শ্বশুর স্বামীর বড় বাধ্য। হি হি হি হাসেন না,

ঘোমটা খসে না মাথা থেকে। মাঝে মাঝে জিন তাড়ানোর কারণে পিঠে তাঁর কালশিরে দাগ পড়ে। ফর্সা সুডোল পিঠখানায় কালো দাগ, চাঁদের গায়ে কলঙ্ক।

ফজলিখালা মা'র গা থেকে হাত সরিয়ে চোখের জল ওড়নায় মুছতে মুছতে বলেন

—এটাই শান্তির পথ বড়বু, আব্বাজির মজলিশে আসো, আল্লাহ রসুলের কথা শোনো। আখেরাতে কাজ দেবে। দুনিয়াদারি আর কদিনের বল। এক পলকের।

মা দুনিয়াদারির মোহ দূর করতেই চান। বাবা যা ইচ্ছে তাই করে বেড়ালে মা'র যেন কিছু আসে না যায়, যেন আল্লাহর ধ্যানে মত্ত থেকে সব ভুলে যেতে পারেন। *আব্বাজি, বুঝলে বড়বু, তোমার জন্য আল্লাহর দরবারে বললেই তুমি কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাবে, পুলসেরাত পার হয়ে যাবে তরতর করে। হাশরের ময়দানে পাল্লাখানা ভারি হওয়া চাই তো! সংসারের জালে এত জড়িয়ে গেলে কি সম্বল নিয়ে ওইপারে যাবে?*

মা মাথা নাড়েন। ঠিক কথা। আখেরাতের সম্বল কিছুই নেই মা'র, মা'র তাই মনে হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজেও আজকাল গাফিলতি হয়। কোরান শরিফের ওপর ধুলো জমছে। তাক থেকে নামানো হয় না অনেকদিন। এ কালে সুখ হল না, পরকালেও যদি না হয়! আচমকা মা'র মনে ভয় ঢোকে।

ফজলিখালা মা'কে নছিহত করে পাঙ্গাস মাছের পেটি দিয়ে ভাত খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে কালো বোরখায় গা ঢেকে হাজিবাড়ি জঙ্গল সাফ করে বানানো শ্বশুরবাড়ি চলে যান। নওমহলে।

পরদিন থেকে বাড়িতে নাস্তার পাট চুকলেই মা বোরখা চাপান গায়ে।

কোথায়? নওমহল।

সপ্তাহ যায়। মাস যায়। মা কোথায় যাও? নওমহল।

ব্যস কারু মুখে রা নেই। আমরা চার ভাই বোন খাবার টেবিলে বা সোফায় বা বারান্দায় বসে থেকে দেখি মা আমাদের পেছন ফেলে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। নওমহলের নেশা চাপলে বাড়ির কারু সাধ্য নেই যে পথ আগলায় মা'র। এ নেশা আল্লাহর নেশা, *আফিমের চেয়েও কড়া।*

মাস গেলে পর মা'র মনে কী উদয় হয় কে জানে, বোরখার তলে আলুথালু শাড়ি, উড়োখুড়ো চুল, হঠাৎ মাঠে খেলতে নামা আমার বাহু ধরে হেঁচকা টেনে বলেন *চল।* বাড়ির বাইরে যে কোনও জায়গায় যাওয়ার সুযোগ হলেই আমার ফূর্তি লাগে। ফুরফুরে হাওয়ায় রিক্সায় চড়ে বেড়ানোর আনন্দ কী বাড়িতে বসে পাব আর! *ইস্কুল-ইউনিফর্মের* পাজামা, যেহেতু এর বাইরে আর কোনও পাজামা নেই আমার, তখনও হাফপ্যান্ট পরার বয়স যেহেতু, পাজামার ওপর লম্বা একটি জামা পরিয়ে, ইস্কুলের ভাঁজ করা শাদা ওড়না যেটিকে বেল্টের ভেতর ঢুকিয়ে পরতে হয় ভাঁজ খুলে সেটিতে মাথা আর বুক ঢেকে, যদিও তখনও ওড়নায় বুক ঢাকার বয়স হয়নি আমার, বুকে কিছু গজায়নি যেহেতু, আমাকে রিক্সায় ওঠান মা। নিজেকে কিম্ভুত লাগে দেখতে। তবু বাড়ির বাইরে বেরোনোর সুযোগ মা'কে অমান্য করে হাতছাড়া করি না। রিক্সায় বসে সিনেমার পোস্টার দেখতে দেখতে, দোকানের সাইনবোর্ড পড়তে পড়তে আর বিচিত্র সব মানুষ দেখতে দেখতে

নওমহলে পৌঁছই। এত শীর্ঘ গন্তব্যে পৌঁছতে মোটেও ইচ্ছে করে না। রিক্সা যদি দিন রাত ভরে এমন নিয়ে চলত আমাকে আরও দূরে কোথাও!

পীর আমিরুল্লাহর হাজিবাড়ির জঙ্গল সাফ করা বাড়ি আমি জানি না কবে হয়ে উঠেছে ছোটখাট এক শহর মত। বিস্তর এলাকা জুড়ে ছোট ছোট ঘর। সবচেয়ে উঁচু, দালানের, চুনকাম করা ঘরটি আমিরুল্লাহর। মা আমিরুল্লাহর মুরিদ হওয়ার পর থেকে তাঁকে *তালইসাব* ডাকা বাদ দিয়ে *হুজুর* ডাকেন, পীরসাব যে কোনও ব্যক্তি সম্পর্কের উর্ধে। এ বাড়িতে মা'র প্রথম কাজ আমিরুল্লাহকে কদমবুসি করা তিনি ঘুমিয়ে থাকুন কি খাবার খেতে থাকুন কি অযু করতে থাকুন। তাঁকে কদম বুসি করে কেবল মা'র নয় সকলেরই কাজ শুরু করতে হয়। উনুনে আগুন ধরানো, কি ফজরের নামাজে দাঁড়ানো, কি পেশাব পায়খানায় যাওয়া। যেহেতু আল্লাহতায়ালার *পেয়ারা বান্দা* আমিরুল্লাহ, শুধু কি পেয়ারা বান্দা, রীতিমত *আল্লাহর ওলি,* আল্লাহতায়ালা প্রায়ই দেখা দেন তাঁর ওলিদের, আমিরুল্লাহর সঙ্গেও প্রায়ই আল্লাহতায়ালার সাক্ষাৎ ঘটে। অবশ্য কখন ঠিক ঘটে কেউ জানে না। মা অনুমান করেন গভীর রাতে। মা'র ধারণা কথাবার্তা ওঁরা আরবিতেই বলেন। মা'র আরও ধারণা আল্লাহর নিজের *মাতৃভাষা* আরবি। ভাষাটি শিখলে, মা ভাবেন, তিনি নিজেও সম্ভবত আল্লাহর সঙ্গে পরকালে দু'একটি বাক্য বিনিময় করতে পারবেন। ভাষাটি শেখার ইচ্ছে খুব মা'র। মা জিভ বেরিয়ে আসা সারমেয়র মত তাকিয়ে থাকেন আরবি জানা লোকের দিকে। মা'র জিভ থেকে লালার মত বেরিয়ে আসতে থাকে বেহেসতের লোভ। মা'র দু'চোখের পাতা আবেশে নুয়ে আসে ভেবে যে গভীর রাতে স্বয়ং আল্লাহতায়ালার সঙ্গে কথা বলেন হুজুর। আমিরুল্লাহ তুষ্ট হলে মা'র মত পাপীর প্রতি আল্লাহতায়ালা সদয় হবেন হয়ত, গুনাহ তিনি কম করেননি, পাগলের মত যাত্রা সিনেমায় দৌড়েছেন। আল্লাহ কখনও ক্ষমা করবেন কি এই গুনাহগারকে! হুজুরকে কদমবুসি সেরে মা পীরের ঘরের মেঝেয় বসে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। সাফ করা নালার মত দু'চোখ মা'র, পথে না আটকে গড়িয়ে কেবল নামে। গাল বেয়ে, বুক বেয়ে, শাড়িতে, ব্লাউজে নামে। গোলাপি দুটো ফোলা ঠোঁট শুকিয়ে চড়চড় করে ফজলিখালার, তিনি মা'র কাঁধে হাত রেখে ঠান্ডা গলায় বলেন — *আল্লাহ কেন ক্ষমা করবেন না, তুমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। আল্লাহ ক্ষমাশীল! আল্লাহ মহান। তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেনই। আল্লাহর কাছে হাত ওঠালে আল্লাহ কখনও ফেরান না।*

আমিরুল্লাহকে তুষ্ট করতে কেবল মা নন, আরও যুবতী পায়ের ওপর খাড়া। বিকেলের চা নাস্তা সেরে আমিরুল্লাহ বিছানায় গা এলিয়ে দিলেই মা এবং আর সব যুবতী নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি বাঁধান কে হুজুরের বাহু নেবেন, কে পা নেবেন, কে মাথা। পায়ের প্রতি লোভ বেশি মা'র। ভাগে পা পড়লে মা'র মুখ তারাবাতির মত ঝলসে ওঠে, ঠোঁটের কোণে ঝুলে থাকে হাসি। পা মানে নোংরা, তোমার নোংরা জায়গায় যখন হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, তার মানে তোমার নোংরাও আমার কাছে পবিত্র। টেপাটেপির কাজ চলে দু'ঘন্টা। এরপর হুজুরের জন্য এক এক করে বাড়িয়ে দিতে থাকেন যুবতীরা কমলার রস, লেবুর শরবত, দুধের ক্ষীর। হুজুরের জন্য খাবার আসে ঝকঝকে রূপোর রেকাবি করে, রুই মাছের দোপিঁয়াজা, কচি মুরগির ঝোল, বাসমতি চালের ভাত, খেয়ে ঢেকুর তুললে তবক দেওয়া পান, হুজুরের আবার পানের বড় নেশা। মেঝেয় শীতল পাটিতে বসে পান

সেজে দেন ছেলে-বউ। একটি করে পান মুখে নেন হুজুর, ছ' সাত চিবোন দিয়ে ফক করে ফেলেন চিলমচিতে, পানের পিচকি ছিটকে পড়ে যুবতীদের গায়ে। গায়ে পড়া পিচকি জিভে চাটেন কেউ কেউ, বেশির ভাগই হুমড়ি খেয়ে পড়েন চিলমচির ওপর। কে আগে হুজুরের চিবোনো পান বা পানের রস পাবেন তাই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বেধে যায়। কাড়াকাড়ি দেখলে আমার কেমন ভয় ধরে যায়, মা'কে দেখেছি সিনেমার টিকিট কাটতে গিয়ে এরকম কাড়াকাড়ি চুলোচুলি বাঁধাতে। অলকা হলে মেয়েদের টিকিট কাটার কোঠায় মেয়েরা যখন চুলোচুলি শেষে হাতে টিকিট নিয়ে বেরিয়ে আসে, সারা শরীর ঘামে ভেজা, ব্লাউজের বোতাম ছেঁড়া, খোঁপা খুলে চুল হয়ে আছে *কেইচ্যা খাউড়ি পাগলির* চুলের মত কিন্তু মুখে তারাবাতির খুশি, হাতে শক্ত করে ধরা টিকিট। মা'দের এই পানের পিচকির জন্য কাড়াকাড়ি মনে হয় যেন বেহেসতের অমৃত নিয়ে কাড়াকাড়ি। মা'র তাই মনে হয়, এ যে সে মানুষের চিবোনো পান বা পিচকি নয়, এ সেই মানুষের মুখের পান, যে মানুষের সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহতায়ালা গভীর রাতে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেলে চুপি চুপি কথা বলেন, যে মানুষ চোখ বুজে গড়গড় করে বলে দিতে পারেন আল্লাহতায়ালার অসীম ক্ষমতার কথা, মহানুভবতার কথা, আল্লাহতায়ালা কখন কোথায় কি বলেছেন, কী ইঙ্গিত করেছেন কাকে — সব। এমন মানুষের মুখের পান খেলে বেহেসত নিশ্চিত না হয়ে যায় না। অবশ্য আমিরুল্লাহ পীরও তাই বলেছেন ইঙ্গিতে। চোখ ছোট করে বাচ্চাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে গেলে লোকে যেমন রহস্যের হাসি হেসে বলে, তেমন করে, যে– *টিকিট চাও বেহেসতের? তবে চোখ কান খোলা রাখো বান্দারা, কি করলে আল্লাহ খুশি হবেন, তা বুঝে নাও। তোমাদের আল্লাহ বুদ্ধি দিয়েছেন।*

মা চিলমচি থেকে তুলে আমিরুল্লাহর মুখের পান মুখে পোরেন। আমি বসা থাকি কাড়াকাড়ির ঠিক পেছনে, একা, ভীত, শরমে মাঝে মাঝে লাল হয় মুখ আমার। বেহেসতে মা'র পেছন পেছন মা'র আঁচল ধরে পৌঁছে যাওয়া যাবে এরকম একটি বিশ্বাস কাজ করে আমার ভেতর। ফজলিখালা বসা ছিলেন কাড়াকাড়ির ডানে। তিনি শুকনো চোখে তাকাচ্ছিলেন কাড়াকাড়ির দিকে, ভাগ চাচ্ছিলেন না চিবোনো রসের। চাইবেন কেন, তাঁর, মা'র ধারণা, টিকিট কেনাই আছে, শুয়ে বসে ইহকালের সময়টুকু পার করলেই চলে। তিনি তো আর যাত্রা সিনেমায় গিয়ে পাপ কামাই করেননি। ফজলিখালা কুরুক্ষেত্রে খানিকটা উবু হয়ে মা'র কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলেন – *মুখের পান কেন, আল্লাহর ওলির কফ থুতুও মাথায় নিলে সওয়াব হবে।*

কথাটি মনে গাঁথে মা'র।

কফ থুতুর ব্যাপারে যাওয়ার আগে মা একশ গোটার একটি তসবিহ হাতে দিয়ে আমাকে বসিয়ে দেন দক্ষিণের ঘরের মেঝেয়। কাগজে *ছাল্লাল্লাহু আলা মহাম্মাদ* লিখে দিয়ে যান যেটি গুণে গুণে পড়তে হবে পাঁচশ বার, পড়লে মা বলেন *সওয়াব হয়।* পীর বাড়িতে মা সওয়াব কামাতে আসেন, আমারও যেন আল্লাহর পথে এসে সওয়াব কামানো হয়, মা তাই গোল্লাছুটের মাঠ থেকে তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছেন এখানে। গোল্লাছুট থেকে ছুটে হাওয়ার রিক্সায় ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ হয়ত বেশি, কিন্তু একটি অদ্ভুত বাড়িতে যে বাড়িতে কারও খেলতে মানা, কারও উচ্চস্বরে কথা বলা মানা, যে বাড়িতে মাথার চুল

থেকে পায়ের নখ অবদি ঢাকা কাপড় একচুল সরা মানা, সে বাড়িতে তসবিহ হাতে নিয়ে বসে থাকার চেয়ে মুতের গন্ধঅলা পেশাবখানায় খামোকা বসে থাকাও ভাল।

সন্ধের মুখে হুজুর মজলিশ বসান। মা আমাকে দক্ষিণের ঘর থেকে সাঁড়াশির মত ধরে নিয়ে যান মজলিশ ঘরে। ওড়না মাথা থেকে খসে পড়লে কনুইয়ের গুঁতো মেরে মা আমাকে সতর্ক করেন। রিক্সায় তিনি আমাকে বলে বলে নিয়ে এসেছেন যেন হুজুরকে দেখামাত্র কদমবুসি করি, যেন মাথা থেকে আমার কাপড় না সরে। হুজুরকে কদমবুসিও আমি করিনি, মাথা থেকে কাপড়ও সরেছে। মজলিশ ঘরে মেয়েদের কাতারে মা আমাকে বসিয়ে নিজে বসেন আসন গেড়ে। পর্দার আড়ালে মেয়েদের বসার নিয়ম, পর্দার বাইরে ছেলের দল। ফাঁক দিয়ে দেখি বড় বড় কিতাব সামনে নিয়ে গদিতে বসে দু'তিনটে খোলা কিতাবের ওপর ঝুঁকে পড়ে আরবি বাক্য আওড়াচ্ছেন হুজুর, শুনে শ্রোতারা *আহা আহা* করে ওঠেন। চশমার কাচ মুছতে মুছতে হুজুর বলেন *যারা ঈমান না আনবে, ঈমান যাদের নেই, তাদের আল্লাহতায়ালা দোযখের আগুনে কি করে পুড়বেন, তা কি জানেন আপনারা? দোযখের ভয়ংকর আগুনে আপনারা পুড়বেন! সূর্য মাথার এক হাত ওপর নেমে এলে যেমন তাপ, সেরকম তাপের আগুন। আর সহস্র সাপ বিচ্ছু কামড়াবে আপনাদের! আপনাদের খেতে দেওয়া হবে ফুটোনো পানি আর পুঁজ। আল্লাহতায়ালা আপনাদের জিহবাকে টেনে আনবেন আপনাদের মাথার ওপর, কিলক দিয়ে আটকে দেবেন সেই জিহবা। আল্লাহ আপনাদের ছুঁড়ে ফেলবেন আগুনে। সেই আগুনে জ্বলবে আপনাদের শরীর, পুড়বে, কিন্তু আপনারা মরবেন না, আল্লাহ আপনাদের মারবেন না, বাঁচিয়ে রাখবেন শাস্তি পোহাতে। সাপ পেচিয়ে থাকবে আপনাদের শরীর, বিচ্ছু কামড়াবে। দুনিয়াদারির আরাম বেশিদিন নয় বান্দারা। শেষ জমানা শুরু হয়ে গেছে। দজ্জাল আসবে যে কোনও সময়। প্রস্তুত থাকুন। কেয়ামত এই আসছে আসছে। শিঙ্গা ইসরাফিলের মুখে। আল্লাহর আদেশ পেতে আর দেরি নেই।*

পর্দার আড়ালে কান্নার রোল ওঠে। ছেলেরা রুমালে চোখ মোছেন, কেউ কেউ হু হু করে কাঁধ ঝাকিয়ে কাঁদেন। কে জানে কার ঈমান আছে, কার নেই।

দুনিয়াদারি দিয়ে কিস্যু হবে না ভাইসব। আখেরাতের সম্বল করুন। আল্লাহর পথে আসুন। মহান পরওয়ারদিগারের ক্ষমা পেলে আপনারা কবরের আযাব থেকে বাঁচবেন, দোযখের যন্ত্রণা থেকে বাঁচবেন। দোযখের আগুন তো আর দুনিয়ার আগুন নয়, এ আগুনের চেয়ে সত্তরগুণ বেশি তার ধার।

আমি তসবিহ হাতে চুপচাপ বসে থাকি মা'র পেছনে। মা'র কান্না দেখে আমার মায়া হয়। মা'র শরীর ফুলে ফুলে ওঠে কান্নার দমকে। এত মানুষ আগুনের ভয়ে হাউমাউ করে কাঁদছে, আমার অবাক লাগে। এ ঠিক বাচ্চাদের ভয় দেখানোর মত, পেটানো হবে হুমকি দিলে অনেক বাচ্চাই তো ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠে। আমাকেও সম্ভবত আর সবার মত কাঁদা উচিত ভেবে আমি অপেক্ষা করতে থাকি চোখের জলের, চোখে আমার কিছুতেই জল আসে না। বরং দোযখে মানুষকে আল্লাহ যেভাবে আগুনে পোড়াবেন তার বর্ণনা শুনে আল্লাহকে বড় নিষ্ঠুর মনে হতে থাকে।

কবরের আযাব আর দোযখের দীর্ঘ বিভৎস বর্ণনার পর মোনাজাতের হাত তোলেন পীরসাব *হে আল্লাহ, তুমি তোমার বান্দাদের ক্ষমা করে দাও। তাদের সব পাপ তুমি ক্ষমা*

কর। তুমি তো ক্ষমাশীল, তুমি মহান, তুমি পরওয়ারদিগার। তোমার পাপী বান্দাদের ক্ষমা কর, তোমার দরবারে আমি ওদের হয়ে ভিক্ষে চাইছি আল্লাহ।

হুজুরের গলার স্বর চড়ায় উঠতে থাকে, আর বান্দাদের কান্নার শব্দও তাল মিলিয়ে ওপরে ওঠে। আমি জবুথবু বসে থাকি, চোখের তারা আমার এদিক ওদিক ঘোরে। পর্দার ভেতরে বাইরে। এ এক আজব জগত বটে।

বাবা খবর পেয়েছেন মা আজকাল নিয়মিত পীরবাড়ি যান। আমিরুল্লাহ পীরের মুরিদও হয়েছেন তিনি। বাড়িতে তিনি ঘোষণা করে দিলেন এ বাড়ির কারও আর পীরবাড়ি যাওয়া চলবে না, বাবার আদেশ কেউ যদি অমান্য করে এ বাড়িতে থাকা তার চলবে না। ঘোষণা শুনে মা তাচ্ছিল্য-গলায় বললেন – *আমার বাঁয় ঠ্যাঙ্গেরও ঠ্যাকা নাই এই কাফেরের বাড়িতে থাকনের। আল্লাহ খোদার নাম নাই। এই বাড়িত থাকলে আমার লাইগা বেহেসত হারাম হইয়া যাইব।*

মা পীরের মুরিদ হওয়ার পর বাড়িতে আর রাঁধেন বাড়েন না। সকালে বাজারের থলে এলে মণি মা'কে জিজ্ঞেস করতে আসে কি দিয়ে কি হবে, লাউ দিয়ে মাছ নাকি কুমড়ো দিয়ে মাংস, শাক হবে কি না, ডাল পাতলা হবে নাকি ঘন। মা বলে দেন – *তগোর যা খুশি রান।*

মণি দিশা পায় না। মা এরকম আগে কখনও করেননি। মণি আনাজপাতি কুটে দিত, মা নিজে হাতে রান্না করতেন। এখন পুরো রান্নাবান্নার ভার মণির একা সামলাতে হবে। ভাঁড়ার ঘরের চাবিটিও মা মণির হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। মশলাপাতি, আনাজপাতি, যা খুশি মণিই বার করবে, মণিই রাঁধবে। মণিই বুঝবে কি দিয়ে কি। হঠাৎ এত স্বাধীনতা পেয়ে মণির নিজেকে *বিবিসাব বিবিসাব* বলে মনে হয়।

নওমহলে পানের পিচকি- কফ থুতু - মজলিশ মোনাজাতের পাট চুকিয়ে বাড়ি ফিরে মা জায়নামাজেই বসে থাকেন বেশির ভাগ সময়। নামাজ শেষে তসবিহ গোণেন। তসবিহ গোণা শেষে কোরান পড়েন সুর করে, কোরান শেষে আবার নামাজ। ফজর জোহর আসর মাগরেব এশা তো আছেই, নফল নামাজও পড়েন। সংসারে মন নেই মা'র। ছেলেমেয়ে খেলো কি না খেলো তা নিয়ে ভাবার সময়ও নেই। ধীরে, যদিও এত ধীরে কথা মা কখনও বলেন না, গম্ভীর কণ্ঠে, যদিও কণ্ঠে গাম্ভীর্য কখনও ছিল না তাঁর, বলেন – *বাবারা, দুনিয়াদারির লেখাপড়ায় কোনও কাম হইব না। আখেরাতের সম্বল কর। নামাজ রোজা কর। তোমার বাপের মত কাফের হইও না। আল্লাহর নাম লও। আল্লাহই দয়াশীল, আল্লাহই তুমাদেরে ক্ষমা করবেন। কায়দা সিফারা পড়। কোরান শরিফ পড়। আমি তুমাদেরে কইতাছি, আল্লাহ আমারে দিয়া তুমাদেরে নছিহত করতাছেন। হেদায়েতের মালিক আল্লাহ। তিনি সব দেখেন, সব শুনেন। আল্লাহর হুকুম ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না।*

মা'র মুখ গরমে ঝরে পড়া শুকনো পাতার মত। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি আবার বলেন –*তুমার বাপে নামাজ পড়ে না। নামাজ যে না পড়ে সে কাফের। এই কাফেরের সংসারে আমি আছি তুমাদের লাইগা। কাফেররে রাইন্ধা বাইড়া খাওয়াইলে আমার গুনাহ হইব।*

তুমরা যদি আল্লাহর পথে না আসো, তাইলে আমি যেইদিকে দুইচোখ যায়, চইলা যাইয়াম। যাও মা, অযু কইরা আসো, নামাজ পড়বা।

মা আমাকে ইঙ্গিত করেন। আমার গা হিম হয়ে যায়। *অযু* করে মা'র সঙ্গে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে হাত দুটো খানিক বুকে রাখা, খানিক হাঁটুতে রাখা, খানিক নুয়ে থাকা, খানিক কপাল ঠেকানো মাটিতে — এর মত অস্বস্তির কাজ আর নেই। কিন্তু মা'র আদেশ, পালন করতেই হবে। *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর* তাঁর মাকে দেখতে দমোদর নদী সাঁতরে পার হয়েছিলেন।

বাবা বাড়ি ফিরে আমাকে জায়নামাজে বসে থাকতে দেখে হাঁক দেন – *নাসরিন, এদিকে আয়।*

জায়নামাজ থেকে এক লাফে বাবার ডাকে উঠে যাই। এ এক ধরনের মুক্তি বটে। বাবার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আমি অনুমান করি অন্তত নামাজ জাতীয় জরুরি ব্যাপার নিয়ে আমি যেহেতু মগ্ন ছিলাম, খেলাধুলো বা আড্ডা জাতীয় অজরুরি ব্যাপারে নয়, সুতরাং এ যাত্রা রেহাই আমি ঠিকই পাব। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি আচমকা ঘাড় ধরে উল্টোদিকে ধাক্কা দেন, ধাক্কাটি আমাকে পড়ার টেবিলের সামনে এনে থামায়। দাঁত কটমট করে বাবা বলেন – *লেখাপড়া ছাইড়া এইগুলা আবার কি শুরু করছস! মায়ের অষ্টকাডি হইছস। আল্লাহরে ডাকলে আল্লাহ ভাত দিব? নাকি নিজের ভাতের ব্যবস্থা নিজে করতে হইব। যা পড়তে ব। পড়ার টেবিল ছাইড়া উঠছস কি পিটাইয়া হাড় গুঁড়া কইরা ফালাব।*

মা ফোঁসেন জায়নামাজে বসে। মেয়ে নামাজ পড়ছে, আর একে ডেকে নিয়ে দুনিয়াদারির পড়ায় বসানো! মেয়েকেও নিজের মত কাফের বানানোর ইচ্ছে কি না!

হুজুর মা'কে বলেছেন মাথা ঠান্ডা রাখবে *হামিমা।* পীর বাড়িতে মা'র নতুন নাম দেওয়া হয়েছে, ঈদুল ওয়ারা বেগম পাল্টে হামিমা রহমান। যারাই যায়, বয়স যার যতই হোক, সবারই নাম বদল করেন পীরসাব। রেনুর নাম এখন *নাজিয়া,* হাসনার নাম *মুতাশ্লেমা,* রুবির নাম *মাদেহা।* হামিমা এখন পীরসাবের কথামত মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করেন। মা আর কতটুকুনই বা ঠান্ডা করতে পারেন মাথা! ঠান্ডারও তো একটা সীমা আছে। ছেলে মেয়েদের তো আর বাবা বিয়োননি, সে কাজটি মা করেছেন। ছেলে মেয়েদের ওপর তাঁর অধিকার যদি তিল পরিমাণ না থাকে তবে আর এ বাড়িতে থাকার তাঁর মানে কী!

বাবা কাপড় পাল্টে পেটের ওপর লুঙ্গির শক্ত গিঁট দিয়ে আমার পড়ার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে বলেন – *আমার কথামত না চললে বাড়ি থেইকা বার হইয়া যা। থাকস ক্যান? আমার খাস, আমার পরস, আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন কইরা এই বাড়িত থাকতে হইব। আর তা না হইলে যা, বাড়ি বাড়ি গিয়া ভিক্ষা কইরা খা। যাস না ক্যান। না করি নাই ত। কাফেরের বাড়িতে থাকবি না। চইলা যাইবি। যা।*

এসব কথা মা'কে উদ্দেশ্য করে বলছেন বাবা, সে স্পষ্ট বুঝি। নামাজ পড়া সে আমার ইচ্ছেয় ঘটেনি, নামাজ ছেড়ে উঠে আসা সেও আমার ইচ্ছেয় নয়। সুতরাং বাবা মা'র এ লড়াইয়ে আমার ভূমিকা নেহাতই তুচ্ছ অনুমান করে স্বস্তি বোধ করি। বাবা ঘর ছাড়লে মা এসে ঢোকেন ঘরে, বলেন – *তা চইলা ত যাইয়ামই। বাইন্ধা রাখতে পারবি*

আমারে তরা? ভাবছস আমার জায়গা নাই যাওয়ার। কাফেরের সাথে থাকনের চেয়ে বনে জঙ্গলে পশুর সাথে থাকা অনেক ভালা। যেদিন যাইয়াম সেইদিন বুঝবি। কাউরে ত জানাইয়া যাইতাম না। চুপ কইরা চইলা যাইয়াম। ছেলেমেয়েগুলারেও বানাইতাছে নিজের মত শয়তান। এগোর সাথে থাকলে জীবনে যা সওয়াব কামাইছি, সব যাইব আমার।

মা'র কথাগুলোও বাবাকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু বলাবলি সব এ ঘরে, আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁরা যেহেতু পরষ্পরের ছায়া মাড়ান না, গর্জন বর্ষণ সব আমার ঘরে এবং আমার ঘাড়ে।

মা তাঁর বাণী শেষ করে হঠাৎ আমার গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসানো চড় লাগিয়ে বলেন *নামাজ থইয়া উইঠা আইছস ক্যা? আল্লাহরে ডরাস না? অত সাহস তর কোত্থেকা অইছে? শয়তান সবসময় আল্লাহর ইবাদত থেইকা মানুষেরে সরাইয়া লয়। তুইও শয়তানের ডাকে সাড়া দিয়া নামাজ অর্ধেক ফালাইয়া উইঠ্যা পড়লি। দোযখের আগুনে পুড়বি দাউ দাউ কইরা, তখন কুনো বাপ তরে বাচাইতে পারব?*

চড় খেয়ে মাথা ঝিমঝিম করে আমার।

রাত পার হয়ে দিন হলে মা নতুন উদ্যমে শুরু করেন তাঁর নছিহত আমার ওপর, যেহেতু আমি জন্ম নিয়েছি এক পবিত্র দিনে। ইস্কুল থেকে ফিরলে মা ওত পেতে থাকেন, কখন খপ করে ধরে আমাকে কোরান পড়াতে বসাবেন। বিকেলে মাঠে এক ঝাঁক মেয়ে আসে গোল্লাছুট খেলতে, তাদের নিয়ে মাঠে যেই না আয়োজন করছি খেলার, মা ডাকেন। খেলা ফেলে আমাকে অযু করে কোরান শরিফ নিয়ে বসতে হয়। মাথায় ওড়না। পায়ে পাজামা। দল বসে থাকে আমার অপেক্ষায়, মাঠে। আর আমাকে তখন পড়তে হয় *আলহামদুলিল্লাহ হি রাব্বিল আল আমিন আর রাহমানির রাহিম...কুলহুআল্লাহু আহাদ আল্লাহুসসামাদ ..*

মা'কে বলি, গলায় অসন্তোষ – *কি পড়ি, এইগুলার মানে কিছু তো জানি না।*

মা ঠান্ডা গলায় বলেন – *মানে জানতে হইব না। আল্লাহর কিতাব পড়লেই সওয়াব হইব।*

কোরান পড়া থেকে মা এই মুক্তি দেবেন, এই আমি দৌড়ে মাঠে খেলতে যাব এরকম ভাবতে ভাবতে মা'র সঙ্গে সুর করে *কলব* থেকে মা যেভাবে বলেন সেভাবে কোরানের সুরাগুলো পড়ে ফেলতে ফেলতে আর ফাঁকে ফাঁকে জানালার বাইরে তাকাতে তাকাতেই দেখি হঠাৎ ঝুপ করে সন্ধে নেমে পড়েছে। মাঠে অপেক্ষা করা গোল্লাছুটের মেয়েরা যে যার বাড়ি ফিরে গেছে। গলার ভেতর জমে থাকে কষ্টের কফ। পড়া শেষে মা যেমন যেমন বলেন, কোরানের গায়ে চুমু দিয়ে রেহেল থেকে সরিয়ে তুলে রাখি আলমারির সবচেয়ে ওপরের তাকে। সকালে সুলতান ওস্তাদজি আসেন আরবি পড়াতে। তা নাকি যথেষ্ট নয়, বিকেলেও কোরান পড়া চাই। এমনিতে আরবির মাস্টার নিয়ে আমি যথেষ্ট অশান্তিতে ছিলাম। লোকটি জালালি কবুতরের গুয়ে শাদা হয়ে থাকা বারান্দায় বসে আমাকে *সিফারা* পড়ান। গুয়ের গন্ধে নাক কুঁচকে থাকলে *কী আল্লাহর কালাম পড়তে গেলে মুখটা এত ব্যাঙের মত কইরা রাখস ক্যা?* বলে মাথায় মোটা আঙুলের গিঁটে ঠং করে টোকা মারেন। *আলিফ লাম যবর আল, লাম খাড়া জবর লা, ইয়াও পেশ হু* – পড়তে গিয়ে *লাম ইয়াও পেশ লাহু* বলাতে দাড়িঅলা এক সকালে বারান্দার সিঁড়ির কাছ থেকে চমৎকার লাল

নীল হলুদ রঙের পাতাবাহার গাছের শক্ত ডাল ভেঙে এনে আমাকে দাঁত খিঁচে বললেন — *হাত পাত।* শিক্ষকের কথা মান্য করতে হয় বলে হাত পেতেছিলাম। সপাং সপাং মেরে হাত আমার লাল করে ছেড়েছিলেন সুলতান ওস্তাদজি। এখন বিকেলেও মা'র হাতের মার খেতে হবে, কোরান পড়তে গিয়ে ঝিমোলাম কি ভুল করলাম পড়ায়, মা কান মলে দেবেন, পিঠে দুমাদুম কিল দেবেন, গালে কষে থাপ্পড় লাগাবেন। আমার নাকি মন নেই পড়ায়, মা'র ধারণা। আমার মন *দুনিয়াদারির লেখাপড়ায়, খেলাধুলায়, নাচগানে।* আমার কপালে *দোযখ* লেখা, মা স্পষ্ট বলে দেন।

আমার খেলা মাটি করে সারা বিকেল কোরান পড়িয়ে মা বেশ ধীরে, গম্ভীর গলায় দাদাকে সামনে পেয়ে বলেন — *নোমান, তুই নামাজ শুরু করছ নাই?*

দাদা হেসে জবাব দেন — *হ মা। শুরু করাম।*

— *তরা যদি নামাজ রোজা না করস, তগোরে শেষ বারের মত জানাইয়া দিতাছি আমারে তরা পাইবি না। আমি যেদিকে খুশি চইলা যাইয়াম।*

হুমকি শুনে দাদা বারান্দার চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে একগাল হেসে বলেন — *বিশ্বাস করেন মা। কসম কাইটা কইতাছি নামাজ শুরু করাম। আপনে যাইয়েন না।*
আমি বারান্দায় এসে বড় শ্বাস নিই। খেলার মাঠখানা খাঁ খাঁ করে। মাঠ থেকে দমকা হাওয়া উড়ে এসে সোজা বুকের ভেতরে ঢুকে হু হু, হু হু করে।

সপ্তাহ গেলে মা আবার পাড়েন কথা — *তুই যে নামাজ শুরু করবি কইলি। কই!*

— *এই তো মা, শুক্রবার থেইকাই শুরু করাম।* দাদা গম্ভীর স্বরে বলেন।

শুক্রবার এলে দাদাকে বলেন মা — *যা মসজিদে যা, জুম্মা পইড়া আয়।*

দাদা ঘাড় চুলকে বলেন —*শইলডা ভাল লাগতাছে না। সামনের শুক্রবার থেইকা আল্লাহর নাম নিয়া যা থাকে কপালে শুরু করামই করাম।*

শুনে মা খুশি হন। বলেন — *কলমাগুলা শিখাইছিলাম মনে আছে?*

— *তা মনে থাকব না ক্যান? কি যে কন মা, কলমা মনে না থাকলে তো মুসলমানই না।*

মা খাবার টেবিলে দাদার পাতে মুরগির রান তুলে দেন। দাদা কলমা মুখস্ত রেখেছেন, সামনের শুক্রবার থেকে নামাজ ধরবেন।

সামনের শুক্রবারে দাদার উত্তর — *আল্লাহর হুকুম ছাড়া গাছের পাতা লড়ে না। আল্লাহ হও কইলে হয় সব। আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারও কিছু করার শক্তি নাই। আল্লাহর হুকুম ছাড়া আমি পড়ি কেমনে নামাজ! আল্লাহ আমারে দিয়া নামাজ পড়াইতাছেন না। আল্লাহ না শুরু করাইলে আমি কেমনে শুরু করি। আমার কি কোনও শক্তি আছে শুরু করার! আমি যদি কই আমার শক্তি আছে, তাইলে তো শেরক করা হইয়া গেল। লা শরিকা লাহু। আল্লাহর কোন শরিক নাই। আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়।* দাদা সুর করে মারফতি গান গেয়ে ওঠেন — *আল্লায় যেমনে নাচায় তেমনে নাচি, পুতুলের কি দোষ?*

দাদার ওপর হাল ছেড়ে দিয়ে আমাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে মা জিজ্ঞেস করেন

— *এই তুই নামাজ পড়ছস?*

— *বাবা কইছে আমারে ইস্কুলের পড়া পড়তে।*

আমি দৌড়ে যেতে যেতে পড়ার টেবিলের দিকে, বলি।

— *নাক টিপলে এহনো দুধ বাইড়ব, ত্যাড়া ত্যাড়া কথা কওয়া শিখছস। যেমন বাপ, তেমন তার পোলাপান। আল্লাহ খোদা মানে না। তগোরে দিয়া আল্লাহ ভাল কাম করাইবেন কেমনে, তগোর উপরে তো শয়তান ভর করছে। শয়তানে তগোরে আল্লাহর নাম লইতে দেয় না। ইবলিশের দোসর হইছস।*

মা হাউমাউ করে হঠাৎ কেঁদে উঠে বলেন — *এই বাড়িতে শয়তান ঢুকছে। সব কয়টা কাফের হইয়া গেছে। ছেলেমেয়েদের উপরে ভরসা আছিল আমার। এরা নষ্ট হইয়া গেছে। আল্লাহ তুমি আমারে এদের কাছ থেইকা দূরে সরাইয়া নেও।*

আল্লাহতায়ালা মা'র কথা রাখেন না। মা'কে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরান না। মা আমাদের দেয়াল ঘেরা বাড়িটিতে, ফুল ফলে ছাওয়া *অবকাশে* থেকেই যান। বাবার হুমকিও বিশেষ কাজে আসে না। মা নিয়মিত নওমহলে মিষ্টির দোকানের পেছনে আমিরুল্লাহর বাড়ি যেতে থাকেন। বৃহস্পতিবার রাতের মজলিশে হাদিস কোরানের ব্যাখ্যা শুনে কেঁদে কেটে চোখ ফুলিয়ে বাড়ি ফেরেন। মা'র বিশ্বাস কেয়ামতের আর বেশি দিন নেই, তড়িঘড়ি তাই আখেরাতের সম্বল করতে হবে। মা'র বিশ্বাস *পীর আমিরুল্লাহ* আল্লাহর কাছে তদবির করে মা'র জন্য একখানা বেহেস্তের টিকিট নেবেন। আমিরুল্লাহ ইঙ্গিতে মা'কে তাই বুঝিয়েছেন।

ছেলেমেয়েকে আল্লাহর পথে আনার হাল একরকম ছেড়ে দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন মা। ছেলেমেয়ে দুনিয়াদারির লেখাপড়া শিখেছে, শয়তান ওদের বে-নামাজি বানাচ্ছে। নিজের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবেন মা। আখেরাতের ময়দানে সবাই *ইয়া নবসি ইয়া নবসি* করবে। কারও দিকেও কারওর ফিরে তাকানোর সময় থাকবে না।

আল্লাহর পথে মা গেছেন ঠিকই, কিন্তু এ পথ প্রথম যেরকম মনে হয়েছিল, মোটে সস্তার পথ নয়। মা'কে আমিরুল্লাহ খানিকটা আভাস দিয়েছেন যে, মানুষকে বেহেস্তের পথ দেখিয়ে নিতে গেলে পথে নানান বাধা বিপত্তিতে পড়তে হয়, পথ সুগম করতে হলে *কড়ি* দরকার হয়। *কড়ি* ছাড়া নবীজিও পথ চলতে পারেননি। টাকাকড়ি যা ঢালা হয় *পথের* উদ্দেশে, তার একটি নাম আছে, *হাদিয়া।* মা'র জন্য হাদিয়া যোগাড় করা খানিকটা মুশকিলের। টুকরো সদাইপাতির জন্যও এখন আর টাকা পয়সা পড়ে না মা'র হাতে। যা কিছু কেনেন, বাবা নিজেই। এ বাড়িতে আসার পর মা'র অলকা সিনেমা হল যেমন, আমার ইস্কুল যেমন বাড়ির কাছে, বাবার তাজ ফার্মেসি, যেখানে বসে বিকেলে রোগী দেখেন সেটিও কাছে, প্রায় ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। আমপট্টি নয়ত দুর্গাবাড়ির বাজার থেকে বাবা নিজে হাতে সদাই কিনে বাড়ি আসেন। মা'র গলায় সোনার মালা গলাতেই ছিল বলে চোর হাতাতে পারেনি। মাতৃ জুয়েলার্স হাঁটা পথ বাড়ি থেকে, মা এক দুপুরে মালাটি বিক্রি করে টাকা দিয়ে আসেন পীরবাড়িতে, পীরের হাদিয়া। ভাঁড়ার ঘর থেকে চাল ডাল তেল সরিয়ে পীর বাড়িতে দিয়েও একরকম স্বস্তি হয় মা'র, যে, একেবারে খালি হাতে তিনি কোরান হাদিস শুনতে আসেন না।

বাবা হাতখরচ বন্ধ করে দেওয়ার পর রিক্সাভাড়াও আজকাল মা'র মেলে না। মা হেঁটে হলেও পীর বাড়িতে যান, পীর বাড়িতে যাওয়া তাঁর চাইই। আমার জ্বর হল কি,

দাদার পা ভাঙল কি ইয়াসমিন গাছ থেকে পড়ে মাথা ভাঙল, মা তাঁর যাত্রা বন্ধ করেন না। কেবল বৃহস্পতিবারের মজলিশে নয়, ইস্কুল থেকে ফিরে সোমবার, মঙ্গলবারেও দেখি মা নেই। মা কোথায়? পীরবাড়ি। মা আমাদের প্রতিদিনকার খুঁটিনাটি ঘটনায় দিন দিন অনুপস্থিত থাকেন। বাবার অস্থিরতা বাড়তে থাকে। দিনে তিনি দু'বেলা বাড়ি এসে খোঁজ নেন বাড়িঘর সংসার সব হাওয়ায় উবে গেছে নাকি আছে। বাবা ভাঁড়ার ঘরে তালা দেন, কালো ফটকেও, রাত ন'টার পর। এসব মা'কে আরও বেশি উন্মাদ করে তোলে। তিনি ভাবেন শয়তান তাঁকে প্রাণপণ বাধা দিচ্ছে আল্লাহর পথে, তিনি আরও পণ করে আল্লাহর ধ্যানে বসেন, আমিরুল্লাহ পীরের খেদমতে প্রাণমন উজাড় করে দেন। বাড়ির কালো ফটক বন্ধ পেয়ে তিনি ফিরে যেতে থাকেন পীর বাড়িতে। মা'র উপস্থিতি রাতেও কমতে থাকে।

সাত রাত মা'র অনুপস্থিতি সহ্য করার পর বাবা দাদাকে নওমহল পাঠান মা'কে নিয়ে আসতে। মহাসমারোহে ফেরত আসার পর বাড়িতে মা'র আদর বেড়ে যায়। তাঁকে ছাড়া এ বাড়ি অচল হয়ে পড়ছে, এ কথা তিনি অনুমানে বোঝেন। বাবাকে শুনিয়ে মা আমাদের বলেন — *তরা যদি নিয়মিত নামাজ পড়ছ, তাইলে তগোর সাথে আমি থাকবাম। নাইলে না। সোজা কথা।*

শুনে, সোফায় হেলান দিয়ে বাবা নরম গলায় বলেন — *নামাজ পড়। কোরান পড়। তুমারে কেউ বাধা দিছে? তুমার ওই পীরবাড়িতে যাইতে অয় ক্যান? পীরবাড়িতে যারা যায় না তারা কি বেহেসতে যাইব না? পোলাপানের লেখাপড়া আছে। তাদের দেখাশুনা কর না, পীরবাড়িতে রাইতদিন পইড়া থাক। নামাজ রোজা করতে হইলে সংসার ছেলেমেয়ে ফালাইয়া করতে হয় নাকি! এইসব বুদ্ধি তুমারে দেয় কে? যত্তসব ধান্দাবাজের কবলে পড়ছ!*

মা রুখে ওঠেন — *খবরদার ধান্দাবাজ কইবা না। আল্লাহর ওলিরে তুমি ধান্দাবাজ কও? এত বড় সাহস! তুমার জিববা খইসা পড়ব কইলাম। তুমার মত কাফেরের সাথে আমার কুনো সম্পর্ক নাই। আমার জীবন তুমি ছারখার কইরা দিছ। এই সময় যদি আমারে ফজলি আইসা আল্লাহর পথে না নিয়া যাইত, আমি ত সিনেমা হলে উল্টা সেন্ডেল পইরা দৌড়াইতাম। আমি অন্ধ আছিলাম, আল্লাহর পথে গিয়া এহন আমার চোখ খুলছে। এই মায়া মহব্বত সব মিথ্যা। এহন আমি বুঝি দুনিয়াদারিতে ডুবলে সব্বনাশ। আখেরাত আমারে পার করব কে? কেউ না। স্বামী সংসার ছেলে মেয়ে কেউ আপন না। এক আল্লাহই আপন।*

ফজলিখালা মা'কে বলেছেন — *বেনামাজির সাথে ঘর করলে তোমার গুনাহ হবে বড়বু। দুলাভাই নামাজ পড়েন না, যারা নামাজ পড়ে না, তারা কাফের। আর কাফেরের সাথে যারা ওঠাবসা করে, তাদেরও আল্লাহতায়ালা কাফেরের সঙ্গে দোযখের আগুনে পোড়াবেন।*

মা দোযখের আগুনে পুড়তে চান না। এই সংসারদাহে তিনি যথেষ্ট পুড়েছেন আর নয়। মা'র হাতে তসবিহর গোটা দ্রুত নড়তে থাকে। মা'র ঠোঁটও তালে তালে নড়ে, *সাল্লিআলা সাইয়াদেনা মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।* অন্ধকার ঘরে তসবিহর গোটাগুলো বেড়ালের চোখের মত জ্বলে। মা জেগে থাকেন সারারাত, সারারাত জায়নামাজে।

মধ্যরাতে মা'র কান্নার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। বালিশ থেকে মাথা তুলে বলি — *মা কান্দো ক্যান?*

মা উত্তর দেন না। কেঁদেই চলেন।

— *মা ঘুমাইবা না? বিছনাত আসো।* মা'কে বলি।

মা কান্না থামান না, ঘুমোতেও আসেন না।

ভোরে ফজরের নামাজ শেষ করে বিছানায় আসেন। সকালে মা'কে জিজ্ঞেস করি — *রাইতে কানতাছিলা কেন মা?*

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দেন — *কবরের আযাবের কথা ভাইবা কানতাছিলাম। ফেরেসতা যহন সাওয়াল জিগাস করব, কি উত্তর আমি দিব! কবরে দুইদিকের মাটি এমন চাপা দিব, এমন চাপা, যে*— মা'র কণ্ঠ বুজে আসে।

মা'কে বেঁধে রাখা যাবে না এ যেমন আমরাও বুঝেছি, বাবাও। তিনি আর কালো ফটক তালা দেওয়ার ঝুঁকি নিলেন না। ফটক খোলা থাক, মা যখন খুশি বাড়ি ফিরুন, তবু ফিরুন। আমার ধারণা, বাবা এই যে মা'র বাড়ি ফেরা চান, সে মা'র প্রতি ভালবাসায় নয়, মা যেন আমাদের গতিবিধি নজর রাখেন, কোনও দুর্ঘটনা যেন না ঘটে, সে কারণে। এর মধ্যে আমার আরবির মাস্টার, মা'র ছোটবেলার *সুলতান ওস্তাতজি,* মারা যাওয়ার খবর এলে বাবা বলে দিলেন *আর আরবি পড়তে হবে না, ইস্কুলের পড়ালেখা কর মন দিয়ে।*

মা'র চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে শুনে। তিনি আল্লাহর কাছে সেজদায় পড়ে কাঁদেন — *আমার ছেলেমেয়েদের তুমি ঈমানদার কর আল্লাহ। ওদেরে তুমি কবরের আযাব থেইকা মুক্তি দাও। ওদেরে তুমি দোযখের আগুন থেইকা বাঁচাও, বেহেসত নসীব কর। তুমি ক্ষমাশীল। তুমি দীন দুনিয়ার মালিক আল্লাহ। তুমি পরওয়ারদিগার।*

মা গাছের নারকেল, পেয়ারা, আম, জাম, কাঁঠাল বোরখার তলে করে নিয়ে যেতে থাকেন পীরবাড়ির লোকদের খাওয়াতে। পাকঘরে যাওয়া প্রায়ই ছেড়েই দিয়েছিলেন, নতুন করে আবার যাওয়া শুরু করেন, খোঁয়াড়ের কচি মুরগি ধরে জবাই করে নিজে হাতে তেলে মশলায় রেঁধে বাটি ভরে নিয়ে কালো ফটক পার হন নিঃশব্দে। পীরকে খেতে দেবেন। পুরোনো দু'চারটে শাড়িও নেন, ফজলিখালা কাঁথা বানানোর জন্য চেয়েছেন। হুজুর কথা দিয়েছেন মা'র কবরে এসে ফেরেসতা যখন *সাওয়াল* জিজ্ঞেস করবেন, সেই জবাবের উত্তর, হুজুর *নিজে* দেবেন। শিগরি তিনি *গাউছুল আজম* হচ্ছেন। গাউছুল আজমকে আল্লাহতায়ালা নিজের গোপন তথ্য জানান। স্বপ্নে এ সুসংবাদ হুজুর পেয়েছেন। মা'র বড় সাধ একবার আল্লাহর দেখা পেতে। তার মত পাপীকে আল্লাহ কি আর দেখা দেবেন! মা'র চোখে জল জমে। বোরখার তলে এক হাতে ধরে রাখেন মুরগির মাংস ভরা বাটি, আরেক হাতে চোখের জল মোছেন!

এক রাতে পীর বাড়ি থেকে ফিরে এসে বোরখা খুলতে খুলতে মা বিড়বিড় করেন বলেন — *হুমায়রা আল্লাহু লেহা একটা সোনার লকেট বানাইছে। তিন ভরি দিয়া ছয়টা চুরিও বানাইছে। আমারে কি কেউ দেয় কিছু? আমার মত নিঃস্ব ত আর কেউ নাই দুনিয়ায়।*

বোরখা খুলে মা চেঁচিয়ে মণিকে ডাকেন ভাত দিতে।

ভাত দেওয়ার পর *ঠান্ডা ভাত দেস কেন? গরম ভাত নাই! আমারে কি পাইছস তরা? আমি মইরা গেলে তগোর সবার শান্তি। আমি কি বুঝি না? কেডা আমারে কি দেয় এই সংসারে! কিচ্ছু না। ভালা একটা কাপড় নাই পিন্দনের। কেডা দেহে?* বলে মা থাল ঠেলে উঠে যান !

মণি ভাতের থালা নিয়ে পাকঘরে চলে যায় গরম করতে। মা আমার পড়ার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে বলেন যেন বাবা ঘরে বসেই শুনতে পান — *মাইনষে তাগোর বউরে সোনা দিয়া মুড়াইয়া রাখে। আর আমি কি পাই! এই বাড়িতে দারোয়ান গিরি করনের লাইগা আমারে রাখা হইছে। মানসে ত দারোয়ানরেও বেতন দেয়। আমি ত বেতন ছাড়া কাম করতাছি এই বাড়িত!*

মা'কে নিচু গলায় বলি — *তুমি ত মা। তুমি বেতন নিবা ক্যা?*

মা ধমকে থামান আমাকে — *আমার কি দিয়া চলে! আমারে দেয় কেডা? বাপে বিয়া দিছিল ডাক্তারএর সাথে, কত শখ আছিল আমার বাপের যে জামাইয়ে আমার ভাই বইনরে লেহাপড়া করাইব। কই, করাইছে কাউরে? কারও খোঁজ লয়? আমার হাত দুইডা আইজ কত দিন ধইরা খালি। মাইনষের বউগুলার শইলে কত গয়না। আমারে ফইরনির মত রাইখা আবার আবদারের সীমা নাই, ছেলেমেয়ে দেখ, ছেলেমেয়ে মানুষ কর!*

যখন আমার ছ'বছর বয়স, পীরবাড়ি থেকে খবর এনেছিলেন ফজলিখালা, দুনিয়াতে দজ্জাল বের হচ্ছে, দজ্জাল মস্ত এক রামদা নিয়ে মানুষের ঈমান পরীক্ষা করবে। যার ঈমান নেই, তাকে কুপিয়ে পাঁচ টুকরো করবে। দজ্জালের ভয়ে নানির বাড়িতে প্রায় সবাই তখন দিনে দু'বেলা কলমা পড়তে শুরু করল। দজ্জাল আজ আসে কাল আসে এরকম। দজ্জাল এসে আমাকে টুকরো করছে, এরকম স্বপ্ন দেখে প্রায়ই ঘুম ভেঙে যেত আমার। শরাফ মামা বললেন — *ছোটবুর বাড়িত সবার ঈমান আছে। দজ্জাল ওগোরে কিচ্ছু করতে পারব না।* মা'রও একই কথা — *ফজলির আর চিন্তা নাই। ওই বাড়ির সবারই ঈমান মজবুত।*

এক একটি দিন যায় আর শরাফ মামাকে, ফেলুমামাকে, মা'কে জিজ্ঞেস করি — *কই, দজ্জাল ত আইল না!*

মা বলেন — *যে কোনও সময় আইব। তালই সাব কইছে শুনলাম দজ্জাল আওনের পরই কেয়ামত অইব।*

— *কেয়ামত অইলে কী হইব মা?* মা'কে জিজ্ঞেস করলে

— *কী আর,* দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন — *ইসরাফিল শিঙ্গায় ফুঁ দিব। পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইব। আল্লাহর সৃষ্টি এই আসমান জমিন কিছুই আর থাকব না।*

পৃথিবী কি করে ধ্বংস হবে তা অনুমান করে নিয়েছিলাম। আকাশ এসে চাপ দেবে পৃথিবীর ওপর, বাড়ি ঘরগুলো সব চ্যাপ্টা হয়ে যাবে, মানুষ মরতে থাকবে পিঁপড়ের মত। বিশাল বিশাল কড়ুই গাছ, নিম গাছ, নারকেল গাছ, খেজুর গাছ সব মাটির তলায় ডেবে যাবে। দজ্জালের ঈমান পরীক্ষায় বাঁচলেও কেয়ামতে মরতেই হবে।

আমরা নানির বাড়ি ছাড়ার ঠিক আগে আগে, ফজলিখালা নতুন খবর নিয়ে আসেন সোনার গয়না পরা হারাম। শুনে বাড়ির মেয়েমানুষেরা যার যার সোনার গয়না খুলে

রাখল। হাশেম মামার বিয়ে হয়েছে সবে। নতুন বউ গা ভরা গয়না পরে বসে থাকেন। পাড়ার বউঝিরা এসে ঘোমটা সরিয়ে বউএর মুখ দেখে যায়।

– *পারুল, সোনার গয়না খুলে রাখ। শেষ জমানা চলে আসছে। এ সময় গয়না গাটি পরলে আল্লাহ গুনাহ দেবেন।* বলে ফজলিখালা নিজেই হাশেম মামার বউএর গা থেকে গয়না খুলে যেন মরা ইঁদুর হাতে নিচ্ছেন এমন করে গয়নার লেজ ধরে ফেলে রাখলেন দূরে।

হাশেম মামা বলেছিলেন – *ছোটবু, নতুন বউএর গা থেইকা গয়না গাটি খুলা নাকি অমঙ্গল জানতাম!*

ফজলিখালা চিকন গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন – *মঙ্গল অমঙ্গলের তুই কি বুঝস হাশেম!* পরশু *রাতে আব্বাজি নবীজিকে স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নের মধ্যেই নবীজি বলেছেন সোনার গয়না শরীরের যে অংশে পরা থাকবে, সে সব অংশ দোযখের আগুনের পুড়বে।*

নানি ফজলিখালাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন – *তর গয়নাগুলা কই রাখছস?*

ফজলিখালা তসবিহ জপতে জপতে বললেন – *গয়না দিয়ে কি হবে মা, ওগুলো হুমায়রার আব্বা বিক্রি করতে নিয়ে গেছে।*

নানির কপালে ভাঁজ পড়েছিল দুটো।

বছর গড়ালো, পীর বাড়িতে সোনার গয়না পরা *হালাল* হয়ে গেছে।

খোলা বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে মা'র দুঃখি মুখের দিকে তাকিয়ে বলি – *সোনার গয়না পরা ত হারাম! পীর বাড়ির সবাই না সোনার গয়না পরা ছাইড়া দিছিল!*

মা আমার উত্তর দেন না। এমন চোখ করে তাকান যেন সত্যি সত্যি শয়তান ভর করেছে আমার ওপর। আমি নই, যা কিছুই বলছি আমি, বলছে শয়তান।

এর কিছুদিন পর, মাতৃ জুয়েলার্স থেকে বাকিতে একজোড়া অনন্ত বালা নিয়ে আসেন মা। জুয়েলার্সের মালিক বাবার বন্ধু মানুষ। মা বলে আসেন বাবাই গয়নার দাম কিস্তিতে কিস্তিতে দিয়ে দেবেন।

ক.

মসজিদ থেকে শুক্রবার *জুম্মার নামাজ* পড়ে এলে পকেটে *বাতাসা* থাকত নানার। খেজুরের গুড় দিয়ে বানানো হলুদ চাকতি। জুম্মার পর মসজিদে বাতাসার দেওয়ার নিয়ম। পুকুর ঘাটের কাছে নানাকে দেখে বাড়ির ছোটরা, আমি ফেলু মামা, ছটকু ইয়াসমিন নানার কাছে দৌড়ে গিয়ে বাতাসা নিয়ে আসতাম। নানা বাড়ির ছোটদের প্রতি সদয় হলেও বড়দের প্রতি নন। আমাদের বাতাসা বিলিয়ে বাড়ি গিয়ে তিনি বড়দের হাড় মাংস *জ্বালাতেন।* জ্বালাতেন শব্দটিই নানি ব্যবহার করেন, যখন *এই লাডি লইয়া আয়, কেডা কেডা মসজিদে যাস নাই ক। পিডাইয়া শ্যাষ কইরা ফালাইয়াম*— বলে বাড়ি মাথায় তুলতেন নানা। ছেলেদের অন্তত জুম্মা পড়তে মসজিদে যেতে হবে, মেয়েদের যেহেতু মসজিদে যাওয়ার বিধান নেই, নামাজ পড়বে ঘরে। মেয়েরা ঘরের বাইরে যাক, ক্ষতি নেই, যেতে হবে বোরখা পরে। নানা জুম্মার দিন খানিকটা আলস্য করেন, এ তাঁর চিরকালের স্বভাব। মসজিদ থেকে বাড়ি ফিরে দুপুরের ভাতঘুমটি দেওয়ার আগে তাঁর হিশেব করা চাই কে কে ফাঁকি দিল, কোন ছেলে মসজিদে যায়নি এবং কোন মেয়ে বাড়িতে নেই, বাইরে সে মেয়ে বোরখা পরে গিয়েছে কি না। এত প্রশ্নে নানি অতিষ্ঠ হতেন। ঘুমিয়ে ওঠার পর নানা আবার ভাল মানুষ। লুঙ্গি কষে বেঁধে ডান হাত লুঙ্গির তলে রেখে বাঁ হাত নেড়ে নেড়ে যেন বাতাস সরাতে সরাতে, হেঁটে চলে যান নতুন বাজার। কে বাড়ি নেই, কে আছে, খোঁজ আর করেন না। বিকেলে রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলে সাত লোকের সঙ্গে কথা হবে, ওই আকর্ষণ নানাকে আর বাড়িতে রাখে না। এক নানি ছাড়া বাড়ির কোনও বয়স্ক মেয়ে স্বেচ্ছায় বোরখা পরেন না। রুনু খালা ঝুনু খালা বোরখা হাত ব্যাগে ভরে বাইরে বেরোন, পুকুরঘাট থেকে ছটকু বা কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন নানা বাড়ি আছেন কি না, নেই জানলে তো ঢুকে গেলেন বাড়ি, আর থাকলে পড়শি কারও বাড়িতে অপেক্ষা করেন, নানা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে খবর পাঠানো হয়, খালারা বাড়ি ঢোকেন; অপেক্ষা না সইলে ব্যাগের বোরখা গায়ে চাপিয়ে আসেন।

নানা এক বড়মামাকেই মাদ্রাসায় পড়িয়েছেন, বাকি ছেলেমেয়েদের ইস্কুল কলেজে। নানার কড়া আদেশ ছিল, অবশ্য কেবল ছেলেদের বেলায়, *বিদ্যা অমূল্য ধন, পড়ালেখায় যেন গাফিলতি না হয় কারও।* মেয়েদের বেলায় *মাইয়া মানষের অত নেকাপড়া করন লাগব না।* রুনু খালা বিএ অবদি পড়েছেন, নানা ক'দিন পরপরই তাঁর বিয়ের ঘর আনেন, রুনু খালা মুখে ধুলো কালি মেখে চুল উস্কোখুস্কো বানিয়ে ছেলে পক্ষের সামনে আসেন যেন কারও তাঁকে পছন্দ না হয়। সুলেখার মা প্রায়ই নানির খাটে বসে *শাদা পাতা* মুখে পুরে বলেন — *রুনুরে কি বাড়ির খুঁডি বানাইবাইন? বিয়া দেইন না কেন এহনও? ঈদুন আর ফজলির ত কি সুন্দর বিয়া হইয়া গেল।*

নানি পানের খিলি বানাতে বানাতে বলেন — *লেহাপড়া আরও করুক। নিজে চাকরি বাকরি করব। বিয়া পরে বইব নে। আইজকাইলকার যুগে মেয়েগোরেও টেকা কামাইতে অইব। জামাইয়ের উপরে নির্ভর থাহন ভালা না, কহন কি অয়, ঠিক আছে!*

ঝুনু খালা ফর্সা বলে তাঁর বিয়ের ঘর আসে বেশি। নানি কড়া গলায় বলে দেন — *মেয়ে আরও লেহাপড়া করব। এত তাড়াতাড়ি বিয়া কিয়ের! আর বড় বইনের বিয়া না হইলে ছুডু বইনের আবার বিয়া অয় কেমনে!*

বড় মামা মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষায় এম এ পড়ে ঢাকাতেই একটি চাকরি জুটিয়ে নিয়েছেন। শাদা বউটি তাঁর সঙ্গে থাকেন। আজও কোনও ছেলেপুলে হয়নি। লোকে বলে *শাদা হইলে কী হইব, বউ ত বাঁজা।* বউএর মাজায় বাঁধার জন্য পাড়ার লোকেরা অনেক তাবিজ কবজ নিয়ে এসে বড় মামাকে দেন। লোক চলে গেলে ওসব তিনি ছুঁড়ে ফেলে দেন কুয়োয়। বড় মামা ছুটিছাটায় বাড়ি আসেন, কখনও বউ নিয়ে, কখনও একাই। এ বাড়িতে এসে তিনি পায়ে খড়ম পরে যখন উঠোনে হাঁটেন, মনে হয় না যে কেবল ক' সপ্তাহের জন্য তিনি এসেছেন, মনে হয় হাজার বছর ধরে এখানেই ছিলেন তিনি।

হাশেম মামা ইস্কুল কামাই করে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াতেন। মেট্রিক পরীক্ষায় দু'তিনবার ফেল দিয়ে আর পড়ালেখা করেননি। ঝুনু খালাকে বড় মামা ঢাকায় নিয়ে ইডেন কলেজে ভর্তি করে দেবেন, এ রকম সিদ্ধান্ত। বাকিরা, ফকরুল, টুটু, শরাফ, ফেলু ইস্কুলের পড়ালেখাও যেমন আধাখেচড়া, নামাজ রোজাতেও। বন্ধু বাড়ছে, আড্ডা বাড়ছে। রাত করে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফেরেন, বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে টুটু মামা সিগারেট ধরেছেন। নানা সবকটিকে প্রায়ই থামে বেঁধে পেটান। গাধা পিটিয়ে *মানুষ* করার মত। মানুষ হওয়ার লক্ষণ তবু কারও মধ্যে নেই। পরীক্ষায় ভাল ফল করছেন না কেউ। বড় মামার সঙ্গে পরামর্শ করেন নানি, এদেরও এক এক করে ঢাকায় নিয়ে ইস্কুলে ভর্তি করে দিতে হবে, অন্তত *মানুষ* হবে।

ছেলেমেয়েরাও না আবার লেখাপড়া না করে বাউন্ডুলে হয়ে যায় এই দুশ্চিন্তায় নানির যখন চুল পাকতে বসেছে, নানা ঘোষণা করলেন তিনি হজ্বে যাবেন। *হজ্বে যাওয়ার টেকা পাইবেন কই?* নানি ক্ষেপে গেলেন! *টেকা আল্লাহই দিব!* নানার হেঁয়ালি উত্তর। টাকা শেষ অবদি আল্লাহ দেননি, দিয়েছিলেন বাবা। কথা, নানা হজ্ব থেকে ফিরে এসে সে টাকা শোধ করে দেবেন। বড় এক টিনের সুটকেসে কাপড় চোপড় মুড়িমুড়কি ভরে সুটকেসের গায়ে শাদা কালিতে *মোহাম্মদ মনিরুদ্দিন আহমেদ, ঠিকানা আকুয়া মাদ্রাসা কোয়ার্টার, ময়মনসিংহ* লিখিয়ে যে বছর নানা জাহাজে করে হজ্বে চলে গেলেন, সে বছরই নীল আর্মস্টং চাঁদে গেলেন। নানা হজ্বে, নীল আর্মস্টং চাঁদে।

চাঁদ নিয়ে বাড়ির সবারই আবেগ প্রচন্ড। বাচ্চা কোলে নিয়ে উঠোনে চাঁদনি রাতে মায়েরা গান করেন *আয় আয় চাঁদ মামা, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।*

চাঁদনি নামলে উঠোনে বসে কিচ্ছা শোনা চাই সবার। কানা মামুর কিচ্ছাই, বাড়ির লোকেরা বলে জমে খুব। রুনুখালা গান করেন *আজ জ্যোস্না রাতে সবাই গেছে বনে।* ঈদের আগে চাঁদ দেখার ধুম পড়ে, চাঁদ দেখতে পেলে নানি বলেন — *আসসালামু আলায়কুম।*

সেবারও বলেছেন, আর ঈদের ছুটিতে বাড়ি আসা বড় মামা নানিকে ফস করে বললেন — *মা, নীল আর্মস্ট্রং পেশাব কইরা আইছে চান্দে। খ্রিস্টানের পেশাব পড়া চান্দেরে সালাম দেন ক্যা?*

ফজলি খালার জ্বিন ছাড়ানো হলে, পেট খারাপ করলে, গায়ে জ্বর জ্বর লাগলে আর মাথাব্যথা হলে *বাপের বাড়ি* গিয়ে ক'দিন থাকার অনুমতি পান *আব্বাজির* কাছ থেকে। সেবার ফজলিখালা এসেছিলেন মাথাব্যথার কারণে, বড় মামার মন্তব্য শুনে বললেন — *আব্বাজি বলেছেন আসলে চাঁদে কেউ যায়নি। আল্লাহই চাঁদ সূর্যের স্রষ্টা। আল্লাহতায়ালা চাঁদ সুর্যকে উদয় করেন, অস্ত যাওয়ান। চাঁদ পবিত্র, চাঁদ দেখে মুসলমান ঈদ করে, রোজা করে। চাঁদে মানুষ গেছে, এসব খিস্টানদের রটনা।*

বড় মামা ঠা ঠা করে হেসে বলেন — *ফজলি, তরে ত আমি ছোডবেলায় বিজ্ঞান পড়াইছিলাম। পড়াই নাই পৃথিবী কি কইরা সৃষ্টি হইল! সব ভুইলা গেছস?*

ফজলিখালা কুয়ো থেকে অযু করার পানি তুলতে তুলতে বললেন — *বিজ্ঞানীরা কি আল্লাহর চেয়ে বেশি জ্ঞানী? কি বলতে চাও তুমি মিয়াভাই! আল্লাহ যা বলেছেন তাই সত্য, বাকি সব মিথ্যা।*

পানি ভরা বালতি উঠোনে নামিয়ে তিনি আবার বলেন — *তরে ত আর জিনে আছড় করে না, করে তর শ্বশুরে!*

আমি ঠিক বুঝে পাই না কার কথা সত্য। বড়মামার নাকি ফজলিখালার! এ বাড়িতে দু'পক্ষেরই আদর বেশি। বড়মামা বাড়ি এলে যেমন পোলাও মাংস রান্না হয়, ফজলিখালা এলে তা না হলেও তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোক এলে এলাহি কারবার শুরু হয়। বড়মামাকে যেমন দূরের মানুষ মনে হয়, ফজলিখালাকেও, তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকদের তো আরও। ওঁরা বেড়াতে এলে আমার মত রোদে পোড়া নাক বেয়ে সর্দি ঝরা মেয়ের চলাচলের সীমানা কুয়োর পাড় পর্যন্ত। কুয়োর পাড় ছাড়ালেই নানি বলেন — *এইদিকে ঘুরঘুর করিস না। মেমান গেলে পরে আইস।* দূরে দাঁড়িয়ে দেখতাম ঘরের বিছানায় তোষক যা গুটিয়ে রাখা হয় দিনের বেলা সেটি পেতে দিয়েছেন নানি, তার ওপর নতুন চাদর, ওতে বসে ফজলিখালার শ্বশুর আর স্বামী খাচ্ছেন। নানি পাকঘর থেকে গরম গরম তরকারি বাটি ভরে দিয়ে আসছেন, ফজলিখালা ঘোমটা লম্বা করে বাটি থেকে তরকারি তুলে দিচ্ছেন ওঁদের পাতে। ওঁদের খাওয়া শেষ হলে ওঁরা পান চিবোতে চিবোতে বিছানায় গড়াতেন। খেতে বসতেন ফজলিখালা, তাঁর শাশুড়ি, ননদ, মেয়েরা, হুমায়রা, সুফায়রা, মুবাশ্বেরা। নানি খেতেন সবার পরে, মেহমান চলে গেলে, বাড়ির লোকদের খাইয়ে। তখন আমার সীমান্ত খুলে যেত। আমাদের আর নানির উঠোনের মাঝখানে যে কুয়োর বেড়া, তা আমি অনায়াসে ডিঙোতে পারি।

বড়মামা পাকা উঠোনে খড়মের ঠকঠক শব্দ তুলে হাঁটতে হাঁটতে বলেন — *ঠিক আছে আল্লাহর কথাই সত্যি, তাইলে আল্লাহ যেমনে কইছেন অমনে চল। তর জামাইয়ে তগোর বাড়ির দাসীর সাথে থাকতে পারব, অসুবিধা নাই। কারণ আল্লাহ কইছে, লা এহেল্লু লাকান্নিসাউ মিন বায়াদু ওলা আল তাবাদাল্লা বিহিন্না মিনা আযোআযেউ ওলাও আয়যাবকা হুসনু হুন্না ইল্লামা মালাকাতু ইয়ামিনুকা। মানে দাসীরা সঙ্গমের জন্য বৈধ।*

বালতির পানি বালতিতেই থেকে যায়। ফজলিখালার আর অযু করা হয় না, তিনি শব্দ করে পা ফেলে ঘরে ঢুকে আলনা থেকে একটানে বোরখাখানা নিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। কাঁদলে ফজলিখালার গাল হয়ে যায় পাকা আমের মত লাল। দেখতে বেশ লাগে। পটে আঁকা ছবির মত।

—মা, আমি যাচ্ছি। এই বাড়িতে আর এক মুহূর্ত থাকা সম্ভব না আমার। এত অপমান আমার সহ্য হয় না।

ফজলিখালা চেঁচিয়ে বলেন।

নানি শুনে উঠোন থেকে দৌড়ে ঘরে গিয়ে ফজলিখালার হাত থেকে বোরখা ছিনিয়ে বলেন — *কান্নাকাটির কি হইছে তর! সিদ্দিকের মুহের লাগাম নাই। দু'একটা আবোল তাবোল কথা কয়। এইল্লিগা তর রওনা হইতে হইব, এই রাইতেবেলা? শ্বশুরবাড়ির মাইনষে খারাপ কইব। যাইবি যা, ঈদটা কইরা যা।*

বোরখাখানা নানির হাত থেকে এক ঝটকায় টেনে গায়ে পরতে পরতে ফজলিখালা বলেন — *আর এক মুহূর্ত না। আমি কি শখে আসি এখানে। বাড়িতে এত লোকের শব্দে আমার মাথাব্যথা হয়, সে কারণেই তো আসি। এলে যদি ভাইরা অপমান করে, তাহলে আর কেন! ভেবেছিলাম বাপের বাড়িতে ঈদ করব। তাও হল না। হুমায়রার আব্বাকে নিয়ে কথা বলল মিয়াভাই। উনার মত পবিত্র মানুষ দুনিয়াতে আর কজন আছে!*

নানি বেঁধে রাখতে পারেন না ফজলিখালাকে। তিনি যাবেনই। হাশেমমামা যান ফজলিখালাকে শ্বশুরবাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে। বাড়িটি থমথম করে সে রাতের জন্য। আমি নীরবে বসে আকাশের চাঁদের দিকে অবাক তাকিয়ে ভাবি কি করে চাঁদে মানুষ গেল, ওই টুকুন ছোট চাঁদে। মা বলতেন চাঁদে এক বুড়ি আছে, চাঁদের বুড়ি, ও বসে চরকা কাটছে। কিন্তু বড়মামা বলেন চাঁদে কোনও বুড়ি টুড়ি নেই, গাছপালা নেই, পানি নেই। চাঁদের দিকে তাকালে ওই যে বুড়ির মত দেখতে, আসলে ও অন্য কিছু, গর্তের ছায়া। চাঁদ যেমনই হোক, চাঁদের সঙ্গে আমার গোপন সখ্য গড়ে ওঠে। আমি যেখানে যাই, আকাশের হেঁটে চাঁদটিও যায় সেখানে। আমি খানাখন্দে হাঁটি, পুকুরঘাটে দাঁড়াই, সেও হাঁটে, দাঁড়ায়। নানির উঠোনে খানিক জিরোই, সেও জিরোয়। শর্মিলাদের বাড়ি থেকে দিব্যি এ বাড়িতে চলে এল।

নানির উঠোন থেকে আমার পেছন পেছন আমাদের উঠোনেও। বাঁশঝাড়ে গেলে ওখানেও।

ঈদের সকালে কলপাড়ে এক এক করে বাড়ির সবাই লাল কসকো সাবান মেখে ঠান্ডা জলে গোসল সারেন। আমাকে নতুন জামা জুতো পরিয়ে দেওয়া হয়, লাল ফিতেয় চুল বেঁধে দেওয়া হয়, গায়ে আতর মেখে কানে আতরের তুলো গুঁজে দেওয়া হয়। বাড়ির ছেলেরা শাদা পাজামা পাঞ্জাবি আর মাথায় টুপি পরে নেন। তাঁদের কানেও আতরের তুলো। সারা বাড়ি সুগন্ধে ছেয়ে যায়। বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে আমিও রওনা দিই ঈদের মাঠে। সে কি বিশাল মাঠ! বড় বড় বিছানার চাদর ঘাসে বিছিয়ে নামাজে দাঁড়ান বাবা, দাদা ছোটদা, আর সব মামারা, বড় মামা ছাড়া। মাঠে মানুষ গিজ গিজ করছে। নামাজ শুরু হলে যখন সবাই উবু হন, দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে দেখি সেই দৃশ্য। অনেকটা আমাদের ইস্কুলের এসেম্বলিতে *পিটি* করার মত, উবু হয়ে পায়ের আঙুল ছুঁই যখন, এরকম লাগে হয়ত দেখতে। নামাজ সেরে বাবারা চেনা মানুষের সঙ্গে কোলাকুলি করেন। কোলাকুলি করার নিয়ম কেবল ছেলেদের। বাড়ি ফিরে মা'কে বলেছিলাম *চল ঈদের কোলাকুলি করি।* মা মাথা নেড়ে বলেছেন *মেয়েদের করতে হয় না। ক্যান করতে হয় না?* প্রশ্ন করলে বলেছেন *নিয়ম নাই। কেন নিয়ম নেই?* প্রশ্নটি চুলবুল করে মনে। মাঠে গরু কোরবানি

দেওয়ার আয়োজন শুরু হয়। তিন দিন আগের কেনা কালো ষাঁড়টি বাঁধা কড়ইগাছে, কালো চোখ দুটো থেকে জল গড়াচ্ছে। দেখে বুকের ভেতর হু হু করে ওঠে আমার, কী জীবন্ত একটি প্রাণী জাবর কাটছে লেজ নাড়ছে, আর কিছুক্ষণ পরই হয়ে উঠবে বালতি বালতি মাংসের টুকরো। কড়ই গাছের গোড়ায় বসে ছুরি ধারান মসজিদের ইমাম। হাশেম মামা বাঁশ যোগাড় করে আনেন। বাবা পাটি বিছিয়ে দেন উঠোনে, বসে মাংস কাটা হবে। ছুরি ধারিয়ে মাঠ থেকে হাঁক দিলেন ইমাম। এক হাঁকেই হাশেম মামা, বাবা আর পাড়ার কিছু লোক ষাঁড়কে দড়িতে বেঁধে বাঁশে আটকে পায়ে হোঁচট খাইয়ে মাটিতে ফেললেন, ষাঁড় হাম্বা ডেকে কাঁদছিল। মা আর খালারা জানালায় দাঁড়িয়েছেন কোরবানি দেখতে। আনন্দে নাচছে সবার চোখে। লুঙ্গি পরা, গায়ে আতর না মাখা বড় মামা মাঠের এক কোণায় দাঁড়িয়ে বললেন *এইভাবে নৃশংস ভাবে একটা বোবা জীবরে মাইরা ফালতাছে, আর মানুষ কি না এইসব দেইখা মজা পায়, আর আল্লাহও নাকি খুশি হয়! দয়া মায়া বলতে কারও কিছু নাই আসলে।*

কোরবানির বিভৎসতা থেকে সরে যান বড় মামা। আমি দাঁড়িয়েই থাকি। হাত পা ছুঁড়ে ষাঁড় কাঁদে। সাত সাতটি তাগড়া লোককে ফেলে ষাঁড় উঠে দাঁড়ায়, আবারও তাকে পায়ে হোঁচট খাইয়ে ফেলা হয়। ফেলেই ইমাম তাঁর ধারালো ছুরিটি *আল্লাহু আকবর* বলে বসিয়ে দেন ষাঁড়ের গলায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। আধখানা গলা কাটা পড়লেও ষাঁড় হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করে। বুকের ভেতর আমার চিনচিন করে একরকম ব্যথা হতে থাকে। এটুকু দায়িত্বই আমার ছিল, দাঁড়িয়ে কোরবানি দেখা, মা তাই বলেছিলেন, বলেন প্রতি কোরবানির ঈদের সকালে। ইমাম যখন চামড়া ছাড়াচ্ছিলেন, তখনও ষাঁড়ের চোখ ভরা জল। শরাফ মামা আর ফেলু মামা দৃশ্যটির পাশ থেকে মোটে সরতে চান না। আমি চলে যাই মনুমিয়ার দোকানে বাঁশিবেলুন কিনতে। গরুর মাংসর সাতটি ভাগ হয়। তিন ভাগ নানিদের, তিন ভাগ আমাদের, এক ভাগ বিলোনো হয় ভিখিরি আর পাড়া পড়শিদের। ঈদের দিনের মজা এই, বাবা সারাদিনই মোলায়েম স্বরে কথা বলেন, পড়তে বসতে বলেন না, মারধোর করেন না। সারাদিন সেমাই জর্দা খেয়ে, পোলাও কোরমা খেয়ে হৈ হৈ করে বেড়ানো হয়, সাত খুন মাফ সেদিন। সারাদিন মাংস কাটা চলে। বড় বড় চুলোয় বড় বড় পাতিলে গরুর মাংস রান্না হতে থাকে, বিকেলে রান্নাবান্না সেরে গোসল সেরে মা আর নানি ঈদের শাড়ি পরেন। রুনু খালা আর ঝুনু খালা সেজেগুজে ফাঁক খোঁজেন বান্ধবীদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার। বাড়িতে অতিথি আসতে থাকে। বড় মামা লুঙ্গি আর পুরোনো এক শার্ট পরে পাড়া ঘুরে এসে বলেন — *সারা পাড়া রক্তে ভাইসা গেছে। কতগুলা যে গরু মারা হইল, হিশাব নাই। এই গরুগুলা কৃষকদেরে দিয়া দিলে ত চাষবাস কইরা চলতে পারত। কত কৃষকের গরু নাই। মানুষ এত রাক্ষস কেন, বুঝলাম না। পুরা গরু মাইরা এক পরিবার খাইব গোসত। এইদিকে কত মানুষ ভাতই পায় না।*

বড় মামাকে গোসল করে ঈদের জামা কাপড় পরতে তাগাদা দিয়ে লাভ নেই। হাল ছেড়ে নানি বলেন — *ঈদ ত করলি না। এল্লা খাইবিও না! খাইয়া ল।*

— *না খাওয়ার কি আছে, খাওন দেন। গরুর গোসত ছাড়া অইন্য কিছু থাকলে দেন।* বড় মামা লম্বা শ্বাস ফেলে বলেন।

চোখে জল জমছিল নানির। বড়মামা কোরবানির ঈদে গরুর মাংস খাবেন না, এ তিনি কি করে সইবেন! নানি আঁচলে চোখ মোছেন এই পণ করে যে তিনিও মাংস ছোঁবেন না। ছেলের মুখে না দিয়ে মায়েরা আবার খায় কি করে কিছু!

বড় মামার মাংস না খাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ল বাড়িতে। শুরু হল বড়দের মধ্যে একধরনের অস্বস্তি। মা আমাদের পাতে খাবার বেড়ে দিতে দিতে বলেন — *মিয়াবাই ঈদের গোসত না খাইয়া ঢাকায় ফিইরা যাইব। গরু জবো করা নাকি তার সহ্য হয় নাই। গরুর গোসত যে বাজার থেইকা কিইনা খাওয়া হয়, হেই গোসত কি গরু না মাইরা হয়!*

ঈদ শেষ হলে আবার আগের জীবনে ফিরতে হয় আমাকে। শরাফ মামা আমার সামনের সারিতে দাঁত নেই বলে গায়ে খোঁচা মেরে বলতে থাকেন

দাঁত পড়া আনারস
গু খায় তিন কলস।

দাঁত পড়লে মা ইঁদুরের গর্তে সে দাঁত ফেলে বলেছেন

ইন্দুর রে ইন্দুর
আমার পঁচা দাঁত নে,
তর সুন্দর দাঁত দে।

ইঁদুর তার দাঁত যতদিন আমাকে না দিচ্ছে, ততদিন আমাকে শরাফ মামার দাঁতাল হাসি দেখতে হবে। রুনু খালা অবশ্য বলেন — *গু না খাইলে দাঁত উঠে না।*

গু দেখলেই আমার বিবমিষা হয়। পায়খানায় বসে নিচের দিকে চাইলেই গু উপচে পড়া চারিটি দেখতে হয়, নীল মাছি ভন ভন করে ওড়ে চারির চারপাশে। নাক মুখ বন্ধ করে যত কম সময় থাকা যায়, থাকি। দাদা অবশ্য পায়খানায় গেলে দু' ঘন্টার আগে বেরোন না। কী করে যে অত দীর্ঘ সময় ওখানে টিকে থাকেন দাদা! এদিকে বাড়িতে মেথর এলেও নাক চেপে ঘরে বসে থাকি আর থুতু ফেলি উঠোনে। মেথর মাসে একবার এসে চারির গু সরিয়ে নেয়। নানি দিব্যি মেথরের সঙ্গে দরদাম করে পয়সা দেন হাতে। রুনু খালার কথায় আমার রাগ ধরে, গু আবার খাওয়া যায় নাকি! বলেছিলাম — *তোমার ত দাঁত আছে। তুমিও কি গু খাইছ রুনু খালা!*

রুনু খালা দিব্যি বলে ফেলেন — *হ খাইছি। ছুট বেলায়।*

শরাফ মামা আমার চেয়ে আরও এক কাঠি ওপরে। ভাতের থালা ফেলে দেন উপুড় করে যদি খেতে বসে দেখেন উঠোনে মুরগি হাগছে বা কেউ উচ্চারণ করছে গু শব্দটি। শরাফ মামা খেতে বসলে একদিন ভাল মানুষের মত বলেছিলাম *গু না খাইলে নাকি দাঁত ওঠে না শরাফ মামা, জানো?* ব্যস, ছুটে এসে ধুম্মুর করে এক কিল বসালেন পিঠে আর ভাত সুদ্ধ থালা ইটের টুকরোর মত ছুঁড়ে দিলেন উঠোনে।

আমাকে *গু খায় তিন কলস* বললে আমি শরাফ মামার পিঠে কিল বসাতে পারি না। তিনি আমার *বড়* বলে। *বড়*দের গায়ে হাত তুলতে হয় না। *বড়*রা আমাকে যখন খুশি ন্যাংটো করে সে কথা কাউকে না বলতে বললে সে কথা বলাও যায় না। *বড়*রাই হয়ত, *বড়*রা যে কোনও এক মন খারাপ করা বিকেলে কোনও এক সুনসান ঘরে ছোটদের ন্যাংটো করে, বিশ্বাস করবে না। মাঝখান থেকে কিলচড় খেতে হবে আমাকেই। *বড়*দের

কিলচড়কে রুখে দাঁড়ানোও যায় না, মাথা নুয়ে মেনে নিতে হয় *বড়রা* যা দেন, শাস্তি হলে শাস্তি, সোহাগ হলে সোহাগ। *বড়রা* যা করেন ভালর জন্যই, বড়রা শিখিয়েছেন।

গুণি এসে টুটুমামা আর শরাফ মামার নুনুর আগা কেটে মুসলমানি করিয়ে যাওয়ার পর নতুন লুঙ্গি পরিয়ে ওঁদের বসিয়ে রাখা হয়েছিল ঘরে, হাঁটলে ওঁরা লুঙ্গির সামনেটা আঙুলে উঁচু করে পা ফাঁক করে হাঁটতেন যেন কাঁটা নুনতে ব্যথা না লাগে, দেখে হাসি পেলে দু'জনই কিলোতেন আমাকে। আমার হাসতে মানা, এমনকি ওঁদের লুঙ্গির দিকে, হাঁটার দিকে তাকানোও মানা। বড়রা, চাইলেই এঁকে দিতে পারেন আমার *মানা না মানার সীমানা।*

সেবার ঈদের ছুটিতে বড় মামা অনেকদিন ছিলেন। প্রায় সারাদিনই শুয়ে শুয়ে বই পড়েছেন, বিকেলে উঠোনে খড়ম পায়ে হেঁটেছেন। কখনও কখনও রাতে বাবার সঙ্গে গল্প করতে এসেছেন আমাদের ঘরে। বড়মামা ধীরে কথা বলেন, চেঁচিয়ে নয়। কারও চেঁচানো শুনলে তিনি জিভে চু চু শব্দ করেন। হাশেমমামা হঠাৎ হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন, *পইড়া গেলাম পইড়া গেলাম।* চিৎকার শুনে বাড়ির সবাই ছুটে এসে দেখেন হাশেম মামার শরীর কুয়োর ভেতরে ঝুলছে। নানি ধমকে বলেন – *এই সব্বনাশা খেলা বাদ দে হাশেম। একদিন ঠিকই পইড়া যাইবি!*

হাশেম মামা হাসতে হাসতে উঠে আসেন। বড় মামা বোকা চোখে তাকিয়ে থাকেন হাশেম মামার দিকে। হাঁ মুখে শব্দ উঠে আসে – *এইটা কি ধরনের খেলা? এই খেলার মজাটা কি বুঝলাম না ত! হাশেম কি পাগল হইয়া গেল নাকি!*

হাশেম মামা আরও একটি কাজ করেন, আমাকে বা ফেলু মামাকে মাঝে মাঝেই কুয়োর ভেতর উপুড় করে ধরে বলেন *ফালাইয়া দিলাম ফালাইয়া দিলাম।* আমার গলা ফাটা চিৎকার শুনে ঘর থেকে লোক বার হয়ে হাশেম মামার কান্ড দেখে। বড় মামা একই রকম বোকা চোখে তাকিয়ে থাকেন।

ফজলিখালা এর মধ্যেই একদিন আসেন, জেনেই আসেন যে বড় মামা বাড়ি আছেন। এসেই, কাউকে *কি খবর কেমন আছ* বলাটুকুও নেই, বড় মামাকে – *তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।*

বড় মামা শুনে ফজলিখালার কাঁধে হাত রেখে হেসে বলেন, *তর এত রাগ ক্যান? এরম ত আগে আছিলি না! বোরখা টোরখা খুল, ব। তারপর কথা ক।*

ফজলিখালা হাতের নাগাল থেকে কাঁধ সরিয়ে বলেন – *না, এই বাড়িতে আমি বসতে আসি নাই। যা বলার বলে চলে যাব।*

বোরখার মাথাটুকু খুলে খাটে পা ঝুলিয়ে বসে যে কথা বলতে এসেছেন তিনি, বলেন, – *তুমি যে সেদিন বললে আল্লাহতায়ালা বলেছেন পুরুষেরা দাসীর সঙ্গে সহবাস করতে পারে। কোন আয়াতে তুমি পেয়েছ! ভুল ভুল। আল্লাহতায়ালা দাসীর কথা বলেননি। কোরানে স্পষ্ট লেখা আছে, ক্রীতদাসীর কথা। ক্রীতদাসীর সঙ্গে সম্পর্ক বৈধ। কিন্তু, এখন তো আর ক্রীতদাসী নেই! আমরা ত আর কাজের লোককে পয়সা দিয়ে কিনে নিই না!* বলে তিনি হাসেন। বিজেতার হাসি।

বড় মামা খাটে পা তুলে আসন করে কোলের ওপর বালিশ চেপে বলেন – *ও এই কথা! এইডা কুনো জরুরি কথা হইল যে তুই বোরখা খুলবি না, ঠান্ডা হইয়া বইবি না,*

কথা কইয়াই চইলা যাইবি। তা ক ত দেখি দাসপ্রথা এহন নাই কেন! পারবি কইতে! দাসপ্রথাডা তুলল কে? তর আল্লায়? নাকি তর রসুলে? তুলছে মানুষে, বুঝলি! প্রথাডা মানুষে না তুললে, কী ছ্যাদাব্যাদা কারবার অইত, ক? আর, চিন্তা কর, ক্রীতদাসী হোক দাসী হোক, আল্লাহ কি কইরা এই বিধান দেয় যে ..

কথা শেষ না হতেই ফজলিখালা গলা চড়ান — *সেই সময়ের জন্য আল্লাহ লিখেছেন। সেই সময়ে মেয়েদের নিরাপত্তা ছিল না। ক্রীতদাসীর আর কোথায় যাওয়ার জায়গা ছিল না। তাই আল্লাহতায়ালা ..*

এবার, ফুললিখালার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বড় মামা বলেন — *যদি মনে করস, কোরান সেই সময়ের জন্য লেখা, ভাল কথা। তাইলে কোরান সেই সময়ের জন্যই রাইখ্যা দে, এই সময়ে এইডা লইয়া নাচনের মানে কি! আর আল্লাহ খালি সেই সময়ের কথা কইছেন ক্যান! এইডাও একটা প্রশ্ন। আল্লাহ অতীতের কথা জানেন, ভবিষ্যতের কথা জানেন, সব দেখেন, সব বোঝেন তাইলে ভবিষ্যতে যে দাসপ্রথা থাকব না, এইডা লিখলেন না ক্যান! দুনিয়াতে বিজলিবাত্তি আইব, মোটর গাড়ি, উড়োজাহাজ, রকেট — রকেটে কইরা চাঁদে যাওনের খবরটাও লিখতে পারতেন। এই যুগে যেইডা চলে না, সেইডা লইয়া মাতামাতির কারণডা কি আমি বুঝি না। তগোর ডরটা এট্টু বেশি।*

মুখ কালো করে উঠে পড়েন ফজলিখালা। বোরখার মাথাটুকু হাতে নিয়ে বলেন *তুমি এত নিচে নেমেছ মিয়াভাই। ছি ছি ছি। তোমার মুখ দেখাও আমার পাপ।* নানির চৌচালা ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের শোবার ঘরে এসে *বড়বু এই ঘরে একটু ঘুমাব আমি, খুব মাথা ব্যথা করছে* বলে সটান শুয়ে পড়লেন। মা ফজলিখালার জন্য পাকঘরে রাঁধতে চলে গেলেন। বিরুই চালের ভাতের সঙ্গে কবুতরের রোস্ট।

বাবার সঙ্গে বড় মামার বেশির ভাগ আলাপ হয় জমি নিয়ে। বড় মামা বলেন — *ঢাকায় একটা জমি কিইনা ফালাও রজব আলী। সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। এই দামে পরে আর পাইবা না।*

বাবা মাথা নেড়ে বলেন — *দেখি দেখি। কিনব।*

আমার খুব ইচ্ছে করে বড় মামার কাছে ঢাকার গল্প শুনি। ঢাকা কেমন দেখতে, ওখানে কি কি আছে এসব। কিন্তু তাঁকে লক্ষ করি কখনও তিনি আমার দিকে ফিরে তাকান না। তাঁর *রাজকন্যাটি* এখন ধুলো কাদায় মিশে আর যে রাজকন্যা নেই, সম্ভবত তাই। তবে একবার, তাও ঢাকা চলে যাওয়ার আগের দিন, তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয় সরাসরি। পায়খানায় যাওয়ার রাস্তায় আরবি লেখা একটি ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে পেয়ে মা'র কাছে দিচ্ছিলাম। এরকমই নিয়ম, মা বলে দিয়েছেন হরফ চেনার পর থেকেই, যে, এই হরফের কোনও কাগজ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলে, যেহেতু সে কাগজ পবিত্র, কোনও ময়লায় না মেশে, পায়ের তলায় না পড়ে, পানিতে ফেলে দিতে। তাই করি অন্যদিন, টুকিয়ে ওতে চকাশ করে চুমু মেরে নৌকোর মত ভাসিয়ে দিই জলে। পায়খানার রাস্তায় পাওয়া কাগজটি, আমি যে লক্ষ্মী মেয়ে, মাড়িয়ে যাইনি, মা'কে তাই দেখাতে আসা আমার। মা উঠোনের দড়িতে কাপড় নাড়ছিলেন, বললেন *আমার হাত বন্ধ, তর বড়মামার হাতে দে।* বড় মামা ছেঁড়া টুকরোটি নিয়ে গড়গড় করে পড়ে ফেললেন। শুনে, মা

তাকালেন মুগ্ধ চোখে বড়মামার দিকে। আরবি জানা মানেই তো বড় *ঈমানদার* হওয়া। যদিও বড়মামা শুক্রবারেও *জুম্মা* পড়তে মসজিদে যান না, ঈদের নামাজেও না। এতে কারও কোনও আপত্তি নেই।

বড় মামা বললেন — *কি করবি এই কাগজরে!*

মা'র আঁচল ধরে, খানিকটা ভর রেখে, শরীরের না হোক, মনের, বললাম — *চুমা দিয়া পুস্কুনিত ফালাইয়া দিয়াম।*

বড় মামা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাগজটি, বললেন — *এই লেখারে চুমা দিতাছস? কি লেখা আছে জানস এতে! লেখা আছে হালার পু, তর মায়েরে চুদি।*

মা'র মুখ মুহূর্তে লাল হয়ে গেল শরমে। তাঁর ভেজা কাপড় পড়ে থাকে কাঁধে, দড়িতে নাড়া হয় না। ফুলবাহারি পানি ভরা কলস নিয়ে কলপাড় থেকে যাচ্ছে ঘরের দিকে, থমকে দাঁড়ায়। নানি মরিচ গাছে পানি ঢালছেন, হাত থেকে বদনি পড়ে উঠোন ভিজে যায়। আমি বড় মামার দিকে দু'পা এগিয়ে, চোখে অপার বিস্ময়, বলি — *বড় মামা, আরবি না আল্লাহর ভাষা? এই ভাষায় গালিগালাজও লেখা হয়!*

বড় মামা খড়ম পায়ে ঠকঠক শব্দে হাঁটেন আর বলেন — *হইব না ক্যান! আরবি আরবগোর ভাষা। আরবেরা মদ খায়, খারাপ কাজ করে, মানুষ খুন করে। গালিগালাজ করে। পুরুষ লুকেরা চৌদ্দটা বিয়া করে। কেউ কেউ একশটাও করে।*

নানি বলেন — *সিদ্দিক থাম ত।*

নানির বড় ছেলে, ননীটা ছানাটা খাইয়ে মানুষ করেছেন, মাদ্রসায় পড়া, আরবি জানা, থামেন।

বড়মামার দিকে খুব সন্দেহ-চোখে তাকিয়ে থাকেন মা। তাঁর বিশ্বাস হতে চায় না এই মানুষটির সঙ্গে একদা তিনি বেড়ে উঠেছেন এই বাড়িতে, এই উঠোনে, কড়ইগাছতলায়। ইস্কুল থেকে ফিরে কোনওরকম নাকে মুখে কিছু ভাত দিয়ে দৌড়ে দু'জন চলে যেতেন নাসিরাবাদ মাদ্রাসার পুকুরে। সারা বিকেল সাঁতরে যখন জল থেকে উঠতেন, চোখ লাল। লাল চোখে বাড়ি গেলে নানির মার খেতে হবে এই ভেবে দু'জনে ঘাটের সিঁড়িতে বসে কচুপাতায় মন্ত্র-মত পড়ে চোখে বুলোতেন যেন শাদা হয়। চোখ শাদা করে ভালমানুষ সেজে বাড়ি ফিরতেন। রাস্তায় তখন দু'একটি ঘোড়ার গাড়ি চলত কেবল। গলির মোড়ে এসে মা খানিক দাঁড়াতেন, মোড়ের দোতলা বাড়িতে এক মেমসাহেব থাকতেন, তাঁকে দেখতে। বিকেলে বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে মেমসাহেব হাসতেন, ধবল পা জোড়াও মেমসাহেবের হাসির সঙ্গে হাসত। বড় মামা মা'র ফ্রক ধরে টেনে গলিতে ঢোকাতেন আর বলতেন — *ওরা খ্রিস্টান, ওগোর দিকে এত চাইয়া থাকলে আল্লাহ গুনাহ দিব।*

বড় মামার লেখাপড়ার জন্য টেবিল চেয়ার এল বাড়িতে, মা'র জন্য এল না। বড়মামার জন্য গোপনে আঙুর আনতেন নানা, কমলা আনতেন। পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে রেখে রেখে ওসব খেতেন তিনি, একটি আঙুরের দানাও মা'কে দেননি কখনও। সেই কুচুটে ছেলেটির বইখাতা, জামা কাপড় গুছিয়ে রাখার দায়িত্ব ছিল মা'র ওপর। টেবিলে কোথাও কালির দাগ পড়ল কি কিছু এদিক ওদিক হল, ধুমধুম কিল বসাতেন মা'র পিঠে। হঠাৎ কখন যে বড় মামা বড় হয়ে গেলেন, বড় হতে হতে আকাশ স্পর্শ করছেন তিনি আর যে মাটিতে ছিলেন মা, সে মাটিতেই রয়ে গেলেন। মা'র আজও ঈর্ষা হয়, কিন্তু ঈর্ষা

কি এই মানুষটির প্রতি! মা'র মনে হয়, এ মানুষটিকে, যাকে তিনি *মিয়াবাই* বলে ডাকেন, আদপেই চেনেন না।

খ.

একাত্তরের যুদ্ধ শেষ হলে মা আবার পীরমুখো হন। পীরের অবশ্য কোথাও পালাতে হয়নি, বহাল তবিয়তে ছিলেন শহরে। দু'চারটে বিহারির সঙ্গে খাতিরও করেছিলেন, ভারত ছেড়ে মুসলমানের দেশ বলেই না এখানে এসেছেন, পাকিস্তান ভেঙে গেলে এ দেশে থাকার তাহলে কি মানে হয়! নওমহলের দশটি বাঙালি বিচ্ছুর বাড়িতে পীরের সম্মতি নিয়ে মুরিদানরা *আল্লাহু আকবর* বলে আগুন ধরিয়েছেন। পীরসাব ওঁদের পিঠে হাত বুলিয়ে বলেছেন, *এতে কোনও দোষ নেই বান্দারা, শত্রুর কবল থেকে এ ইসলাম বাঁচানোর জেহাদ। জেহাদ* সম্পর্কে মা'র ধারণা তেমন স্পষ্ট না হলেও যেহেতু তিনি পীরের মুরিদ এবং যেহেতু পীরের কোনও কথা ও কাজ নিয়ে কোনও মুরিদের সংশয় থাকা উচিত নয়, মা কোনও প্রশ্ন করেন না, যে প্রশ্নে পীরের আহত বা বিচলিত হওয়ার কোনওরকম ফাঁক থাকে। মা মাথা পেতে জেহাদ পরবর্তী যে ফতোয়া ঘোষিত হয়, তা মাথা পেতে বরণ করে শাদা থান কাপড় কিনে লম্বা লম্বা সালোয়ার কামিজ বানিয়ে ফেলেন নিজের জন্য। শাড়ি ছেড়ে এখন থেকে তাই পরবেন, পীর আমিরুল্লাহ সাফ সাফ বলে দিয়েছেন — *নবীজির পত্নীরা যেরকম পোশাক পরতেন, সেরকম পোশাক পরতে হবে সব মেয়েদের। চুল বড় করা যাবে না। চুল হবে ছেলেদের মেয়েদের, বাবরি ছাট।*

কাঁচিতে ঘ্যাঁচ করে পাছায় পড়া লম্বা চুল, সে ফিনফিনে হোক, টাসেল বেঁধে ঘন করতেন, কেটে ফেললেন মা। ঘাড় অবদি চুল নিয়ে ঢিলে সালোয়ার কামিজ পরে মাথায় বুকে ওড়না পেঁচালেন। মা'কে দেখে আর *মা* বলে মনে হয় না। মন খারাপ করে বলি

—*এইগুলা পরছ ক্যান মা?*

মা বলেন — *শাড়ি আর পরতাম না। শাড়ি হিন্দুগোর পোশাক। কাফেরের পোশাক। শাড়ি পরলে গুনাহ হইব।*

পীরবাড়ি থেকে যে ফতোয়াই জারি হয়, মা মাথা পেতে বরণ করেন। মা ভুলে যান তাঁর ছোটবেলার সই অমলার কথা। ভুলে যান রথের মেলা থেকে খই, খেলনা, আর পুতলা কেনার দিনগুলো, লক্ষ্মী পুজোয় সরস্বতীদের বাড়ি গিয়ে মিষ্টান্ন খাওয়া, সখীদের হাত ধরে পাড়ার পুজোমন্ডপ দেখা। মা ভুলে যান মা'কে না জানিয়ে একা একা আমি পিঠের চুল কেটে ঘাড়ে ওঠালে মা মনের ঝাল মিটিয়ে আমাকে কিলিয়ে বলেছিলেন — *কি সুন্দর চুলগুলা কাইটা ভূত বানাইছস। তর চুল আমি তেল পানি দিয়া কী যত্নই না করছিলাম!*

সেই মা, চোখের সামনে বদলে গেলেন। খাবার টেবিলে বসে সবাই খাচ্ছে, মা থালায় খাবার বেড়ে টেবিল ছেড়ে মেঝেয় বসে, নয়ত বিছানায়, হাতে থাল, খান। কেন, কী ব্যাপার? মা বলেন — *টেবিল চেয়ারে বইসা খাওয়া হারাম। ইহুদি নাছারারা টেবিল চেয়ারে বইসা খায়।*

পুরো পাড়ায় দু'তিনঘর মুসলমান, বাকি সব হিন্দু। বারো মাসে তেরো পুজো লেগে থাকে পাড়ায়। হিন্দুরা কালো ফটক পেরিয়ে বাড়ি ঢুকে বেলপাতা চায়, পুজোয় লাগবে বলে। হ্যাঁ বলে দিই, ওরা গাছে উঠে বেলপাতা পেড়ে নেয়। ফটকের ওপর পেঁচিয়ে থাকা মাধবীলতা গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে নেয়। পাতার তলে কেউ কেউ দুটো তিনটে বেলও নেয়। নিক, বেল আমার বড় অপছন্দ। মা বেলের শরবত বানিয়ে মুখের কাছে ধরলে আমি নাক কুঁচকে হাত সরিয়ে দিই মা'র। মা বেলপাতা নিতে আসা অনেকের সঙ্গে ভাবও জমিয়ে ফেলেছিলেন — *কি গো মেয়ে, তোমার নাম কি? কোন বাড়িতে থাকো? বাবা কি করে? ভাই বোন কজন?* সেই মা পীরবাড়ি গেলেন আর বাড়ির ধারা বদলে ফেললেন। বেলপাতা নিতে আসা পাড়ার হিন্দু ছেলেমেয়েকে দূরদূর করে তাড়িয়ে আমাদের বললেন — *পূজার লাইগা আর বেলপাতা দিবি না কাউরে। ওরা কাফের। ওদের পূজায় কিছু দিলে গুনাহ হইব।*

আমি মন খারাপ করে বলি — *ওদেরে কাফের কও ক্যান? আমি তো চিনি ওদের, ওরা ভাল মানুষ খুব।*

মা তসবিহ জপতে জপতে বলেন — *যারা মুসলমান না, তারা সব কাফের। হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সব।*

মা'র নাগাল থেকে নিজেকে খানিক দূরে রেখে বলি — *ধর, একটা বাচ্চা আজকা জন্ম নিল, তার বাবা মা হিন্দু, নয়ত খ্রিস্টান। সে বাচ্চার কোনও হাত ছিল না কোন বাবা মার ঘরে সে জন্মাইব। সে তোমার কিম্বা মসজিদের ইমামের ঘরেও জন্মাইতে পারত। বাচ্চার তো কোনও দোষ নাই. তারে বাবা মা যা শিখাইছে তাই শিখছে, পূজা করতে, কীর্তন গাইতে, গির্জায় যাইতে, এই বাচ্চা কি দোযখে যাইব না কি বেহেসতে!*

মা'র ঠোঁট নড়ে, তসবিহ গুনছেন। আমার প্রশ্নের কোনও জবাব দেন না। আমি দু'পা এগিয়ে এসে আবার বলি — *কও মা, দোযখে না বেহেসতে?*

মা বলেন — *সে যদি মুসলমান হয়, ঈমান আনে, তাইলে বেহেসতে। তা না হইলে দোযখে।*

— *দোযখে? তার কি দোষ?* চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করি।

সে যে জন্মাইছে বিধর্মীর ঘরে, মা চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, *ওইটাই তার দোষ।*

আমি এবার সুযোগ পেয়ে ধনুক গলা থেকে ছুঁড়ে দিই শব্দের তীর — *আল্লাহ হও না কইলে কোনও কিছু হয় না, তুমি নিজেই কও। আল্লায় বাচ্চাটারে হওয়াইছেন বিধর্মীর ঘরে। দোষ তো তাইলে আল্লাহর। জানে না বোঝে না বাচ্চারে দোষ দেওয়া ঠিক না।*

মা'র যে হাতে তসবিহ ছিল, সে হাতেই খপ করে ধরে আমাকে এক ঝটকায় কাছে এনে চুল মুঠি ধরে হেঁচকা টান লাগিয়ে বলেন — *আল্লাহ নিয়া কথা কস! কত বড় সাহস তর! কার কাছে শিখছস এইসব! আর যদি একদিন শুনি আল্লাহ রসুল নিয়া বাজে কথা কইতে, তরে আমি গলা টিইপা মাইরা ফালাইয়াম। আমি জন্ম দিছি, তর মত দুষমনরে আমার মাইরা ফেলার অধিকার আছে। এমন পাপীরে মারলে আমার আরও সওয়াব হইব।*

আমি ঠিক বুঝে পাই না আল্লাহ রসুলের কথা আমি মন্দ কি বলেছি। কেবল মা'কে বোঝাতে চেয়েছিলাম একটি শিশুর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই কোন ঘরে সে জন্ম নেবে, কোন ধর্ম সে বরণ করবে। যেহেতু আল্লাহতায়ালাই সিদ্ধান্তটি নেন, দায়িত্বটি তাঁর।

আল্লাহর ওপর কোনওরকম জটিল দায়িত্ব দিতে পছন্দ করেন না মা। মা'র অপছন্দের পরিসর এত দ্রুত বাড়তে থাকে, যে আমি যা কিছুই করি, মা বলেন গুনাহ করছি।

টিউবয়েল থেকে গ্লাসে জল ভরে খাচ্ছি, মা বললেন –*খাড়ইয়া পানি খাস ক্যান? খাড়ইয়া পানি খাইলে শয়তানের মুত খাওয়া হয়।*

পেশাবখানা থেকে এলে হাত পরীক্ষা করেন ভেজা কি না, না ভেজা থাকলে – *মুইতা পানি লইছস? হিন্দুরা মুইতা পানি লয় না। কাফেরের একমাত্র স্থান দোযখ।*

পুবের জানালা ঘেসে হাসনুহেনা গাছ, সারারাত ফুল ফুটে সুগন্ধে ভরে থাকে ঘর। জানালার দিকে মাথা রেখে যখনই শুই, মা তেড়ে আসেন –*পশ্চিম দিকে পা দিয়া শুইছস ক্যা? জানস না পশ্চিমে কাবা শরিফ? গুনাহ হইব। পশ্চিমে মাথা দিয়া শ।*

আমার তখন দিকের ধারণা হয়েছে, পাড়ার পশ্চিম দিকে একটি মন্দিরও আছে জানি। মা'কে বললে মা *শয়তানের দোসর* বলে গাল দেবেন, পিঠে কিলও হয়ত দেবেন ধুমুর ধুমুর, এই ভয়ে পা সরিয়ে রাখি। বেচারা পা দু'খানা যদিও মক্কার কাবা শরিফ থেকে হাজার মাইল দূরে ছিল, মাঝখানে খাল বিল পাহাড় পর্বত, পায়খানা, পেশাবখানা, মন্দির গির্জা সবই ছিল।

আমি যুক্তি খুঁজে পাই না মা'র ধর্মের। প্রশ্ন করে যে মামুলি উত্তরগুলো মেলে, তা এরকম, আল্লাহ মাটি দিয়ে মানুষ বানিয়েছেন আর আগুন দিয়ে বানিয়েছেন জ্বিন। হাশরের ময়দানে বিচার হবে ইনসান এবং জিনের। জিন কোথায় আছে, আছে বাতাসে বাতাসে, আমরা দেখতে পাই না। আল্লাহ কোথায় আছেন, আল্লাহ হচ্ছেন নূর, আল্লাহকেও দেখতে পাওয়া যায় না, আল্লাহ ওপরে থাকেন, মানে আকাশের কোথাও। আল্লাহ যেখানেই থাকুন সব দেখতে পান, সব শুনতে পান।

আবার শবেবরাতের রাতে রুটি সেমাই রেঁধে সারারাত নামাজ পড়ার আয়োজন করে মা বলেন – *আজ আল্লাহ সাত আসমানের নিচে নাইমা আইছেন, এইখান থেইকা ভাল কইরা দেখবেন দুনিয়ায় কারা কি করতাছে।*

ফস করে বেরিয়ে যায় মুখ থেকে – *মা, সাত আসমানের ওপর থেইকা কি আল্লাহ ভাল দেখতে পারেন না দুনিয়ার মানুষদের? ভাল কইরা দেখতে হইলে কি নিচে আসতে হয়?*

মা দাঁতে দাঁত পিষে বলেন – *এত প্রশ্ন করতে হয় না। আল্লাহকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবি। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোনও মাবুদ নাই। আল্লাহ গফুরুর রাহিম। আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়।*

পীর আমিরুল্লাহকে আমি ঠিক এই বাক্যগুলোই বলতে শুনেছি। মা'কে ময়না পাখির মত মনে হয়। নানিবাড়ির খাঁচায় বসে থাকা ময়না পাখিটি বাড়িতে কেউ ঢুকলেই বলত – *মেমান আইছে, খাওন দেও।* রুনুখালা শিখিয়েছিলেন বলতে। ব্যস, শিখে অবদি ময়না নিজের বুলি ভুলে, কেবল তা আওড়াত।

পীরবাড়ি থেকে মা যা শিখে আসেন, কেবল যে আওড়ান তা, তা নয়, আমার ওপর, বিশেষ করে আমারই ওপর, তার বিরামহীম চর্চা চলে। আমাকে সংক্রামিত করতে মা মরিয়া হয়ে ওঠেন, যদিও সময় সময় বলেন – *তরা নিজের পথ নিজে দেখ। আমার নছিহত করার আমি করছি। হাশরের মাঠে আল্লাহ তগোরে জিগাস করবেন তোমাদেরে*

কেউ কি জানাইছিল আমার কথা, তখন না করতে পারবি? আসলে আল্লাহ রসুলের কথা আমি যে বলি, তা আল্লাহ আমারে দিয়া তগোরে বলাইতাছেন। আমি উছিলা মাত্র।

ভেতরের ঘরে বসে মা এবং বারান্দায় বসে সুলতান ওস্তাদজী আমাকে *কলেমা* শিখেয়েছিলেন, কতটুকু তার মনে রেখেছি, মাঝে মাঝেই ঝালাই করেন মা, নছিহত করার উছিলা হয়ে, বেশ মোলায়েম স্বরে — *কলেমা এ তৈয়বটা কও তো মা!*

আমি ফটাফট বলে দিই — *লা ইলাহা ইল্লালল্লাহু মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।*

শেষ হতে না হতেই মা আবার — *কলেমা শাহাদাৎ?*

—আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

নির্বিকার, যেন আওড়াচ্ছি *ফুল পড়ে পাতা নড়ে*, যে আমি ফুলও চিনি না, পাতাও না।

মা'র মুখে হাসি ফোটে। প্রসারিত ঠোঁট সংকুচিত হতে মা'র সময় নেয়নি যেদিন বলেছিলাম — *তুমি যে বল আল্লাহ মাটি দিয়া মানুষ বানাইছে,*

মা শুধরে দিয়েছিলেন — *বানাইছে না বানাইছেন।*

—বানাইছেন, তাইলে আমগোর শইলে মাটি কই! আছে চামড়া, চামড়ার তলে মাংস, মাংসের তলে হাড্ডি!

মা তাঁর কালো ঠোঁট আরও কালো করে আনেন কুঁচকে, মোলায়েম স্বর মিলিয়ে গিয়ে ঝাঁজ কেবল — *আল্লাহর মাটি কি ভাবছস যেই সেই মাটি! দুনিয়ার মাটি?*

শরাফ মামা প্রায়ই গায়ের চামড়ার ওপর নখের আঁচড় কেটে শাদা দাগ করে বলতেন *—এইযে দেখ মাটি। আল্লাহ আমগোরে মাটি দিয়া বানাইছে।*

আমি খানিকটা দমে যাই, হবে হয়ত, আল্লাহর মাটি যে দুনিয়ার মাটির মত, এর কোনও মানে নেই। সাত আসমানের ওপর হয়ত অন্যরকম মাটি পাওয়া যায়। আমাকে গালে হাত দিয়ে ভাবতে দেখে মা বলেন —*আল্লাহর কুদরতের কোনও সীমা নাই। সবর করবি আল্লাহর কাছে। এই যে ধর ডাবের মধ্যে,* খানিক থেমে, উঠোনে নারকেল গাছগুলোর দিকে বিহ্বল-চোখে তাকিয়ে আবার শুরু করেন — আল্লা*হ কি সুস্বাদু পানি দিছেন। মানুষের শক্তি আছে ডাবের মধ্যে পানি দিতে? উখের কথা ধর, আল্লাহর কি কুদরত, লাডির মধ্যে শরবত!*

মা'র মুগ্ধ দৃষ্টি নারকেল গাছ ছাড়িয়ে উঠোনের আরও গাছের ওপর ছড়িয়ে যায়।

— তারপর হইল গিয়া কাঁঠাল, কেমনে কোয়া কোয়া কইরা আল্লাহ বসাইয়া দিছেন! কোন মানুষের শক্তি আছে কাঁঠাল বানাইতে! আল্লাহর কাছে সবর কর। এত ফলফলান্তি দিছেন বান্দাদের খাইতে।

ডালিম গাছের ওপর চোখ ফেলে — *ডালিমের কথাই ধর। কী কইরা দানাগুলার মধ্যে আল্লাহ চিনি ভইরা দিছেন! আল্লাহ ছাড়া কার ক্ষমতা আছে বানানির!*

আমাকে কাবু করে ফেলে মা'র বর্ণনা। কাবু হলে মা স্থির হন। দু'চোখে মমতা উপচে ওঠে।

কালো বোরখায় সারা শরীর ঢেকে মা রওনা হচ্ছিলেন পীরবাড়িতে, হঠাৎই, মা'র এক পা যখন সিঁড়িতে, আরেক পা মাঠে, বলি — *মা, মেয়েদের বোরখা পরতে হয় কেন?*

মা বলেন, মা'র চোখে সুর্মা, মাঠের পা'টিকে সিঁড়িতে ফের উঠিয়ে — *আব্রু রক্ষা করার লাইগ্যা। আল্লাহ কইছেন মেয়েদের শরীর যেন বাইরের মানষে না দেখে। দেখলে গুনাহ হইব।*

সিঁড়ির দু'ধাপ নেমে এসে প্রশ্ন করি — *আল্লাহ ছেলেদের বোরখা পরতে কন নাই ক্যান? তাদের শরীল যদি বাইরের মানষে দেখে?*

মা'র ছাইরঙা চোখদুটো উনুনের মত জ্বলে ওঠে — *আল্লাহ যা আদেশ করছেন তাই মানতে হইব। ছেলেদের বোরখা পরার আদেশ করেন নাই, মেয়েদের বোরখা পরতে কইছেন। মুখ বুইজা মানতে হইব আল্লাহর আদেশ। প্রশ্ন করলে গুনাহ হইব।*

গুনাহ গুনাহ গুনাহ। তিন ধাপ পিছিয়ে দাঁড়াই। ডানে ফিরলে গুনাহ। বামে ঘুরলে গুনাহ। প্রশ্ন করলে গুনাহ। গুনাহ করলে আল্লাহ দোযখে ছুঁড়বেন। দোযখে সাপে কামড়াবে, বিচ্ছু কামড়াবে। সাপ বিচ্ছুকে আমার ভীষণ ভয়। কিন্তু ওদিকে যে ইস্কুলে অঙ্কের মাস্টার অঙ্ক একটি বোর্ডে লিখেই বলেন *কোনও প্রশ্ন থাকলে কর। প্রশ্ন যে করে না, সে অঙ্ক বোঝে না।*

যাক্কুম গাছের ফল খাওয়াবেন আল্লাহ, সে এক ভয়ংকর জিনিস, খেলে পেটের নাড়িভুড়ি উগলে আসে। নানার মুখে *যাক্কুম* গাছের নাম আমি প্রথম শুনি।

ও নানা যাক্কুম গাছ কি রকম দেখতে!

খালি কাঁটা! কাঁটার উপরে কাঁটা! নানা গা ঝাঁকুনি দেন ভয়ে।

ফণিমনসার মত! সম্ভবত।

আমার মনে হত নানা বোধহয় জীবনে একবার হলেও খেয়ে দেখেছেন যাক্কুম ফল। তিনি আর দ্বিতীয়বার এর ধারে কাছে যেতে চান না, এমন বিস্বাদ।

হজ্ব থেকে ফিরে এসে অবদি আর দোযখের নয়, বেহেসতের খাবারের বর্ণনা দিতে শুরু করেছেন নানা। চোখ বুজে, যেন তাঁর সামনে বেহেসতর খানা সাজানো, মুখে স্মিত হাসি, বলেন *আহা বেহেসতে এমন খানা, একবার খাইলে ঢেক একটা আইব তো মেসকাম্বর।* দেখে মনে হয় বেহেসতের সুস্বাদু খানা খাবার লোভে নানা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পরেন, খাবারের পর সুগন্ধী ঢেঁকুরটির জন্যও। নানা যেদিন হজ্ব থেকে ফিরলেন, তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে বসেছিল বাড়ির সবাই, যেন নানা ফিরেছেন স্বয়ং *আল্লাহর* সঙ্গে মোলাকাত করে। নানা কখনও কেঁদে কখনও হেসে বলছিলেন কি করে তিনি কাবার চারদিকে ঘুরেছেন, *হযরে আসওয়াদ* নামের কালো পাথরে চুমু খেয়েছেন, লোকের পাপ শুষে নিয়ে পাথরটি কালো বর্ণ হয়ে গেছে, জুতো ছুঁড়ে মেরেছেন পাহাড়ে, মাথা ন্যাড়া করেছেন, সেলাই ছাড়া কাপড় পরেছেন। হযরতের *রওজা মোবারক জিয়ারত* করেছেন।

নানাকে দেখতে পড়শিরাও ভিড় করেছিল, পড়শিদের মধ্য থেকে সুলেখার মা বললেন — *আহা একবার হজ্বে গেলে মানষের সব গুনাহ মাপ হইয়া যায়। আপনের কপাল ভাল।*

আমি পা ছড়িয়ে মেঝেয় বসা পুঁচকে, বড়দের কথার মধ্যে নাক গলিয়ে বলি — *যারা খারাপ কাজ করে, মানুষ খুন করে, যে পুলিশগুলা মিন্টুরে মাইরা ফেলছে গুলি কইরা, সবার গুনাহ মাপ কইরা দেন আল্লাহ?*

নানা পুঁচকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন — *হ। সব গুনাহ।*

মা বলতেন *গুনাহ অনেক রকম। কবিরা গুনাহ সবচেয়ে খারাপ। এই গুনাহর কোনও মাপ নাই।*

— *কবিরা গুনাও? জিজ্ঞেস করি*

নানা এবার আর পুঁচকেকে উত্তর দেন না। নানাকে ঘিরে থাকা বৃত্ত থেকে উঠে পুঁচকের বাহু ধরে টেনে কলপাড়ে নিয়ে অখুশি মা *ফুলবাহারি বালতিতে পানি ভইরা রাখছে কইন, গুসল কর,* বলেন।

বালতি থেকে লোটা ভরে ঠান্ডা টিউবয়েলের পানি মাথায় ঢালতে থাকি, এখানে দাঁড়িয়েই বাড়ির ছেলে বুড়ো নাতির গোসল সারতে হয়। নানি আর তাঁর ডাঙর মেয়েরা করেন গোসলখানায়, ওটি আবার পেশাবখানাও। মাথার ওপর খোলা, সাড়ে তিনখানা দেয়াল, আধখানায় পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া। আমাদের উঠোনের এক কিনারেও এরকম একটি মাথা খোলা দরজা ফরজা নেই গোসলপেশাবখানা আছে, মুতের হলুদ দাগ পড়ে গেছে মেঝেয়। টিউবয়েল নানির উঠোনে বলে এখানেই আমরা গোসল সারি। বাবা অবশ্য দাগ পড়া গোসলখানায় সারেন। খুব ভোরে ফুলবাহারি বালতি ভরে দিয়ে আসে পানি। বেশিদিন হয়নি নানির উঠোনে টিউবয়েল বসেছে, আগে কাপড় ধোয়ার, গোসল করার এমনকি খাওয়ার পানিও কুয়ো থেকে নেওয়া হত। রাস্তায় সরকারি কল বসলে সেই কল থেকে কাজের বেটি পাঠিয়ে কলসি ভরে খাওয়ার পানি নিয়ে আসা হত। মা যখন ছোট, খাওয়া হত পুকুরের পানি, পুকুরে তখন গোসল করা, কাপড় ধোয়া ছিল নিষেধ। মা'র আমলের আর আমার আমলের দিনের মধ্যে বিস্তর তফাৎ, মনে মনে ভাবি। কলপারে বসে গোসল করতে করতে, গায়ে গন্ধ-সাবান মাখতে মাখতে সাবানের গন্ধের চেয়ে নাকে লাগে কাঁঠালের গন্ধ। নানির গাছে কাঁঠাল পাকছে গরমে। কাঠাঁলের গন্ধে আমার গলার ভেতরে সুরসুর করে চলে যায় পিচ্ছিল কিছু। প্রথম কাঁঠাল খেতে গিয়ে গলায় আমার আটকে গিয়েছিল রসালো কোয়া, ওয়াক করে আধ গেলা কোয়া ফিরিয়ে এনেছিলাম। এরপর থেকে মা কাঁঠাল চিপে রস বানিয়ে দুধ মুড়ির সঙ্গে খেতে দেন, ওতে গলায় আটকায় না ঠিক, কিন্তু গন্ধ সয় না আমার। মা বলেন, *এক হাতে নাক চিইপা ধর, আরেক হাতে খা।* শুনে হাসি, এ ঠিক খাটা পায়খানায় হাগার মত, চারিতে গু পড়ে, গুএর গন্ধ ঠেকাতে এক হাতে নাক চেপে রাখতে হয়।

গায়ে সাবান মাখতে মাখতে উঠোনে বসে জিভ বের করে হাঁপাতে থাকা কুকুরটিকে বলি — *এই কুত্তা, কাডল আর গুএর রঙও ত একরকম, সত্যি না?*

কুকুরের লাল জিভখানা বেরিয়েই থাকে, উত্তর নেই। এই কুকুরটির বড় দুর্নাম পাড়ায়। পাকঘরে ঢুকে পাতিলে মুখ দেয়, মাংস মুখে নিয়ে লেজ তুলে দেয় দৌড়। পাড়ার ছেলেরা একে দেখলেই ঢিল ছোঁড়ে।

সাবান মেখে লোটা ভরে পানি নিয়ে গায়ে ঢালি, আর কুকরটিকে বলি — *হজ্বে যাইবি? তর সাত খুন মাপ হইব। কবিরা গুনাও।*

কুকুরের গায়ে আমার গোসলের পানি ছিটকে পড়ে, সে কোনওরকম ঘেউঘেউএ না গিয়ে ভালমানুষের মত গা ঝেড়ে চলে যায়। ঘরে তখন নানা মক্কা থেকে আনা জমজমের পানি দিচ্ছেন খেতে বৃত্তের প্রত্যেককে। নানি দৌড়ে গেছেন পাকঘরে চিতই পিঠা বানাতে। নানা চিতই পিঠা খেতে বড় ভালবাসেন।

যে মাসে নানা মক্কা থেকে ফিরলেন, সে মাসেই বড়মামা গেলেন বিদেশ, উড়োজাহাজে করে, করাচি। করাচি থেকে ফটো পাঠিয়েছেন ঘোড়ায় চড়া, মাথায় হ্যাট, গায়ে স্যুট। নানি ছবিটি বাঁধিয়ে, টাঙিয়ে রেখেছেন ঘরে, বাঁশের ব্যাংকের পাশে। বিদেশে থাকা ছেলের ফটো দেখতেও পড়শিরা এ বাড়ি আসেন। সুলেখার মা নানির পানের বাটা থেকে পান বানিয়ে মুখে পুরে, এক চিমটি শাদা পাতা আর আঙুলে চুন তুলে জিভে লাগিয়ে, উঠোনে পিচ করে প্রথম পিচকি ফেলে এসে এদিক ওদিক দেখে, ঘরে যখন কেউ নেই, বলেছেন নানির কানের কাছে মুখ নিয়ে, ঘোমটাখানা মাথায় টেনে দিয়ে আরও, ডান হাতের বাকি সব আঙুলে চুনের আঙুল ছাড়া, সেটি খাড়া – *সিদ্দিকে শুনি কমুনিস্ট হইছে। বিদেশের চাকরিডাও কমুনিস্টির।*

পীরবাড়িতে নিয়মিত যাওয়া শুরু করার আগে মা দোযখের সাপ বিচ্ছুর কথা এত বলতেন না। নামাজও দ্রুত সারতেন, বাড়িতে বাবার ফেরার, দাদার-ছোটদার আসার, পাকঘরে চিনেমাটির থাল ভাঙার শব্দ হলেও মা নামাজের ফরজ পড়ে সুন্নত আর পড়তেন না, জায়নামাজ গুটিয়ে উঠে পড়তেন। আর এখন বাড়িতে তুফান বয়ে গেলেও মা ধ্যানে বসে থাকেন, সুন্নত না পড়লেও চলে কিন্তু মা'র পড়া চাই। মোনাজাত ততক্ষণ করা চাই, যতক্ষণ না মা'র মনে হয় তিনি প্রাণ মন সব ঢেলে দিতে পেরেছেন, এবং আস্থা হয় যে আল্লাহ তাঁর মোনাজাত কবুল করবেন, সাপ বিচ্ছুর কামড় থেকে বাঁচাবেন। সাপ বিচ্ছুর ব্যাপারটি আমার মাথায় কিলবিল করে, দোযখ মানে হচ্ছে বিশাল এক গর্ত, গর্তে আগুন জ্বলছে, সাপ বিচ্ছু কামড়াচ্ছে মানুষদের, আর আল্লাহতায়ালা শাদা মুখ, শাদা দাড়ি, শাদা পাজামা পাঞ্জাবি টুপি পরে ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে দেখছেন ওপর থেকে আর খুশিতে হা হা করে হাসছেন, সিনেমার খারাপ লোকদের মত। এর মধ্যে আমার আবার কুঁচ বরণ কন্যা, বেহুলা, রূপবান সিনেমাগুলো দেখা হয়েছে। মা সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন ক'দিন। ইস্কুল থেকে দেখিয়েছে *দর্শন* আর *কাবুলিওয়ালা।* সিনেমায় খারাপ লোকেরা মানুষকে কষ্ট দিয়ে আরাম পায়, দেখেছি। মা'কে সাহস হয় না বলতে যে আল্লাহ নিশ্চয় খারাপ লোক, না হলে মানুষকে কষ্ট দেওয়ার কথা এত বলেন কেন! তবে আঙুলে তুড়ি বাজিয়ে বলি – *দোযখে যদি ওঝারা যায়, তাইলে ত সব সাপগুলারে বশ কইরা ফালাইব। সাপ খেলা দেখ নাই? ওঝা যা কয়, সাপ তাই শোনে!*

আমি এ সময় বাংলা ইংরেজি বিজ্ঞান পড়া, পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়ে তরতরিয়ে ক্লাস ডিঙোনো, দাদাদের বালিশের তলে রাখা বড়দের গল্পের বইও গোগ্রাসে পড়ে ফেলা মেয়ে। মা নামাজ পড়তে আদেশ করলে, কলপাড়ে বসে অযু করে, কাপড়ে মাথা ঢেকে, মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে, হাঁটু ভেঙে, বসে, বিড়বিড় করে যা বলতে হয় আরবি ভাষায়, যেহেতু তার অর্থ কখনও বুঝিনি, মা'কে বলি – *ইস্কুলে মাস্টাররা বলে না বুইঝা কোনও কিছুই মুখস্ত করতে নাই, গাধা ছাত্রীরা মুখস্তবিদ্যা আওড়ায়, আর ভাল ছাত্রীরা বুইঝা পড়ে, পইড়া নিজের ভাষায় লেখে। ধর, আরবিতে না পইড়া বাংলায় নামাজ পড়লে অসুবিধা কি, আল্লাহ কি বাংলাভাষা জানে না?*

মা ফুঁসে উঠে বলেন – *এত কথা কইবি না। তুই আমারে আরে জ্বালাইস না। কত আশা ছিল মেয়ে একটা পবিত্র দিনে জন্মাইছে, মেয়ে নামাজ রোজা করব। ঈমানদার হইব।*

মা এড়িয়ে যান প্রশ্ন।

তিনি অন্ধকার একলা ঘরে *আল্লাহু আল্লাহু* বলে ডানে বায়ে মাথা ঝাঁকিয়ে জিকির করতে নামছেন ইদানীং। স্বর আনতে হয় *কলব* থেকে, গলার স্বরে চলবে না। ঘন্টা পেরিয়ে যাবে, আল্লাহু থামবে না। আল্লাহু চলবেই। আল্লাহু আল্লাহু। সারা ঘর কেঁপে উঠবে শব্দে। ঘরের বেড়াল ভয়ের চোটে এক দৌড়ে পাঁচিলের ওপর গিয়ে বসে থাকবে। সেই অদ্ভুত শব্দে পোষা কুকুর ঘেউ ঘেউ রব তুলবে। মা তবু থামবেন না, কারণ জিকির যাঁরা করেন, তাঁদের কাঁধ থেকে পাখা গজায়, তাঁরা এই জগত থেকে উড়ে আরেক জগতে পৌঁছে যান, সে জগতে কেবল এক আল্লাহ আছেন, আর আছেন জিকিরঅলা, সাত আসমানের ওপর। আল্লাহ তাঁর জিকিরি বান্দার চিবুক উঁচু করে ধরে ঠোঁটে গাঢ় চুমু খান, দেখে বান্দা মুর্ছা যান মুহূর্তে। আল্লাহকে দেখতে আমিরুল্লাহর মত লাগে, কখনও ছোটবেলার জায়গির মাস্টারের মত, কখনও বা লম্বা আলখাল্লা পরা সুলতান ওস্তাদজির মত। মা মাথা ঝাঁকান জোরে, না আল্লাহতায়ালা নওমহলের হুজুর বা অঙ্কের মাস্টার বা সুলতান ওস্তাদজির মত হওয়ার কথা নয়, আল্লাহর কোনও আকার থাকতে নেই, আল্লাহ নিরাকার। আল্লাহ আকার হয়ে যত দেখা দেন, তিনি তত মাথা ঝাঁকিয়ে মনের ভূত তাড়ান। বেড়াল বসেই থাকে পাঁচিলের ওপর।

বাবা, মা'র জিকির করার সময়ে, এক বিকেলে অসময়ে বাড়ি ফিরে, এদিক ওদিক উৎস খুঁজতে খুঁজতে শব্দের, সন্ধান পান।

যে বাবা আমার ঘরে এসে ছাত্রাণাম অধ্যয়নং তপ, সংস্কৃত শ্লোক না আওড়ে তাঁর বাণী শুরু করেন না, তিনি সেদিন বলেন, এক হাত কোমরে, আরেক হাত প্যান্টের পকেটে – *তর মা কি পাগল হইয়া গেল নাকি! এইসব কি করে?*

আমি রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর বইটি ভুগোল বই মেলে আড়াল করে, চোখ রেখে বঙ্গোপসাগরে, বলি – *মা জিকির করতাছে।*

– বেহেসতের জন্য মানুষটা বেহুঁশ হইয়া গেছে। সমাজ সংসার ফালাইয়া আল্লাহরে ডাকলে কে কইছে আল্লাহ খুশি হয়? কবি বইলা গেছেন কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর, মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতে সুরাসুর।

বাবা আমার পড়ার টেবিলের দিকে দু'পা এগিয়ে আসেন। ওপরের বইখানা দুহাতে চেপে রাখি যেন আবার তলেরটি কোনও ফাঁক ফোকর দিয়ে বাবার চোখে না পড়ে।

–লেখাপড়া মন দিয়া কর। জীবনের এইটাই সম্বল। তোমার সম্বল তুমি আমারে দিয়া দিবা না, তোমারই থাকবে। আমি কষ্ট করে লেখাপড়া করছি, ইস্কুল থেইকা ফিইরা গরু চড়াইতে হইত আমার, রাত্রে কুপি জ্বালাইয়া লেখাপড়া করে ক্লাসে ফার্স্ট হইতাম। তোমাদের যেন কোনও কষ্ট না হয়, সেই ব্যবস্থা আমি করে দিছি। মন দিয়া লেখাপড়া কর, যেন ফার্স্ট হও। বইএর প্রথম পাতা থেইকা শেষ পাতা পর্যন্ত ঠোঁটস্থ কইরা ফালাও।

বাবার বাণীর কোনও উত্তর নেই, নীরবতা ছাড়া।

মা জিকির শেষ করে বেরিয়ে আসেন অন্ধকার থেকে আলোয়। মা'র ফোলা চোখ, ভোঁতা নাক, কালো ঠোঁট, হাড় বেরোনো গাল তৃপ্তিতে হাসে।

বাবার চলে যাওয়ার শব্দ পেয়ে ওপরের ভুগোলকে তলে পাঠিয়ে তলেরটিকে ওপরে নিয়ে আসি। পাঠ্য বইএর বাইরের কোনও বই পড়লে মাও ধমকাতেন আগে। সেদিন ফিরেও তাকালেন না আমি *পাঠ্য* কি *অপাঠ্য* পড়ছি। মা'র কাছে দুনিয়াদারির সব বিদ্যাই অপাঠ্য।

মা হাসি মুখে নিয়ে অপ্রকৃতিস্থের মত হেঁটে যান উঠোনের গোলাপ গাছের কাছে, গোলাপে হাত বুলোন। ডালের কাঁটা হাতে ফোঁটে মা'র, ফুঁটুক, *কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল বুলোতে!* হাত বুলোতে বুলোতে মা'র মুখের হাসি বেড়ে কানের লতি অবদি পৌঁছোয়, দু'গালের হাড়ের ওপর সুপুরির মত গোল হয়ে জমা মাংস। বই থেকে চোখ তুললেই খোলা দরজা, দরজার ওপাশে ছত্রিশ রকম ফুল ফলে ছাওয়া উঠোন, সেই উঠোনে মা আর পাঁচিল থেকে নেমে আসা বেড়াল, গালে মা'র সুপুরি হাসি। গভীর অরণ্যে ধাবমান হরিণের দ্যুতির মত মা'র হাসিটি আমাকে টেনে নেয় গোলাপ গাছের কাছে।

— *কি মা, ফুলে হাত বুলাও কেন!*

আমার প্রশ্ন শেষ হতে না হতেই মা বলেন — *আল্লাহ কি সুন্দর লাল রং দিছেন ফুলের, পাপড়িগুলা কি পাতলা কি নরম, পরতে পরতে পাপড়ি বসানো, এক মাপের, কুনো ছুটো বড় নাই। কী সুন্দর গন্ধ, কোনও মানুষের ক্ষমতা আছে এমন একটা ফুল বানানোর! আল্লাহর যে কত দান!*

মা এত বিভোর হয়ে থাকেন ফুলের সৌন্দর্যে যেন জীবনে প্রথম তিনি কোনও ফুল দেখছেন, ফুলের গন্ধ শুঁকছেন। যেন প্রথম আজ জেনেছেন যে আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি এই আসমান ও জমিনের যা কিছু, সব। মা বলেন — *একটা ফুলের থেকে আরেক ফুল ভিন্ন, একটা ফুলের থেকে আরেক ফুলের সুবাস ভিন্ন। পাতাগুলা হরেক রকম হরেক গাছে। একটা থেকে আরেকটা ফলের স্বাদ ভিন্ন। কী অসীম ক্ষমতা আল্লাহতায়ালার।*

ফুল থেকে চোখ তুলে মা আমার চোখে তাকান কিন্তু আসলে আমাকে তিনি দেখেন না, দেখেন মুখের ডৌলে সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা। মুখ থেকে চোখ যায় আকাশে, সেখানেও ক্ষমতা, মা'র মুখে মিষ্টি হাসি, মা জগত সংসারের অনেক উর্ধে।

সন্ধে হচ্ছে, মা এখন ঘরে যাবেন, আয়াতুল কুরশি পড়ে ফুঁ দেবেন ঘরগুলোয়, এতে বালা মুসিবত দূর হবে। কিন্তু বালা মুসিবত আসলে দূর হবে না। কারণ আকাশে কুন্ডুলি পাকাচ্ছে কালো মেঘ। গুড়ুম গুড়ুম শব্দে এক মেঘ আরেক মেঘকে গুঁতোচ্ছে। ঘুর্ণিঝড় শুরু হয়ে যাবে কিছু জানান না দিয়ে, ছুটে যাওয়া কিশোরীর চুলের মত উড়বে নারকেল গাছের পাতা। জাম গাছের ডাল ভেঙে পড়বে পেয়ারা গাছে, পেয়ারা গাছের ডাল লটকে থাকবে আম গাছে। আমের মুকুল ঝুরঝুর করে ঝরে পড়বে উঠোনে। ঝড়ে কারও বাড়ির টিনের চাল উড়ে এসে পড়বে আমাদের কাঠাল গাছের মাথায়। শেকড় উপড়ে থুবড়ে পড়ে থাকবে আমাদের আতা গাছ, কাঁঠালি চাপার গাছ। মা তখন আল্লাহর দরবারে চিৎকার করবেন *আল্লাহ গো এই ঝড় থামাও।* জিকির করা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া মা, রোজা করা, কোরান পড়া মা, ঘাড় অবদি চুল কাটা, নবীজির বিবিদের কায়দায় পোশাক

পরা, বেহেসতের টিকিট প্রায় হাতে পাওয়া মা'র কান্না এক আকাশ থেকে দুই আকাশে ওঠে, বড়জোর তিন কি চার আকাশে, সাত আকাশে ওঠার আগেই মা'র কান্না ধপাশ করে পড়বে নিচে, পড়বি পড় ঝড়ের ঘাড়ে। দরজা জানলা সেঁটে, ডাল ভাঙা চাল ভাঙা প্রায় দালান ভাঙা শব্দে কাতর হয়ে আমি, ইয়াসমিন, মণি মা'কে ঘিরে থাকব, মা ওপরঅলার সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন বলে। মা সশব্দে আওড়াতে থাকবেন — *ওয়া ক্বীলা ইয়া আরদুবলায়ী মাআকি ওয়া ইয়াসামাউ আক্বলিয়ী ওয়া গীদাল মাউ ওয়া কুদিআল আমরু ওয়াসতাওয়াত আলাল জুদিয়্যি ওয়া ক্বীলা বুদাল্লিল কাওমিজ জালিমীন।*

মা, হঠাৎ, অন্তত আমাকে, তাজ্জব করে দিয়ে বলবেন — *তর বাবা না জানি কই, নোমানকামাল না জানি কই!*

মা'কে আবার সেই আগের মা বলে মনে হবে। স্বামী ছেলেমেয়ের জন্য উতলা, আকুল। যেন ঝড়ে মচকে গেছে মা'র অসংসারি চরিত্র।

কপাল ঠুকে মেঝেয়, যেন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছেন মা কালিকে, বলবেন — *ওরা যেইখানেই থাক, ওদেরে বাঁচাও আল্লাহ।*

ঝড় থামবে আরও পড়ে, আমার মন বলবে এ ঝড় থামাতে মা'র বা আল্লাহ তায়ালার কোনও হাত ছিল না। আমার মন কেন এ কথা বলবে, আমি তার বুঝব না কিছু। আমি হাতড়াব খুঁজতে মনের শরীর, খুঁজে পাব না।

কিন্তু কাল বৈশাখি গেলে, জ্যৈষ্ঠ গেলে, আষাঢ়, শ্রাবণ গেলে, পৌষ মাঘ ফাল্গুন গেলে পাব, চৈত্রে গিয়ে। চৈত্রে গিয়ে মা'র আলমারিতে পাব অনুবাদ কোরানের। পড়ব। কারণ আমার জানার ইচ্ছে ছিল যা পড়ি তার মানে, সুরা ফাতিহা, সুরা নিসা, লাহাব, এখলাসের মানে। আরবির তলে বাংলা, মুখোশের তলে মুখ।

কাঠ ফাটা রোদ বাইরে। সারা পাড়া ঝিমোচ্ছে নিঝুম দুপুরের হাঁটুতে মাথা রেখে। পা ছড়িয়ে রকেট ঘুমোচ্ছে বারান্দায়। গাছগুলোও ঝিমোচ্ছে হাত পা অবশ ফেলে রেখে। মণি ছাদের সিঁড়িতে বেলগাছের ছায়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে, বালতির ভেজা কাপড় বালতিতে পড়ে আছে, ছাদের দড়িতে নাড়া হয়নি এখনও। আমার এক হাতে তেঁতুলের গুলি, জিভে চাটছি, আরেক হাতে কোরানের তরজমা। পড়তে পড়তে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে, *চাঁদের নিজস্ব আলো আছে! পৃথিবী স্থির হয়ে আছে, পাহাড়গুলো পৃথিবীকে কিলকের মত আটকে রেখেছে, তাই পৃথিবী কোথাও হেলে পড়ছে না।* আমি একবার দু'বার তিনবার পড়ি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ি। ডান কাতে বাম কাতে মাথা রেখে পড়ি। কিন্তু, পৃথিবী তো স্থির নেই, পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে।

কোরানে তাহলে ভুল লেখা! নাকি ইস্কুলের বইয়ে যা লেখা, তা ভুল।

আমি ধন্দে পড়ি।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে কিছু নেই তাহলে! পাহাড়ের কারণে কি পৃথিবী হেলে পড়ছে না ডানে বামে! কিন্তু বিজ্ঞান বইয়ে পড়েছি পৃথিবী চব্বিশ ঘন্টায় একবার নিজের কক্ষপথে ঘোরে। পৃথিবী তো হেলছেই তবে!

কে সত্য! বিজ্ঞান না কোরান?

হাতের তেঁতুল হাতেই থাকে। আমি থ হয়ে বসে থাকি মেঝেয় পা ছড়িয়ে, হাঁটুর ওপর খোলা পড়ে থাকে বই। বাইরের লু হাওয়া এসে জানালার নীল পর্দাগুলো ওড়ায়, চুল ওড়ায়, বইয়ের পাতা ওড়ায়।

আমার মনও ওড়ে। উড়তে উড়তে যত দূরে যায় তত তার আকার বাড়ে আর নিজের অস্তিত্বটি হতে থাকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র। আমি পড়ে থাকি একটি বিন্দুর মত একা, অসহায়, নিষ্পন্দ। ঘুঘুর ডাকে আবার সজাগ হই, চোখের তারা নড়ে। নড়ে নড়ে দেখতে থাকে *পুরুষের পাঁজরের একটি হাড় থেকে বানানো হয়েছে তার সঙ্গিনী। মেয়েদের ঘাড়ের একটি হাড় বাঁকা, তাই তারা সিধে কথা বলে না, সিধে পথে চলে না। মেয়েরা হচ্ছে শস্যক্ষেত্র, পুরুষেরা যেমন ইচ্ছে গমন করবে, মেয়েরা স্বামীর অবাধ্য হলে স্বামী তাদের বিছানা থেকে তাড়াবে, তারপর বোঝাবে, তারপরও অবাধ্য হলে পেটাবে। মেয়েরা বাপের সম্পত্তির ভাগ পাবে তিন ভাগের এক ভাগ, পুরুষেরা পাবে দুইভাগ। পুরুষেরা এক দুই তিন করে চারটি বিয়ে করতে পারে। নারীদের সে অধিকার নেই। পুরুষেরা তালাক দিতে পারে কেবল তিনবার তালাক উচ্চারণ করেই। নারীদের অধিকার নেই তালাক দেবার। সাক্ষী দিতে গেলে এক পুরুষ সমান দুই নারী।*

চাঁদের নিজস্ব আলো আছে কি নেই, সূর্য ঘুরছে কি থেমে আছে, পৃথিবী থেমে আছে কি ঘুরছে তা আমি না হয় নিজের চোখে দেখিনি, কিন্তু মানুষে মানুষে তফাৎ কেন হবে, নারী এবং পুরুষে! ছোটদা আর আমি পাড়ার এক চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রের জানালায় উঁকি দিয়ে আস্ত একটি নরকঙ্কাল দেখেছিলাম ঘরে ঝুলছে। কঙ্কালটি, ছোটদা বলেছিলেন, মেয়েরও হতে পারে, ছেলেরও। দু'শ ছ'টি হাড় আছে মানুষের শরীরে। ইস্কুল মাস্টাররাও বলেন সে কথা। দাদার ঘাড় আর আমার ঘাড়ে তফাৎ তো কিছু দেখি না! তাঁরটি যেমন সোজা, আমারটিও। তাঁর বরং হাড় ফোটানোর অভ্যেস আছে। হাত পায়ের আঙুল টেনে ফোটান, ঘাড় ধরে হেঁচকা টান দেন ডানে বামে, মটমট করে হাড় ফোটে, পিঠের হাড়ও ফোটান গা মুচড়ে। কেবল নিজের হাড় ফুটিয়ে দাদার মন ভরে না, অন্যের হাড়ও তাঁর ফোটানো চাই। আমাকে ঠেসে ধরে ঘাড়ের হাড় ফুটিয়ে দেন, একই রকম শব্দ হয় হাড় ফোটার। দাদার কিংবা ছোটদার বুকের যতগুলো হাড়, আমারও ততগুলো। বাবার পাঁজরে যতগুলো, মা'র পাঁজরেও। বাবার বুকে তো একটি হাড় কম নেই, যা দিয়ে মা'কে বানানো হয়েছে! এক লোকে যদি চার বিয়ে করে, তার পাঁজর থেকে চারটি হাড় কমে যাবে! আমার বিশ্বাস হতে চায় না। নানা যে হঠাৎ এক মেয়েকে বিয়ে করে বাড়িতে পনেরোদিন রেখেছিলেন, নানার সে সঙ্গিনীকেও কি নানার পাঁজরের হাড় দিয়ে বানানো হয়েছে!

সাক্ষী দিতে হলে দু'জন নারী দরকার হয় কেন যেখানে পুরুষের বেলায় একজন হলেই চলে! নারী কি সত্য কথা বলে না! কেবল পুরুষই কি সত্য বলে! শরাফ মামা কি সত্যবাদী! ঝুনুখালার সোনার দুল শরাফ মামা বলেছিলেন নেননি। সে দুল শেষ অবদি পাওয়া গেছে তাঁর লুঙ্গির গিঁটের ভেতর। ঘুমোচ্ছিলেন, গিঁট আলগা হয়ে বেরিয়ে এসেছিল দুলদুটো। নানি দেখে সরিয়ে রেখেছিলেন। শরাফ মামা ঘুম থেকে উঠেই বাড়ি ছেড়ে পালালেন। তাঁকে খুঁজে পেয়ে মারধোর করা হবে না এই শর্ত দিয়ে ফেরত আনা হয়েছিল বাড়িতে।

বাপের সম্পত্তির বেশির ভাগ পাবে ছেলে, মেয়ে পাবে কম ভাগ, কেন এই অবিচার! এ বাড়িতে দাদার অধিকার আমার চেয়ে এক ভাগ বেশি হওয়ার কারণ কি! দাদাও যেমন সন্তান, আমিও তেমন। তফাতের মধ্যে এই, দাদার নুনু লম্বা, আমার নুনু চ্যাপ্টা। *বুদ্ধিসুদ্ধি* মা মাঝে মধ্যেই বলেন, *নোমানডার এক্কেবারে নাই।* তবুও দাদার ভাগে বেশি, কারণ একটিই, তাঁর নুনু। যে কোরানকে চুমু দিয়ে নামাতে হয়, তুলতে হয়, সে কোরানে এমন বৈষম্যের কথা লেখা, আমার বিশ্বাস করতে মন চায় না। কোরান পড়তে আমার ইচ্ছে না হতে পারে, কিন্তু কোরানে মন্দ কথা লেখা আছে এরকম আমার কখনও মনে হয়নি আগে। আল্লাহও তাহলে সমান চোখে দেখেন না মেয়েদের! আল্লাহও তাহলে গেঁতুর বাবার মত, গেঁতুর মা'কে বেদম পেটাতো, গেঁতুর মা তার হুকুম মানে না, তাই। গেঁতুর মার চিৎকারে যেদিন পুরো আকুয়া পাড়া কাঁপছিল, আমি ফেলু মামার পেছন পেছন দৌড়ে, বাঁশঝাড়ের তল দিয়ে গেঁতুর মার উঠোনে থেমেছিলাম। আরও লোকের ভিড় ছিল উঠোনে। হাঁটুর ওপর লুঙ্গি, গা খালি, পা খালি, ঘাম ঝরছে দরদর করে গা বেয়ে ঠান্ডার বাপের গরম জিলিপির দোকানের সামনে দই মাঠা বিক্রি করা কদম ছাটা চুলের হোঁদল কুতকুতে চোখের গেঁতুর বাবার।

হারামজাদি মাগী, শইল্যো তর তেল বাইড়া গেছে, নুন ছাড়া রাইন্ধা থস, আবার কাইজ্যা করস! বলতে বলতে পিঠে পেটে মুখে লাথি মারছে সে গেঁতুর মা'র, চুলোর ভেতর থেকে আগুনজ্বলা খড়ি এনে পেটাচ্ছে সারা গায়ে, ছ্যাঁত ছ্যাঁত করে গেঁতূর মা'র গা পুড়ছে, গেতুঁর মা কাটা মুরগির মত লাফাচ্ছে, উঠোনে ভিড় করা লোকের দু'হাত আড়াআড়ি করে পেটের ওপর রাখা, পিঠের ওপর রাখা, বাহুর শেকলে বাহু বাঁধা। আঙুলের ভেতর আঙুল ঢুকোনো হাত মাথার পেছনে রাখা, মাথার ভর হাতে অথবা হাতের ভর মাথায়। মেয়েদের ডান হাতে ঠোঁট ঢাকা, বাম হাতে কনুই ধরা ডান হাতের, কনুইয়ের ভর বাম হাতে। কারও বাম হাত ঝুলে আছে কাঁধ থেকে, ডান হাতের ভর কোমরে। চোখগুলো হাতের মত অলস নয় কারও, চোখ গিলছে গেঁতুর বাপের *গায়ের জোর,* গেতুঁর মা'র নাক মুখ মাথা থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত। এরপর যে কান্ডটি করেছিল গেতুঁর বাবা দেখে ভিড়ের হাতগুলো মাথা থেকে কোমর থেকে পেট থেকে পিঠ থেকে মুখ থেকে ধীরে ধীরে খসে পড়ে, ঝুলে থাকে, আঙুলগুলো থোড় থেকে বের হওয়া কচি কলার মত। উঠোনের মাঝখানে যুদ্ধ জয়ের মত দাঁড়িয়ে বলেছিল *তরে আমি তালাক দিলাম মাগী, এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, বাইন তালাক।*

জবাই করা মুরগি তখন আর নড়ছে না, কাতরাচ্ছে না। চোখগুলো উৎসুক। চোখগুলোয় ক্ষিধে। পরনের কাপড় ছিঁড়ে ত্যানা ত্যানা গেতুঁর মার, রোদে পোড়া উড়ো খুড়ো লাল চুল ধুলো কাদায় মাখা। এক এক করে চোখ সরে যাচ্ছে, হাত সরে যাচ্ছে, পা সরে যাচ্ছে ভিড়ের। শেষ উত্তেজক দৃশ্যের পর বায়োস্কোপের *যবনিকা পতন* ঘটলে তো তাই হয়। ছোট শনের ঘর, চালের ওপর লতিয়ে ওঠা লাউ শাক, এক চিলতে গোবর জলে লেপা উঠোন, উঠোনে পড়ে থাকা তালাক হয়ে যাওয়া গেঁতুর মা। লোকের চোখের ক্ষিধে মিটেছে। শেষ দৃশ্য পেছনে রেখে লোক সরে যাচ্ছে। ফেলু মামাও সরে যাচ্ছেন, ফেলু মামার পেছন পেছন সরে যাচ্ছি আমি।

সরে যাওয়া লোকের মুখে খই ফুটছে তখন, *নুন দিছে না তরহারিত, জামাই চেতব না তো কি করব! বেডিডাও আছিল আস্তা কাইজ্যাকুড়নি, অহন বুঝব মজা! গেতুঁর বাপের খেদমত করে নাই মাগী, হুত্যা থাকছে; উঁচ কপাইল্যা চিরন দাঁতি, রাইত পুহাইলে হারায় পতি।* গেতুঁর মা শেষ দৃশ্য থেকে উঠে এসে পুকুর ঘাটে বসে সারাদিন বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদেছে। কেউ আর ভিড় করেনি তাকে দেখতে। কেবল জানালায় থুতনি রেখে আমি তাকিয়ে ছিলাম বর্ষায় জল ভরে উপচে ওঠা পুকুরের দিকে। ঘাটে বসে গেঁতুর মা কাপড় কাচত, গায়ে কাপড় কাচা সাবান মেখে ডুব দিয়ে গোসল সারত, গোসল সেরে ভেজা কাপড়ে সপ সপ করে হেঁটে ঘরে ফিরত, হাতে ঝুলে থাকত জল নিংড়ানো কাচা কাপড়। সেই পুকুর ঘাট খালি পড়ে আছে, গেতুঁর মা আর গেতুঁর বাবার লুঙ্গি গেঞ্জি কাচছে না, গেতুঁর মুতের কাঁথা কাচছে না, পুকুর পুকুরের মত পড়ে আছে একা, খলসে মাছ খলসে মাছের মত, গেঁতুর মা বসে থাকে গেতুঁর মা'র মত নয়, উঁইএর ঢিবির মত।

মা আমাকে ধমকে জানলা থেকে সরান — *ছেড়িডার খালি ছুডুলুকের দিকে নজর।*

নানির বাড়ির সবাই বস্তির মানুষদের *ছোটলোক* বলে। আর দালানে থাকা মানুষদের বলে *বড়লোক।* বড়লোকেরা বাড়ি এলে নানির বাড়িতে বড় ঘরের গদিঅলা চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়, শেমাই পায়েস রান্না করে গরম গরম খেতে দেওয়া হয় পিরিচে করে, চামচে তুলে তুলে বড়লোকেরা শেমাই পায়েস খায়। পায়েস খেয়ে কাচের গ্লাসে টিউবয়েলের পানি। পানি খেয়ে চিনেমাটির কাপে চা, চায়ের সঙ্গে গ্লুকোস বিস্কুট। ছোটলোকেরা এ বাড়ি এলে মেঝেয় বসে, পিরিচে করে তাদের শেমাই খেতে দেওয়া হয় না, চা বিস্কুটও না।

গেতুঁর মা'কে তালাক দেওয়ার সাতদিনের মাথায় কুতকুত খেলার বয়সী এক মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে তোলে *ছোটলোক* গেঁতুর বাবা। মা শুনে বলেছিলেন — *গেঁতুর বাপটা একটা আস্তা শয়তান। গেঁতুর মারে খামাকা তালাক দিল।*

ফুলবাহারির জামাইয়ের চার বউ ঘরে। মা বলেন — *ফুলবাহারির জামাইডা বড় বদমাইশ। কত্তগুলা বিয়া করছে।*

মা বাবাকেও বলেন বাবার নাকি হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, কোনও একদিন রাজিয়া বেগমকে বাবার বিয়ে করার সম্ভাবনা আছে বলে। কিন্তু মা'র এ কেমন আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানা! পুরুষকে আল্লাহ অবাধ অধিকার দিয়েছেন যখন ইচ্ছে বউকে তালাক দেওয়ার, যখন ইচ্ছে বিয়ে করার, *এক দুই তিন করে চারটে।* ওরা তো আল্লাহর বেঁধে দেওয়া নিয়মের মধ্যেই চলছে। মা কি সাহসে ওদের গাল দেন তবে! আল্লাহর আদেশ এ কেমন মাথা পেতে নেওয়া তবে মা'র! মা কি জানেন মা যে নিজেই গুনাহ করছেন!

আমার হাঁটুর ওপর পড়ে থাকে বই, লু হাওয়ায় পাতা ওড়ে বইয়ের, জানলার পর্দা ওড়ে, ফিনফিনে চুল ওড়ে। আমার মনে হতে থাকে আমি যক্ষের ধন দেখেছি কারও, গোপনে। গোপনে দেখেছি মোহর ভরা কলসির গলায় পেঁচিয়ে থাকা সাপ। কলসিতে মোহর আছে বলেই জানে লোকে! আসলে কি মোহর, নাকি কলসি খালি। *খালি কলসি বাজে বেশি।*

মা'কে খুব কমই দেখেছি আমাদের সঙ্গে বসে ভাত খেতে। বাড়ির সবাইকে খাইয়ে বেলা চলে গেলে নিজে খান। আমরা খেয়ে যে খাবার বাঁচে, তা। মুরগি রান্না হলে মা'র ভাগে গলার হাড়, বুকের হাড়, পিঠের হাড়। মা খেয়ে যা থাকে, খায় চাকর চাকরানি। না থাকলে ক্ষতি নেই, ওদের খাবার আলাদা রাঁধা হয়, মাছ মাংস আমাদের, কাজের মেয়েদের জন্য *পাইন্যা ডাল*, শুঁটকি। এরকমই নিয়ম, এ নিয়ম নানির বাড়িতেও ছিল, নানিও খেতেন নানাকে খাইয়ে, ছেলেদের খাইয়ে, বাচ্চাকাচ্চা খাইয়ে, পরে। সবার খাওয়া হলে কাজের লোক খেত। পান্তা ভাত, নুন মরিচ দিয়ে, নয়ত নষ্ট হয়ে যাওয়া ডাল মেখে। আমরা যখন খাই, মা কখনও কোনও কাজের লোককে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেন না। ওরা নাকি আমাদের খাবারে *নজর* দেয়। সাত বছর বয়সে একদিন পেট কামড়াচ্ছে রাতে, মা বললেন *ফুলবাহারিডারে দেখছিলাম হাঁ কইরা দেখতাছে তুই যহন খাস। ওর নজর লাগছে।*

মা নানির ঘর থেকে তিনটে পান এনে সর্ষের তেল মেখে পানগুলো এক এক করে আমার সারা পেটে ছুঁইয়ে আনছিলেন বলতে বলতে *উইঠ্যা আয় বাও বাতাসের নজর, ফুলবাহারির নজর,* এসব। পেট থেকে নজর তুলে নিয়ে পান তিনটে একটি কাঠিতে গেঁথে কুপির আগুনে পুড়িয়ে মা বললেন – *নজর পুড়লাম।*

নজর কি মা? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

মা বললেন *কারও কারও চোক্কের নজর লাগে খুব। একবার ভিক্ষা করতে আইছে এক বেডি, উঠানের তাজা পাইব্যা গাছটার দিকে চাইয়া কইল আহা, কত পাইব্যা ধরছে! বেডি দরজার আড়াল হইতেই গাছটা পইড়া গেল। গুঁড়ি ধইরা কেউ লাড়ে নাই, ঝড় নাই, বাতাস নাই– চোক্কের সামনে আপনাসে পইড়া গেল গাছ।*

ফুলবাহারি তর খাওনের দিকে বুধয় চাইয়া কইছে আহা কি মজার খাওন! নজর পোড়ানোর পর ব্যথা কমে গেল। অবশ্য বাবা ওষুধ দিয়েছিলেন খেতে। মা বললেন *নজরডা পুড়াইছি বইলা পেডের বেদনা ভালা হইছে।*

আকুয়া পাড়ায় তিন বেটির চোখ ছিল নজরের, মা বলেন। তারা যেদিকে তাকাত, গাছের দিকে হলে গাছ মরত, মানুষ হলে সে মানষ এমন অসুখে পড়ত যে শ্বাস ওঠে প্রায়। তিন বেটিকে দেখলে পাড়ার মানুষ দুয়োর এঁটে বসত। নানির বাড়ির দুটো গাছ প্রায় মরতে বসেছিল, তিন বেটির একজনের কাছ থেকে *পানি পড়া* এনে গাছের গোড়ায় ঢেলে বাঁচানো হয়েছিল গাছ। নানির মা, মা'দের দাদি, কুকুরে কামড়ালে পেটে কুকুরের বাচ্চা যেন না হয় সে ওষুধ দিতেন। সবরি কলার ভেতর, কেউ জানত না কি দিয়ে বানানো, গোল মরিচের মত দেখতে জিনিসটি পুরে খাইয়ে দেওয়া হত। সেটিই ওষুধ। ওষুধ খাওয়ার পর নিষেধের মধ্যে একটিই ছিল, কোনও সবরি কলা খাওয়া চলবে না তিন মাস। ওষুধে কাজ হত, মানুষের পেট থেকে আর কুকুরের বাচ্চা বেরোত না। পাড়ার কেউ কেউ নানির মা'র কাছ থেকে *কলার ওষুধ* নিয়ে যেত। বেশির ভাগ লোক খাওয়াত *সাত পুকুরের পানি।* সাতটি পুকুর থেকে এক আঁজলা করে পানি তুলে খাইয়ে দিলেই

কুকুর কামড়ানো রোগীর জলাতঙ্ক রোগ সারত, মানুষের পেটে মানুষের বাচ্চাই ধরত, কুকুরের নয়। আমাকে কুকুর কামড়ানোর পর সাত পুকুরের পানিও খাওয়ানো হয়নি, মা'দের দাদি তখন মরে সারা, কলার ওষুধও হয়নি। পেটে ইনজেকশন দিচ্ছেন বাবা, দিলে কি হবে, শরাফ মামা হাততালি দিয়ে বলতেন *পেটে তর কুত্তার বাচ্চা। হাঃ হাঃ।* আমার ভয় হত খুব। পেট টিপে টিপে দেখতাম কুকুরের বাচ্চা সত্যিই বড় হচ্ছে কি না ভেতরে। বরইএর বিচি গিলে ফেললে শরাফ মামা বলতেন *মাথা দিয়া বরই গাছ গজাইব।* আমি ঠিক ঠিকই মাথায় হাত দিয়ে পরখ করতাম, বরই গাছের কোনও চারা চাঁদি ফেটে উঠছে কি না। মাথায় মাথায় *ঠুস* লাগলে বলা হত, শিং গজাবে, আরেকটি ঠুস ইচ্ছে করেই দিতে হত, দুটো হলে নাকি আর গজায় না। ফকরুল মামার মাথার সঙ্গে কলপাড়ে এক ঠুস লাগার পর আমি আর দ্বিতীয় ঠুসে যাইনি, এই মামাটিকে আমার বরাবরই বড় দূরের মনে হত, ঈশ্বর গঞ্জ থেকে আমরা সপরিবার ফিরে এলে ফকরুল মামাকে বড় মামা ঢাকায় নিয়ে গিয়েছিলেন লেখাপড়া করাতে। ঢাকা থেকে মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ফিরেছেন, বড় মামা করাচি থেকে ফিরলে আবার গিয়ে কলেজে ভর্তি হবেন। ঢাকায় থাকা মানুষকে আমার আকাশের তারা বলে মনে হত, চাইলেই ছোঁয়া যায় না। ফকরুল মামা নিজেও ঠিক বোঝেননি টিউবয়েলের হাতলে নয়, লেগেছিল আমার মাথার সঙ্গে তাঁর মাথা। তিনি কলপাড়ে বসে উঁবু হয়ে মাথায় *বাংলা সাবান* মাখছিলেন, চোখ বুজে রেখেছিলেন সাবানের ফেনা যখন মাথা গড়িয়ে মুখে নামছিল, আর আমি গিয়েছিলাম বদনি ভরে পানি আনতে। শিং গজায় কি না দেখতে আয়না হাতে বসেছিলাম পুরো বিকেল, গজায়নি। শরাফ মামাকে জানালে প্রায় প্রতিদিনই বলতে লাগলেন আজ না হোক কাল গজাবে। শরাফ মামা যাই বলুন, শিং আমার সে যাত্রা গজায়নি।

ফকরুল মামা গোসল টোসল করে ধোয়া লুঙ্গি আর শার্ট পরে বিকেলে দাঁড়িয়েছিলেন কুয়োর পাড়ে নানা এক পুঞ্জি রেখেছিলেন পাটশুলার, তার পাশে। পুঞ্জির দিকে এমন মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকার কারণ কি মা জিজ্ঞেস করতে ফকরুল মামা বলেছিলেন – *না, ভাবতাছিলাম, যদি আগুন ধরাইয়া দেওন যাইত পুঞ্জিত, দেখতাম কেমনে কইরা পুড়ে।*

মা নানিকে গলা ছেড়ে ডেকে বললেন *ফকরুলের কান্ড দেইখা যান মা, কী কয়। পুঞ্জিত আগুন লাগাইতে চায়।* নানি চা বানাচ্ছিলেন, শুনে হাসলেন। নানি বিকেলে বড়দের জন্য চা বানান, মিটসেফের ভেতর থেকে কৌটো খুলে টোস্ট বিস্কুট দেন চা'র সঙ্গে। সন্ধের মুখে পুঞ্জিতে ঠিকই আগুন লাগল। খোঁজ পড়ল ফকরুল মামার। তিনি নেই বাড়িতে, চা বিস্কুট খেয়ে হাঁটতে গেছেন রাস্তায়। কার দোষ, সব্বনাশটি কে করেছে এসব প্রশ্নে না গিয়ে নানি কুয়ো থেকে বালতি বালতি পানি তুলে আগুনে ঢাললেন, ফটফট করে ফুটতে ফুটতে আগুন নারকেল গাছের চুড়ো অবদি উঠল। নানির পানিতে কোনও কাজ হল না। কুয়োর পাড়ের গাছগাছালি পুড়ে গেল। ফকরুল মামা ফিরে এসে পুঞ্জিতে আগুন লাগার কাহিনী শুনে মুষড়ে পড়লেন – *হায় রে, এত ইচ্ছা আছিল পুড়লে কেরম লাগে, দেখি। আর আমিই কি না দেখতে পারলাম না।* দোষ পড়ল গিয়ে ফুলবাহারির ওপর। টুটু মামা সাক্ষী দিলেন তিনি দেখেছেন ফুলবাহারি কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছে। বিড়ি খেয়ে নিশ্চয় সে পুঞ্জির ওপর ফেলেছে বিড়ির পুটকি। ফুলবাহারিকে *কিলিয়ে ভর্তা* বানাবেন বললেন মা, তাকে বলে দেওয়া হল এ বাড়িতে আর বিড়ি খাওয়া চলবে না

তার। ফুলবাহারি বিড়ি খাওয়া ধরেছিল আবার, খেত পাকঘরের বারান্দায় বসে। মুখ ভর্তি বসন্তের দাগঅলা সেই কালো মৈসাপের মত দেখতে ফুলবাহারির জন্য, যার কাঁধে বাড়ির সব অপকর্মের দোষ পড়ত, হঠাৎ আমার মায়া হতে থাকে পাজামা পরার বয়সে পৌঁছে, এক সকালে ঘুম থেকে উঠে *অবকাশের* ভেতর বারান্দায় কয়লা গুঁড়ো করে দাঁত মাজতে মাজতে। ফুলবাহারি শীতের সকালে ভাপা পিঠা বানাত, সে কি স্বাদ পিঠার, ধবল পিঠার মাঝখানে খেঁজুরের গুড়, ঢাকা থাকত পাতলা কাপড়ে, ভেতর থেকে গরম ধোঁয়া উঠত। নানি বাড়ি থেকে চলে আসার পর শীত আসে, শীত যায়, ভাপা পিঠা আর খাওয়া হয় না। দাঁত মাজতে মাজতে আমার বড় ইচ্ছে করে শীতের এই কুয়াশা-ডোবা সকালে একখানা ভাপা পিঠা পেতে। শীতের সকাল যদি খেজুরের রস, ভাপা পিঠা আর কোঁচড় ভরা শিউলি ফুল ছাড়া কাটে, তবে আর এ কেমন শীত! মা আমাদের গায়ে চাদর পেঁচিয়ে চাদরের দু'কোণা ঘাড়ের পেছনে নিয়ে গিঁট দিয়ে দিতেন। কুয়াশা কেটে সূর্য উঠলে রোদ পোহাতে বের হতাম মাঠে। এ বাড়িতে শীতের রোদও পোহানো হয় না। হঠাৎ করে যেন বড় নাগরিক জীবনে চলে এসেছি। মোটা উলের সোয়েটার পরে ঘরে বসে থেকে, রুটি ডিম খেয়ে শীতের সকাল পার করতে হয়।

মণি বদনি ভরে পানি রেখে যায় আমার সামনে, যেন দাঁত মাজা শেষ হলে মুখ ধুই। ওকে বলিনি পানি দিতে, তবু। ফুলবাহারিও এমন করত, হেঁচকি উঠছে, নিঃশব্দে এক গ্লাস পানি দিয়ে যেত হাতে। হোঁচট খেয়ে পড়লাম, দৌড়ে এসে কোলে তুলে হাঁটুতে বা পায়ের নখে হাত বুলিয়ে দিত। মণি দেখতে ফুলবাহারির মত নয়, কিন্তু ওর মতই নিঃশব্দে কাজ করে, চাওয়ার আগেই হাতের কাছে কাংখিত জিনিস রেখে যায়। ওরা পারে কি করে এত, ভাবি। কাকডাকা ভোরে উঠে উঠোন ঝাঁট দেয় ওরা। নাস্তা তৈরি করে টেবিলে দিয়ে যায়। নাস্তা খাওয়া শেষ হলে থাল বাসন নিয়ে কলপাড়ে যায় ধুতে। ইস্কুলের পোশাক পরা হলে এগিয়ে এসে জুতো পরিয়ে দেয় পায়ে। জামা কাপড় ফেলে রাখি চেয়ারে টেবিলে, গুছিয়ে রাখে আলনায়। ময়লা হলে ধুয়ে দেয়। রাতে বিছানাগুলো শলার ঝাড়ুতে ঝেড়ে মশারি টাঙিয়ে গুঁজে দেয়। আমরা গুছোনো বিছানায় ঘুমোতে যাই। ঘুমিয়ে যাওয়ার অনেক পরে ওরা ঘুমোয়। রাতের বাসন কোসন মেজে, আমাদের এঁটো খাবারগুলো খেয়ে, তারপর। ঘুমোয় মেঝেয়। মশা কামড়ায় ওদের সারারাত, ওদের জন্য কোনও বিছানা বা মশারি নেই। ওদের মুখে মশার কামড়গুলো হামের ফুসকুরির মত লাগে দেখতে। শীতের রাতে লেপ নেই তোষক নেই, ছেঁড়া কাঁথা সম্বল। এরকমই নিয়ম, এই নিয়মে আমাকেও অভ্যস্ত হতে হয়, আমাকেও ওদের চড় থাপড় দিতে হয়, কিল গুঁতো দিতে হয়। রিক্সায় ওদের কোথাও নিলে পাদানিতে বসিয়ে নিই। জায়গা থাকলেও আমাদের পাশে বসার নিয়ম নেই ওদের। ওরা পরনের কাপড় জুতো পায় বছরে একবার, *ছোট ঈদে।* বাবা ওদের জন্য বাজারের সবচেয়ে কমদামি কাপড় কিনে আনেন। সবচেয়ে সস্তা সাবান পায় ওরা গায়ে মাখার। চুলে মাখার তেল পায় সস্তা সয়াবিন, নারকেল তেল দেওয়া হয় না। নারকেল তেল কেবল আমাদের চুলের জন্য। রাতে পড়তে বসি যখন, পায়ের কাছে বসে মশা তাড়ায় ওরা, হাতপাখায় বাতাস করে। পানি চাইলে দৌড়ে ওরা গ্লাস ভরে পানি এনে হাতে দেয়। আমাদের কারও জগ থেকে গ্লাসে ঢেলে পানি খাবার অভ্যেস হয়নি। হাতের কাছে পানি পেয়ে অভ্যেস। হাতের কাছে যা চাই, তাই পাই। আর

ওদের অভ্যেস আমরা যা ইচ্ছে করি, তা পুরণ করার। ওরা জন্ম নিয়েছে কেবল মনিবের সেবা করার উদ্দেশে। ওদের মৃত্যু হবে মনিবের সেবা করতে করতে। ওদের অসুখ হলে ওদের ভৎসর্না করা হয়, ওরা মরে গেলে ওদের দুর্ভাগ্যকে দায়ি করা হয়। ওরা নোংরা, আমরা পরিষ্কার। ওরা নিচুতলার, আমরা ওপরতলার। ওরা *ছোটলোক।* আমরা *বড়লোক।*

বই পড়ে বাংলা ইংরেজি গদ্য পদ্য শিখেছি। ব্যাকরণ শিখেছি। ভুগোল ইতিহাস শিখেছি। অঙ্ক বিজ্ঞান শিখেছি। সংসার আমাকে শিখিয়েছে নিচু জাত, উঁচু জাত, ছোটলোকি, বড়লোকি। বাল্যশিক্ষার *অহংকার করিও না, দরিদ্রকে ঘৃণা করিও না, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই,* সংসারে এসে অক্ষরবাক্য সমেত হোঁচট খেয়ে পড়ে। এ বড় পুরোনো নিয়ম, শোষণ, দরিদ্রের ওপর ধনীর। আমিও এই অদৃশ্য শেকলে অলক্ষে জড়িয়ে পড়ি।

মুখ ধুয়ে ঘরে আসার পর এক কাপ চা দিয়ে যায় মণি। সকালে চা খাওয়ার অভ্যেস হয়েছে সেই নানির বাড়িতেই। সকালে দু'রকম নাস্তা হত। প্রথম ছোট নাস্তা সকাল সাতটার দিকে, দশটার দিকে বড় নাস্তা। ছোট নাস্তা চা মুড়ি। চায়ের কাপে মুড়ি ফেলে চামচ দিয়ে তুলে তুলে খেতে হত। বড় নাস্তা পাতলা আটার রুটি সঙ্গে আগের রাতের মাংস, ভাজি, না হলে ডিম ভাজা, এসব।

চায়ে চুমুক দিচ্ছি, রান্নাঘর থেকে শব্দ আসে হুড়োহুড়ির, মা চড় কষাচ্ছে, লাথি বসাচ্ছে মণির গায়ে। ওর পরনে আমার পুরোনো জামাখানা একটানে মা ছিঁড়ে ফেলেন আরও। মণির দোষ, সে পাতিল থেকে মাংস চুরি করে খেয়েছে। মা'র কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার পরও ও বলছে — *মাংস বিলাইয়ে খাইছে।*

মা দাঁত খিঁচে বলেন — *বিলাইয়ে না, তুই খাইছস। তুই একটা আস্তা চুরনি। এত খাওয়াই, তারপরও তর পেট ভরে না ছেড়ি! মাংস কি তরে দেইনা! কত বড় সাহস তর যে পাতিলে হাত দেস!*

মণি মার খেয়েও স্বীকার করে না সে চুরি করেছে। মা ঝাঁটা হাতে নিয়ে ওর পিঠে ঝপাং ঝপাং মেরে বলেন — *স্বীকার কর এহনও যে তুই খাইছস।*

মা'র শাড়ি খসে পড়ে মাথা থেকে, বুক থেকে। *আব্রুর* দিকে মা'র তখন নজর নেই। মরিয়া হয়ে ওঠেন মণির স্বীকারোক্তি শোনার।

মণি অনড় দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছিল। জল পড়ছিল চোখ থেকে গাল গড়িয়ে বুকে। দৃশ্যটির মধ্যে আমি নাক গলিয়ে বলি — *কইয়া ফালা, আর খাইতাম না।*

মণি কাতর গলায় বলে — *আর খাইতাম না।*

মা থামেন। ধমকে দূরে সরতে বলেন আমাকে।

এসব লাথিঝাঁটা মণির কাছে ডাল ভাত।

পরদিনই মণি তার জীবনের ঝুড়ি খুলে বসে মা'র সামনে।

— *আমি তহন কাঁইচলা আবু। বুনি খাই। নুনি, চিনি ছুডু ছুডু। বাবা আমগোর বেবাকতারে ফালাইয়া গেল গা। রাজমিস্তিরির কাম করতে বাবা জামালপুর গেল, আর ফিইরা আহে নাই। মায়ে খবর পায়, বাবা একটা বিয়া করছে হেইনু। বিয়া করছে পুলার লাইগ্যা। একটা পুলার শখ আছিল বাবার।*

মা খানিক ঝিমোন, খানিক শোনেন। মা'র চুলের গোঁড়া থেকে লিক এনে, চামড়ায় ঘাঁপটি মেরে বসে থাকা *ঢেলা, আধাগুইড়া* এনে বাঁ হাতের নখে রেখে ডান হাতের নখে চেপে ফোটায় মণি আর বলে – *তিন মাইয়া জম্মাইছে দেইখা বাবা রাগে আর থাহে নাই। মায়ের যদি একটা পুলা অইত, বাবা যাইত না। পুলা কেমনে অইয়াইব মায়ে। আল্লাহ মায়েরে পুলা দেয় নাই। একচোখ্যা আল্লাহ আমার মা'ডার দিকে চাইল না। আল্লাহরে আর দুষ দেই ক্যা। আমার বাপটা বড় পাষাণ, পাষাণ না হইলে এইভাবে ফালাইয়া যায়! আইজকা বাপ থাকলে মানষের বাড়ি বন্দিগিরি কইরা খাইতে অইত না! বাপের ত ক্ষেমতা আছিল আমগোরে ভাত কাপড় দেওনের।*

বড় শ্বাস ফেলে ডান বাহুতে চোখের পানি মুছে মণি আবার শুরু করে – *আমার মা পড়ে আমার চাচাগোর কাছে গেল, মামুগোর কাছে গেল। দূর দূর কইরা বেবাকে খেদাইল মায়েরে। তাগো চুলায় বাত ফুটতাছিল টগবগ কইরা। কি সোন্দর সুবাস, অহনও হেই সুবাস নাহো লাইগ্যা রইছে। আমগোরে কেউ একবেলা বাত দেয় নাই। ক্ষিদায় আমি কান্দি, নুনি কান্দে, চিনি কান্দে। মায়ে পুস্কুনি থেইকা শাপলা তুইলা সিদ্ধ কইরা খাইতে দিত। বাত নাই। বাড়ি বাড়ি ঘুইরা মায়ে বাতের মাড় মাইগ্যা আনে। হুগাইয়া আমগোর শইলো হাড্ডি ছাড়া কিছু নাই। খাওন না পাইয়া নুনিডা ব্যারামে পড়ল। শিং মাছের তরহারি দিয়া বাত খাইবার চায়। কেডা দিব! মা আল্লাহর কাছে কত কানল, এক চোখ্যা আল্লাহ ফিইরা চাইল না। নুনিডা মইরা গেল। কব্বরো নুনিডারে মাডি দিবার গিয়া মায়ের যে কী কান্দন। হেষে মা কাম খুঁজল মাইনষের বাড়ি। বিবিসাইবরা ছেড়ি উলা মায়েরে কামো নেয় না। মায়ে হেল্লিগা আমারে আর চিনিরেও কামে দিল। বান্দিগিরিই আছিল আমগোর কপালে। চিনি যেই বাড়িত কাম করত, হেই বাড়ির সাইবের খাইসলত আছিল খারাপ। চিনির বুহো বুলে আত দিত। বিবিসাইব দেইখ্যা চিনিরে খেদাইয়া দিছে। মা কত বাড়িত ঘুরল চিনিরে কামে দিবার। বিবিসাইবরা হেরে রাহে না। ডরায়। কয় আমরা ডাঙ্গর মাইয়া কামে রাহি না। চিনি অহন এক বাড়িত আছে, সাইব বিদেশো থাহে, বিবিসাইব থাহে পুলাপান লইয়া একলা।*

মা বলেন – *ডাইনদিকে খাজ্যাইতাছে, উহুন পাইবি। খুঁজ।*

মণি মা'র মাথার ডানদিকে বিলি দিতে দিতে বলে – *মা আমগোর মাতার উহুন মচকা দিয়া আনত। আনহে একটা মচকা কিন্যা লইনযে, উহুন ঝুরঝুরাইয়া পড়ব।*

মণির পরনে মলিন এক জামা, জামার তলে ছেঁড়া পাজামা। বছরে দুদিন পায়ে সেন্ডেল পরে, ঈদে। ঈদের পরদিনই তা খুলে রাখতে হয়, পরের ঈদে পরার জন্য। ঈদের দিন গোসল করে জামা সেন্ডেল পরে মণি আমাদের কাছে হাতের তালু পেতে পাউডার চায়। পাউডার পেয়ে খুশিতে সে দৌড়োয় পাকঘরের ভাঙা আয়নার সামনে, মুখ শাদা করে পাউডার মাখতে। ওইটুকুন আনন্দই জোটে তার বছরে। শাদা মুখে লাজুক হেসে বাড়ির বড়দের পায়ে ঈদের সালাম ঠুকে ফিরে যেতে হয় তাকে আবার পাকঘরে, ঈদের দিনের রান্নায় দম ফেলার জো নেই, সারাদিন বড় বড় পাতিলে পোলাও মাংস রান্না চলে। সারাদিন যায় মণির ফুঁকনি ফুঁকে চুলো ধরাতে, থাল বাসন মাজতে। মণির ঈদের জামা সন্ধেবেলাতেই মশলার রঙে, ছাইয়ে, কাদায় মলিন লাগে দেখতে।

— *মায়েরে মাইনষে কইছিল,* উকুন এনে নখে টকাশ করে ফুটিয়ে মণি বলে *একটা বিয়া বইতে। জামাই আবার পলায় যদি, খেদাইয়া দেয় যদি। মায়ে বিয়া বয় নাই। আমার বেতনের টেহা জমলে, আমি মারে লইয়া, চিনিরে লইয়া গেরামো যাইয়াম গা, যাইয়া একখান ঘর তুলবাম, মুগ্গা মুগ্গি কিইনা পালবাম। মুগ্গা মুগ্গি ডিম দিব, বাইচ্চা দিব, হেইতা বাজারো বেচলে আমগো ঠিহই পুষাইব।*

মণির চোখে রাজহাঁসের মত সাঁতরায় স্বপ্ন। মাসে পাঁচ টাকা বেতন তার এ বাড়িতে। কখনও সে তার বেতনের টাকা হাতে নিয়ে দেখেনি। মা'র কাছে টাকা জমা আছে। মণির যখন বিয়ে হবে, মা বলেছেন তাকে জমানো টাকা দিয়ে সোনার দুল বানিয়ে দেবেন একজোড়া, নাকের একটি ফুলও।

— *শুনার দুল দিয়া কি করাম! বিয়া বইলে আবার জামাইয়ে পুলা না অইলে যদি খেদাইয়া দেয়! আমারে বেতনের টেহাটি দিয়া দেইনযে, যহন যাইয়াম।*

মণির চোখের ভেতর রাজহাঁস গ্রীবা উঁচিয়ে। মণির স্বপ্নের ঘরে মা তার দুই মেয়ে চিনি আর মণিকে নিয়ে মাংসের ঝোল মেখে পেট পুরে ধোঁয়া ওঠা ভাত খেয়ে নীল মশারির নিচে নকশি কাঁথা গায়ে ঘুমোয়। এর চেয়ে বড় কোনও স্বপ্ন দেখতে মণি জানে না।

সপ্তা দুই পরে বাড়িতে মা বাবা কেউ নেই, বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে দেখি পাড়ার মেয়েরাও আসেনি খেলতে, মণি বাসন মাজছে উঠোনে বসে, নারকেলের *ছুবলায়* ছাই মেখে। আমারও ইচ্ছে করে এলুমিনিয়ামের কালি পড়া বাসনগুলোকে মেজে ধবধবে শাদা বানাতে। মণির হাত থেকে পাতিল টেনে নিয়ে ছাইমাখা ছুবলায় ঘসি। ওর মুখ নীল হয়ে ওঠে আমার কান্ড দেখে, ঢোঁক গিলে বলে —*খালুজান জানলে আমারে মাইরা ফালাইব আপা। আনহে যাইন। আমারে কাম করতে দেইন।*

— *কেউ জানব না। তুই কাউরে কইস না। চল তাড়াতাড়ি মাইজা আমরা এক্কা দোক্কা খেলি।* আমি বলি।

মণির একটি চোখ খুশিতে নাচে। এক্কা দোক্কা সে হয়ত খেলেছে কখনও, এ বাড়িতে নয়। এ বাড়িতে *চাকরানি*দের খেলার নিয়ম নেই।

— *খেলবাইন আমার সাথে? খালা জানলে আমারে মারব।* মণি চারদিক তাকায়, বাড়িতে কেউ নেই জেনেও তাকায়। তার আরেক চোখে দ্বিধা।

— *কেউ জানব না। গেট খুলনের শব্দ পাইলে আমরা খেলা বন্ধ কইরা দিয়াম।* মণির দ্বিধার চোখটিতে চেয়ে বলি।

উঠোনে দাগ কেটে এক্কা দোক্কা খেলি আমি আর মণি। *বড়লোক* আর *ছোটলোক।* মণিকে এত খুশি হতে কখনও দেখিনি আমি। ও ভুলে যাচ্ছিল আমি তার মনিবের মেয়ে। যেন আমরা অনেকদিনের সই, দু'জনই আমরা ছোটলোক, অথবা দু'জনই বড়লোক। হাতে পায়ে ধুলো আমাদের। আমি কিনি এক্কা, তেক্কা, যমুনা, মণি কেনে দোক্কা, চৌকা। খেলা পুরোদমে চলতে থাকে, এমন সময় কালো ফটকে শব্দ, ছিটকে পড়ি দু'জন দু'দিকে। মণি দৌড়োয় পাকঘরে। আমি পায়ে এক্কাদোক্কার দাগ মুছে দৌড়োই ঘরে, সোজা পড়ার টেবিলে। পাকঘর থেকে তড়িঘড়ি কাচের বাসন পত্র নিয়ে মণি দৌড়োয়

কলপাড়ে, ধোবার কথা ছিল এসব। কলপারে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বেচারা, ঝনঝন করে ভেঙে পড়ে কাচের গ্লাস, চিনেমাটির থাল, বাটি কাপ শত টুকরো হয়ে।

মা দেখেন তাঁর শখের বাসনের হাল।

চুলের মুঠি ধরে টিউবয়েলের হাতলের ওপর মণির কপাল ঠোকেন মা। কেটে রক্ত ঝরে কপাল থেকে। হাতলের গায়ে লেগে থাকে রক্ত। মণি ফ্যাকাসে চোখে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। সে দিনই মণিকে বিদেয় করে দেওয়া হয়। দুটো ছেঁড়া জামা আর ঈদের সেন্ডেল পুঁটলিতে বেঁধে চোখের জল মুছতে মুছতে মণি মা'কে বলে — *আমার বেতনের টেহাটি দেইন খালা।*

মা বলেন — *কত বড় সাহস তর বেতনের টেহা দাবি করস! তুই আমার বাসন কিইনা দে, ভাঙছস যেইডি। তর বেতনের জমা টেহা দিয়া আমার বাসন কিনতে অইব। দূর অ। দূর অ আমার চোক্কের সামনেথে।*

মণি দূর হয় পুঁটলি বগলে করে। দু'বছরে এ বাড়ি থেকে তার অর্জন দুটো ছেঁড়া জামা আর একজোড়া কাল ফিতের সেন্ডেল। মণি তার মায়ের কাছে যাবে, মা তাকে অন্য কোনও বাড়িতে কাজে দেবে আবার পাঁচ টাকা মাসে। মণি আবার স্বপ্ন দেখবে। আমি বারান্দার থামে হেলান দিয়ে মণির চলে যাওয়া দেখি। ও মিলিয়ে যেতে থাকে অন্ধকারে। ওকে পেছন ফিরতে দেখি না। ফুলবাহারিও এরকম চলে গিয়েছিল একদিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে, পেছন ফেরেনি। সন্ধে থেকে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। কুয়াশায় ভিজে যেতে থাকে ঘাস মাটি, ভিজতে থাকি আমি। চোখের পাপড়িগুলোয় শিশির জমে আমার। প্রফুল্লদের বাড়ি থেকে শিউলি ফুলের গন্ধ এসে আমাদের আঙিনা ভরে যায়।

মা দুনিয়া দারি ছেড়ে দিতে চান, কিন্তু হাঁড়ে মজ্জার দুনিয়াদারি তাঁকে ছেড়ে কোথাও যায় না। চিনেমাটির থাল বাটি আর কাচের গ্লাসের জন্য মা এমনই কাতর হন যে মাগরেবের নামাজেও তিনি মন বসাতে পারেন না।

বারান্দায় বসে কুঁ কুঁ করে কাঁদতে থাকে *রকেট।* মা জায়নামাজে বসে চেঁচান — *কুত্তাডারে দূর কর। কুত্তা থাকলে বাড়িত ফেরেসতা আয়ে না।*

মিশনারির এক পাদ্রী যুদ্ধের পর দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার দিন তাঁর কুকুরটিকে দিয়ে গেছেন ছোটদাকে, ছোটদা গিটার শিখতে যেতেন মিশনারির কাছে এক বাড়িতে, যাওয়ার পথে প্রায়ই দেখতেন বিশাল এক কুকুর পাদ্রীর পেছন পেছন হাঁটছে, ছোটদা কুকরটির দিকে বিস্ময়- চোখে তাকিয়ে থাকতেন। কুকুর বল মুখে নিয়ে দৌড়োত, পাদ্রী হাত বাড়িয়ে দিলে সেও ডান পা তুলে দিয়ে *হ্যান্ডশেক* করত। সেই কুকুর আমাদের বাড়ি আসার পর হৈ চৈ পড়ে গেল। রকেট বলে ডাকলেই কুকুর রকেটের মত দৌড়ে আসে। হাত বাড়ালে কুকুরও হাত বাড়ায়। বাবা বললেন — *বাড়িতে কুকুর একটা দরকার আছে। কুকুর চোর খেদাইব।* বাবা কসাইখানা থেকে সস্তায় হাড়গোড়অলা একধরনের মাংস কিনে আনেন রকেটের জন্য, জলে সেদ্ধ করে ওগুলো ওকে দেওয়া হয় খেতে। রকেটের আবার বাজে অভ্যেস, ফাঁক পেলেই ঘরের সোফায় গিয়ে শোয়। বিছানায় কাদা পায়ে ওঠে। নানিবাড়িতেও কুকুর দেখেছি, ঠিকানাহীন কুকুর, রাস্তায় ঘুরত, ক্ষিধে পেলে আজ এ বাড়ি কাল ও বাড়ি গিয়ে বিরস মুখে বসে থাকত, ফেলে দেওয়া এঁটোকাঁটা লেজ নেড়ে নেড়ে খেয়ে গাছের ছায়ায় ঘুমোত। ওসব কুকুর লোকের লাথি খেত, ঢিল খেত,

গাল খেত। আর রকেট দেখি মানুষের মত আরাম চায়। গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে লেজ নাড়ে খুশিতে। কিন্তু মা বলে দেন – *কুকুর হইল নাপাক জিনিস, নাপাক জিনিসরে দূরে রাখ।* ব্যস রকেটের ঘরে আসা বন্ধ, বারান্দায় ঘুমোবে দিনে, রাতে শেকল ছেঁড়ে দেওয়া হবে, চোর তাড়াবে। রকেট চোখের আড়ালে থাকে দিনের বেলা, টিনের ঘরের বারান্দায়, কে যায় ওদিকে! হাবিজাবি জিনিসপত্র থাকে ও ঘরে। সারাদিন এমন হয় রকেটের ফুটো টিনের থালা খালি পড়ে থাকে। মা ভুলে যান রকেটকে খাবার দিতে। রাতে কুঁ কুঁ শব্দে কাঁদে রকেট।

ইস্কুল থেকে ফিরে আমি প্রায়ই জিজ্ঞেস করি – *রকেটরে খাওয়া দিছ?*

মা বলেন – *দিছি।*

– *কহন দিছ? মনে হয় ক্ষিদা লাগছে রকেটের, আবার দেও।*

আমার *নাপতানিতে* মা রাগেন। – *তর এত খোঁজ লওয়া লাগব না কহন দিছি। কুত্তা কহন কি খাইব না খাইব তা আমি বুঝবাম।*

রকেটের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মন বলে রকেট খায়নি। আধপেট খেয়ে আমার থালের খাবার মা'কে লুকিয়ে রকেটের ফুটো টিনের থালে ঢেলে দিই, রকেট লেজ নেড়ে মুখ ডুবিয়ে খায়। মুহূর্তে খেয়ে শেষ করে আরও খাওয়ার আশায় লেজ নাড়তে থাকে।

বাবাও হঠাৎ হঠাৎ বলেন – *কুকুরটা শুকাইয়া যাইতাছে। ওরে খাওয়া দেও না নাকি!*

মা বাবার ওপরও রাগেন। দাঁতে দাঁত ঘসে বলেন –*খাওয়া আমি দিতাছি। খাওয়ার উপরে খাইলে কুত্তার শইলের লুম পইড়া যাইব। অত দরদ থাকলে নিজে রাইন্দা খাওয়াইও।*

রকেট শুকিয়ে যেতে থাকে। পেট মিশে যেতে থাকে পিঠের সঙ্গে। রকেট আবার নিজে শেকল খুলে বেরিয়ে আসতে শিখেছে, বেরিয়ে কালো ফটক খোলা পেলে সোজা চলে যায় রাস্তার ময়লা খুঁটে খেতে। রাস্তার কুকুর দল বেঁধে রকেটকে কামড়ায়। এক পাল নেড়ি কুত্তা আর একা *এলসেসিয়ান। এলসেসিয়ান* হেরে যায়। রকেটের গায়ে ঘাঁ হতে থাকে। মা বলেন – *কুত্তার অসুখ হইছে। ভাত খাইলে বমি করে। কুত্তারে আর ভাত দেওয়া ঠিক না।*

ছোটদা তাঁর গিটারে সুর তোলেন, শিস দিতে দিতে রাস্তায় হাঁটেন, পাশের বাড়ির ডলি পাল শিস শুনে তাদের জানালায় এসে দাঁড়ায়। বন্ধুরা বাড়িতে আসে আড্ডা দিতে, আড্ডা দিয়ে চুলে টেরি কেটে বন্ধুদের সঙ্গে ছোটদা বেরিয়ে যান বাইরে। রকেটের খবর নেওয়া আর তাঁর হয়ে ওঠে না।

কুত্তা থাকলে বাড়িত ফেরেসতা আয়ে না, মা'র চিৎকার আমাকে এতটুকু নড়ায় না। যেমন আমি দাঁড়িয়েছিলাম, তেমন থাকি। যেন আমি শুনিনি মা কি বলছেন। যেন এ বাড়িতে ফেরেসতা আসুক না আসুক আমার কিছু যায় আসে না। যেন আমি ঝিঁঝির ডাক শুনছি খুব মন দিয়ে। *গল্পের বই গেলা এক উদাসীন মেয়ে আমি,* মা প্রায়ই আক্ষেপ করেন। আমি আজ না হয় সত্যিই উদাসীন। পথ হারিয়ে মণি যদি ফিরে আসে, গোপনে অপেক্ষা করি এক উদাসীন মেয়ে, কুয়াশায় ভিজে।

মণিকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর মা দু'দিন ডাল ভাত রাঁধেন, একাই। মেজাজ খচে থাকে মা'র, বাবা বাড়ি ফিরলেই চেঁচান — *ছেড়িগুলারে পাকঘরে আইতে দেয় না। অগোর কি বিয়া শাদি অইব না? জামাইরে রাইন্ধা খাওয়াইতে অইব না? বাপের বাড়ি থাইকা সব মেয়েরাই রান্দা শিহে। আর এইগুলান বেডার লাহান চলে।*

বাবা কেশে গলা পরিষ্কার করে বলেন — *এরা লেখাপড়া করে। পাকঘরে কাম করব ক্যা? কাম করার মানুষ রাখি নাই? আমার মেয়েরা যেন পাকঘরের ধারে কাছে না যায়। লেখাপড়া নষ্ট হইব।*

— *লেহাপড়া কইরা,* মা বলেন, *উল্ডাইয়া দিতাছে এহেকটা। বাপ না থাকলে ঘরে, সারাদিন ছেড়িরা খেলে। কামের মানুষ খুজো। আমার একলার পক্ষে রান্ধাবাড়ি সম্ভব না। যে কামের ছেড়িই আয়ে, কাম কাজ শিখ্যা যহন একলাই পারে সব করতে, তহন যায় গা।*

মা রান্নাঘরে যাওয়া বন্ধ করে দেন, চুলোয় আগুন ধরে না। কেউ জানে না কে খড়ি চিড়বে, কে মশলা বাটবে, থাল বাসন মাজবে! রান্না করবে! কাপড়চোপড় ধোবে! ঘরদোর ঝারু দেবে! বাবাকে বোঝানো হয় সংসার অচল হয়ে আছে। তিনি ভাত চাইলে বলে দেওয়া হয় *কামের মানুষ নাই, কেডা রানব ভাত!* এদিকে, মা, বাবা যেন না জানেন, আমাদের খেতে দেন, বাড়িতে ভিখিরি এলে একবেলা খাবার দেবেন চুক্তিতে মশলা বাটিয়ে, থালবাসন ধুইয়ে, ভাত রাঁধিয়ে, আনাজপাতি কাটিয়ে, রাঁধেন।

শেষ অবদি নতুন বাজারের উদ্বাস্তু এক মেয়েকে, শুয়ে ছিল ফুটপাতে, ডেকে তুলে নাম ধাম জিজ্ঞেস করে বাবা নিয়ে আসেন বাড়িতে।

আপাতত, বলেন বাবা, *রাখো।*

আপাতত হলেও মা পরীক্ষা নিতে বসেন। মা চেয়ারে বসে ভেতর বারান্দায়, মেয়েটি কাঠের থাম ধরে দাঁড়িয়ে। বয়স আট নয় হবে, নাক বেয়ে সর্দি ঝুলছে, ছাতা পড়া গা, চুল রোদে পুড়ে লাল, পরনে একটি ময়লা হাফপ্যান্ট কেবল, একসময় শাদা ছিল বোধহয় এর রং, এখন মেটে রঙের, পুরু কাদা জমে শুকিয়ে আছে পায়ে। ঠ্যাংএর চামড়া খরার মাটির মত ফাটা। মা তেতো গলায় জিজ্ঞেস করেন — *কি নাম তর?*

— *রেনু।* মেয়ে নাকের সর্দি টেনে ফিরিয়ে নিয়ে নাকে, বলে।

— *কি কি কাম পারস?* মা জিজ্ঞেস করেন।

রেনু কথা বলে না। উঠোনের গাছগাছালি দেখে, হাঁস মুরগি দেখে।

মা রেনুর আগামাথায় তীক্ষ্ন চোখ ফেলে আবার জিজ্ঞেস করেন — *কুনোদিন কাম করছস কারও বাড়িত?*

রেনু মাথা নেড়ে বলে — *না।*

—*তর মা বাপ নাই?* ধমকে শুধোন।

—*মা আছে। বাপ নাই।* রেনু নির্বিকার বলে, যেন বাবা মা থাকা না থাকা বড় কোনও ঘটনা নয়।

মা মিঠে স্বরে জিজ্ঞেস করেন — *আরও ভাই বইন আছে?*

— *নাহ।* যায় আসে না ভঙ্গিতে, রেনু।

— *মশলা বাটতে পারবি? কাপড় ধুইতে?*

রেনু ঘাড় কাত করে, পারবে।

মা নাক কুঁচকে, রেনুর গা থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে বলেই কি না, বলেন —*ভাত রানতে পারস?*

রেনু আবার ঘাড় কাত করে, পারে।

পরীক্ষায় পাশ হয় রেনুর। রেনু বহাল হয়ে যায়। মা তাকে কলতলায় পাঠান সাবান মেখে, গায়ের ময়লা তুলে গোসল করতে। গোসল সারলে হাতের তালুতে তেল ঢেলে দেন চুলে মাখার। আমার পুরোনো একখানা জামা পরতে দিয়ে বাসি ডাল দিয়ে পান্তা খেতে দেন। খেয়ে রেনুকে ঘর ঝাড়ু দিতে বলেন, ঘর ঝাড়ুর পর মশলা বাটা, ভাত রাঁধা। মা রেনুর কাজ লক্ষ করেন আড়াল থেকে।

বাড়িতে কাজের লোক একটি গেলে আরেকটি আসে। মণি গেলে রেনু আসে। এক *ছোটলোক* গিয়ে আরেক *ছোটলোক।* ছোটলোকে শহর ভতি। হাত বাড়ালেই ছোটলোক। আমাদের আরাম আয়েশে কোনও ছেদ পড়ে না।

রেনুর হাতে সংসার তুলে দিয়ে মা পীরবাড়ি যান। মজলিশ শুনে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে বাড়ি ফেরেন। দুনিয়াদারির *মা বাপ* তুলে গাল দেন, আবার ভাত রাঁধতে গিয়ে জাউ করে ফেললে রেনুর গালে কষে চড় কষান।

মা'র মেজাজ এই ভাল, এই খারাপ। কাজের লোক মা'র মেজাজের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে এ বাড়িতে। মা'র ভালবাসাও হঠাৎ হঠাৎ উপচে পড়ে। রেনুকে *কায়দা* পড়াতে বসেন রাতে। রেনু আরবি অক্ষরে হাত রেখে পড়ে *আলিফ বে তে সে।* আমার পুরোনো জামা একটির জায়গায় দুটো চলে যায় রেনুর দখলে।

বড়র পিরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণে চাঁদ।

এ বাড়িতে রেনুর খাপ খাওয়ানোর আগেই রকেট মরে পড়ে থাকে বারান্দায়। মা বাবাকে খবর পাঠান মেথর ডেকে আনতে, *মরা কুত্তাডারে বাইরে ফালাইতে।*

বাবা তাঁর ওষুধের দোকানের এক কর্মচারি পাঠিয়ে দেন। সে রকেটের গলায় দড়ি বেঁধে টেনে বাড়ির বাইরে নিয়ে যায়। উঠোনের মাটির ওপর দাগ পড়ে য়ায় রকেটের যাওয়ার। আমি দৌড়ে গোসলখানায় যাই, কাঁদতে। এই একটি জায়গা আছে বাড়িতে, নিজেকে লুকোনো যায়। রকেট আর রকেটের মত ছুটে আসবে না ডাকলেই। হাতে বিস্কুট নিয়ে দাঁড়ালে দৌড়ে এসে লাফিয়ে বিস্কুট নেবে না মুখে। আমরা রাস্তায় বেরোলে রকেটও বেরোত, পাড়ার লোকেরা হাঁ হয়ে আমাদের এলসেসিয়ান দেখত। মোড়ে গিয়ে বলতাম *রকেট বাড়ি যা,* আমাদের বাধ্য খোকা এক দৌড়ে বাড়ি ফিরে যেত। সেই রকেট না খেতে পেয়ে, অসুখে ভুগে, ছলছল চোখে আমাদের দেখতে দেখতে চুপচাপ মরে গেল। কেউ তাকে পশু হাসপাতালেও একদিন নিয়ে গেল না। আমি এ বাড়ির *ঢেঙ্গি ছেড়ি,* আমি নাক গলালে গাল শুনতে হয়। তাই নিজের নাক কান ঠোঁট সাধ্যমত গুটিয়ে রেখেছিলাম।

রকেট মরে যাওয়ার পর নতুন একটি কুকুরের বাচ্চা নিয়ে এলেন মা নানি বাড়ি থেকে। দিশি কুকুর। ওকে *রকেট* নামে ডাকার ইচ্ছে ছিল, মা বললেন এর নাম *পপি।* মা যা বলেন, তাই, পপি। পাবনায় এক কারাপালের কুকুরের নাম পপি ছিল, মা'র শখ তাই পপি রাখার। মা ছাগল পোষেন, কবুতর পোষেন, মুরগি পোষেন, এখন কুকুর। মা তাঁর

পপিকে এখন খাওয়ান দাওয়ান। এখন আর তেমন বলেন না *কুত্তা নাপাক জিনিস, কুত্তা থাকলে বাড়িত ফেরেসতা আসে না।* দেখতে দেখতে পপি মা'র খুব ন্যাওটা হয়ে পড়ে। মা এখন পপির মণিব। মা নিজের পাত থেকে পপির থালে মাংস তুলে দেন। পপিকে খেলা শেখাতে চাই, শেখে না, ছুঁড়ে দেওয়া বল লাফিয়ে মুখে নিতে পারে না। পপি একখানা শাদামাটা চোর তাড়ানো কুকুর হয়ে ওঠে। মা শাদামাটা কুকুরকে আদরযত্ন করেন, রেনুকেও করেন। রেনু মা'র গা টিপে দেয় রাতে। বিলি কেটে দেয় চুলে। মা তাকে আরবি অক্ষর শেখানো শেষ করে বাংলা অক্ষর শেখাতে শুরু করেন। তবু রেনু বিনিয়ে বিনিয়ে ফাঁক পেলেই কাঁদে, তার মা'র জন্য *পরান পোড়ে।*

এত করলাম তারপরও কান্দস, মা বলেন, *বান্দির জাত বান্দিই থাকবি। বাড়ি বাড়ি বান্দিগিরি কইরাই তর খাইতে অইব।*

বাবা রেনুর *ঘাড় ত্যাড়ামির* খবর শুনে তার মা'কে খুঁজে পেতে নিয়ে আসেন বাড়িতে। মা'কে বলেন — *রেনুর মায়েরেও রাখো। মায়ে ভারি কাম করব, আর ছেড়ি করবে ফুটফইরমাশ।*

রেনুর মা'র জন্য পরদিন বাবা একটা ছাপা সুতি শাড়ি কিনে আনেন। মা শাড়িটির বুনট দু'আঙুলে পরখ করে বলেন *কাপড়ডার বাইন বড় ভালা। দামি কাপড়। এরম কাপড় আমিও বছরে দুইডা পাই না।*

কাজে লাগা অবদি রেনুর মা'কে উঠতে বসতে ধমকান মা। বাবা বাড়ি ফিরলে বলেন — *এই বেডির স্বভাব চরিত্র ভালা না।*

—*ক্যান কি করছে?* বাবার চোখে কৌতূহল।

—*বাজার লইয়া দোহানের কর্মচারি আইছিল দুপুরে, দেহি ফিসফিস কইরা কথা কয় হের সাথে।* মা বলেন — *একখান ব্লাউজ দিছি পিনতে। পিন্দেনা। ব্যাডাইনের সামনে বুক দেহাইয়া হাডে।*

বাবা চুপ করে থাকেন।

বাবার চুপ হয়ে থাকা দেখলে মা'র গা জ্বলে।

মাস পার হয় রেনু আর তার মা'কে দিয়েই, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। মা আবার অসময়ে বাড়ি ফিরতে থাকেন, জায়নামাজে বসে *জিকির* করতে থাকেন আল্লাহর। সংসারে এই আছেন তিনি, এই নেই। রেনুর মা'র হাতে অলক্ষে চলে যায় গোটা সংসারের ভার। তেল লাগবে কি নুন লাগবে, কালিজিরা কি এলাচি, রেনুর মা'র কাছেই জিজ্ঞেস করেন বাবা। অবসরে সে চুল বাঁধে, গুনগুনিয়ে গান করে। মা'র দেখে এত রাগ হয় যে বলেন — *গান কইর না রেনুর মা। কামের মানুষ কাম করবা। মুখ বুইজা করবা।*

রেনুর মা গুনগুন থামায়।

সে সময়ই এক রাতে, যে রাতে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেলে শরৎচন্দের *দেবদাস* পড়ে কেঁদে কেটে বালিশ ভিজিয়ে তোষকের তলায় নিরাপদে বইটি রেখে সবে ঘুমিয়েছি, ভীষণ শব্দে ধড়ফড়িয়ে উঠি। শব্দটি ঠিক কিসের প্রথম অনুমান হয় না। কান পেতে থেকে বুঝি মা'র চিৎকার, সেই সঙ্গে দরজায় শব্দ, ধুড়ুম ধুড়ুম। কোনও বন্ধ দরজা ঠেলছে কেউ। জোরে। ভাঙতে চাইছে। বাড়িতে কি ডাকাত এল! আমার হাত পা অবশ

হতে শুরু করে, গা ঘামতে। শ্বাস বন্ধ করে শুয়ে থাকি আশংকায়। চোখ বুজে, যেন অঘোরে ঘুমোচ্ছি, যেন গলায় কোপ বসাতে মায়া হয় চোর ডাকাতের। কেউ দৌড়োচ্ছে বারান্দায়। আরও একজন কেউ। তীব্র চিৎকার বারান্দার দিকে আসছে। কেউ একজন গলা চেপে কথা বলছে, কাকে, কি, বোঝার সাধ্য নেই।

ঘুম আমার যেমন ভাঙে, ইয়াসমিনেরও। ও ফিসফিস করে বলে — *কী হইছে বুবু?*

— *জানি না।* অস্ফুট স্বরে বলি।

বুকের ভেতর ধুমধুম করে হাতুড়ি পড়ে আমার। ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। বারান্দার দাপাদাপি কমে এলে দাদাকে, ছোটদাকে ঘুম থেকে তুলে যে খবরটি দেন মা, তা চোর ডাকাতের নয়। বাবার। বাবা ধরা পড়েছেন রাত আড়াইটায় রান্নাঘরে রেনুর মা'র বিছানায়। মা'র পাতলা ঘুম, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে ঘরগুলোয় হেঁটে হেঁটে পরখ করছিলেন দরজা জানালা সব বন্ধ আছে কি না, চোরের উপদ্রব যেহেতু, তাই করেন উঠে। বাবার ঘরের দরজাখানা বারান্দায় যাওয়ার, দেখলেন মা, সিটকিনি খোলা। মশারি তুলে দেখলেন বাবা নেই বিছানায়। পেশাবখানায় খুঁজলেন, বাবা নেই। বারান্দায়, নেই। রান্নাঘরের ভেতর থেকে শব্দ আসছে কিছুর। কান পেতে শুনলেন ভেতরে বাবার গলা আর চৌকির, রেনুর মা যে চৌকিতে বিছানা পাতছে গত সাতদিন ধরে, মটমট আওয়াজ।

এত রাতে বাবা শুতে গেছেন রান্নাঘরে রেনুর মা'র সঙ্গে! আমি মশারির চাঁদির দিকে চেয়ে থাকি নিস্প্রাণ। আমার পাশে ইয়াসমিন শুয়ে থাকে বড় বড় চোখ মেলে, নিশব্দে।

দুনিয়াদারি ছেড়ে দেওয়া মা বিনিয়ে বিনিয়ে সারারাত কাঁদেন। মা'র কান্নার সঙ্গে জেগে থাকে আমার, ছোটদার, দাদার আর ইয়াসমিনের দীর্ঘনিঃশ্বাস।

পীরবাড়ি ২

পীরবাড়িতে ঢুকলে আমার গা ছমছম করে। এ বাড়ির সবগুলো গাছই, আমার আশংকা হয়, জ্বিন ভূত পেত্নীর বাসা। কখন কোন গাছের তল দিয়ে যাওয়ার সময় জ্বিন লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে কে জানে, মা'র আঙুল শক্ত করে ধরে পীরের ঘরের দিকে হাঁটি। আসলে আমি হাঁটি না, মা হাঁটেন, আমাকে হাঁটতে হয়। মা মুরিদ হয়েছেন পীরের। শাড়ি ছেড়ে জামা পাজামা ধরেছেন। মা'কে মা বলে মনে হয় না।

পীরের ঘরে বসে আছেন ছ'সাতটি মেয়ে, পরনে ওদের পায়ের পাতা অবদি ঝুলে থাকা লম্বা জামা, মাথায় ওড়না। জামাগুলো শরীরের সঙ্গে এমন মিশে থাকে যে দূর থেকে দেখলে মনে হয় উদোম গায়ে বুঝি ওরা। একজনের পরনে কেবল শাড়ি। গলায় তাবিজ ঝুলছে চারটে। মাথায় ঘোমটা টানা। খুব বিমর্ষ মুখ তাঁর। পীরের পায়ের ওপর দু'হাত রেখে তিনি বলেন

— *পুলা না হইলে স্বামী আমারে তালাক দিব হুজুর।*

খুব ধীরে কথা বলেন পীর আমিরুল্লাহ, কথা যখন বলেন পাঁচ আঙুলে দাড়ি আঁচড়ান। ছাদের কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলে, চোখে অপার মায়া, বলেন

আল্লাহর নাম লও, আল্লাহ ছাড়া দেওয়ার মালিক কেউ নেই, আমি তো উছিলা মাত্র। মাঝরাতে জিকির করবে। তিনি পরওয়ার দেগার, দো জাহানের মালিক, তার কাছে কাঁদো আলেয়া। না কাঁদলে তার মন নরম হবে কেন, বল! বান্দা যদি হাত পাতে, সেই হাত আল্লাহ ফেরান না। তার অসীম দয়া।

আলেয়া উপুড় হয়ে পায়ের ওপর, যেন সেজদা করছেন, ডুকরে কেঁদে ওঠেন। ছেলে হওয়ার শর্তে তিনি মাঝরাত কেন, সারারাতই জিকির করবেন। আমিরুল্লাহ দাড়ি থেকে হাত সরিয়ে আলেয়ার পিঠে রাখেন, কড়িকাঠ থেকে নামিয়ে আলেয়ার ঘোমটা খসে বেরিয়ে আসা চুলে চোখ রেখে বলেন *আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, নিরাকার, সর্বশক্তিমান। তার আদি নেই, অন্ত নেই। তার পিতামাতা পুত্রকন্যা নেই। তিনিই সবকিছু দেখেন অথচ তার আমাদের মত চক্ষু নেই। তিনি সবই শোনেন, অথচ তার কর্ণ নেই। তিনি সবকিছুই করতে পারেন অথচ আমাদের মত তার হাত নেই। তিনি সর্বত্র সর্বদা বিরাজিত। তিনি আহার করেন না, নিদ্রা যান না। তার কোনও আকৃতি নেই। তার তুলনা দেওয়া যেতে পারে এমন কোনও বস্তু নেই। তিনি চিরদিনই আছেন এবং চিরদিনই থাকবেন। তিনি সকলের অভাব পূরণ করেন, তার নিজের কোনও অভাব নেই। তিনি চিরজীবিত, তার মৃত্যু নেই, ধ্বংসও নেই। তিনি পরম দাতা, অসীম দয়ালু। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ইজ্জতের মালিক, মানুষকে তিনি ইজ্জত দান করেন। তুমি তার দরবারে হাত ওঠাও, তোমার নিশ্চয় ছেলে হবে, সমাজে তোমার ইজ্জত রক্ষা হবে।*

মা'র পেছনে জড়সড় দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিরাকার শরীরটির কথা ভাবি। এ অনেকটা আমাদের ইস্কুলে যাদু দেখাতে আসা লোকটির মত, কালো কাপড় দিয়ে তাঁকে ঢেকে ফেলা হল, পরে কাপড় সরালে যাদুকর আর নেই ওতে। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন।

আমারও যদি নিরাকার শরীর থাকত, সারা শহর ঘুরে বেড়াতাম, ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে একা একা চলে যেতাম, কেউ আমার ঘাড় খুঁজে পেত না ঘরে ঠেলার।

নতজানু আলেয়ার উপুড় হওয়া শরীরের তল থেকে পীরসাব পা সরিয়ে নেন। যুবতীদের ভিড় থেকে হুমায়রা ছুটে এসে আলেয়াকে ধরে উঠোনে নিয়ে যায়। জবা গাছ তলে দাঁড়িয়ে আঁচলের গিঁট খুলে ভাঁজ করা নোট বার করে হুমায়রার হাতে দেন আলেয়া। হুমায়রা মুঠোর ভেতর নোটটি নিয়ে পীরসাবের হাতে গুঁজে দেয়, অভিজ্ঞ হাত। টাকা এক হাত থেকে আরেক হাতে যায়। অনেকটা *রিলে রেসের* মত। পীরসাব তাঁর আলখাল্লার পকেটে ঢুকিয়ে দেন টাকার হাতটি, ওটিই আপাতত চলমান ক্যাশবাক্স। পকেটে ঢোকানো হাতটির ওপর চোখ গেঁথে থাকে আমার। আমার চোখের পাতায় তীক্ষ্ণ চোখ রেখে — *হামিমা, সঙ্গে কে তোমার, মেয়ে নাকি!* পীর বলেন।

মা আমার বাহু টেনে সামনে এনে বলেন — *জ্বি হুজুর। এই মেয়ে জন্মাইছে বারই রবিউল আওয়ালে। মেয়ে আমার সাথে দাড়ায়া নামাজ পড়ে। কায়দা সিফারা পইড়া সাইরা কোরান শরিফ ধরছে। এরে এট্টু দুয়া কইরা দিবেন হুজুর, যেন মেয়ে আমার ঈমানদার হয়।*

মা আমার পিঠ ঠেলে বলেন — *যা হুজুরকে কদমবুসি কর।*

আমি গা শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকি। কদমবুসি করার জন্য এক পাও এগোতে ইচ্ছে করে না আমার। মা গা ঠেলেন আমার, আবারও। আমি এক পা দু'পা করে পেছোতে থাকি। মুখে শাদা লম্বা দাড়ি, পায়ের গোড়ালি অবদি আলখাল্লা, মাথায় আল্লাহু লেখা গোল টুপি লাগানো পীর থাবা বাড়িয়ে খপ করে ধরেন আমাকে, যেন গাছ থেকে টুপ করে পড়া একটি চালতা ধরছেন মুঠোয়। আমাকে তাঁর গায়ের সঙ্গে লেপটে ফেলেন এত যে আলখাল্লার ভেতর হারিয়ে যায় আমার শরীর। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। চোখ বুজে বিড় বিড় করে কিছু বলে পীরসাব ফুঁ দেন আমার সারা মুখে। ফুঁএর সঙ্গে থুতু ছিটকে পড়ে মুখে আমার।

আলখাল্লা থেকে বেরিয়ে দৌড়ে গিয়ে লুকোই মোহাবিষ্ট মা'র পেছনে। জামার হাতায় থুতু মুছতে মুছতে শুনি পীর বলছেন — *তুমার মেয়ে কি দুনিয়াদারির পড়া পড়ছে নাকি!*

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন — *হ। আমার ত কোনও হাত নাই হুজুর ছেলেমেয়ের ওপর। এর বাপে সেই পড়াই পড়াইতেছে। এই মেয়ের আবার আল্লাহ রসুল সম্পর্কে খুব জানার ইচ্ছা। তাই ভাবছি এহানে নিয়া আসলে ওর ভাল লাগবে। মনটা ফিরবে আল্লাহর দিকে আরও।*

হুজুর চুক চুক দুঃখ করেন জিহবায়। বিছানায় শরীর এলিয়ে বলেন — *মুশকিল কি জানো! দুনিয়াদারির লেখাপড়ায় মনে শয়তান ঢুকে যায়, পরে শয়তানের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে আল্লাহর পথে আসা কঠিন হয়ে পড়ে। এই যে দেখ নাজিয়া, নাফিসা, মুনাজ্জেবা, মতিয়া এরা সবাই কলেজে পড়ত, সবাই পড়া ছেড়ে দিয়েছে। দিয়ে এখন আল্লাহর পথের পড়াশুনা করছে। আখেরাতের সম্বল করছে। ওরা এখন বুঝতে পারে, ওইসব পড়ালেখা আসলে মিথ্যা। ওরা ঢাকা ছিল ভয়ংকর অন্ধকারে। সত্যিকার জ্ঞানের আলো ওরা পায়নি।*

মা আমাকে ইঙ্গিতে উঠোনে যেতে বলে হুজুরকে তালপাতার পাখায় বাতাস করেন। ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি পেরিয়ে যেই না উঠোনে পা দেব, চিলের মত ছোঁ মেরে আমাকে তুলে নেয় হুমায়রা, নিয়ে সোজা উত্তরের ঘরে। এ ঘরটির তোষকগুলো গুটোনো থাকে দিনের বেলা, চৌকির ওপর বিছানো থাকে কেবল শীতল পাটি। পাটির ওপর বসে ফজলিখালার মেয়েরা তসবিহ জপে, নামাজ পড়ে। তারা কেউ ইস্কুলে যায় না, তারা *আল্লাহর পথের লেখাপড়া* করে বাড়িতে।

হুমায়রা আমার চেয়ে বছর পাঁচেক বড়। মুখখানা গোল চালতার মত ওর।

– *তুমি বড় খালার মেয়ে, তুমি আমার খালাতো বোন হও, তা জানো!* হুমায়রা আমার কাঁধে টোকা মেরে বলেন।

– *দুনিয়াদারির লেখাপড়া কর কেন? এই লেখাপড়া করলে আল্লাহ নারাজ হবেন। আল্লাহ অনেক গুনাহ দেবেন তোমাকে।*

বলে আমাকে পাটির ওপর বসিয়ে হুমায়রা পাশে বসে আমার।

– *তোমার বাবা হচ্ছে একটা কাফের। কাফেরের কথা শুনলে তোমাকেও দোযখে পাঠাবেন আল্লাহতায়ালা।*

চোখ বুজে দোযখের কল্পনা করতে গিয়ে গায়ে কাঁপুনি ওঠে হুমায়রার। আমার হাতদু'খানা হঠাৎ চেপে ধরে সে কি কারণে, ঠিক বুঝতে পারি না। গা হিম হতে থাকে আমার। বড় একটি গর্তে আগুন জ্বলছে, ফুটন্ত পানির ওপর ভাসতে ভাসতে কাতরাচ্ছে অগুনতি মানুষ। মানুষগুলোর মধ্যে দেখি আমিও কাতরাচ্ছি। আমাদের সামনে ততক্ষণে এসে দাঁড়ায় একজন একজন করে সাতজন মেয়ে, ওদের দৃষ্টির হুল ফোঁটে আমার শরীরে। দুনিয়াদারির লেখাপড়া করা অদ্ভুত এক জীব যেন আমি। চোখে ওদের খলসে মাছের মত লাফ দিয়ে ওঠে এক ঝাঁক করুণা, ওরা যেন বেহেসতের বাগানে বসে দেখতে পাচ্ছে আমি দোযখের আগুনে পুড়ছি। আমাকে দেখে *আহা আহা* করে ওরা। লম্বা মত এক মেয়ে বলে – *হুমায়রা, ও কি আল্লাহর পথে আসতে চায়!*

– *হ্যাঁ, কিন্তু ওর বাবা ওরে দিতে চায় না।* হুমায়রা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে। আমি খালাতো বোন বলেই বোধহয় ওর *দীর্ঘশ্বাস* অতি দীর্ঘ।

লম্বা মত জিভে চুক চুক শব্দ করে। বাকিরাও করে *চুক চুক। চুক চুক। চুক চুক।*

যেন অনেকগুলো বেড়াল দুধ খাচ্ছে শব্দ করে। শব্দ শুনি আর ঋষি-মুষিকের মত বসে গুণি ওদের, সাত ছয় পাঁচ চার তিন দুই এক। লম্বা, খাটো, মাঝারি, খাটো, খাটো, খাটো, মাঝারি। ওদের মনে মনে ইস্কুলের এসেম্বলিতে দাঁড় করাই। খাটো, খাটো, খাটো, মাঝারি, মাঝারি, লম্বা। ওদের দিয়ে গাওয়াই, *ও সাত ভাই চম্পা জাগোরে!*

আমার মগ্নতা ভাঙে হুমায়রার গুঁতোয় – *দেখ এদের বাবা এদেরকে,* সাতজনকে থুতনি তুলে দেখিয়ে বলে সে, *আল্লাহর পথে দিয়ে গেছে। এরা এইখানেই থাকে। কোরান হাদিস শেখে।*

হুমায়রা আবারও অতি দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে – *খালুকে নছিহত করলে তিনি নিশ্চয় আল্লাহর পথে আসতেন। ছেলেমেয়েদেরও আল্লাহর পথে দিতেন।*

বাবাকে করলে কাজ হত কি না আমার সংশয় আছে, তবে জজ সাহেবকে নছিহত করে কাজ হয়েছিল। জজ তাঁর ষোল বছরের মেয়ে মুনাজ্জেবাকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে গেছেন, লম্বা মেয়েটি, হুমায়রা বলে, মুনাজ্জেবা, জজের মেয়ে। কোথাকার জজ? ঢাকার। ঢাকা শব্দটি এমন স্বরে হুমায়রা উচ্চারণ করে যে ঢাকার জজ মানে বুঝতে হবে বড় জজ। ঘটনাটি এরকম ছিল, ষোল বছরের মেয়ে লেখাপড়ায় ভাল হলেও গোল্লায় যেতে শুরু করে, বখাটে এক ছেলের সঙ্গে প্রেম করে। জজ সাহেবের মেয়েকে নাকি পাড়ার মাঠে বখাটেটির সঙ্গে অন্ধকারে শুয়ে থাকতে দেখেছে কারা। পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেল। মেয়েকে ইস্কুল বন্ধ করে বাড়িতে বসিয়ে রাখলেন জজ সাহেব। তখন কেউ একজন তাঁকে বললেন আমিরুল্লাহ পীরের নাম, তিনি মেয়েদের বাড়িতে রেখে কোরান হাদিস শেখান, মেয়েরা নামাজি হয়, ঈমানদার হয়, অন্দরমহলের বাইরে পা দেওয়া নিষেধ তাদের, কঠোর পর্দার মধ্যে তাদের জীবন যাপন করতে হয়। শুনে *ঢাকার জজ* একবার মজলিশ শুনতে আসেন পীরের বাড়ি। পীরের ব্যাবহারে তাঁর মন গলে। তিনি তাঁর উচ্ছন্নে যাওয়া মেয়েকে হুজুরের হাতে সঁপে দিয়ে যান ক'দিন পরেই। *রুবিনা* পাল্টে পীরসাব মেয়ের নাম দিয়েছেন *মুনাজ্জেবা।* মুনাজ্জেবা লম্বা লম্বা জামা গায়ে মাথায় ওড়না জড়িয়ে পর্দা পুশিদা মত অন্দরমহলে থাকে, কোরান হাদিস পড়ে, মজলিশে হুজুরের দোযখের বর্ণনা শুনে কেঁদে বুক ভাসায়, হুজুরের গা হাত পা টেপে। সেই থেকে শুরু এ বাড়িতে বড় বড় ঘরের মেয়ে আসার, *পুলিশের মেয়ে, উকিলের মেয়ে, সরকারি কর্তাদের মেয়ে।* হযরত ইব্রাহিম আল্লাহর হুকুম মত নিজের ছেলেকে কোরবানি দিয়েছিলেন, আর আজকালকার বাবারা কেন পারবেন না নিজের মেয়েকে *আল্লাহর পথে* দিতে! হুমায়রা ভাবে। এ বাড়িতে মেয়েদের আল্লাহর প্রেমে *দিওয়ানা* হতে বলা হয়, মেয়েরা হয়। *নিরাকার* আল্লাহর সঙ্গে মেয়েদের প্রেম ভীষণ জমে ওঠে এ বাড়িতে আসা মাত্র। পীর আমিরুল্লাহ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন দেখে, তাঁর মনে হয় এরা মুনাজ্জেবা নাজিয়া নাসিমা নয়, এরা শ্রেফ বেহেসতের বাগানের ফুল।

আমিরুল্লাহ পীর জঙ্গল সাফ করা আঙিনায় ঘর তুলে দেন মেয়েদের। কারও ঘরে টিনের চাল, কারও ঘরে সিমেন্টের। ঘরগুলোয় জানালা নেই, গরমে হাঁসফাঁস করে মেয়েরা। পীরসাব বলেছেন – *আরবে এইরকম ঘর ছিল, যে ঘরে আমাদের নবী জীবন যাপন করতেন। এরকম ঘরে থাকলে সওয়াব হয়। নবীজি যে কষ্ট করেছেন, সে কষ্ট যদি তোমরা করতে পার, তবে নবীজি নিজে তোমাদের জন্য হাশরের ময়দানে সাক্ষী দেবেন।*

মেয়েরা আবেগমথিত কণ্ঠে বলে *আহা আহা।* তাদের জানালার দরকার নেই। দরজাও, যদি এমন হত যে নবীজির ঘর ছিল না, তবে সেটিও ত্যাগ করতে সম্ভবত ওরা আপত্তি করত না।

দু'তিন বছর পার হলে বাবারা ফেরত নিতে আসেন ঈমানদার মেয়েদের। মেয়েরা ঘাড় শক্ত করে বলেন – *যাব না।* মুনাজ্জেবার বাবা শয্যাশায়ী বলে তার মা এসেছিলেন নিতে। মুনাজ্জেবা যায়নি। কলুষিত দুনিয়ায় তার আর ফেরার ইচ্ছে নেই। এ বাড়ির আঙিনা থেকে বেরোলেই তার বিশ্বাস গায়ে তার পাপের ফোসকা পড়বে।

কেবল মুনাজ্জেবা নয়, অন্যরাও, বিয়ের বয়স হলে বাবারা পাত্র ঠিক ক'রে যখন নিতে আসেন, ওরা যেতে রাজি হয় না। সাফ সাফ জানিয়ে দেয়, ওরা *আল্লাহর পথে*

থাকবে। এই *শেষ জমানায়* বিয়ে করা উচিত নয়, হুজুর বলেছেন। ওরা তাই অনুচিত কোনও কাজে আকৃষ্ট হয় না। বাবাদের ফিরে যেতে হয় মেয়েরা পীরবাড়ির *পবিত্র মাটি* কামড়ে রাখে বলে।

বিয়ে করা উচিত নয় কেন, প্রশ্ন জাগে মনে। উত্তর ওদের জিভের ডগায়, *হুজুর মোরাকাবায়* বসে কথা বলেছেন আল্লাহতায়ালার সঙ্গে। বেহেসতের বাগানে হাঁটতে হাঁটতে দু'জনের কথা হয়। মুনাজ্জেবা চোখ বুজে বেহেসতের বাগানে পাখি হয়ে ওড়েন। আল্লাহ নিজমুখে হুজুরকে বলেছেন – *শেষ জমানা শুরু হয়ে গেছে। ইসরাফিলের শিঙ্গা ফুকার সময় হয়ে গেছে। কেয়ামত খুব সামনে। শেষ জমানায় সমাজ সংসার সব বাদ দাও, সময় নেই, তাড়াতাড়ি আখেরাতের সম্বল কর।*

মেয়েদের বিশ্বাস, হুজুর নিজে ওদের পুলসেরাত পার করে দেবেন। হুজুর বলেছেন তিনি তাঁর প্রিয় মুরিদদের হাত ধরে বেহেসতে যাবেন, তাদের না নিয়ে তিনি বেহেসতের দরজায় ঢুকবেন না। মেয়েরা তাই শেষ জমানায় আর হুজুরের চোখের আড়াল হতে চায় না। হুজুর বলেছেন, মুরিদদের নিয়ে শীঘ্র তিনি মক্কা চলে যাবেন, কেয়ামতের আগ অবদি নবীজির দেশেই থাকার ইচ্ছে তাঁর।

মুনাজ্জেবা বলে, *আল্লাহতায়ালা বাহন পাঠাবেন মক্কা যাওয়ার।*

বাহন কি রকম, সাত জনের সঙ্গে হুমায়রা গভীর মগ্ন অনুমান করতে, সম্ভবত *বোররাখ।* আল্লাহতায়ালার বাহনটি সম্পর্কে তাদের এখনও স্পষ্ট ধারণা নেই। কিন্তু যে কোনওদিন যে বাহনটি এসে পৌঁছবে এ বাড়িতে, এ সম্পর্কে কারও কোনও দ্বিধা নেই। লিস্টিও তৈরি হয়ে গেছে কে কোন *ব্যাচে* যাবে। মুনাজ্জেবার নাম প্রথম ব্যাচে, খোঁজ নিয়ে জেনেছে সে। লিস্টি পীরসাবের বালিশের নিচে।

মেয়েদের মুখে আতঙ্ক, যেন আজ বাদে কালই কেয়ামত আসছে।

আমার ভেতরেও একটু একটু করে কেয়ামতের ভয় ঢোকে। তাহলে বাবা যে ইচ্ছে করছেন আমাকে লেখাপড়া করে বড় হতে! বড় হওয়ার আগেই তো কেয়ামত চলে আসবে! পৃথিবী ধ্বংস হয়ে ঢুকে যাবে পৃথিবীর পেটে। বিচার হবে হাশরের ময়দানে, যেখানে আল্লাহ নিজে বসবেন দাঁড়িপাল্লা নিয়ে *নেক* মাপতে।

বুক টিপটিপ করে। সামনে দাঁড়ালে নিশ্চয় আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, নিয়মিত নামাজ রোজা করেছি কি না, তসবিহ জপেছি কি না, কোরান পড়েছি কি না! আল্লাহর আদেশ মত চলেছি কি না। উত্তর কি দেব! যদি বলি হ্যাঁ সব করেছি, তাহলে নির্ঘাত ধরা পড়ে যাব। কারণ আল্লাহ তো লিখেই রেখেছেন সবার ভবিষ্যত। ভবিষ্যত যদি সব লেখাই থাকে, তবে ময়দানে আবার দুনিয়ায় কি করেছি না করেছি খামোকা জিজ্ঞেস করার কি মানে হয়! আমার কেন জানি না বিশ্বাস হয় হাশরের মাঠে, দুনিয়ার সব লোক জড়ো হবে যে মাঠে, যে মাঠের কথা ভাবলে কেবল ঢাকায় বড় মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে লালমাটিয়ার যে মাঠ দেখেছিলাম, সে মাঠের ছবি মনে ভাসে – সেটির পুলসেরাত, আমার বিশ্বাস, যাদুকর লোকটি হাওয়া হয়ে গিয়ে নির্বিঘ্নে পার হয়ে যেতে পারবেন। ইস্কুলে যাদু দেখাতে এসে যেমন করে কালো কাপড়ের মধ্য থেকে *নেই* হয়ে গিয়েছিলেন হঠাৎ!

আমি বিভোর ছিলাম যাদুকরের পুলসেরাত পার হওয়ার দৃশ্যতে। চোখের সামনে আর কিছু নেই, কেবল একটি সুতো। সুতোর ওপর হাঁটতে গিয়ে টলমল করছে আমার পা। কিন্তু দিব্যি হেঁটে যাচ্ছেন, এক চুল নড়ছে না যাদুকরের শরীর। যাদুকর লোকটি হিন্দু, নাম সমীর চন্দ্র। কোনও হিন্দু লোক যদি পুলসেরাত পার হতে পারে, তবে আল্লাহ তাকে পাঠাবেন কোথায়, যেহেতু সে হিন্দু, দোযখে, নাকি বেহেসতে যেহেতু সে পুলসেরাত পার হয়েছে! আমি বিচারক হলে, ভাবি, বেহেসতেই পাঠাতাম। কিন্তু শুনেছি কেউ যদি হিন্দু হয়, সে যা কিছুই পার হোক, নেকের বোঝা তার যত ভারি হোক না কেন, দোযখেই   যেতে হবে তাকে, কারণ তার জন্য দোযখ লিখে রেখেছেন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা। আগে থেকেই লিখে রাখার ব্যাপারটি আমার মোটেও মনে ধরে না। লেখালেখির ব্যবস্থা থাকলে আর বিচারের আয়োজন করা কেন! হাশরের ময়দানে যা হবে, তা নেহাত নাটক ছাড়া আর কিছু নয়। আর সেই নাটকের শরিক হওয়ার জন্য সে কি ভীষণ উত্তেজিত মানুষ!

লক্ষ করি নি, কি কারণে এক এক করে মেয়েরা উত্তরের ঘর খালি করে হুজুরের ঘরের দিকে চলে গেল, হুমায়রাও। আমি একা বসে অপেক্ষা করতে থাকি মা'র জন্য। কখন মা'র এ বাড়ির কাজ ফুরোবে আমার পক্ষে সম্ভব নয় অনুমান করা। এর আগে যতবার এসেছি বিকেলে ফিরবেন বলে সন্ধে আর সন্ধেয় ফিরবেন বললে রীতিমত রাত করেছেন। কখনও আবার এমন হয়েছে যে ফিরতে দেরি হবে বললেন, কিন্তু কি রহস্যজনক কারণে বোরখা পরে নিয়ে তাড়া লাগিয়েছেন *চল শিগরি চল।* আমি উত্তরের ঘরে একা বসে আছি, মা'র সেদিকে মন নেই। তিনি ছুটে ছুটে এর ওর সঙ্গে কানাকানি করছেন। কানাকানি কথা, সে যারই হোক, বড় শুনতে ইচ্ছে করে। কানাকানি শেষ হলে আমি অনুমান করি তিনি হুজুরকে বাতাস করবেন, হুজুরের পা টিপবেন, শরবত বানিয়ে দেবেন, পান সেজে দেবেন, চিলুমচি ধরবেন মুখের সামনে। চিলমচি থেকে তুলে হুজুরের কফ থুতু খেয়ে বা মুখে মাথায় ডলে মা'র এ বাড়ির কাজ আপাতত ফুরোবে।

মা যার সঙ্গে কানে কানে কথা বলছিলেন তার মুখ খানা আমি চেষ্টা করছিলাম দেখতে, কলসির তলার মত দেখতে এক নিতম্ব ছাড়া আর কিছু সম্ভব হচ্ছিল না দেখা । হঠাৎ, আমার গায়ের ওপর দিয়ে ঝড়ো বাতাসের মত দৌড়ে গেল দুটো মেয়ে জানালার দিকে। তারা, আমার মনে হয় না খেয়াল করেছে যে আমি, একটি প্রাণী বসে আছি ঘরে। এ দুটো আগের সাতজনে ছিল না। আনকোরা, অন্তত আমার চোখে। গায়ের পোশাক আগের সাতজনের মতই। মাথা থেকে পা অবদি ঢাকা। জানালায় দাঁড়িয়ে দুটো মেয়ের কে বলছে আমি ধরতে পারি না, যে, *দেখ দেখ ওই হইল মহাম্মদ, ফাতেমা আপার ছেলে।*

আরেকটি কণ্ঠ, আমি এও অনুমান করতে পারি না, ডান বা বামের জনের, *এই যে ঘাড়ে হাত দিল, সে হাজেরাখালার ছেলে, মহাম্মদ।*

দু'টো মেয়ের পশ্চাতদেশ ছাড়া আর কিছু নেই চোখের সামনে।

আমাকে ডিঙিয়ে আরও ক'টি মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জানালায়। আরও পশ্চাতদেশ। জানালা থেকে দেখা যাচ্ছে *বাহিরবাড়ির আঙিনা।* আঙিনায় পুরুষেরা যারা মজলিশে শরিক হবে, পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে। অন্দরমহলে কেবল মেয়েরা ছাড়া আছে হাতে

গোণা কিছু ছেলের প্রবেশাধিকার আছে। হাতে গোনাদের মধ্যে বেশির ভাগই হুজুরের আত্মীয়। আঙিনায় দাঁড়িয়ে থাকারা হাতে গোণা নয়।

— *আর ওই যে মহাম্মদ, নুরুননবী ভায়ের ছেলে।* নতুন একটি কণ্ঠস্বর।

মেয়েরা হাসছে। হাসতে হাসতে, মুখে ওড়না চেপে কারও ঘাড়ের ওপর দিয়ে, বগলের তল দিয়ে, দু'মাথার ত্রিকোণ দিয়ে, গলার ফাঁক দিয়ে, দেখছে। সামনের মেয়েরা পেছনের মেয়েদের জন্য জায়গা ছাড়ছে না, পেছনের মেয়েগুলো মাছের মত পিছলে সামনে যেতে চাইছে। পেছনের পেছনের মেয়েরা বলছে, *এইবার সর, দেখলা তো! আমাদেরে দেখতে দেও।* আমি পেছনের পেছনের পেছনে দাঁড়িয়ে এক পলক দেখি, কিছু যুবক শাদা পাজামা পাঞ্জাবি আর টুপি মাথায় দাঁড়িয়ে আছে, কারও কোমরে হাত, কারও ঘাড়ে, কেউ পাছা চুলকোচ্ছে, কেউ হাই তুলছে, কেউ অযু করছে, কেউ মশা তাড়াচ্ছে গা থেকে। এত দেখার কি আছে এসব, আমি ঠিক বুঝে পাই না।

আরও কিছু মেয়ে হুড়মুড়িয়ে জানালায় ভিড় করে, এরা সাতজনের অংশ। সবাই মহাম্মদদের দেখে। এত ছেলের নাম *মহাম্মদ* কেন, মনে প্রশ্ন জাগে। প্রশ্নটি তেঁতুলের কালো বিচির মত গলায় আটকে থাকে। একটিই কেবল জানালা এ ঘরে, তাও পুরোনো ঘর বলে এটি। নতুন ঘরগুলোয় জানালা হবার নিয়ম নেই। নতুন ঘর থেকে মেয়েদের কোনও *মহাম্মদকে* দেখার সুযোগ নেই।

ফজলিখালার এক ছেলের নামও মহাম্মদ, এটিই প্রথম ছেলে, মহাম্মদের আগে জন্মেছে হুমায়রা, সুফায়রা, মুবাশ্বেরা। তিন মেয়ে হওয়ার পর ফজলিখালাকে ঘন ঘন জ্বিনে ধরত। মুবাশ্বেরার পর মহাম্মদ জন্মানোর পর জিনে ধরা কমেছিল। মহাম্মদের পর এক এক করে আরও তিনটে মেয়ে জন্মেছে, জিনে ধরা বেড়ে গেছে আগের চেয়ে অনেক বেশি। হুমায়রাকে শুনেছি ক'দিন আগে জিনে ধরেছে। তিনদিন তিনরাত পর জিন ছেড়েছে ওকে। এ বাড়িতে এমনই, আজ এ মেয়েকে, কাল ও মেয়েকে জিনে ধরছে, আর ঘর অন্ধকার করে, দরজা জানালা বন্ধ করে *পীরসাব* নিজে জিন তাড়ান। আমি নিজে দেখেছিলাম যূথির জিন তাড়ানো। যূথি আমার এক ক্লাস ওপরে পড়ত। মেয়েটি চমৎকার দেখতে ছিল। ইস্কুলের বট গাছের নিচে একা একা বসে ও গান গাইছিল একদিন, ঘন্টা পড়লে মেয়েরা ক্লাসে চলে গেল সব, যূথি গানই গাইছিল, পরের ক্লাসের ঘন্টাও পড়ল, যূথি তখনও গান গাইছে একা একা, চুল হাওয়ায় উড়ছে। খবর পেয়ে এক মৌলভি ছিলেন, উর্দু পরাতেন আমাদের, আমরা উর্দু স্যার বলে ডাকতাম, যূথিকে বটতলা থেকে টেনে এনে মাস্টারদের জানালেন যে ওকে জিনে ধরেছে। যূথি গলা ছেড়ে চিল্লাচ্ছিল *আমারে ছাইড়া দেন ছাইড়া দেন* বলে। ওকে শক্ত মুঠোয় ধরে উর্দু স্যার জিন তাড়ানোর আয়োজন করলেন। পাক পানিতে *আল হামদু সুরা, আয়াতুল কুরসি, আর সুরা জিনের* প্রথম পাঁচ আয়াত পড়ে পানি ছিটোলেন যূথির মুখে, আর মুখের সামনে আগুন ধরে নিমের ডাল দিয়ে পেটালেন। পেটালেন যূথি মুখ থুবড়ে পড়া অবদি। যূথির জিন তাড়ানো দেখেছিলাম দু'চোখে জগতের সকল বিস্ময় নিয়ে, ইস্কুলের আর সব মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। ওর জন্য বড় মায়া হচ্ছিল আমার।

উত্তরের ঘরে বসে আমার অস্থির লাগে, গা ছমছম করে। এ বাড়িতে, ভয় হয় আবার আমাকেও না জ্বিনে ধরে। আমাকেও না অন্ধকার ঘরে জিন তাড়াতে হাতে ছড়ি নিয়ে ঢোকেন পীর আমিরুল্লাহ।

আমি যখন কুঁকড়ে আছি ভয়ে, মেয়েরা ততক্ষণে জানালা থেকে সরে গেছে, মা এসে দ্রুত বলে যান, মজলিশ শেষ করে তিনি বাড়ি ফিরবেন। মজলিশের অভিজ্ঞতা আমার কিঞ্চিত আছে, এটি আমাকে মোটেও উৎফুল্ল করে না। মজলিশ বসে বড় এক ঘরে, অন্দরমহল থেকে মেয়েরা সরাসরি ঢুকে যেতে পারে মেয়েদের জন্য পর্দা ঢাকা জায়গায়। মেঝেয় ফরাস পাতা, ওতেই হাঁটু মুড়ে বসতে হয় সবাইকে। সামনে উচু চৌকিতে গদি পাতা, ওখানে বসেন পীরসাব। লোবানের গন্ধঅলা মজলিশ-ঘরে যখন ঢোকেন তিনি, ডানহাতখানা উঁচু করে, গম্ভীর মুখে। সকলে দাঁড়িয়ে বলেন *আসসালামু আলায়কুম ইয়া রহমতুল্লাহ।* শব্দে গমগম করে ঘর। পীর সাব ভারি গলায় – *ওয়ালায়কুম আসসালাম বলে* হাত নেড়ে বান্দাদের বসতে ইঙ্গিত করেন। মেয়েদের গা থেকে পাউডারের গন্ধ বেরোতে থাকে, চোখে সুরমা পরা মেয়েরা, পর্দা ফাঁক করে হুজুরকে দেখেন, আড়চোখে দেখেন বাকি পুরুষদের।

হুজুর দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন *বুঝলেন কি না আবু বকর, এই দুনিয়া মিছে দুনিয়া। এই দুনিয়ায় টাকা কড়ি করে কী লাভ, কেউ কি সঙ্গে নিয়ে যাবে কিছু! বলুন, কেউ সঙ্গে নেবে কিছু কবরে!*

আবু বকর, কালো মুখে কালো দাঁড়ি বেটে এক লোক, সামনের সারিতে বসা, উত্তর দেন – *জী না হুজুর।*

– *তো আল্লাহর প্রেমে নিজেকে সমপ্পন কব্বেন নাকি ধন দৌলতের প্রেমে!* হুজুর প্রশ্নটি আবু বকরকে করেন, কিন্তু দৃষ্টি ছুঁড়ে দেন মজলিশের শাদা মাথাগুলোয়।

– *আল্লাহর প্রেমে হুজুর।* ঘোর লাগা গলায় বলেন আবু বকর।

মেয়েরা পর্দার আড়াল থেকে আবু বকর লোকটিকে পলকহীন দেখে। সে দিনের জন্য আবু বকরের নাম মুখে মুখে ফিরবে। হুজুর যেচে কথা বলেছেন তাঁর সঙ্গে। এ কম সম্মান নয় আবু বকরের! কেউ কেউ এও মন্তব্য করবে আবু বকরের ভাগ্য ভাল, হুজুর তাঁর বেহেসত নসীবের জন্য আল্লাহর কাছে তদবির করবেন।

মজলিশের সময় ঘড়ি ধরে এক ঘন্টা। আজকের ঘন্টা তিনি পার করেছেন নবীজির দারিদ্রের বর্ণনায়, ছেঁড়া একটি কম্বল সম্বল ছিল তাঁর। নবীজির দুঃখে মজলিশের লোকেরা হাউমাউ করে কেঁদেছেন। যে যত কাঁদতে পারে, তার সুনাম বাড়ে এ বাড়িতে। সুনাম অবশ্য স্বপ্ন দেখলেও বাড়ে। ফজলিখালা স্বপ্ন দেখেছেন তিনি নবীজির সঙ্গে এক চমৎকার ফোয়ারার ধারে বসে কথা বলছেন, শাদা শাদা পাখি উড়ছে, বাতাস বইছে ঝিরিঝিরি, কী কথা বলছেন তা খেয়াল করতে যদিও পারেননি, হুজুর বলেছেন ফজলিখালার বেহেসত নিশ্চিত। পীরবাড়িতে ফজলিখালার মূল্য অনেকখানি বেড়ে গেছে এরপর, অনেকে আলাদা করে জানতে চেয়েছে ফোয়ারার পাশে বসা নবীজিকে ঠিক কেমন দেখতে লাগছিল, কেমন তাঁর চেহারা। মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে স্বপ্নের বর্ণনাটি যখন তিনি দেন, *কী যে নূর তাঁর মুখে, কী যে অপূর্ব সুন্দর তিনি, কী যে আশ্চর্য সুন্দর কোমল তাঁর হাত!* ফজলিখালা যখন বলেন চোখ ধীরে ধীরে মুদে আসে যেন তিনি এখনও সে

হাতের স্পর্শ পাচ্ছেন। হাত ধরে দু'জন ফোয়ারার দিকে গিয়েছেন গোসল করতে, গোসল করছেন, ঘুম ভেঙে গেল। ফজলিখালার এই স্বপ্নের কথা শোনার পর এ বাড়ির অনেকেই নবীজিকে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তাঁদেরও সুনাম হল। মা বড় আক্ষেপ করেন কখনও তিনি নবীজিকে স্বপ্ন দেখেননি বলে। ঘুমোনোর আগে খুব করে নবীজিকে ভেবে ঘুমোন, যেন স্বপ্নে তাঁর সাক্ষাৎ পান। পাননি। নিজেকে বড় গুনাহগার মনে হয় মা'র।

মজলিশ শেষ হতেই এক এক করে লাইন ধরে পুরুষেরা কদমবুসি সেরে পীরের হাতে টাকা গুঁজে দেন। *হাদিয়া* যে কোনও অঙ্কের হতে পারে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে যা পারে তাই দেবেন হুজুর এ রকমই বলে দিয়েছেন।

আবু বকর পরম শ্রদ্ধায় হুজুরকে কদমবুসি সেরে বলেন — *হুজুর বড় ভয় হয়, শেষ জমানা চইলা আসছে, কেয়ামত আইসা যাইতেছে। ব্যবসা বাণিজ্যে আর মন দিই না। খালি হাতেই তো দাড়াইতে হইব পরকালে। কী আছে কে জানে কপালে। সারাজীবন তো আমলই করা হয় নাই। দোয়া করুইন হুজুর, আপনের দোয়া ছাড়া কপালে দুর্গতি আছে।*

হুজুর কথা দেন, দোয়া তিনি করবেন।

পুরুষের হাদিয়া এবং কদমবুসি গ্রহণ করার পর অন্দরমহলে ঢোকেন হুজুর। বাইরে থেকে আসা মেয়ে মহিলা এখন এক এক করে কদমবুসি করে *হাদিয়া* দেবেন। এইপর্ব শেষ হলে হুজুর গা এলিয়ে দেবেন বিছানায়, তখন যুবতীরা ঝাঁপিয়ে পড়বেন গা টিপতে।

আমি মা'র ওড়না টেনে নাকি সুরে বলি — *ও মা। চল। বাসায় যাইতে হইব। বাবা বাসায় ফিইরা যদি দেখে আমি নাই, মারব ত!*

এক ঝটকায় আমার মুঠো থেকে ওড়না ছাড়িয়ে মা বলেন — *বিরক্ত করিস না।*

আমি একা দাঁড়িয়ে থাকি উঠোনের অন্ধকারে, জবা গাছের তলায়। চুল খোলা থাকলে জ্বিনে ধরে শুনেছি। চুল ঢেকে রাখি ওড়নায়। ওড়না পাজামা পরার অভ্যেস নেই আমার, ওগুলো মেয়েরা আরও বড় হয়ে পরে। এখনও বাড়িতে ফ্রক পরি আমি। কিন্তু পীর বাড়িতে যে বয়সেরই হও না কেন, হুজুর অনুমোদিত পোশাক ছাড়া ফটকের ভেতরে ঢোকা যাবে না। *দুনিয়ার ভেতরে এ এক আজব দুনিয়া।*

রিক্সায় বাড়ি ফিরতে ফিরতে মা'কে জিজ্ঞেস করি — *এই যে লক্ষ লক্ষ বছর ধইরা আল্লাহ তায়ালা ইসরাফিলরে মুখে শিঙ্গা দিয়া বসাইয়া রাখছেন, এর দরকারটা কি ছিল? আল্লাহ ত জানেন কখন কেয়ামত হইব, তখনই তিনি ইসরাফিলরে কইতে পারতেন শিঙ্গা মুখে লইতে। বেচারা ইসরাফিল! কোনও নড়ন চড়ন নাই।*

মা বোরখার তল থেকে বলেন — *আল্লাহ ইহকাল পরকালের সৃষ্টিকর্তা। ইসরাফিল এক ফেরেসতা মাত্র। ইসরাফিলরে আল্লাহ যেভাবে বলছেন সেভাবেই আল্লাহর হুকুম মাইনা চলতে হয় তাঁর। সব ফেরেসতাদের চলতে হয়। আল্লাহর ইচ্ছা নিয়া প্রশ্ন করবি না। আল্লাহরে ভয় পাইতে হইব।*

আমি বলি — *তুমার হুজুর তো বলছেন আল্লাহর প্রেমে পড়তে হইব। ভয় পাইলে কি প্রেমে পড়ন যায় নাকি!*

প্রেম শব্দটি উচ্চারণ করতে আমার বরাবরই জিভে জড়তা ছিল, শব্দটি উচ্চারণে এক অলিখিত নিষেধাজ্ঞা আছে। সে নিষেধ নর নারীর প্রেমের বেলায় কেবল। কারণ এ

রকমই শুনেছি প্রেমে পড়ে মন্দ লোকে, ঝুনু খালাকে দেখেছি লুকিয়ে প্রেম করতে। দাদাও লুকিয়ে কবিতা লিখতেন অনিতার জন্য। ঝুনু খালার সঙ্গে রাসু খালুর *ইয়ে* ছিল, দাদা বলেন। ইস্কুলে মেয়েরাও প্রেম শব্দটি উচ্চারণ করে না, বলে ওই মেয়ের সঙ্গে ওই ছেলেটির *ইয়ে* আছে। ইয়ে শব্দটির মানে বুঝতে প্রথম প্রথম আমার অসুবিধে হত। পরে বুঝে, নিজেও, *ইয়ে* বলতে অভ্যেস করেছি। এটিই, লক্ষ করেছি, বাড়ি এবং বাড়ির বাইরে, যেখানে আমার এবং আমার পরিচিতদের চলাচল, চলে। আল্লাহর সঙ্গে পীরসাবের *ইয়ে* আছে, এ ধরনের বাক্য আমি শুনিনি পীর বাড়িতে। আল্লাহর প্রসঙ্গে *প্রেম* শব্দটি অবাধে উচ্চারণ করা হয়। হুমায়রার সঙ্গে আতিক নামে ওর এক ফুফাতো ভাইয়ের প্রেম চলছে না বলে, শুনেছি বলা হয়, *ইয়ে* চলছে, তাও বলা হয় ফিসফিসিয়ে, কেউ যেন না শোনে, কিন্তু কারও কোনও অস্বস্তি হয় না বলতে যে হুমায়রা আল্লাহর প্রেমে মগ্ন, সেটি সজোরেই বলা হয়, যেন একশ লোকে শোনে।

মা বলেন — *আল্লাহরে যায়।*

— *তুমি ত বলছ, আল্লাহ সব লিইখা রাখছেন খাতায়, প্রত্যেকটা মানুষের জন্ম মৃত্যু, কার সাথে কার কখন বিয়া হবে তাও। এমন কি কে বেহেসতে যাইব, কে দোযখে যাইব তাও লেখা আছে। তা যদি লেখাই থাকে, ধর আবু বকর, তার যদি বেহেসত আল্লাহ লিইখাই রাখেন, তাইলে কি সে গুনাহ করলেও বেহেস্তে যাইব! আর ধর আমিই, আমার জন্য যদি আল্লাহ আগে থেইকাই দোযখ লেইখা রাখেন, তাইলে আমারই বা কি লাভ আল্লাহরে ডাইকা! আল্লাহ কি পরে তাইলে নিজের লেখা সংশোধন করেন!* এক দমে বলে আমি থামি।

— *এমনে ত বোবা হইয়া থাকস মানষের সামনে। আমার সামনেই তর খই ফুডে মুহে।* মা রুষ্ট-স্বরে বলেন।

— *আল্লাহ ত সব পারেন করতে, ঠিক না!* কণ্ঠে প্রচন্ড কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করি।

মা বলেন — *হ। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, সবই হয়। আল্লাহ হও বললে হয়। আল্লাহ হও না বললে কারও শক্তি নাই কিছু হওয়াইতে। আল্লাহর আদেশ ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়ে না।*

মা'র সারা শরীর কালো বোরখায় ঢাকা, কপাল থেকে নেমে এসেছে পাতলা কালো কাপড়, যেন হাঁটতে গিয়ে সামনে কোনও গর্ত পড়লে পা ফেলার আগে অন্তত দেখেন। পাতলা আবরণটির দিকে, যার তলে মা'র চোখ থেকে হলকা বেরোচ্ছে আগুনের, তাকিয়ে বলি — *ধর, কিছু নাই, খালি হাত, আল্লাহ কি কিছু নাই থাইকা ফুল বানাইতে পারেন!*

— *হ।* মা বলেন।

— *ধর, আল্লাহর হাতে একখান রুমাল। রুমালের মধ্য থেইকা আল্লাহ কি একটা কবুতর বানাইতে পারবেন!* আবারও প্রশ্ন করি।

মা নিশ্চিত স্বরে বলেন — *হ।*

— *আমগোর ইস্কুলে যাদু দেখাইতে আইছিল যে লোকটা, সেও পারে। সেও পারে বাতাসে আল্লাহর মত মিলাইয়া থাকতে।* আমি ঠোঁট উল্টে বলি।

— *কি কইলি তুই! তর ত ঈমান নষ্ট হইয়া গেছে। তুই আল্লাহর সাথে তুলনা করলি যাদুকররে! কত সাহস তর! পাজি ছেড়ি, পাজ্যামি করস। আমি কি আশায় লইয়া যাই*

তরে হুজুরের কথাবার্তা শুনতে! দিন দিন আস্তা শয়তান হইতাছস। এইসব তর বাপের কাছে শিখছস! তর ঠোঁট আমি সিলাই কইরা দিয়াম, আরেকবার এইসব কইলে।

মা'র রুখে ওঠায় আমি দমে যাই।

মা একবার বলেছিলেন *আবদুল কাদের জিলানি* আল্লাহর আদেশ পেয়ে কবর থেকে জ্যান্ত হয়ে বেরিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস হয়, যাদুকর লোকটিও তা পারবেন। মা'কে আর সে কথা বলতে যাই না। এত গাল খাওয়ার ইচ্ছে হয় না আমার। তবে মাথার ভেতর আরেকটি প্রশ্ন খুব আঁকু পাঁকু করে, সেটি মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় —*পীরবাড়ির মানুষদেরে এত জ্বিনে ধরে ক্যান? আমাদেরে ত জ্বিনে ধরে না! ওই বাড়িতে তুমি কইছ আল্লাহ নাইমা আসেন, তাইলে আল্লাহর এরিয়ায় জ্বিন আসার সাহস পায় ক্যান!*

মা আমার পেটে কনুইএর গুঁতো দিয়ে বলেন — *আর একটা কথা না। বাসাত গিয়া তওবা কইরা নামাজ পইড়া আল্লাহর কাছে মাপ চা। আল্লাহরে ডরাস না, ডরাস না দেইখাই ত শয়তানি চিন্তা মাথাত আয়ে।*

আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর জোটে না।

ইস্কুলের বিজ্ঞান বই সামনে নিয়ে মা'কে বলি — *আল্লাহ ত আদম হাওয়া প্রথম সৃষ্টি করছে, ঠিক না?*

— *করছে না, করছেন।* মা আমার বেয়াদবি শুধরে দেন।

— *এই যে দেখ,* বিজ্ঞান বইয়ে আদিম মানুষের ছবি দেখিয়ে বলি, *এক কোষি প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণী, তারপর বানর থেইকা বিবর্তন ঘইটা এইরকম আদিম মানুষ হইছে। তারা গুহায় থাকত, মারামারি করত, ফল মুল খাইত, কাচা মাংস খাইত। অনেক পরে পাথরে পাথর ঘইষা আগুন জ্বালাইতে শিইখা তারপরে তারা অনেক কিছু করতে শিখে। ধীরে ধীরে মানুষ সভ্য হইছে। আল্লাহর বানানো হযরত আদম আলায়েসসাল্লাম কি এরম লোমঅলা ল্যাংটা বান্দরের মত দেখতে ছিল নাকি, যারে আল্লাহ মাটি দিয়া বানাইয়া বেহেসতের বাগানে হাঁটতে দিছিলেন!*

মা চোখ নাক কুঁচকে, যেন দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে বই থেকে, বলেন — *সর, সর, সর। দূর হ সামনে থেইকা। এই বইএ যা লেহা সব মিছা কতা। আল্লাহ যা বলছেন, তাই একমাত্র সত্য। আল্লাহর উপরে আর কুনো সত্য নাই।*

মা'র সামনে থেকে আমাকে সরে আসতে হয়। বাবার কাছে ব্যাপারটি তুলব, তা সম্ভব নয়। তাঁর সামনে দাঁড়ালে গলায় স্বর ফোটে না। আল্লাহ সত্য নাকি বিজ্ঞান সত্য — কে আমাকে উত্তর দেবে। আল্লাহ যা বলেছেন তার ভেতরে যুক্তি কম দেখি। *যুক্তি* শব্দটি নতুন শিখেছি আমি, বাবা তাঁর বাণীতে ইদানীং প্রায়ই বলছেন, *যুক্তি ছাড়া কোনও কাজ করবি না, যা কিছুই করস নিজের বিবেকরে জিগাস করবি, বিবেকে যদি কয় কাজটা করতে তাইলেই করবি। সব মানুষেরই বিবেক বইলা একটা জিনিস থাকে। মানুষ হইল এনিমেল, কিন্তু র‍্যাশনাল অ্যানিমেল। যুক্তিবুদ্ধি না থাকলে মানুষ আর জন্তুতে কোনও তফাৎ নাই।*

বাবা অবশ্য বাণীটি দিতে শুরু করেছেন উঠোনে রাখা খড়ির স্তুপে দেশলাই জ্বেলে খেলতে গিয়ে আগুন প্রায় ধরিয়ে দিয়েছিলাম বলে। আগুন যদি ছড়াতো, বাবার বিশ্বাস বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

বিজ্ঞানের কথায় আমি যুক্তি দেখি বেশি। আল্লাহ *আদম হাওয়াকে* ধাম করে বেহেসত থেকে ফেলে দিলেন পৃথিবীতে, কেমন যেন *গপ্প গপ্প* মনে হয়। রূপকথার বইয়ের মত। মা'কে বললে মা বলেন *আল্লাহ সম্পর্কে বাজে কথা কইলে তর জিব খইসা পড়ব।* আমি জিভ খসে কি না দেখতে ঘরের দরজা বন্ধ করে *আল্লাহ তুই পচা, আল্লাহ তুই শয়তান, আল্লাহ তুই একটা আস্তা বদমাইশ, আল্লাহ তুই শুয়োরের বাচ্চা* বলেছিলাম। জিভের জায়গায় জিভ রইল, আমিও নিশ্চিত হলাম আল্লাহকে গালাগাল করলে আসলে জিভ খসে না, মা ভুল বলেন। আর আল্লাহর কাছে চাইলেই যে আল্লাহ কিছু দেন না, তারও প্রমাণ পেয়েছি। নামাজ সেরে আল্লাহর কাছে মোনাজাতের হাত তুলে পোড়াবাড়ির চমচম চেয়েছিলাম, শরাফ মামারা যেমন ঠান্ডার বাপের দোকানের লুচিবুন্দি নাস্তা খায়, তা চেয়েছিলাম, জোটেনি। একটা কাঠের ঘোড়া চেয়েছিলাম, রাজবাড়ি ইস্কুলে চমৎকার রঙিন একটি কাঠের ঘোড়া দেখে লোভ হয়েছিল, কেউ আমাকে কাঠের ঘোড়া দেয়নি, আরও কত কী চেয়েছিলাম — আমান কাকা আর শরাফ মামা কুষ্ঠ হয়ে মারা যান চেয়েছিলাম, ওঁদের কুষ্ঠও হয়নি, ওঁরা মরেনও নি। মা প্রায়ই আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করেন বাবা যেন কুষ্ঠ হয়ে শিগরি মরে যান। অথচ বাবা দিব্যি সুস্থ, দিন দিন পেশীতে শক্তি বাড়ছে। জ্বরেও যে একদিন বিছানায় পড়বেন, তাও নয়। আমার প্রায়ই জ্বর হয়, সে কি খুশি হই জ্বর হলে, তখন আর লেখাপড়া করতে হয় না, বাবা তখন বেশ নরম গলায় কথা বলেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। ওই একটি সময়, যখন বাবার আদর বড় সুলভ। থোকা থোকা আঙুর, কমলালেবু এনে শিয়রে রাখেন, শুয়ে শুয়ে ভাইবোনকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাই। ওরা হাত পেতে প্যান প্যান করে চাইলে সামান্য দিই। মা আদা কেটে নুন মেখে দেন খেতে। কিন্তু ওষুধ খেতে গেলেই বিরক্তি ধরে, জ্বর হওয়ার আনন্দ সব উবে যায়। বড় বড় ট্যাবলেট গিলতে বললে মনে হয় অসুখ হওয়াটা বড় বাজে এক ব্যাপার। পাঁচ ছ'রকম ওষুধ ঘন্টায় ঘন্টায় গিলতে বলেন বাবা। *খাচ্ছি খাব* বলে টুপ করে জানালার বাইরে ওষুধ ফেলে দেওয়ার অভ্যেস আমার। জ্বর সাত আটদিনেও যখন ছাড়ে না, বাবার সন্দেহ হয়। তিনি নিজে আমার মুখের ভেতর পানি ঢেলে বলেন *হা কর,* হাঁ করলে ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল ঢুকিয়ে দেন মুখে। গলায় ওসব আটকে যায়, *ওয়াক* করে মেঝে ভাসিয়ে ফেলি। বাবা আবার বলেন *হাঁ কর।* এ ঠিক *একবার না পারিলে দেখ শতবার* এর মত। বাবা হাল ছাড়েন না যতক্ষণ না ওষুধ আমার পেটে ঢুকছে। বাবা ঘরে না থাকলে মা সুরা পড়ে ফুঁ দিয়ে দেন বুকে। ফুঁ দেওয়াতে ভালই লাগে। ফুঁ তো আর তেতো ওষুধ নয় যে গিলতে হয়। গ্লাস ভরে ময়লা পড়া *পড়া পানি* খাওয়ান। অসুখ সারলে মা বলেন মা'র ফুঁয়ে আর পীরের পড়া পানিতে অসুখ সেরেছে, বাবা বলেন ওষুধে সেরেছে।

বাবার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা নেই মোটে, তিনি সামনে দাঁড়ালে মনে হয় এক দৈত্য এসে দাঁড়াল, প্রাণ যায় যায়, তবু বাবা যখন বলেন জ্বর হচ্ছে অসুখের উপসর্গ, শরীরে জীবাণু ঢুকে অসুখ তৈরি করে, ওষুধে জীবাণু নাশক জিনিস আছে, তা শরীরে গিয়ে জীবাণু ধ্বংস করলে তবেই অসুখ সারে—বাবার কথাকেই আমার যৌক্তিক মনে হয়।

নানিবাড়ির পেছনের বস্তিগুলোয় কারও অসুখ হলে ফুঁ দেওয়ার চল ছিল। ক'দিন পর পরই সুরা টুরা পড়ে রোগে ভোগা গেঁতুকে ফুঁ দিয়ে যেত এক মৌলবি, পানিতে ফুঁ দিয়ে রেখে যেত, পড়া পানি খেলে নাকি অসুখ সারবে। ফুলে ঢোল হয়ে, শেষে গেঁতু, ছ'বছর বয়স মাত্র, মরেই গেল। ঝুনু খালার পাগলামি কমাতেও মৌলবি ফুঁ দিয়েছিলেন, কমেনি। বাবাকে ফুঁ দিতে গোপনে এক মৌলবি যোগাড় করেছিলেন মা, যেন রাজিয়া বেগমের কবল থেকে মুক্ত হন বাবা। বাবার গায়ে তো ফুঁ দেওয়া সম্ভব নয়, ফুঁ দিয়েছিলেন বাবা যে ঘরে ঘুমোতেন, সুতোয় গিঁট দিয়ে চার টুকরো সুতো পুঁতে রেখেছিলেন সে ঘরের চার কিনারে, গোপনে। মৌলবি বলে গিয়েছিলেন, *এখন আপনের স্বামীর মন ফিরব।* মা আর নানিকে ফিসফিস কথা বলতে শুনেছিলাম এ নিয়ে। বাবার মন তো ফেরেনি, মা'র চেয়ে বেশি আর এ কথা কে জানে! তবু ঝাড় ফুঁকে অন্ধ বিশ্বাস মা'র।

মা বলেন সব মিথ্যে যা লেখা ইস্কুলের বইয়ে। আমার বিশ্বাস হতে চায় না। পীরবাড়িতে যাওয়া শুরু করার আগে ইস্কুলের লেখাপড়াকে মা দোষ দেন নি, বরং তিনি নিজে আরও লেখাপড়া করতে পারেননি বলে দুঃখ করতেন। দুঃখ হঠাৎ হঠাৎ এখনও করেন, সে জ্ঞানার্জনের জন্য নয়, লেখাপড়া না করাতে তিনি কোনও চাকরি জুটিয়ে বাবার সংসারে ঝাড়ু মেরে মহানন্দে বিদায় নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছেন না বলে। চোখের সামনে কী ভীষণ পাল্টে গেলেন মা। মা কি *ভুল* পথে যাচ্ছেন, নাকি *সত্য* পথে। আমি ঠিক বুঝে পাই না, মা না হয় যুক্তি ছাড়া কথা বলেন কিন্তু লেখাপড়া জানা, রীতিমত বিএ এমএ পাশ করা লোকেরাও তো কখনও মানুষ বা জগতের উৎপত্তি বিষয়ে কোনও তর্কে মাতেন না, আল্লাহ যা বলেছেন তা দিব্যি মেনে নেন, নিশ্চয় মেনে নেন, মেনে না নিলে নামাজ রোজা করেন কেন! নানিবাড়ির পেছনে বস্তি, সামনে ছিল শিক্ষিত লোকদের বাড়ি। সেসব বাড়ির এত লোক যখন আল্লাহকে মানেন, আল্লাহ ব্যাপারটি নেহাত *ফেলনা* নয়। বাবা নিজেই রোজা করেন, রমজান এলে। ছোটবেলায় আমার শখ হত রোজা রাখতে, শেষ রাতে উঠে আমিও সবার সঙ্গে বসে প্রথম মাছ মাংস পরে দুধ কলা মেখে ভাত খেতাম। দুপুর বেলা বাবা বলতেন *এখন তুমাকে কিছু খেতে হবে।*

আমি মাথা নেড়ে বলতাম — *আমি রোজা রাখছি।*

— *উহুঁ, ছোটদের রোজায় এখন খাইয়া পরে আবার ইফতারি করতে হয় সন্ধ্যার সময়। তাইলে রোজা হইব দুইটা।* বাবা বলতেন।

আসলে দুটো রোজার মানেটি হচ্ছে আমাকে খেতে হবে, সারাদিন না খেয়ে থাকলে আমার কষ্ট হবে, আমি কষ্ট পাই বাবা চাইতেন না। শেষ রাতে *সাইরেন* বাজার সময় বেশির ভাগ দিনই আমাকে ডাকা হত না, কিন্তু ঘরে থাল বাসনের শব্দ পেয়ে লাফিয়ে উঠে শেষ রাতের খাবার খেতাম, *রোজা* রাখব। আল্লাহ বলেছেন উপোস করতে, তাই উপোস করতে চাইতাম তা নয়। ছোটরা রোজা রাখলে বাড়িতে বেশ আদর পাওয়া যায়, লক্ষ করেছি। আদর পাওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য, সম্ভবত। আদরের বাইরেও এ অনেকটা খেলার মত ছিল, উপোস উপোস খেলা, খেলা শেষে মুড়ি, ছোলা, ডালের বড়া, বেগুন বড়া, গরম গরম জিলিপির সামনে বসে থেকে সাইরেন বাজলে খাওয়া শুরু করা। *সাইরেন সাইরেন, খাওয়া খাওয়া।*

পুরো মাস রোজা রেখে বাবা ঈদের উৎসবও করেন জাঁক করে। ছেলেমেয়েদের জন্য জামা কেনেন, মা'র জন্য শাড়ি, বড় ঈদে কোরবানি দিতে গরু কেনেন, নয়ত খাসি। সারাবছরে বাবার এটুকুই ধর্ম পালন। অবশ্য মাঝে একবার এক মৌলবি রাখলেন প্রতি সকালে এসে যেন তাঁকে *কায়দা* পড়িয়ে যান। হঠাৎ এ শখ কেন হয়েছিল তাঁর, কাউকে বলেননি। তবে শখটি হওয়ার ক'দিন আগে তিনি, আমি মনে করতে পারি, রাতে বাড়ি ফিরে খাবার টেবিলে বসে মা'র কাছে বলেছিলেন যে এক রোগীর বাড়িতে অদ্ভুত এক লোক দেখেছেন তিনি, লম্বা চুলদাড়ি লোকটির, ছেঁড়া জামা জুতো, কাগজে *আল্লাহ* লিখলেন আরবিতে, আর সে লেখা থেকে স্পষ্ট আওয়াজ বেরোতে লাগল *আল্লাহু আল্লাহু।* কাগজটি হাতে নিয়ে বাবা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন কোনও চালাকি আছে কি না, নেই। জামার পকেটে কোনও যন্ত্র লুকোনো আছে কি না, নেই। লোকটি নিজে শব্দ করছে কি না মুখে, না। কাগজের অক্ষর এমন জিকির কী করে তোলে বাবা বুঝে পান না। মা *আহা আহা* করলেন বাবার গল্প শুনে। বাবা লাটিমের মত ঝিম ধরে বসে রইলেন। মুখে খাবার উঠল না। ভাত নেড়ে চেড়ে ক্ষিধে নেই বলে থাল সরিয়ে রাখলেন। রক্তচাপ বাড়লে বাবা সকাল সকাল ঘুমোতে চলে যান যেমন, সে রাতেও গেলেন। বাবা কখনও, কী করলেন তিনি বাড়ির বাইরে, কী রোগী দেখলেন, কোথায় কী ঘটল কিছু বলেন না কাউকে, আমাদের তো নয়ই, মা'কেও না। কিন্তু সেদিন বাবা অদ্ভুত ব্যবহার করলেন। তার সপ্তাহ খানিক পর সকাল বেলা *রাতকানা* মৌলবি, রাতে লোকটি পথ চেনেন না বলে লোকে ডাকে তাই, নতুন একটি *কায়দা* হাতে নিয়ে দরজায় কড়া নাড়লেন, বাবা খবর দিয়েছেন। অবশ্য বাবার এসব সয়নি বেশিদিন। দুদিন *আলিফ জবর আ বে জবর বা* পড়েই মৌলবি এলে বলতেন, *মৌলবি সাব চা টা খান, আজ আর পড়তে ইচ্ছা করতাছে না। আগামী কাল পড়ব।* চা নাস্তা দেওয়া হত মৌলবিকে বাইরের ঘরে, ও খেয়ে তিনি বিদেয় হতেন। আগামীকাল আসে, পরশু আসে, ছাত্রের টিকিটির আর দেখা পাওয়া যায় না। দিন পাঁচেক পর মৌলবিকে পুরো মাসের বেতন দিয়ে একেবারই বিদেয় করে দিলেন। এই হচ্ছে ধর্মের গ্রাস বাবার ওপর, কেবল দু'দিনের জন্যই ছিল তার থাবা। এরপরই বাবা আবার আগের বাবা, অহংকারি, নীতিবান, কর্মঠ, ব্যাকব্রাশ, প্যান্টের ভেতরে শার্ট, শার্টের ওপর টাই, টাইয়ের ওপর কোট। শীতকালে ওভারকোট। ছয় ঋতুতেই জুতোর মচমচ।

বড় মামা ঢাকা থেকে প্রতিমাসে অবকাশের ঠিকানায় *উদয়ন* নামে একটি পত্রিকা পাঠান। এটি আমাদের কাজে লাগে বই খাতার মলাট বাঁধায়। *উদয়ন* এল, ছবি টবি দেখে ব্যস *মলাট।* বইখাতায় মলাট বাঁধা সেই লেখাপড়া শুরু করা অবদি শেখা। প্রথম প্রথম মলাট বেঁধে দিতেন মা, বিস্কুটের ঠোঙা, বাবা টোস্ট বিস্কুট কিনে আনতেন ভরে, কেটে। পরে সৌন্দর্যজ্ঞান বাড়লে নিজেই মলাট বাঁধি ক্যালেন্ডারের রঙিন পাতায়, গ্লাক্সোর ক্যালেন্ডারই বেশি, এরপর শুরু হল মাসিক উদয়নের পাতা ছিঁড়ে। *উদয়ন* পত্রিকাটি সোভিয়েত ইওনিয়নের দূতাবাস থেকে বেরোয়, বড় মামা দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পত্রিকাটির যুগ্ম সম্পাদকের চাকরি করেন। ময়মনসিংহে বেড়াতে এলে সঙ্গে করে বেশ বই আনেন, কিছু বই আবার রেখে যান আমাদের বাড়িতে। কী মনে করে কে জানে, সম্ভবত দাদারা যেন পড়েন। আদৌ ওসব বই খুলে দেখেন না দাদা কিংবা ছোটদা। আমি

অলস বিকেলগুলোয় মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে দেখি *ছোটদের লেনিন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, সমাজতন্ত্র কি ও কেন, ম্যাক্সিম গোর্কির মা, আমার ছেলেবেলা, পৃথিবীর পাঠশালা* এসব।

বড়মামা বাড়ি এলে বেশ ভাল ভাল রেঁধে খাওয়ান মা, চলে গেলে বলেন — *মেবাই কি যে হইয়া গেল, মাদ্রাসায় পড়া ছাত্র, হইল কি না কমুনিস্ট। ছি ছি।* মা'র *ছি ছি* শব্দ আমাকে সজাগ করে। জিজ্ঞেস করি, *কমুনিস্ট কি, মা?*

— *আর কী, আল্লাহ খোদা মানে না।* মা মন-মরা স্বরে বলেন।

এই প্রথম বিস্ময় আমার, তাহলে আল্লাহ খোদা না মানা লোকও জগতে আছে! বড় মামা চাঁদে নীল আর্মস্ট্রং মুতে এসেছেন বলেন, আরবি ভাষাটি যে কোনও ভাষার মত একটি ভাষা, এ ভাষাতেও অশ্লীল কথা লেখা হয়, অবলীলায় বলেন, কিন্তু তিনি আল্লাহ খোদা মানেন না এ আমাকে আগে কেউ বলেননি। বড় মামা কেন তা মানেন না আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কোনও উপায় নেই জানার, বড় মামা থাকেন দূরের শহরে, যখন আসেন, তাঁর রাজকন্যাটিকে তিনি একটি ছোট খাট শিশুই ভাবেন, রাজকন্যা যে দেখতে দেখতে বড় হচ্ছে, কতরকম প্রশ্ন জমছে মনে, তা তিনি মোটেও দেখতে পান না। বোকা সোকা লাজুক মেয়ের হাতে দু'টো লজেন্স তুলে দেয়াই ভাবেন যথেষ্ট।

বড় মামার রেখে যাওয়া বইগুলো প্রথম নেড়ে চেড়ে এরপর পড়ে পড়ে আমার ধারণা জন্মেছে সেই ফ্রক পরা বয়সেই যে পৃথিবীটা কেবল ঝাড়ফুঁকের জগত নয়, এসবের বাইরে বড় একটি জগত আছে, *যুক্তির জগত।* নামাজ রোজা সবাই করে না, কোরান হাদিস সবাই পড়ে না। সবাই বারো মাসে তেরো পূজার আয়োজন করে না। মাটির মূর্তি বানিয়ে মাথা ঠোকে না। মিলাদ হয় না, কীর্তন হয় না। খ্রিস্টান মানেই মিশনারির কালো আলখাল্লা পরা *নান* আর *ফাদার* নয়। এর বাইরে অন্যরকম কিছু আছে। আমার সেই টলমল সময়ে বাড়িতে সাজ সাজ রব পড়ে যায় একদিন। বড় মামা খবর পাঠিয়েছেন তিনি এক বিদেশি লোক নিয়ে বাড়িতে আসবেন। বাড়ি ঝাড়া মোছা হল, মুছে মেঝে চকচক করা হল, বিছানাগুলোয় ধোয়া চাদর বিছানো হল, খাবার টেবিলের ওপর কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হল। জানালা দরজায় নতুন পর্দা টাঙানো হল। দুপুরের আগেই আমাদের সবাইকে গোসল করে সবচেয়ে ভাল জামাটি পরে শান্ত হয়ে বসে থাকতে বলা হল বৈঠকঘরে। ভিক্তর ই পিরোইকো যখন বাড়ি ঢুকে সবার দিকে হাত বাড়িয়ে দেবেন, আমাদেরও হাত বাড়াতে হবে, আমাদের মুখস্ত করানো হল বলতে *হাউ ডু ইউ ডু।* ব্যস এটুকুই, এরপর আমাদের ঢুকে যেতে হবে ভেতরের ঘরে। ঠিক হল, দাদাই ঠিক করলেন, তিনি যেহেতু ইংরেজি বলতে জানেন, তিনিই খাবার টেবিলে বড় মামা আর ভিক্তরের সঙ্গে বসবেন খেতে। সব ঠিক। ভিক্তর এলেন, হাত মেলানো হল, কিন্তু হাউ ডু ইউ ডু, শেখানো বাক্যটি আমার মুখ থেকে কিছুতেই বেরোল না। বাক্যটিতে বড় হাডুডু হাডুডু গন্ধ আছে।

শেখানো জিনিসে, আজকাল এই হয়েছে আমার, মন সায় দেয় না। বাড়িতে প্রচুর খাবার রান্না হয়েছিল। খেয়ে দেয়ে ভিক্তর বাড়ি ঘুরে দেখতে বেরোলেন। উঠোনে আলম থাকত যে ঘরটিতে, সে ঘরের পেছনে জংলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করলেন।

ওই প্রথম আমার কোনও শাদা লোক দেখা।

কী শাদা রে কী শাদা! জীবনে অনেক শাদা ইংরেজ দেখা মা'র চোখও বিস্ময়ে অভিভূত হল।

ভিক্তর চলে গেলে, যেন এ বাড়ি ভিক্তরের পদধুলোয় ধন্য হয়েছে, বিগলিত হেসে দাদা বারান্দার চেয়ারে বসে পা দোলাতে লাগলেন। তাঁর পরনে ইস্ত্রি করা শার্ট প্যান্ট, পালিশ করা জুতো।

মা পরদিন পীরবাড়ি থেকে ঘুরে আসার পর বললেন — *শাদা হইলে কী হইব! দেখলাম ত খাড়োয়া পেশাব করছে বেডা। পেশাব কইরা পানিও লইছে না। শয়তানরা খাড়োয়া পেশাব করে। কম্যুনিস্ট ত, করত না! আল্লাহ রসুল বিশ্বাস করে না, আগে জানলে আমি রান্ধা বাড়া করতাম না।*

শয়তানে, মা'র বিশ্বাস, জগত ভরে গেছে।

বিদ্যাময়ী ইস্কুল শহরের নামকরা মেয়েদের ইস্কুল। বিদ্যাময়ী দেবী নামে শশিকান্ত নাকি সূর্যকান্ত মহারাজার বোন ইস্কুলটি বানিয়েছিলেন। দেয়াল ঘেরা বিশাল সবুজ মাঠের ওপর লাল দোতলা দালান। বট অশ্বত্থ গাছে ছাওয়া। মাঠের একপাশে পদ্মপুকুর। ইস্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় আমি টিকে গেলে, ঝুনুখালা, এ ইস্কুলে লেখাপড়া করেছেন যেহেতু, কোনটি কোন ক্লাসঘর, কোনটি মাস্টারদের বসার ঘর, কোনখানে *এসেম্বলি* হয় আমাকে চিনিয়ে বসিয়ে দেন *চতুর্থ শ্রেণীকক্ষের* প্রথম সারিতে। বসিয়ে, কানে কানে বলেন, মুচকি হেসে, *তরে কিন্তু বড় ক্লাসের মেয়েরা আইসা একটা জিনিস কইতে পারে।*

— *কি কইতে পারে ঝুনুখালা?*

আমার ভয় ধরা মুখে তাকিয়ে খালা হেসেছেন, রহস্য ভাঙেননি।

ঘটনা প্রথমদিন ঘটেনি, ঘটেছে দ্বিতীয়দিন। দুপুরবেলা টিফিনের একঘন্টা ছুটি হয় ইস্কুলে, টিফিন খেয়ে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে মেয়েরা মাঠে *বৌচি* খেলছে, দেখছি, একা দাঁড়িয়ে দেখছি, হঠাৎ চোখে পড়ে এক মেয়ে স্পষ্টতই ওপরের ক্লাসের, আমি চিনি না, রেলিংএ ভর দিয়ে আমাকে দেখছে, মুখে হাসি। আমি চোখ সরিয়ে নিয়ে ক্লাসঘরের দিকে দু'পা যেই বাড়াই, মেয়েটি পেছন থেকে ডাকে, *এই মেয়ে শোনো।*

আমি থমকে দাঁড়াই।

মেয়েটি কাছে এসে জিজ্ঞেস করে — *তোমার নাম কি?*

আমি বলি — *নাম জিগাস করেন ক্যান?*

লম্বা, শ্যামলা, চুল বেনি করা মেয়েটি হেসে বলে — *তুমি তো খুব সুন্দর, সেজন্য।*

মেয়েটি আমার হাত টেনে নেয় মুঠোয়, হাতের আঙুলে অল্প অল্প চাপ দেয়। ছাড়িয়ে নিয়ে আমি গা কাঠ করে দাঁড়িয়ে থাকি।

মেয়েটি, কি নাম জানি না, বলে — *ভয় পাওয়ার কিছু নাই। আমি তোমারে কিচ্ছু করব না।*

চোখ আমার মাটিতে, বুক ধুকপুক করে। মেয়েটি আরও কাছ ঘেঁসে কেউ যেন শুনতে না পায়, বলে — *তুমি আমার ফেভারিট হবা?*

ফেভারিট হওয়া কাকে বলে আমি জানি না। চোখ উপচে জল নামে আমার। মেয়েটি আমার চোখের জল আঙুলে মুছে দিয়ে বলে — *কি বোকা মেয়ে, কাঁদো কেন!*

একদল মেয়েকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে দেখে মেয়েটি দ্রুত সরে যায়।

ক্লাসঘরের সিলিং জুড়ে লম্বা রঙিন কাপড়ের পাখা, ঘরের বাইরে বসে আয়ারা টানে, পাখা দোলে, ওই টানা পাখার নিচে বসেও ভেতরে ঘামতে থাকি ভেবে যে একটি ওপরের ক্লাসের মেয়ে নিশ্চয় আমাকে ফুঁসলিয়ে কোথাও নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কোথায় কে জানে!

মেয়েটি পরদিন টিফিনের সময়, সেদিনও আমি সিঁড়ির কাছে একা দাঁড়িয়ে, হাতে একটি পাকা পেয়ারা দিয়ে বলল – *এই লাজুক মেয়ে, ফেভারিট হবা না আমার? বল, হবা। আমি তোমারে অনেক অনেক আদর করব।*

বুজে আসা স্বরে বলি – *না।*

মেয়েটি মিষ্টি হেসে আমার হাত ধরে, আমি মুঠি করে রাখি হাত।

ক্লাসের কিছু মেয়ে, আমি তাদের নামও তখন জানি না, ইস্কুল ছুটির পর গায়ে পড়ে জিজ্ঞেস করে – *তোমার ফেভারিট কে? ওইযে লম্বা আপাটা তোমার ফেভারিট, না?*

আমি কিছু বুঝে পাই না *ফেভারিট* ব্যাপারটি কি! মেয়েরা কার *ফেভারিট* কে, এই নিয়ে কানাকানি করে। কেউ তার ফেভারিটের নাম বলে না, সব যেন বড় গোপন এক ব্যাপার।

ঝুনু খালার কাছে গোটা ব্যাপারটি পরে জানা হয় আমার। বিদ্যাময়ী ইস্কুলে এ খুব পুরোনো নিয়ম যে ওপরের ক্লাসের মেয়েরা নিচের ক্লাসের সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে *ফেভারিট* পাতে। একধরনের *সই* পাতার মত। ঘটনাটি আর সবার কাছে গোপন থাকা চাই। কেউ যেন না দেখে তারা ইস্কুল ছুটির পর নয়ত খেলার ঘন্টায়, নয়ত টিফিনের সময় গাছের তলে, পুকুরঘাটে, দেয়ালের আড়ালে দেখা করে, হাতে হাত রেখে গল্প করে, বড় মেয়েটি ছোট মেয়েটিকে এটা ওটা উপহার দেয়। ঝুনু খালার ফেভারিটের নাম ছিল বিউটি। অসম্ভব সুন্দর একটি মেয়ে। ঝুনুখালা যখন বিউটির কথা বলেন, মিষ্টি হাসেন, সেরকম মিষ্টি হাসি লম্বা মেয়েটিও হেসেছিল।

দিন যেতে থাকে, আর আমার মনে হতে থাকে ফেভারিট ব্যাপারটি বিষম এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার। ইচ্ছে করে আবার কেউ এসে একবার *ফেভারিট* হতে বলুক আমাকে। একবার কেউ ডাকলেই আমি চলে যাব, *চলে যাব সুতোর ওপারে।* ক্লাসের সুন্দর মেয়েগুলো টিফিনের ঘন্টা পড়লে পাখির মত উড়াল দিয়ে কোথায় যে যায়! কান পাতলে মেয়েদের কানাকানি শুনি যে মমতার গলার নতুন মালাটি ওর ফেভারিট দিয়েছে। শাহানার ফেভারিটের নাম বন্যা। কেউ বলে বন্যা নয়, কেউ বলে না বন্যাই, বন্যার সঙ্গে বট গাছের আড়ালে কেউ ওকে ঘনিষ্ট দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে।

আমি এক *বোকাচন্দ, লজ্জাবতী লতা।* ফেভারিট নেই, ক্লাসেও কোনও বন্ধু নেই, কেউ আমাকে খেলায় নেয় না, ক্লাসে পড়া ধরলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকি। গানের, নাচের, খেলার ক্লাসেও আমার মত *লাড্ডু* আর একজনও নেই। বাংলা ক্লাসে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল – *একটা ফুলের নাম বল তো দেখি!* আমি ভাবছিলাম, ফুল তো অনেকই আছে, কিন্তু খুব সুগন্ধ ছড়ায় কোন ফুল, গোলাপ না কি দোলন চাঁপা নাকি শিউলি নাকি বেলি, নাকি রজনীগন্ধা।

মাস্টার আমার নৈঃশব্দ্য দেখে রাগ করে বললেন – *মেয়েটা কি বোবা নাকি!*

বোবাই। বোবা বলে, সে, যেহেতু ক্লাসে দাঁড়িয়ে বলতে হবে মাস্টারকে *মে আই গো টু দ্য বাথরুম?* এরকমই বলার নিয়ম, ইংরেজিতে, আর মাস্টার ইচ্ছে করলে বলতে পারেন, হ্যাঁ অথবা না, না বললে বসে থাকতে হবে শ্বাস বন্ধ করে, যা যে কেউ দেখলেই বুঝবে কেন, আর হ্যাঁ বললে সবার চোখের সামনে দিয়ে আমাকে দৌড়ে নয়ত ঠ্যাং চেপে

হাঁটতে হবে— সকলে ভাবতে বসবে আমি *বড়টির* জন্য যাচ্ছি নাকি *ছোটটির* জন্য, এসব জিনিস যে জনসমক্ষে *চাপা* বড় লজ্জা, তাই আমি *মে আই গো টু* জাতীয় কোনও বাক্যে না গিয়ে বোবা হয়ে ছিলাম। শক্তি দিয়ে *ঠে*কাচ্ছিলাম। *ঠে*কিয়েছিলাম, মাস্টার চলে গেলে, কেউ যেন না বোঝে কোথায় যাচ্ছি, গিয়ে মাঠের যে কোণাটিতে পায়খানা, সে কোণায় ভিড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, *ঠে*কিয়ে। পরে আসা মেয়েগুলো আমাকে ডিঙিয়ে এক এক করে *সেরে* আসে। আমার আর *সারা* হয় না। বেগবান জিনিস শরীর থেকে বেরোতে হাত পা ছুঁড়ে রীতিমত যুদ্ধ শুরু করে ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হওয়া নিরস্ত্র হওয়া আমার সঙ্গে। মনে মনে বলি *আর একটু সবুর কর বাবা!* সবুর কার এত সয়! শেষ অবদি মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে যোদ্ধার দল। শাদা পাজামা মুহূর্তে রঙিন হয়ে ওঠে। আমি দাঁড়িয়ে থাকি লজ্জায় মুখ নিচু করে, দেয়ালে শরীর সেঁটে, একা। আমি জানি না কে আমাকে ওই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। উদ্ধার করতে অবশ্য একজন এগিয়ে আসে, যে মেয়েটি আমার সামনে এসে মিষ্টি হেসে বলে *কি হয়েছে, এখানে একা একা দাড়ায়া আছ কেন?* সে ওই লম্বা মেয়েটি, চোখের জল মুছে দেওয়ার, পাকা পেয়ারার। ধরণী আসলে দ্বিধা হয় না কখনও, যত তাকে হতে বলা হোক না কেন। অথবা হয়, *সীতা* হলেই হয়, আমি কি আর *সীতা* হতে পেরেছি! আমার মাথা ঘাড় থেকে ঝুলে থাকে, যেন এক্ষুণি ছিঁড়ে পড়বে, মেয়েটি বুঝে আমার করুণ দশা, হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে শলা পরামর্শ করে আমার বই খাতা ক্লাস থেকে নিজেই নিয়ে এসে ইস্কুলের মেথরানি রামরতিয়াকে সঙ্গে দেয় আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। এ কাজটি যদি অন্য কেউ করত, সইত।

বাড়িতে খবরটি গোপন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। সম্ভব হয়নি। অসময়ে ইস্কুল থেকে হলুদ পাজামার ফেরা, সঙ্গে মেথরানি। বাড়ির বড়রা মুখ টিপে হাসে, ছোটরা গলা ফাটিয়ে। দাদার নিজের একার দুর্নাম ঘুচল এবার, সাত পাক নেচে বলে

বিদ্যাময়ীর হাগড়া গাড়ি শাদা পাজামা হলুদ করল

অসময়ে ইস্কুল থেইকা রামরতিয়ায় নিয়া আইল।

পুরো মাস আমাকে *গুয়ের চারি, রামরতিয়ার সই* বলে ডাকা হল বাড়িতে। মা অবশ্য মাঝে মধ্যে ধমকে সরান দাদাকে, বলেন *ওর পেটটা খারাপ আছিল।*

মা'র আস্কারা পেয়ে আমি দাদাকে ভেংচি কেটে বলি – *তুমিও তো ইস্কুলে হাগ্যা দিতা!*

দাদা বলে – *ইহিরি, তর মত বড় হইয়া হাগছি নাকি, আমি তহন ছোট্ট, ওয়ানে পড়ি মাত্র।*

দাদাকে নিতে এক্সপেরিমেন্টাল ইস্কুলের রিক্সা আসত, বাচ্চারা যেন সিট থেকে পড়ে না যায় সামনে বেল্ট বাঁধা থাকত। প্রায়ই ইস্কুল ছুটির আগেই দাদাকে বাড়ি দিয়ে যেত রিক্সাঅলা। দু'আঙুলে ধরা থাকত দাদার গুয়ে মাখা হাফপ্যান্ট। একদিন রেগেমেগে রিক্সাঅলা বলল *ছেলের পেট ভালা কইরা পরে ইস্কুলে পাঠাইয়েন।*

মা বলেন – *একবার এক কৌটার দুধ খাওয়ানোর পরে নোমানের পেট যে খারাপ হইল তো হইলই। আইজও ওর পেটটা ভালা না।*

এটি হচ্ছে দাদার জন্মের দোষে নাকি কৌটোর দুধের দোষে, মা নিশ্চিত নন।

দাদার হেগে দেওয়া প্রসঙ্গ এলে আমি স্বস্তি বোধ করি। অন্তত আমি যে একা একটি বিশ্রি কান্ড ঘটাইনি, তা ভেবে। কিন্তু ইস্কুলে সে স্বস্তি জোটে না আমার।

ইস্কুলে কারও ফেভারিট হওয়ার সম্ভাবনা, আমি বুঝি, আমার আর নেই। লম্বা মেয়েটিকে দূর থেকে দেখেই উল্টো হাঁটি। যে কেউ আমার দিকে তাকালে মনে হয় সে বুঝি আমার পাজামা হলুদ করার ঘটনাটি জানে। লজ্জায় আমার কান নাক লাল হয়ে থাকে।

যুদ্ধ শেষ হলে যখন ইস্কুল খোলে, বার্ষিক পরীক্ষা ছাড়াই আমাদের ওপরের ক্লাসে তুলে দেওয়া হয়। *পাক সর জমিনের* বদলে ইস্কুলের এসেম্বলিতে নতুন পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে গাইতে হয় *আমার সোনার বাংলা।* মানুষের দৈর্ঘ প্রস্থ বদলে গেছে, ভাবনা ভাষা আরও সতেজ, দীপ্ত, আরও প্রাণময়। যেন বয়স ন' মাসের বদলে বেড়ে গেছে ন' বছর। যেন বালিকারা এখন আর বালিকা নয়, তরুণী। কারও বাড়ি পুড়েছে, কারও ভাই হারিয়েছে, কারও বাবা, কারও ধর্ষিতা বোনের জরায়ুতে ফুলে ফেঁপে বড় হচ্ছে অনাকাংখিত শিশু। এরকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সকলে আমরা হেঁটে এসেছি, লাশ দেখতে দেখতে, আর্ত চিৎকার শুনতে শুনতে।

তখন কোনও এক বালিকা-বেলায় শাদা পাজামা হলুদ করে বাড়ি ফিরেছিলাম এ নিতান্তই বিস্মৃত হওয়ার মত তুচ্ছ।

অপেনটো বায়োস্কোপ
নাইন টেন তেইসকোপ
সুলতানা বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা

বলে মেয়েদের গলায় মালা পরিয়ে নিজের দলে নিয়ে *গোলাপ পদ্ম* খেলতে, আমার আর কান গরম হয় না শরমে। খেলার ঘন্টা বাজলে জিমনেসিয়ামে দৌড়োনো, টিফিনের সময় দৌড়ে দাঁড়িয়াবান্ধার কোট দখল করায় আমি আর আড়ষ্ট হই না। *বৌচি* খেলতে আর সবার মত আমিও নামি। অবশ্য বার্ষিক খেলা প্রতিযোগিতায় আমি যে *লাড্ডু,* সে লাড্ডুই থাকি। শাহানা আর তার চার বোন, হীরা, পান্না, মুক্তা, ঝর্ণা লেখাপড়ায় লাড্ডু হয়েও খরগোসের মত *ছোট দৌড়, বড় দৌড়, বিস্কুট দৌড়, ব্যাঙ দৌড়* এরকম একশ রকম দৌড়ে সবকটি পুরস্কার জিতে নিয়ে যায়। শাহানার দিকে বিস্মিত মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকি আমি। ইস্কুলের সেই দুর্দান্ত মেয়ে শাহানার সঙ্গেও আমার বিষম ভাব হয়ে গেল একদিন।

এতসবের মধ্যেও, আমার কিন্তু বুক ধুপপুক করেছিল আরও একবার, চোখ নত হয়েছিল, লজ্জায় লাল হয়েছিল নাকের ডগা, আমার হাতখানা সে ছুঁয়েছিল বলে সারা গা কেঁপেছিল আমার, তাকে স্বপ্ন দেখে জেগে উঠতাম, সারাদিন তাকে মনে করে আমার ঠোঁটে খেলত মিষ্টি হাসি। ঘুমোতে গেলে চোখে ভাসত মেয়েটির মুখ, তার হাসি, তার কথা বলা, তার হেঁটে আসা, তার হাত নাড়া, তার পিঠের ওপর কোঁকড়া চুলের বেণি। আমার মনে হত জগতে আমি এত আশ্চর্য সুন্দর কাউকে দেখিনি। জগতে আর কারও

চোখ এত সুন্দর নয়। মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে, আমি জগত ভুলে যাই। আমার সারা গায়ে অদ্ভুত, অদ্ভুত শিহরণ হয়।

ঘটনাটির শুরু এরকম, ইস্কুলে যাচ্ছি, ছোটদা আর তাঁর এক বন্ধু, মিলু, পথে আমাকে থামিয়ে একটি চিঠি দিলেন হাতে, *রুনি* নামের এক মেয়েকে, মেট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে, হোস্টেলে থাকে, দিতে। চিঠিটি মিলুর লেখা। বলা হল, ব্যাপারটি যেন বাড়ির কেউ না জানে, ইস্কুলের কোনও মেয়েও। এ আর এমন কি, রুনিকে খুঁজে বের করে চিঠিটি দিই। চিঠিটি রুনি তখন পড়ে না, জামা সরিয়ে বুকের ভেতরে কোথাও রেখে দেয়। আমি অপলক তাকিয়ে ছিলাম রুনির চোখে। সেই আশ্চর্য সুন্দর দুটো চোখে। আমার ইচ্ছে করেছিল রুনি দাঁড়িয়ে থাকুক আমার সামনে আরও আরও, আমি তার চোখদুটোর দিকে আরও আরও তাকিয়ে থাকি। রুনি সেদিন চিঠি নিয়ে চলে যাওয়ার পর আমি দাঁড়িয়েই ছিলাম হোস্টেলের দেয়ালে পিঠ রেখে, ক্লাসের ঘন্টা আমাকে সচল করার আগ অবদি। সেই থেকে আমার তৃষ্ণার্ত চোখ খোঁজে তাকে হাজার মেয়ের ভিড়ে। ক্লাসঘরের জানালায় বসে তাকিয়ে থাকি বাইরের মাঠে, যদি তাকে হাঁটতে দেখি, যদি একপলক দেখা হয় আবার হঠাৎ কখনও।

দু'দিন পর ইস্কুল ছুটি হলে পদ্মপুকুর পাড় থেকে দৌড়ে এসে আমাকে একটি চিঠি দেয় রুনি, মিলুকে দিতে। চিঠিটি হাতে নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকি। রুনি মিষ্টি হেসে বলে — কিছু বলবে?

আমি মাথা নাড়ি। আমার আর কি বলার ছিল!

— *তুমি খুব লাজুক মেয়ে। এত কম কথা বল। হোস্টেলে এসো, তোমার সঙ্গে গল্প করবখন।*

বলে রুনি আমার হাত ধরে কাছে টানে তার, রুনির শরীরে ফুলের গন্ধ। রুনি যেন রূপকথার দোলনচাপা, প্রাণ পেয়ে রাজকুমারি হয়েছে। আমার সারা শরীর কাঁপে ভাল লাগায়। বুক ধুকপুক করে। আমার ভেতরে কোথাও কোনও পুকুরে একশ পদ্ম ফোটে। মিলু আরও চিঠি দিক, রুনি তার উত্তর দিক প্রতিদিন, তাহলেই আমি রুনির *আরও আরও* কাছে যাব, রুনি আমার চিবুকে আঙুল রাখবে, চমৎকার ভাঙা কণ্ঠে কথা বলবে, কপালের চুলগুলো উড়বে হাওয়ায়। আমি তার বুকে মুখ রেখে দোলনচাপার গন্ধ নেব।

পড়ালেখায় মন বসে না, খাতায় শতবার করে নাম লিখি রুনির। অঙ্ক করতে করতে, কখন বুঝি না মার্জিনের বাঁপাশে রুনির কালো দুটো চোখ আঁকি। হোমওয়ার্কে *গোল্লা* পেতে থাকি দিনদিন। রুনি আমার জীবন জগত, জানি সে ক্ষুদ্র, গ্রাস করে নেয়। খেলার মাঠ আমাকে আর আগের মত টানে না, পুকুর ঘাটে একা বসে থেকে রুনিকে ভাবি, পুকুরের কালো জলে রুনির চোখ দেখি। যে বাহুতে আমার স্পর্শ করেছিল রুনি, সে বাহুতে হাত বুলিয়ে মনে মনে আবার তার স্পর্শ নিই। আমার পুতুল খেলা, গোল্লাছুট, অপেনটো বায়োস্কোপ তুচ্ছ করে উদাস বসে থাকি কদম গাছের তলে, রুনির স্পর্শ পাওয়ার তৃষ্ণায় গোপনে আকুল হই।

রুনির সঙ্গে আসলে দীর্ঘ দীর্ঘ ক্ষণ বসে কখনও আমার গল্প করা হয়নি। আমার সাধ না মেটা যেটুকু অল্প সময় রুনির জুটত, ও নিজে গল্প বলেছে, আমি মুগ্ধ হয়ে কেবল

শুনেছিই, হোস্টেলের সিঁড়িতে বসে, ওর বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে। যেন রূপকথার বইএর ছবি থেকে নেমে আসা দোলনচাপা-রাজকুমারি এক নিবিড় বনে চুল খুলে গান গাইছে। ওকে কেবল ভীষণ রকম ভালবাসতে ইচ্ছে করত আমার, খুব গোপনে ভীষণ রকম। ওর চোখের দিকে একবার তাকালে আমার সারা জীবনের গল্প ওকে বলা হয়ে যায়। ওকে একবার স্পর্শ করলেই জগতের সব সুখ আমার হাতের মুঠোয় চলে আসে।

রুনি আমার হাতে রেশমি চুড়ি পরিয়ে দেয়, গলায় মালা। রুনির শরীর ঘনিষ্ঠ হতে থাকে আমার শরীরের সঙ্গে, আর আমি গন্ধ পেতে থাকি দোলন চাঁপার। আমি ওকে আরও আরও ভালবাসতে থাকি। শরমে চোখের পাতা নুয়ে আসে আমার।

সেই চুড়ি মালা অবশ্য বাড়ি এসে খুলে রাখতে হয়। বাবা জামা জুতো ছাড়া শরীরে বাড়তি কোনও জিনিস পছন্দ করেন না। অলংকার পরাবেন আশায় আমার দু'কান ছিদ্র করেছিলেন মা, দেখে মা'কে যা তা গাল দিয়েছেন বাবা। কখনও চুড়ি মালা দুল পরতে দেননি, ইস্কুল থেকে ফেরার পথে ফুটপাতের চুড়িঅলার কাছ থেকে একবার এক হাত কাচের চুড়ি কিনে বাড়ি ফিরেছিলাম, দেখে ভেঙে টুকরো টুকরো করে সবকটা চুড়ি, গালে চড় কষিয়ে বাবা বলেছিলেন — *ফের যদি দেখি এইসব পরছস, তর হাড় গুঁড়া কইরা দিব।*

পায়ে একবার আলতা পরেছিলাম, বাবা খামচে ধরে বলেছিলেন — *কি ব্যাপার, রক্ত কেন তর পায়ে, কাইটা গেছে নাকি!*

মা প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলেছিলেন — *রক্ত হইব কেন, মেয়েরা লাগায়, শখ হইছে, লাগাইছে।*

রুনির দেওয়া চুড়ি মালা আমার পরার দরকার হয় না, ওর ভালবাসা আমি অন্তরে অনুভব করি। রুনির সঙ্গে গভীর গোপন ভালবাসায় আমি যখন মগ্ন, সে সময় এক রাতে, আমার শরীর জেগে ওঠে শুভ্র বিছানায়। কে যেন আমাকে নিজের বিছানা থেকে নামিয়ে নিঃশব্দে হাঁটায়, হাঁটিয়ে মেঝেয় পাতা *ছোটলোকের* মলিন বিছানায়, অন্ধকারের কাঁথায় ঢেকে শরীর, শোয়ায়। মণি আবার ফেরত এসেছে এ বাড়িতে, এসেছে ডাঙর হয়ে। দুপুররাতে বাবার সঙ্গে হাতে নাতে ধরা পড়ার পর রেনুর মা'কে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন মা, এরপর আকুয়ার বস্তি থেকে এক এক করে অনেককেই এনে গতর খাটিয়েছেন, শেষে পুকুরপাড়ে একা বসে থাকা, না খাওয়া মণিকেই তুলে আনেন। মণির শরীর নিয়ে আমি খেলি, ওকে উলঙ্গ করে, ওর বুকে হঠাৎ কবে বড় হওয়া দুটো পেয়ারা দু'হাতের মুঠোয় নিয়ে। মণির জামার তলে লুকিয়ে এত সুন্দর স্তন কেউ ছোঁয়নি; আমি কেবল ছুঁই, আমি কেবল দু'হাতে, ঠোঁটে, নাকে ছুঁয়ে দিই, যেন কতকালের পুরোনো সইএর সঙ্গে নতুন করে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা। রথের মেলা থেকে কিনে আনা মণি আমার শখের পুতুল, আমার জ্যান্ত পুতুল। আমার বুকে তখন কেবল গোলাপ ফুটছে, কুঁড়ির ভেতর থেকে উঁকি দেওয়া গোলাপের ঘুমঘুম চোখ শরমে বুজে আসে আলোয়। অন্ধকারে সেই চোখ চুমু খায় মণির পাকা পেয়ারায়।

মধ্যরাতের গোপন খেলা খেলেই চলি সইয়ের সনে,
কেউ জানে না।

এ যেন বালিকার গোল্লাছুট। গোল্লা থেকে ছুটতে ছুটতে, ভুলে ধুলোকাদার ঘর, মিছিমিছির রান্নাবাড়ি, পুতুল বিয়ে, টগবগ করা জীবনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দু'চোখে রাজ্যির বিস্ময় নিয়ে খুলে খুলে শরীর দেখি, শরীরের ভেতরে দেখি লুকোনো আরও এক গোপন শরীর।

বোকাচন্দ মেয়েটি গোপনে গোপনে এমন কান্ড ঘটিয়ে ফেলতে পারে!

রুনিকে, মিলুর চিঠি আর সে দেয় না, এখন নিজেই সে ফুলপাখিপাতার আল্পনা আঁকা কাগজে চিঠি লেখে, দাদার ড্রয়ার থেকে চুরি করা কাগজে, বুকের বাগান থেকে একটি একটি করে শব্দের ফুল তুলে সে মালা গাঁথে। রুনি উত্তর লেখে। রুনির চিঠিতে সে দোলনচাঁপার ঘ্রাণ পায়। তার নিরাভরণ নিস্পন্দ জীবন দুলে ওঠে ফুলের দোলনায়। কে জানে বাড়ির! কেউ না। একই সঙ্গে দুটো জীবন যাপন করি আমি, বাবা মা'র গাল, চড় থাপড় খাওয়া বাইরের আমি, আর ভেতরের অন্য আমি, গোল্লা থেকে ছোটা আমি, প্রেমের জলের ডুবুরি।

ছাত্রাণাম অধ্যয়নং তপঃ। ছাত্রদের তপস্যাই হওয়া উচিত অধ্যায়ন। জ্ঞানের চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নাই। বড় বড় মনীষীরা বলে গেছেন। কী বলে গেছেন?

আমার উত্তর দেবার দরকার হয় না, কারণ বাবাই বলবেন কি বলে গেছেন মনীষীরা। *বলে গেছেন কষ্ট করিলে কেষ্ট মেলে। সুতরাং তুমাকে আদা জল খেয়ে লাগতে হবে। খেলাধুলা বাদ, আরাম আয়েশ বাদ। শুধু বিদ্যা অর্জন কর। বিদ্বান হও। তুমাকে দশটা লোকে সম্মান করবে, সমাজে মাথা উঁচু করে থাকতে পারবা। আমারে দেখাইয়া লেখাপড়া কইর না, নিজের জন্য কর। পাগলেও নিজের বুঝ বুঝে।আর যদি লেখাপড়া না কইরা ভাদাইম্যা হও, ভাব বাপের হোটেলে থাকি, গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়াব, তাইলে কী হবে ভবিষ্যত? রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করতে হবে। সুতরাং জ্ঞানী হও। বিদ্যা অর্জন কর। মানুষের মত মানুষ হও। কষ্ট কর, তাইলেই কেষ্ট মিলবে। কষ্ট কইরা চাষাবাদ করার পর চাষীরা ফসল ঘরে তুলে। কষ্ট না কইরা তুমি খেলা নিয়া থাকলে, আড্ডা মারলে, তামাশা করলে কেষ্ট মিলবে না। কষ্ট কইরা রাইত দিন খাইটা লেখাপড়া কইরা মানুষ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়, জজ ব্যারিস্টার হয়। রাত দশটার আগে ঘুমানি চলবে না। টিউটর আসে ঠিকমত?*

এই উত্তরটি বাবা দেবেন না, আমাকেই দিতে হবে, *হ, আসে।*

সামনের পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ হইলে, বাবা চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, *পিঠের চামড়া তুইলা ফেলব, বইলা দিলাম।*

জুতোর মচমচ শব্দ শুনে বুঝি বাবা এখন সরেছেন দরজা থেকে। দরজায় দাঁড়িয়ে এরকম *বাণী* বর্ষণ করা তাঁর প্রতিদিনের স্বভাব। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করিয়ে যে করেই হোক *মস্ত* কিছু বানাবেন তিনি, এরকমই তাঁর পণ। মেট্রিকে *খারাপ* ফল করার পর দাদা বাড়ি ফেরেননি তিনদিন ভয়ে। বাবা সন্ধি বেত হাতে নিয়ে দাদার অপেক্ষায় বসেছিলেন, মাথায় লোটা লোটা ঠান্ডা পানি ঢেলেছিলেন। দাদার বন্ধুরা যারা একই রকম পাশ করেছিল, তাদের বাবারা মিষ্টি নিয়ে বাড়ি ফিরেছে, আত্মীয় স্বজনকে ছেলে-পাশের মিষ্টি খাইয়েছে। তিনদিন পর দাদাকে খুঁজে বার করে কান টেনে বাড়ি নিয়ে আসেন

বাবা। সাফ সাফ বলে দেন, আইএসসিতে ভাল ফল না পেলে এ বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। দাদার জন্য তিনটে মাস্টার রেখে দিলেন। পরীক্ষায় তারপরও দাদা দ্বিতীয় বিভাগ। দাদা নিজে অবশ্য বলেন *হায়ার সেকেন্ড ডিভিশন।* তাঁর ওই *হায়ার* দিয়ে কাজ হয় না। মেডিকেল কলেজে দু'দুবার ভর্তি পরীক্ষায় বসেও পাশের লিস্টিতে নাম পাওয়া যায় না তাঁর। দাদার এ অবস্থায় বাবার রক্তচাপ বাড়তে থাকে। মুড়ির মত ওষুধ ছুঁড়তে থাকেন মুখে। অক্ষমাযোগ্য অপরাধ করে দাদা লক্ষ করেন সংসারে তাঁর আদর কমছে, তিনি দিন দিন উদাস হতে থাকেন। খেতে বসে বাবা ছোটদার পাতে মাংসের ভাল টুকরোগুলো তুলে দেন, দাদা ঝোল মেখে ভাত ডলতে থাকেন, পাতে একখানা কেবল চোষা হাড়।

ছোটদার জন্য চারটে মাস্টার, অঙ্কের, পদার্থ বিদ্যার, রসায়নের, ইংরেজির। ছোটদা মাস্টারদের বাড়িতে পড়তে যান বিকেলে। আমার মাস্টার আসেন বাড়িতে। ইয়াসমিনের মাস্টারও। ইস্কুল থেকে ফিরে জিরোতে না জিরোতে মাস্টার আসেন। যত ওপরের ক্লাসে উঠছি, তত *গৃহশিক্ষক* বাড়ছে। দাদা আর ছোটদার জন্য সন্ধে থেকে রাত বারোটা অবদি পড়া, আমার জন্য দশ, ইয়াসমিনের জন্য রাত আট, বাবা এরকম নিয়ম করে দেন। দাদারা বড় বলে শব্দ করে না পড়লেও চলবে, কিন্তু আমাদের, আমার আর ইয়াসমিনের শব্দ করে পড়তে হবে, বাবা যেন তাঁর ঘরে বসে শুনতে পান আমরা ঘুমোচ্ছি না, পড়ছি। এদিকে ঘড়ির কাঁটা আটের ঘরে এলে আমার চোখ ঢুলে আসে, বাবা পা পা করে এসে আমাকে হাতে নাতে ধরে বলেন *যাও চোখ্যে সরিষার তেল দিয়া আসো, তাইলে ঘুম আসবে না।* চোখের রোগীরা যেমন করে চোখে ওষুধ দেয়, আমাকে ঠিক ওরকম করে ঘাড় পিঠের দিকে ঝুলিয়ে শিশি থেকে ঢালতে হয় চোখে সর্ষের তেল, চোখ জ্বালা করে বিষম কিন্তু বাবা স্বস্তি পান ভেবে যে ঘুম এখন বাপ বাপ করে পালাবে।

পড়তে বসে সন্ধে থেকে টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমোতে থাকেন ছোটদা। কালো ফটকের শব্দ শুনলে ধাক্কা দিয়ে ছোটদাকে জাগিয়ে দিই, *উঠ উঠ বাবা আইছে।* ছোটদা ধড়ফড়িয়ে মাথা তোলেন, মুখের লালায় বই ভেজা, লালার শাদাটে দাগ নেমে গেছে ঠোঁটের কিনার থেকে গালে, চোখদুটোয় শুকনো মরিচের লাল। পা নাড়তে নাড়তে তিনি পড়তে শুরু করেন। আসলে তিনি কিছু পড়েন না, *গাঁগোঁগাঁগোঁ* ধরনের শব্দ করেন। দূর থেকে বাবা সম্ভবত ভাবেন তাঁর পুত্রধন এবারও স্টার পেয়ে বাবার মান রক্ষা করবেন।

বাবা যতক্ষণ বাড়ি থাকেন, সকলে গলা নিচু করে কথা বলে। বাড়িতে কবরের স্তব্ধতা, যেন চারটে লক্ষ্মী ছেলেমেয়ে একেকজন বড় বড় দার্শনিক বা বিজ্ঞানী হতে যাচ্ছে। দাদার বেলা বাবার বাণী এরকম — *এই গাধারে দিয়া কিচ্ছু অইল না। মেডিকেলে পড়াইতে চাইলাম। চান্স পায় নাই কোথাও। বি এস সি পরীক্ষা দিয়া এখন কেরানিগিরি ছাড়া তর ভাগ্যে আর কি জুটব! দেখ কুনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইতে পারস কি না। তরই বন্ধু জাহাঙ্গীর ডাক্তারি পড়তাছে। ফয়সল পড়তাছে। তর কি মগজ কিছু কম ছিল ওদের চেয়ে! ওরা ভাত খাইছে, তুই খাস নাই? এত এত মাস্টার রাইখা পড়াইলাম, তাও পরীক্ষায় একটা ফার্স্ট ডিভিশন পাইলে না। লজ্জা করে না মুখ দেখাইতে। আমি হইলে কচুগাছে ফাঁসি নিয়া মরতাম।*

ছোটদার বেলায় – *দুনিয়া ভুইলা যাও কামাল। এখনই তুমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়। তুমি মেট্রিকে স্টার পাওয়া ছাত্র। তোমার ভবিষ্যত এখন ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্টের ওপর নির্ভর করতাছে। এই রেজাল্ট আরও ভাল না করলে কমপিটিশনে টিকতে পারবা না বাবা। ডাক্তারি পড়তে হইব। ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হইতে হবে। বন্ধুদের নিয়া আড্ডা বাদ। খাইটা পইড়া মেডিকেলে ভর্তি হও। আমার খুব আশা ছিল বড় ছেলে ডাক্তার হইব। পারল না। এখন তুমিই আমার ভরসা। পড়ায় মন দাও বাবা। দিনে আঠারো ঘন্টা কইরা পড়। ভাল রেজাল্ট কইরা বাপের মুখ রাখো। আমি চাষীর ছেলে ডাক্তার হইছি। তুমি আমার চেয়ে বড় ডাক্তার হইয়া দেখাইয়া দেও।*

সকাল বেলা ঘরে ঘরে বাণী বিতরণ করে বাবা বাড়ি থেকে বেরোন। তখনই এক সঙ্গে চারটে চেয়ার সরার শব্দ হয়, সরিয়ে কেউ মাঠে যায় দৌড়ে, কেউ রেডিওর নব ঘোরায়, কেউ গলা ছেড়ে গান গায়, এক লাফে বিছানায় শোয়। কালো ফটকটি আমাদের একধরনের জীবন বাঁচায়, *খটাস* করে শব্দ হয়ে সংকেত দেয় বাবার আসার, অথবা যাওয়ার। বাবার শব্দটির একটি আলাদা ধরন আছে, বাবা ফটক খুললে যে ধরনের শব্দ হয়, তা বাবা খুললেই হয়। চোখ বুজে আমরা বলে দিতে পারি এ বাবা নাকি বাবা নয়। বাবা অবশ্য রূপকথার দৈত্যদের মত নানারকম চালাকি করেন। রাতে বাড়ি ফিরবেন বলে বেরিয়ে দুপুরে ফেরেন, দুপুরে ফিরছেন বলেন, ফেরেন রাত করে। বাবার *বলাকথায়* আমাদের খুব একটা আস্থা নেই। চব্বিশ ঘন্টা আমরা সতর্ক থাকার চেষ্টা করি। মাঝে মাঝে ফটকও বেশ নিঃশব্দে খোলার চেষ্টা করেন তিনি যেন হাতে নাতে সবাইকে ধরতে পারেন। কখনও সখনও যে তিনি আচমকা পেছনে এসে দাঁড়াননি আমাদের সতর্ক হবার আগে, তা নয়। আমাকে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে সজনে বাছতে দেখে সেই সজনে দিয়ে পেটাতে পেটাতে পড়ার টেবিলে এনে বসিয়েছিলেন, পাড়ার মেয়েদের নিয়ে মাঠে খেলতে দেখে চড়িয়ে ভেতরে এনেছেন, সব ক'টি মেয়েকে ধমকে বাড়ির বার করেছেন। বাবার হাতে মার খেয়ে মনে মনে কত যে বাবার মৃত্যু কামনা করেছি, যেন বাবা আজই ভীষণ অসুখ হয়ে মরে যান। বাবা এমন শক্ত শরীরের মানুষ, সামান্য জ্বরজারিও হত না কখনও। এদিকে আমাকে জ্বরে ধরত বেশ, জ্বর হয় হোক, কিন্তু ওষুধ নৈব নৈব চ। আর টিকার নাম শুনলে তো গায়ে জ্বর চলে আসে। ইস্কুলে গুটিবসন্তের টিকা দেওয়ার লোক যখনই আসত, পায়খানায় লুকোতাম। বাড়িতেও লোক আসত, ব্যস, বাড়ি থেকে সারাদিনের জন্য হাওয়া। শুকনো মুখে রাস্তায় ঘুরঘুর করতাম যতক্ষণ না দেখছি ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। টিকা নিইনি, বাবার কাছে ধরা পড়ে গিয়ে এমন কান্ড হয়েছিল যে বাবা নিজেই আমার হাতে জন্মের যন্ত্রণা দিয়ে টিকা দিলেন। আর যার হাত থেকেই বাঁচি, বাবার হাত থেকে বাঁচার আমার কোনও সাধ্য ছিল না।

বছরে এক ক্লাসে তিনবার পরীক্ষা হয়, প্রথম ত্রৈমাসিক, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক, তৃতীয়টি হচ্ছে বার্ষিক, বার্ষিকে উতরে গেলে ওপরের ক্লাসে বসতে হয়। প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে তেত্রিশ পেয়ে ঘরে ফিরেছি। তেত্রিশ হচ্ছে *পাশ নম্বর*, এর নিচে পেলে আর কালো কালিতে নম্বর লেখা হয় না, হয় লাল কালিতে। মানে *সব্বনাশ।* তেত্রিশ পেয়ে সেদিন আমার সারাদিন মন খারাপ। ভয়ে জিভ শুকিয়ে আসছে। বারবার জল খাচ্ছি। মা'র

শরীর ঘেঁসে বসে থাকি যেন মা আমার সহায় হন। মা'কে বলিও যে মা ঠিকই বলেন দুনিয়াদারির লেখাপড়ার মত বাজে ব্যাপার আর নেই। বাবাকে দেখাতেই হবে *প্রগেস রিপোর্ট,* এটি দেখলে পিঠে কি রকম বেত পড়বে, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। মা বলেন *মোটা জামা পইরা ল, পিঠে লাগব কম।* গায়ে মোটা জামা পরে গরমে সেদ্ধ হতে থাকি কিন্তু বাবা ফিরে আমাকে মারধোর না করে শান্ত গলায় বলেন *আজ থেইকা আমি তরে ইংরেজি পড়াব।* এর চেয়ে যদি পিটিয়ে আমার পিঠের চামড়া তুলতেন, খুশি হতাম। এ যেন *বাঘমামা* আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলছেন *আজ থেকে প্রতিদিন আমি তোকে খাব।* বাবা যা বলেছেন তাই, *হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।* রাত আটটায় রোগী দেখে বাড়ি ফিরে শার্ট প্যান্ট খুলে পেটের ওপর লুঙ্গির গিঁট দিয়ে, চোখে চশমা পরে, তোষকের তলে রাখা সন্ধি বেতটি নিয়ে আমার পড়ার টেবিলে এসে বসেন নতুন *কানাই মাস্টার।* আমার এক চোখ থাকে সন্ধি বেতে, আরেক চোখ বইয়ে। ইংরেজি গ্রামার শেখান বাবা আমাকে। পড়তে পড়তে হাই উঠলে ঘুমের, সপাং করে বেত পড়ে পিঠে, গা কেঁপে ওঠে আমার। *পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার টেন্স,* নানারকম তার শাখা প্রশাখা, বাবা আমার মগজ খুলে মগজে নিজ হাতে ঢুকিয়ে দেন, ঢুকিয়ে বেত মেরে খুলি জোড়া দেন, যেন জীবনে কখনও আর এগুলো বেরিয়ে না আসে। জীবনের কথা দূরে থাক, পরদিনই ভুল করি, প্রতিদিনকার মত এক চোখ টেবিলের চকচকে বেতে, আরেক চোখ বইয়ে, টান টান করা পিঠ, বাবা বলেছেন সোজা হয়ে বসতে, বাঁকা হয়ে বসে অলস লোকেরা। ভুল যখনই হল, *সপাং সপাং।* যত *সপাং সপাং* তত ভুল। চোখে জল আসে। চোখে জল আসলে সপাং সপাং। যত *সপাং সপাং* তত জল। চোখে জল নিয়ে বলেছিলাম *পানি খাইয়াম,* বাবা বলে দিলেন *পানি খাওন লাগব না।* বাবা পড়াতে বসলে আমার পেশাব পায়খানা পাওয়া নিষেধ, তেষ্টা পাওয়া, ক্ষিধে পাওয়া নিষেধ। বাবা বলেন *ওসব পাওয়া নাকি পড়ায় ফাঁকি দেওয়ার কায়দা।*

পড়া শেষ হলে মা পিঠের দাগের ওপর মলম লাগাতে লাগাতে বলেন — *এইভাবে গরুর মত পিটাইয়া কুনো লাভ আছে? যার হয়, তার নয়ে হয়; যার হয় না, তার নব্বইয়েও হয় না। সারাদিন গপ্পের বই পড়লে কি কইরা পরীক্ষায় ভালা করব! বাপে বাড়িত থাকলে বেহেই পড়ার টেবিলে, না থাকলে বাড়িটা মাছের বাজার হইয়া যায়। আর এইডা হইল মিরমিরা শয়তান। নাটের গুরু। কারে কুন দিয়া খুচাইব, এই তালে থাকে। এহন ভাল হইছে না! মাইর খাইয়া উপুড় অইয়া পইরা থাহস!*

প্রতি রাতে মার খেতে খেতে এমন হয় যে, ইস্কুলের পড়া বাদ দিয়ে *ইংরেজি ব্যাকরণ* মুখস্ত করি দিনরাত। ওদিকে হোমওয়ার্কে *গোল্লা* জোটে। অঙ্কের খিটখিটে শিক্ষক ক্লাসে *নিল ডাউন* করিয়ে রাখেন। বেঞ্চের ওপর দু' কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বিজ্ঞান ক্লাসে, আবার কোনও কোনও শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে এনে ক্লাসের সবাই যেন দেখতে পায় বকের মত এক পায়ে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেন, ইস্কুলে *গবেট ছাত্রী* হিসেবে রাতারাতি আমার নাম উঠে আসে এক নম্বরে। এদিকে বাড়িতে মুখস্ত করা ব্যাকরণও সব গুলিয়ে যায় বাবার গর্জন শুনে, পিঠে বেতের সপাং সপাং চলতেই থাকে। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে আমার নম্বর ওঠে বারো। নম্বর দেখে মা বাঁকা হেসে বলেন — *ক্লাস সেভেনে যহন পড়তাম, ক্লাসের টিচার জিগাস করল মেয়েরা তুমরা*

কেউ গোবর ইংরাজি জান? কেউ জানে না, আমি ছাড়া। কইলাম, সারা ক্লাস শুনাইয়া, কাউ ডাং। পড়ালেখাডা চালাইয়া যাইতে পারলে আমি আইজ ইংরেজির মাস্টার হইতাম।

নম্বর দেখে বাবার রক্তচাপ এমনই বাড়ে যে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

বাবা হাসপাতালে, বাড়ি আবার *মাছের বাজার।* হই চই হুল্লোড়। পড়ার টেবিলে ধুলো জমতে থাকে। কে আর ছায়া মাড়ায় ওসবের! গল্পে, আড্ডায়, গানে মজে থাকি সারাদিন, নিষিদ্ধ ছাদে কাটে বিকেল, রাত কাটে গল্পের বইএ, লুকোছাপার দরকার হয় না, ঠ্যাংএর ওপর ঠ্যাং তুলে, প্রকাশ্যে। বই জোটে ইস্কুলের মমতা নামের এক মেয়ের কাছ থেকে। মমতাকে বলা হত *বইয়ের পোকা।* ওই পোকার সঙ্গে আমার আবার হঠাৎ খাতির হয়ে যায়। ক্লাসের পেছনের বেঞ্চে বসে সে মাস্টারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কেবল বই পড়ত। ইস্কুল ছুটির পরও একদিন পড়ছিল ক্লাসঘরে, একা। দফতরি এসে দরজায় তালা দিয়ে যায় বাইরে থেকে। সে মেয়ে আটকা পড়ে যায় পরদিন সকাল হওয়াতক। খবরটি প্রথম জানতে পাই আমি, কারণ পরদিন আমিই সকালবেলা সবার আগে ক্লাসে ঢুকেছিলাম। মমতা ঘুমোচ্ছিল বেঞ্চে শুয়ে। কি ব্যাপার! বলল কাল বিকেলে ক্লাস থেকে বেরোতে গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি করে কাউকে সে পায়নি, সারা ইস্কুল ফাঁকা। আমি আঁতকে উঠি। তারপর? *তারপর আর কি করি,* মমতা হেসে বলল, *বইটা পড়া শেষ করে অনেক রাতে শুয়েছি।* কী সে বই! মমতা দেখালো নীহাররঞ্জন গুপ্তের *কিরীটি অমনিবাস।* ও এতটুকু ভাবছিল না বাড়িতে ওর মা কি করছে ওর না ফেরায়। ও দিব্যি *ক্ষিধে লেগেছে* বলে বেরিয়ে গেল। বইটি রয়েই গেল আমার কাছে। মমতাকে এরপর দু'দিন ইস্কুলে আসতে দেয়নি ওর মা। বইটি পড়ে ওকে যেদিন ফেরত দিলাম, ও বিষম খুশি হল, ভেবেছিল ওর বই হারিয়ে গেছে। এরপর থেকে ও যে বইই পড়ত, আমাকে দিত। কেবল আমাকেই দিত।

যাই হোক, বাবা হাসপাতালে। প্রতি বিকেলে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার ভরে নিয়ে হাসপাতালে যান মা। বাবা এক বিকেলে মা'কে বলে দিলেন তাঁর দু'মেয়েকে তিনি দেখতে চান। কেন দেখতে চান, দেখতে চাওয়ার হঠাৎ কি হল ইত্যাদি প্যাঁচালের পর ভাঙা গলায় বললাম *আমার জ্বর জ্বর লাগতাছে, তাছাড়া আমার মাস্টার আইব। ইয়াসমিনরে নিয়া যাও।* যে যুক্তিই দিই না কেন, খাটে না, মা আমাকে নিয়ে যাবেনই। আমাদের গিয়ে দাঁড়াতেই হয় হাসপাতালের কেবিনে, যেখানে বাবা ডেটলের গন্ধের সঙ্গে শুয়েছিলেন। বাবার মুখে দাড়ি গজিয়ে গেছে। দাড়ি গজানো বাবাকে কখনও দেখিনি আগে। বয়স মনে হল বছর কয়েক বেড়ে গেছে বাবার। আমাকে কাছে ডেকে, একেবারে নাগালের মধ্যে, মলিন কণ্ঠে বললেন

এখন নিশ্চয় তুমারা বলতাছ
যম গেছে যমের বাড়ি
আমরা হইলাম স্বাধীন নারী।

বাবা তবে জেনে গেছেন তাঁর নাম দিয়েছি আমি *যম।* বাবাকে *বাবা* সম্বোধন করা বাদ দিয়েছি সে অনেক বছর, আর আড়ালে যে *বাবা* বলি, তাও বাদ দিয়েছি তিনি আমার মাস্টার হওয়ার পর। শ্রেফ *যম।* নামটি তোফা হয়েছে ছোটদা মন্তব্য করেছিলেন যেদিন তিনি জুতো কেনার টাকা চেয়েও বাবার কাছ থেকে পাননি। আমি আশংকা করছিলাম

হাসপাতালের শাদা বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে এই বুঝি তিনি আমার হাড় গুঁড়ো করবেন, তাঁকে *যম* নাম দেওয়ার অপরাধের শাস্তি। তা না করে আমাকে অবাক করে তিনি বললেন

— *মা গো কি দিয়া খাইছ আজ?*

বাবার কোমল স্বরে স্বস্তি পেয়ে বলি — *ডিম দিয়া।*

— *আমি বাড়ি গিয়াই তোমাদের জন্য বড় বড় রুইমাছ নিয়া আসব, মুরগি নিয়া আসব। বাজারে ফজলি আম উঠছে, আম নিয়া আসব ঝুড়ি ভইরা।*

আমি মাথা নেড়ে *আচ্ছা* বলি।

বাবার যে কোনও কথায় *হুঁ হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে* বলে যত শীঘ্র হাসপাতাল থেকে বিদেয় হওয়া যায়, ততই মঙ্গল। কিন্তু আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে বাবা তাঁর বুকের ওপর আমার মাথা টেনে এনে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন — *চুলে তেল দেও নাই কেন? চুলে তেল দিয়া আচড়াইয়া ফিতা দিয়া বাইন্ধা রাখবা। তাইলে তো সুন্দর দেখা যায়।*

আমি শ্বাস বন্ধ করে রাখি। বাবা তাঁর খড়খড়ে গাল আমার গালে ঘসে বলেন — *তুমার যে মেধা আছে তা আমি জানি মা। তুমাকে পড়াতে গিয়া সেইটা বুঝছি। বল ত মা, মাই ফাদার হ্যাজ বিন ক্রাইং ফর মোর দেন টু আওয়ারস কি টেনস?*

— *প্রেজেন্ট পারফেক্ট কনটিনিউয়াস।* মিনমিন করে বলি।

— *এই তো আমার লক্ষ্মী মা, এই তো সব পারে আমার মা।*

বাবা আমার পিঠে হাত বোলান, বেতে-কাটা ঘাএ স্পর্শ লেগে যন্ত্রণায় ধনুকের মত বেঁকে ওঠে পিঠ। তবু অসাড় শুয়ে থাকি। বাবার জন্য হঠাৎ আমার মায়া হতে শুরু করে।

হাসপাতাল থেকে বাবা সুস্থ হয়ে ফিরে এলে *মাছের বাজারে* নেমে আসে মাঝরাতের ঠান্ডা স্তব্ধতা। আমার জীবনেও। আমাকে ইস্কুল বদলাতে হবে। বিদ্যাময়ী ভাল ইস্কুল, এতে কোনও দ্বিমত নেই বাবার, কিন্তু আরও একটি ভাল ইস্কুল খুলেছে, *রেসিডেনসিয়াল মডেল ইস্কুল,* ওতে আমাকে পড়তে হবে। ততদিনে বিদ্যাময়ীতে আমার বান্ধবী বেড়েছে, রুনির সঙ্গে আমার গোপন আত্মীয়তা হয়েছে, আর আমাকে কি না সবার মধ্য থেকে বলা নেই কওয়া নেই, বাজপাখি এসে ঝাঁ করে তুলে নিয়ে যাবে! বলি, উদ্বাস্তু হওয়ার আগে মাটি আঁকড়ে ধরার মত — *আমি বিদ্যাময়ী ছাইড়া কুথাও পড়তে চাই না।*

বাবা ধমকে বলেন — *তুই চাওয়ার কে? আমি চাই তরে মডেলে পড়াইতে।*

আমি ফুঁপিয়ে বলি — *বিদ্যাময়ী ভাল ইস্কুল।*

বাবা কেশে বলেন — *মডেল আরও ভাল।*

যত সাহস আছে শরীরে, সবটুকু ঢেলে, চোখ শক্ত করে বুজে, দাঁতে দাঁত চেপে বলি — *আমি অন্য ইস্কুলে পড়ব না।*

বাবা আয়নার সামনে গলায় টাই বাঁধতে বাঁধতে বলেন — *তুই পড়বি, তর ঘাড়ে পড়বে।*

নতুন ইস্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে *এইম ইন লাইফ* বলে একটি রচনা লিখতে বলা হয়েছিল। ওই একটি কাজই পরীক্ষার খাতা জুড়ে করি, রচনা লিখি, লিখতে লিখতে

লক্ষ করি ইংরেজি ভাষাটি কড়া কথা বলার জন্য, রাগ করার জন্য, গাল দেবার জন্য বেশ চমৎকার। ঝড়ের মত আবেগ নামে বাংলায়, মায়ামমতা বুকের দরজা খুলে হুড়মুড় বেরিয়ে আসে বাংলায় তাই ভাষাটিকে অন্তত সেদিনের জন্য এড়িয়ে চলি। আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিই *আমার জীবনের এইম নয় এই ইস্কুলে পড়া। ইস্কুলটি একটি ভূতুড়ে বাড়ির মত। আমি একটি ইস্কুলে পড়ছি, সেটি খুবই ভাল, এবং আমি সেটিতেই পড়তে চাই। আমার ইচ্ছের বাইরে বাবা আমাকে দিয়ে তাঁর যা ইচ্ছে তা করাতে চান, এ আমার সয় না। তিনি যদি চান আমাকে ব্রহ্মপুত্রে ভাসিয়ে দেবেন, তিনি দেবেন কারণ তিনি চেয়েছেন ভাসিয়ে দিতে। আমি ভাসতে চাই কি না চাই, তা তিনি পরোয়া করেন না। আমার জীবনটি কি আমার, না তাঁর? যদি আমার হয়, যা আসলে আমারই, তবে আপনাদের কাছে সর্নিবন্ধ অনুরোধ, আমাকে এই ইস্কুলে ভর্তি করাবেন না। আমার জীবনের এত বড় ক্ষতি আপনারা করবেন না আমার বিশ্বাস।*

প্রশ্নপত্রের আর কোনও প্রশ্নের দিকে ফিরে তাকাই না। বাবাকে বেশ জব্দ করা গেল বলে একধরনের সুখ হয় আমার।পরীক্ষার শেষ ঘন্টা পর্যন্ত খামোকা বসে থেকে যখন বেরিয়ে আসি,   করিডোরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাবা, উড়ে এসে জিজ্ঞেস করেন –*পরীক্ষা কেমন হইছে?*

বলি, শুকনো মুখে – *ভাল।*

বাবা হেসে বলেন – *সব প্রশ্নের উত্তর দিছ তো!*

– *হ।* সুবোধ কন্যার মত মাথা নেড়ে বলি।

– *খুব কড়াকড়ি। পরীক্ষা দিল দুইশ জন। নিবে মাত্র তিরিশ জন।* বাবার কপাল ঘামে দুশ্চিন্তায়।

মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস নেই, কিন্তু এই মিথ্যেটি আমি চোখ বুজে অনেকক্ষণ আওড়েছিলাম যেন চোখ কান নাক সব বন্ধ করে একবার বলে ফেলতে পারি কোনওরকম।

বাবা আমাকে সোজা নিয়ে গেলেন নতুন বাজারে বাবার ওষুধের দোকানে, দোকানের ভেতরে রোগী দেখার কোঠা তাঁর। অন্যের ফার্মেসিতে বসার দরকার হয় না বাবার আর, যুদ্ধের পর নানার দোকানের দু'কদম দূরে দোকান কিনে নাম দিয়েছেন, *আরোগ্য বিতান।* ভেতরে তাঁর গদির চেয়ারটিতে আমাকে বসিয়ে পোড়াবাড়ির চমচম কিনে এনে মুখে তুলে খাইয়ে দিতে দিতে বললেন – *ভাল কইরা লেখাপড়া করবা। প্রত্যেক ক্লাসে তুমার ফার্স্ট হওয়া চাই। আদা জল খাইয়া এহন থেইকা লাগো।* বাবার স্বপ্ন যে ক'দিন পরেই মরা পাতার মত ঝরে পড়বে, তা তিনি না জানলেও আমি জানি। আমার এই জানা, মণিকে গভীর রাতে ন্যাংটো করার ঘটনার মত গোপন।

ক'দিন পর বাবা *সুখবর* আনলেন নতুন ইস্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় আমি পাশ করেছি। মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। এ কী করে সম্ভব! হ্যাঁ, বাবা যা ইচ্ছে করেন, তাই সম্ভব হয়। অন্তত অন্য কোথাও না হলেও, আমার জীবনে। সেই প্রায় বিস্তীর্ণ মরুভূমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা নির্জন নিরব ইস্কুল নামের বাড়িটিতে এনে বাবা বললেন *ব্রহ্মপুত্রে তুমারে আমি ভাসাইয়া দিতে চাই না। তুমি আমার মেয়ে। আমার আত্মজা। আমি ছাড়া তুমার ভাল কেউ*

চায় না। ব্রহ্মপুত্রে যদি তুমি ডুবতে থাকো, তুমারে বাচাইয়া আনতে যদি কেউ ঝাঁপ দেয়, সে আমিই।

সারা ইস্কুলে হাতে গোণা ক'জন ছাত্রী মাত্র। পাঁচ ছ'জন মাস্টার। চোখের জল দু'হাতের তালুতে ঘন ঘন মুছে আমাকে বসতে হয় ক্লাসঘরে। ওদিকে বন্ধুরা বিদ্যাময়ীতে বিক্ষোভ করছে বাজ পাখির বিরুদ্ধে, যুদ্ধ-দেখা যুদ্ধংদেহি বন্ধুরা।

নতুন ইস্কুলে আমার মন বসে না। ইয়াসমিনেরও মন বসে না *রাজবাড়ি* ইস্কুলে। যুদ্ধের পর খ্রিস্টান মিশনারিদের চালানো *মরিয়ম ইস্কুল* বন্ধ হয়ে গেলে ওকে *রাজবাড়িতে* ভর্তি করা হয়। *টুইংকল টুইংকল লিটল স্টার* বা *হামটি ডামটি স্যাট অন এ ওয়াল* এর বদলে ওকে এখন পড়তে হয় *তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে।* ইস্কুলের *মাদার* ওকে কোলে নিয়ে আদর করত বলেই কিনা নাকি বেশিদিন এক জায়গায় কাটানোর পর একধরনের মমতা জন্মায় বলে ও ফাঁক পেলেই বিকেল বেলা বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা-পথ মরিয়ম ইস্কুল, গিয়ে তালা বন্ধ লোহার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। ইস্কুলের দালান ফেটে বটগাছের চারা বেরোচ্ছে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ওর এত মমতা বাড়িটির জন্য, বাড়িটি ভাঙা হোক কি মলিন হোক; বাড়ির পাশের গাছটির জন্য, গাছের পাশে মাঠটির জন্য, মাঠের পাশে পুকুরটির জন্য, ইস্কুলের দোলনাটির জন্য ও এত মন খারাপ করে থাকে যে বাবা ওর জন্য বাড়ির মাঠে একটি দোলনা বসিয়ে দিলেন। দোলনায় দুলতে দুলতে ও চোখ বুজে, মনে নিয়ে এটি ওর পুরোনো ইস্কুলের মাঠ, গায় — *হাউ আই ওয়ান্ডা হোয়াট ইউ আর।* পেছনে আমি কি ফেলে এসেছি ভাবি। কোনও দোলনা বা দালানের জন্য আমার মন কেমন করে কি আদৌ! না। রুনির জন্য করে, টের পাই। কেবল রুনির জন্যই কি! না। রুনি অনেকটা ধ্রুবতারার মত, তীব্র আলো ওর, কিন্তু বড় দূরের। ওকে অবশ্য দূরেই থাকা মানায়। ধুলো কাদায় আমার সঙ্গে প্রতিদিনকার লুটোপুটিতে ওই রূপসীকে আমি টানি না। যাদের নাকে সর্দি, দাঁতে ময়লা, চুলে উকুন, তাদের সঙ্গে আমার অভ্যস্ত জীবনের জন্যও মন কেমন করে। অভ্যস্ত জীবন এমনই, যে, মানুষ, বিশেষ করে সে যদি অন্তর্মুখি হয়, বোধহয় ভয় পায় সে জীবন থেকে দূরে এসে আবার নতুন কিছুতে অভ্যস্ত হতে। তৃণের সঙ্গে তৃণের দৈনন্দিন প্রীতি গড়ে উঠতে সময় নেয় না হয়ত, কিন্তু, তৃণ বটে আমি, ভিন্ন জাতের তৃণ, কুঁকড়ে থাকা।

নতুন ইস্কুলে আবার টিফিন নিজেদের নিয়ে আসার নিয়ম। বাবা প্রতিরাতে চাক চাক করে কাটা বড় *ফ্রুট কেক* নিয়ে আসেন বাড়িতে, ইস্কুলের টিফিন। টিফিন নিয়ে আসি ঠিকই, খেতে ইচ্ছে করে না। তার চেয়ে মনে হয় পুরোনো ছেঁড়া জুতো বেচে যে কটকটি পাওয়া যায়, খেতে আরাম হত। স্বাদ বদলাতে ইচ্ছে করে আমার। *ফ্রুট কেক* জগতে সবচেয়ে সুস্বাদু খাবার বলে বাবা বিশ্বাস করতে পারেন, আমি করি না। অন্তত এইটুকু স্বাধীনতা আমার তো আছে, এ জিনিস আমার পছন্দ না করার এবং না খাওয়ার। সেদিন, টিফিন টিফিনের মত ফেলে রেখে বারান্দার রেলিং ধরে একা দাঁড়িয়ে ছিলাম, সামনে দেখার কিছু ছিল না পচা ডোবা বুজে মাঠ-মত বানানো উষড় জমি ছাড়া, আমাকে বিষম চমকে দিয়ে পিঠে হাত রেখেছিল রুনি। রুনিকে দেখে পেছোতে থাকি একপা দু'পা করে। ও আমার বেশি কাছে এলে যদি বুকের ধুকপুক আর রোমকূপের রিনরিন শুনে ফেলে, তাই পেঁছোই। রুনি পা পা করে সামনে এগোতে এগোতে বলতে থাকে, তেমনই

মিষ্টি হেসে, *আমি এখন এ ইস্কুলের টিচার্স কোয়ার্টারে থাকব। কী মজা তাই না! রেবেকা আপাকে চেনো? ইস্কুলের ডাক্তার। সে আমার বড় বোন।*

আমি একটি নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে রুনিকে দু'চোখ ভরে দেখতে থাকি। রেবেকা আপাকে আমি চিনি কি চিনি না তার উত্তর দিতে ভুলে যাই। আমাকে মূক করে ফেলে ধূমকেতুর মত রুনির পতন আমার নিঃসঙ্গ আঙিনায়। ভালবাসা, ভাবি, খুব গভীর হলেই সম্ভবত পারে কাংখিত মানুষকে চোখের সামনে এনে দাঁড় করাতে। রুনি আমার দিকে এগোতে থাকে হাত বাড়িয়ে, পেছোতে পেছোতে আমি দেয়ালে সেঁটে যাই।

– *এই এত লজ্জা কেন তোমার!* বলে সে কাঁধে হাত রাখে আমার। শরীরের ভেতর জাগে সেই অদ্ভুত শিহরণ, আমি যার অনুবাদ জানি না। দ্রুত শ্বাস পড়ে আমার, এত দ্রুত যে শ্বাস আড়াল করতে আমি দু'হাতে মুখ ঢাকি।

– *বনভোজনে যাবে না? ইস্কুল থেকে সবাইকে বনভোজনে নিচ্ছে ধনবাড়ির জমিদার বাড়িতে। আমি যাব। সেই কতদূরে ধনবাড়ি। আমার খুব দূরে যেতে ইচ্ছে করে।*

রুনির দু'চোখে অল্প অল্প করে চোখ রাখি, দু'চোখে তার আকাশের সবটুকু নীল। ইচ্ছে করে পাখা মেলে উড়ি। রুনির নিটোল শরীর হেসে ওঠে আমার আধফোটা চোখে চেয়ে। এমন করে হাসতে পারে রুনি ছাড়া আর কে! রুনিকে আমি ভালবাসতেই পারি, ওকে যে কেউ যে কোনও দূরত্ব থেকে ভালবাসতে পারে। কিন্তু আমার প্রতি ওর ভালবাসা, জানি না এর নাম ভালবাসা কি না, সম্ভবত স্নেহ অথবা একধরনের প্রশ্রয় আমাকে বড় অপ্রতিভ করে। ও আমাকে যত কাছে টানে, তত আমি ক্ষুদ্র হতে থাকি। মহিরূহ যদি কোনও তুচ্ছ তৃণের দিকে ঝুঁকে থাকে, তবে তৃণ যে তৃণই তা বিষম প্রকট হয়ে ওঠে! আমি নিজের কোনও অস্তিত্ব অনুভব করি না রুনি যখন আমাকে ভালবাসে, বুঝি।

গাঢ় অমাবস্যায় যদি হঠাৎ চাঁদ উঠে জ্যোৎস্নায় ভিজেয়ে ফেলে চারদিক আর সেই জ্যোৎস্না যদি আমাকে ভাসিয়ে নেয় দোলন চাঁপার বাগানে, তবে! রুনি চলে যাওয়ার পরও আমি দাঁড়িয়েই থাকি সেখানে, যেন এটিই আমার একমাত্র গন্তব্য যেখানে পৌঁছব বলে স্বপ্ন দেখছি সহস্র বছর। হঠাৎ নতুন ইস্কুলের মরা গাছপালাকেও বড় জীবন্ত মনে হয়। ইস্কুলের দালানগুলোকে বড় প্রাণবান মনে হয়। ধুলো ওড়ানো হু হু হাওয়াকেও মনে হয় চমৎকার দখিনা বাতাস। ধুসর মাটিও রুনির পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবুজ হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে করে খালি পায়ে দৌড়ে যাই ঘাসে।

বনভোজনে যেতে হলে দশ টাকা চাঁদা দিতে হবে ইস্কুলে। বাবার কাছে দশ টাকা চাইলে শান্ত কণ্ঠে বললেন – *যাওয়ার দরকার নাই।*

এও কি হয়! আমি বলি – *যাইতেই হইব।*

বাবা খেঁকিয়ে ওঠেন – *যাইতেই হইব! কে তরে জোর করবে! বনভোজন কি কোনও সাবজেক্ট? না গেলে নম্বর কম ওঠে!*

বাবা টাকা দিলেন না।

এদিকে ইস্কুলে মেয়েরা বনভোজনে যাওয়ার খুশিতে বুঁদ হয়ে আছে। আমি কেবল একা আহত পাখির মত তড়পাচ্ছি। আমাকে বাঁচায় আয়শা নামের এক মেয়ে, বলে *তুমার*

টাকা না থাকলে আমার কাছ থেইকা কর্জ নেও। সে দিব্যি দশ টাকা কর্জ দিয়ে দিল। বনভোজনে যাওয়ার লিস্টিতে নাম উঠল আমার। ভোরবেলা ট্রাকে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল ধনবাড়ি। রুনি বসেছিল মাস্টারদের আর বড় ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে বাসে। বড় বড় ডেকচি পাতিল, চাল ডাল, থালবাসন বাসের ছাদে তুলে মাইকে গান বাজিয়ে রওনা হয়ে গেল আমাদের যন্ত্রযান। ধনবাড়িতে রুনির সৌন্দর্য আমি দূর থেকে দেখি, ও বামে গেলে আমি ডানে ফিরি, ও ডানে গেলে আমি বামে। ও চোখের আড়াল হলে আমি অস্থির হয়ে খুঁজি ওকে। ওকে দৃষ্টির নাগালে রেখে আমি বসে থাকি চুপচাপ গাছের ছায়ায় কিম্বা সিঁড়িতে, একা। বনভোজন থেকে ফিরতে ফিরতে সন্ধে পার হয়ে যায়, বাড়ি ফিরে দেখি বাবা দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায় আমার অপেক্ষায়।

— *এত দেরি হইল ক্যান ইস্কুল থেইকা ফিরতে?* বাবা খপ করে ধরলেন আমাকে।

নখ খুঁটতে খুঁটতে জবাব দিলাম — *বনভোজনে গেছিলাম।*

বাবা টেনে আমাকে উঠোনে নিয়ে কাঁঠাল গাছের ডাল ভেঙে এনে পেটান। বাবা মা পেটালে পিঠ পেতে রাখতে হয়, এরকমই নিয়ম। পিঠ পেতে রাখি আমি। মনের ঝাল মিটিয়ে পিটিয়ে বাবা জিজ্ঞেস করেন — *টেকা কেডা দিছে বনভোজনে যাওয়ার?*

স্বর ফুটতে চায় না গলায়, তবু বলি, যেহেতু বাবা মা কোনও প্রশ্ন করলে উত্তর দিতেই হয়, যে *ক্লাসের এক মেয়ে কর্জ দিছে।*

বাবা এবার জোরে এক থাপ্পড় কষান গালে। *কর্জ কইরা বনভোজন করস। এত শখ ক্যান? তর শখ আমি পুটকি দিয়া বাইর করাম।*

পরদিন সকালে বাবা বেরিয়ে যাওয়ার আগে ইস্কুলে যাওয়া আসার রিক্সা ভাড়ার জন্য বরাদ্দ এক টাকার সঙ্গে দশ টাকার একটি নোট ছুঁড়ে দিয়ে বলেন — *এরপর থেইকা যদি কথা না শুনস, যেইভাবে কই সেইভাবে না চলস, তাইলে তর পিঠে উঠানে যত খড়ি আছে, সব ভাঙবাম।*

বনভোজন পার হওয়ার পর, রব ওঠে ইস্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, যে যা জানে নাচ, গান, আবৃত্তি তাই নিয়ে মঞ্চে দাঁড়াতে হবে। *কমন রুমে* হারমোনিয়াম বাজিয়ে মেয়েরা গান মকশো করে। রবীন্দ্রনাথের *পূজারিণী* কবিতার ওপর ছোট একটা নাটক-মতও। *আজি ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা* গানটির সঙ্গে সঙ্গে নাচ আর চকখড়িতে ধানের ক্ষেত, শাদা মেঘের ছবি আঁকার আয়োজন হয়। এসব দেখতে দেখতে একটি *হাওয়াইন গিটার* হাতের কাছে পেয়ে এক ফাঁকে ছোটদার গানের খাতা দেখে গোপনে শেখা *এত সুর আর এত গান যদি কোনওদিন থেমে যায়, সেইদিন তুমিও তো ওগো, জানি ভুলে যাবে যে আমায়* বাজিয়ে বসি। শুনে মেয়েরা ধরল অনুষ্ঠানে আমাকে গিটার বাজাতে হবে। বাজাতেই হল। আঙুল কাঁপছিল, পা কাঁপছিল, ওই কাঁপাকাঁপির মধ্যেই যেটুকু বেরিয়ে এল তাতে শুনেছি, অনেকে বলেছে *বাহ!* নতুন ইস্কুলে ততদিনে ভাল ছাত্রী বলে আমার বেশ নাম হয়েছে। ড্রইং ক্লাসে আমাকে বলা হয় *জিনিয়াস,* ইংরেজি ক্লাসে বলা হয়, *এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট* রচনা নাকি লিখেছি ভর্তি পরীক্ষায়। বাংলার মাস্টার বলেন — *তুমি তো দেখছি কবি হে।*

ইস্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর শুরু হল *গার্লস গাইডে* মেয়ে নেওয়া। শারীরিক কসরত শুরু হল। গলায় ড্রাম বেঁধে ড্রাম বাজানো শিখছি। সার্কিট হাউজের মাঠে

বিজয় দিবসে গার্লস হাইডের দল গিয়ে কাঠি নাচ নেচে এলাম। যা কিছুই করি, মুখ থাকে নিচু, চোখ লজ্জায় আনত। নাচের মাস্টার যোগেশ চন্দ্র আসেন ইস্কুলে মেয়েদের *নৃত্যনাট্য* শেখাতে, রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা। লজ্জাবতী লতা*কে খপ করে ধরে বলেন – *এই, চিত্রাঙ্গদা হবি?* লজ্জাবতী যোগেশ চন্দ্রের ঠ্যাংএর ফাঁক গলে পালায়। চিত্রাঙ্গদার মহড়া শুরু হয়। মহড়া দেখে উত্তেজিত আমি বাড়ি ফিরে ইয়াসমিনকে সখী বানিয়ে বাড়ির মাঠ জুড়ে নেচে নেচে গাই *গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে, পর্বত শিখরে অরণ্যে তমস ছায়ায়।* আমিই হই চিত্রাঙ্গদা, আমিই হই অর্জুন, মদন। ইস্কুলে মহড়া চলে, আর বাড়িতে চলে আমার মঞ্চায়ন। দর্শকের সারিতে মা, মণি, দাদা, ছোটদা, পপি।

ছোটদা কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার পর বাড়িতে আবদার করলেন আনন্দ মোহন কলেজে বেবি নাম, নেত্রকোণা বাড়ি, তাঁর এক সহপাঠী মেয়েকে এ বাড়িতে থাকতে দেওয়া হোক, যেহেতু বেবির থাকার জন্য কোনও ভাল জায়গা নেই। ছোটদার আবদার মঞ্জুর হল। বেবি সুটকেস নিয়ে উঠল *অবকাশে,* আমার বিছানায় শোবার জায়গা হল তার। টেবিল চেয়ার দেওয়া হল তাকে পড়াশুনা করার। বেবি, দেখতে লম্বা, শ্যামলা, চমৎকার মায়াবি চোখ, দু'দিনেই খাতির জমিয়ে ফেলল বাড়ির সবার সঙ্গে। আত্মীয় স্বজনের বাইরে কারও মুখ দেখে ঘুমোতে যাওয়ার, বা ঘুম থেকে ওঠার আমার সুযোগ ঘটেনি এর আগে। বাইরের জগত থেকে আমাদের সংসারে একটি জলজ্যান্ত মানুষের প্রবেশ ঢেউ তোলে আমার নিস্তরঙ্গ জীবনে। বেবি যখন গল্প করে তার বোন মঞ্জুরি কী করে গাছের মগডাল থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছিল, সে ই বা কী করে একা একা নেত্রকোণা থেকে চলে এল ময়মনসিংহে লেখাপড়া করতে, কী করে তার পাগল এক ভাই কংসের জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকত সারাদিন, একদিন তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি — কংস হয়ে দাঁড়ায় আমারই নদী, ব্রহ্মপুত্র যেমন। মঞ্জুরিকে মনে হয় আমার জন্ম জন্ম চেনা। মা'র সঙ্গে চুলোর পাড়ে বসে বেবি গল্প করে কী করে তার পাগল ভাইটিকে আর খুঁজে না পাওয়ার পর মা তার নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়ে বিছানায় পড়ল, শুকিয়ে পাতাকাঠির মত হয়ে বেবিকে বলল তাকে পুকুরে নিয়ে স্নান করিয়ে আনতে, বেবি তাই করল, পুকুর থেকে নেয়ে এসে শাদা একটি শাড়ি পরে বেবির মা শুল, সেই শোয়াই তার শেষ শোয়া। মা গল্প শুনে আহা আহা করে বলেন *তুমি হইলা আমার মেয়ে। আমার এখন তিন মেয়ে।*

বাবা বাড়ি ফিরে বেবিকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, *পড়াশুনা কেমন চলছে? ফার্স্ট ডিভিশন পাইবা ত!*

বেবি মাথা নুয়ে বলে – *জী খালুজান, আশা রাখি।*

সাড়ে তিন মাস পর বেবিকে অবশ্য পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যেতে হল। কারণ মা হঠাৎ এক দুপুরে আবিষ্কার করেছিলেন ছোটদা বিছানায় শুয়ে আছেন, খাটের কিনারে বসে ছোটদার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বেবি। মা ফেটে পড়লেন *বেবি, এত শয়তানি তুমার মনে মনে ছিল! আমারে বুঝাইছ তুমাদের ভাই বোনের সম্পর্ক। দুধ কলা দিয়া কালসাপ পুষতাছি আমি। আমার ছেলের সাথে ফস্টি নস্টি করার উদ্দেশ্য তুমার! এত বড় সাহস!*

বেবি কেঁদে পড়ল মা'র পায়ে। ছোটদার মাথা ধরেছিল বলে বেবি কেবল স্পর্শ করেছিল কপালে, এই যা। আর কোনওদিন এমন ভুল হবে না বলে সে জোড় হাতে ক্ষমা চাইল। মা ক্ষমা করার মানুষ নন। বলে দেন, মন যখন ভাঙে মা'র, একেবারেই ভাঙে।

বেবির চলে যাওয়াতে বাড়িতে সবচেয়ে যে মানুষটি নির্বিকার ছিলেন, তিনি ছোটদা।

ছোটদার পরীক্ষা সামনে, *আইএসসি,* যে পরীক্ষায় পাশ করে ভর্তি হবেন তিনি মেডিকেল কলেজে। বাবার অনেকদিনের স্বপ্ন, তাঁর একটি ছেলে ডাক্তার হবে। সেই ছোটদা হঠাৎ বাড়ি ফেরেন না। একদিন দু'দিন, সপ্তাহ চলে যায়, তাঁর টিকিটি নেই। বাবা উন্মাদ হয়ে সারা শহরে খোঁজ করেন। বাবা তখন টাঙ্গাইলের সিভিল সার্জন, ভোররাতে বাসে করে টাঙ্গাইল যান চাকরি করতে, অবশ্য যত না চাকরি করতে চাকরি বাঁচাতেই বেশি, রাতে বাড়ি ফিরে আসেন। আপিসে ছুটির দরখাস্ত ফেলে তিনি ছেলের খোঁজ করেন। ময়মনসিংহ ছোট শহর, ছেলে মেলে, তবে ছেলে আর সেই আগের ছেলে নেই। ছেলে বিবাহিত। কি ঘটনা, ক্লাসের এক হিন্দু মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে তাকে বিয়ে অবদি করে ফেলেছেন গোপনে, এক বন্ধুকে *উকিল বাপ* বানিয়ে। এখন বউ নিয়ে সেই বন্ধুর বাড়িতে আছেন।

বাবা কপালের শিরা চেপে বলেন — *সব্বনাশ হইয়া গেছে। আমার সব আশা ভরসা শেষ। ছেলে আমার এ কি কান্ড করল! কে তারে এইসব করতে বুদ্ধি দিল। পরীক্ষার আর মাত্র কয়েক মাস আছে। ছেলে আমার ডাক্তারি পড়বে। ছেলে আমার মানুষের মত মানুষ হবে। ছেলে এ কি পাগলামি করল! ওর ভবিষ্যত নষ্ট হইয়া গেল! কত কইছি বন্ধুদের সাথে মিশবি না। মিশছে। কত বুঝাইছি লেখাপড়া কইরা মানুষ হইতে!*

বাবার মাথায় লোটা লোটা ঠান্ডা পানি ঢালেন মা। বাবার রক্তচাপ বাড়ছে। মা টের পান না, বাবার হৃদপিন্ডের ওপর কালো এক থাবা বসিয়ে যায় ফুঁসে ওঠা রক্তচাপ।

মা ফুঁপিয়ে কাঁদেন আর বলেন - *আমার হীরার টুকরা ছেলে। কই আছে, কী খায় কেডা জানে! বদমাইশেরা ওরে নিচ্চয় তাবিজ করছে! এইডা কি তার বিয়ার বয়স হইল যে বিয়া করে। আল্লাহগো আমার ছেলেরে আমার কাছে ফিরাইয়া দাও।*

চোখের পানি মুছে বাবার ঝিম ধরে থাকাকে ঠেলে ভাঙেন মা, *নাকি গুজব?*

বাবা ডানে বামে মাথা নাড়েন।

গুজব নয়। ঘটনা সত্য। মেয়ের নাম গীতা মিত্র। *হিন্দু।*

চুলোয় হাঁড়ি চড়ে না। শুয়ে থেকে থেকে সারাদিন কড়িকাঠ গুনি। দাদা ঢাকা চলে গেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। আমার বড় একা লাগে। দাদা নেই, ছোটদাও যদি আর এ বাড়িতে না থাকেন, বাড়িটি বিষম খাঁ খাঁ করবে। মণি ঝিমোয় বারান্দায়, রোদ সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে নিচে, উঠোনে। রোদের গায়ে কারও পা পড়ে না। রোদে দাঁড় করিয়ে মা তাঁর ছেলেমেয়েদের গা মেজে গোসল করিয়ে সারা গায়ে মেখে দিতেন সর্ষের তেল, মেখে দু'কানের ছিদ্রে দু'ফোঁটা করে তেল আর নাভির ছিদ্রে একফোঁটা। বড় হয়ে যাওয়া ছোটদাকেও তাই করতেন। ছোটদা কপালের ওপর ঢেউ করে চুল আঁচড়াতেন, চোখা জুতো পরতেন, পাশের বাড়ির ডলি পালের দিকে চেয়ে দুষ্টু দুষ্টু হাসতেন আর বাড়ির ভেতর ঢুকেই তিনি মা'র তোতলা শিশু, মুখে লোকমা তুলে খাওয়াতেন তাঁকে মা।

বাবার শিয়রের কাছে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলেন — *একটা হিন্দু মেয়েরে, কী কইরা একটা হিন্দু মেয়েরে বিয়া করল কামাল! মেয়েটা কয়দিন আইছে এই বাড়িতে। ওর আচার ব্যবহার আমার ভালা লাগে নাই। আইসা নোমানরে সিনেমায় লইয়া যাইতে চায়। নোমান না যাইতে চাইলে কামালরে সাধে। ছেড়াগোর পিছে পিছে ঘুরার স্বভাব। বড় চতুর মেয়ে, আমার শাদাসিধা ছেলেটারে পটাইছে। কামালের কয়দিন ধইরা*

দেখতাছিলাম বড় উড়া উড়া মন। ওই মেয়ের পাল্লায় পড়ছে এইটা যদি জানতাম আগে! তাইলে ওরে আমি সাবধান কইরা দিতাম।

খাটের রেলিংএ কুনই রেখে গালে হাত রেখে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মা বলেন

— *আল্লাহই পারেন ছেলের মন ফিরাইতে। আল্লাগো ছেলেরে আমার ফিরাইয়া আনো। হিন্দু বাড়িত বিয়া হইত ক্যা আমার ছেলের! আমার হীরার টুকরা ছেলের লাইগা কত বড় বড় ঘরের মেয়ের বাপেরা ভিড় করত অইলে! কত জাঁক জমক কইরা বউ ঘরে আনতাম! লেখাপড়া শেষ কইরা চাকরি বাকরি করতে থাকব, তারপরে না বিয়া! মন ঠিকই ফিরব আমার ছেলের, ফিইরা আইব। ভুল ত মাইনষেই করে!*

গীতা মিত্র বিদ্যাময়ীতে পড়ত, মুখখানা গোল, তেঁতুলের গুলির মত, মায়া মায়া কালো মুখে হরিণের চোখ। ইস্কুলে নানা পরবে অনুষ্ঠানে নাচত মেয়ে। ছোটদার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আনন্দ মোহন কলেজে পড়তে গিয়ে। আবার তাঁর খোঁড়া মাসির কারণে, খোঁড়া মাসি পড়াত আমাদের, সে সূত্রে এ বাড়িতেও ক'দিন এসেছে সে, এসে আমাদের দু'বোনের সঙ্গে রসিয়ে গল্প করেছে, বলেছে আমাদের সে লুকিয়ে সিনেমায় নিয়ে যাবে, নাচ শেখাবে, গাছ থেকে আতাফল পাড়তে গিয়ে তরতর করে গাছের মগডালে গিয়ে বসেছে, অমন এক দস্যি মেয়ে দেখে আমরা তখন খুশিতে বাঁচি না। বেবি ছিল অন্যরকম, সেলাই জানা রান্না জানা ঘরকুনো মেয়ে। বেবির দাপিয়ে বেড়ানোর স্বভাব ছিল না, গীতার যেমন। দস্যি মেয়েটি খুব অল্পতেই আমাদের হৃদয় দখল করে ফেলে। অবশ্য হৃদয়ের কপাট তখন এমন খোলা যে কেউ পা রাখলেই দখল হয়ে যায়। ঈদের জামা বানাতে শাদা সার্টিনের জামার কাপড় কিনে আনা হল, গীতা বাড়ি এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কাপড়, বলল *আমি খুব ভাল শিলাই জানি, আমি শিলাইয়া দিব।* ব্যস, বাড়িতে দিনে দু'বার করে আসতে লাগল গজফিতায় গায়ের মাপ নিতে আমাদের। তিন দিনে সেলাই হবে বলেছিল, লাগিয়েছে তের দিন। তাও জামা জোটে ঈদের সকালে। পরতে গিয়ে দেখি বুক এমন আঁটো যে প্রায় ফেটে যায়, ঝুল এত বড় যে মনে হয় পীরবাড়ির আলখাল্লা। এমন অদ্ভুত জামা এর আগে কখনও পরিনি। ঈদটিও গিয়েছিল মাঠে মারা। ঈদের সকালে বাড়ি এসে জামা পরিয়ে দিয়ে সে হাততালি দিয়ে ইঁদুর-দেতো হাসি দিয়ে বলল

— *ইস কি যে সুন্দর লাগতাছে তুমারে! দারুন! দারুন।*

বলল — *চল তুমারে দারুন এক জায়গায় নিয়া যাব বেড়াইতে।*

দারুন এক জায়গায় যাওয়ার জন্য আমার তর সয় না। রিক্সা করে গীতার সঙ্গে দিব্যি রওনা হয়ে গেলাম। উঠলাম গিয়ে সাহেব কোয়ার্টারে জজের বাড়িতে। বড়লোকের বাড়ি। রুহি নামের এক মেয়ে গীতার বান্ধবী, তাকে নিয়ে তার বেরোতে হবে কোথাও। রুহি, চ্যাপ্টা দেখতে মেয়ে, বেজায় ফর্সা, তার মা'কে পটাতে লাগল বাইরে বেরোবে বলে। মা'র পটতে যত দেরি হয় গীতা আর রুহি তত ফিসফিস কথা বলে নিজেদের মধ্যে, আর আমি বসে থাকি খেলনার মত সোফায়। ঘন্টা দুই পর রুহির মা পটল, রুহি মুখে লাল পাউডারের আস্তর মেখে চোখে কাজল ফাজল লাগিয়ে বের হল, তিনজন এক রিক্সায় বসে রওনা হলাম সেই *দারুন* জায়গায়। আমার তখন দারুন জায়গাটি ঠিক কোথায়, জানা হয়নি। ওরা রিক্সায় বসে খিলখিল হাসে, আর আমি কাঠের ঘোড়ার মত বসে থাকি গীতার কোলে। গুলকিবাড়ির এক বাড়িতে রিক্সা থামে, বাড়ির এক শিয়াল-মুখো লোক

আমাদের ভেতরে ঢুকিয়ে গেটে তালা দিয়ে দেয়। লোকটিকে আমি কখনও দেখিনি এর আগে। নিঝুম একটি বাড়ি, বড় মাঠঅলা। ঘরের ভেতর ঢুকে দেখি সারা বাড়িতে আর কোনও লোক নেই, শিয়াল-মুখো ছাড়া। দুটো ঘর পাশাপাশি। ভেতরে শোবার ঘরে রুহি ঢুকে যায় লোকটির সঙ্গে। পাশের ঘরের সোফায় খেলনার মত নাকি কাঠের ঘোড়ার মত নাকি জানি না, বসে আমি দেখতে থাকি লোকটি রুহির সঙ্গে ঘন হয়ে বিছানায় বসল। এত ঘন হয়ে যে আমার পলক পড়ে না। শিয়াল-মুখো শুয়ে পড়ল বিছানায় রুহিকে বুকের ওপর টেনে। হঠাৎই এক লাফে রুহিকে সরিয়ে বিছানা থেকে উঠে এসে লোকটি আমাদের হাতে ফানটার বোতল ধরিয়ে দিয়ে *গীতা যাও, লনে বস গিয়া* বলে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

মাঠে গিয়ে আমি কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করি – *লোকটা কে?*

মিটিমিটি হেসে গীতা বলল – *খুররম ভাই। অনেক বড়লোক। গাড়ি আছে।*

– *রুহিরে নিয়া যে লোকটা দরজা বন্ধ কইরা দিল।* ঢোঁক গিলে বলি, *এহন কি হইব। আমার ডর লাগতাছে। চল যাইগা।*

গীতা তার কালো মুখে শাদা হাসি ফুটিয়ে বলে, *আরে বস, এহনি যাইয়া কি করবা!*

দুপুর পার হয়ে বিকেল হয়ে গেল *চল যাইগা চল যাইগা* করে করে। আমি ছটফট করি, প্রতিটি মুহূর্ত কাটে আমার অস্বস্তিতে। শিয়াল-মুখো ঘন্টায় ঘন্টায় ফানটার বোতল দিয়ে যায় এদিকে। ফানটা খেয়ে তখন আর আমার পোষাচ্ছে না। ক্ষিধেয় চিনচিন করছে পেট। গেটের কাছে গিয়ে কান্না-গলায় বলি – *গেট খুইলা দেও। আমি যাইগা। আমার আর ভাল লাগতাছে না।*

গীতার মুখও শুকনো হয়ে ছিল। শোবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল – *ও খুররম ভাই। ও থাকতে চাইতাছে না। আমরা না হয় যাই গা।*

বেরিয়ে এল শেয়াল-মুখো, পাকানো মোচ পুরু ঠোঁটের ওপর, আঙুলে সিগারেট, খালি গা, খালি পা।

– *গীতা, ফটো তুইলা দেও তো কিছু। আসো।* বলে লোকটি গীতাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম দরজায়।

রুহি মাথা নিচু করে বিছানার মধ্যিখানে বসেছিল। বাঁধা ছিল চুল ঘোড়ার লেজের মত, এখন খোলা, এলোমেলো। ঠোঁটে লিপস্টিক ছিল, নেই। চোখের কাজল ছতড়ে গেছে। বড় মায়া হতে থাকে রুহির জন্য। লোকটি কি ওকে ন্যাংটো করেছিল! ও কি চেয়েছিল ন্যাংটো হতে নাকি চায়নি! লোকটি কি ভয় দেখিয়ে, জোর করে রুহিকে আটকে রেখেছে ঘরে! কিছু ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। গীতার হাতে ক্যামেরা দিয়ে লোকটি রুহিকে দু'হাতে জাপটে ধরল, গীতা মিটিমিটি হেসে টিপ দিল বোতামে। লোকটি শুয়ে পড়ল রুহির কোলে। গীতা টিপল আবার। রুহির গালে গাল লাগাল লোকটি, গীতা টিপল।

আমাদের ছাড়া পেতে পেতে সন্ধে পার হয়ে গিয়েছিল। গীতা প্রথম রুহিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে পরে আমাকে দিল, বলল *কাউরে কইবা না কই গেছিলা।* সারাদিনের নিখোঁজ কন্যার জন্য দুশ্চিন্তায় বাবা মা'র ঈদ মাটি হয়েছে। আমি পাংশু মুখে বাবা মা'র রক্তচোখের সামনে দাঁড়িয়ে পিঠ পেতে বরণ করেছি যা আমার প্রাপ্য ছিল। সেই রহস্যে মোড়া গীতা, যে আমাকে একটি *দারুন দিন* উপহার দিয়েছিল, সে এখন ছোটদার বউ!

শহরের নামকরা গিটার বাজিয়ে ছোটদা, কলেজে তাঁর গিটারের সুরের সঙ্গে *ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা* নেচেই গীতা মিত্রের মাথা ঠেকানো শুরু হয়েছিল ছোটদার কাঁধে, বুকে। সেই গীতা মিত্র! বেবি বলত, *ও একটা জঘন্য মেয়ে। ওর সাথে মিশবা না।* গীতাও বলত *বেবি খারাপ। দেইখ ও যেন আর তুমাদের বাসায় না আসে।*

গলা ফাটে বাবার, — *অরে আমি ত্যাজ্যা পুত্র করাম। আমার খাইয়া আমার পইরা আমাকে গলায় ছুরি বসাইল।*

ফোঁপানো বন্ধ হয়ে এবার গলা চড়ছে মা'র

শেষ পর্যন্ত একটা চাড়ালনিরে বিয়া করল!

খড়িউলার ঝিয়েরে বিয়া করল!

ওই হিন্দু খড়িউলা হইব এম বি বি এস ডাক্তারের বেয়াই!

অর মা মাসিরা রাস্তার কলপারো গিয়া গোসল করে। ছুটোলুকের জাত। কাউট্যা খাউরা জাত। মালাউনের জাত।

সমাজে মুখ দেহানো আর গেল না! মান ইজ্জত সব গেছে!

গুষ্ঠির মুহে চুনকালি দিল ছেলে!

একটা নর্তকীরে বিয়া করল, ছি ছি ছি।

এমন ছেলেরে ক্যান আমি জন্ম দিছিলাম!

মা'র বিলাপ ক্লান্তি হীন ঢেউ, সংসার সমুদ্রে। এমন বিপর্যয় এ সংসারে ঘটেনি আর। নানি নানা রুনু খালা হাশেম মামাকে ডেকে পাঠান বাবা। ঢাকা থেকে বড় মামা আসেন, ঝুনু খালা আসেন, দাদা আসেন। সকলে বিষম উদ্বিগ্ন, ঘরে মূল্যবান বৈঠক চলছে, ওতে ছোটদের, আমার আর ইয়াসমিনের উঁকি দেওয়া মানা। মধ্যরাত অবদি কথাবার্তা চলে, স্বর এত নিচে নামিয়ে কথা বলেন ওঁরা যে আমি কান পেতে থেকেও কিছু বুঝে উঠতে পারি না। শিমুল তুলোর মত ওড়ে দু'একটি শব্দ, ঠিক অনুমান করতে পারি না, হাওয়া কোন দিকে বইছে।

বৈঠকের পরদিন এক ভয়ংকর ঘটনা ঘটে। ছোটদাকে ধরে এনে বৈঠকঘরে মোটা শেকলে বাঁধেন বাবা আর হাশেম মামা। পায়ে শেকল, হাতে শেকলে, শেকলে তালা। চাবি বাবার বুক পকেটে। বাবার গর্জনে বাড়ি কাঁপে, গাছপালা কাঁপে। জানালার ফাঁকে চোখ রেখে দৃশ্য দেখে গা ঘামতে থাকে আমার। ইয়াসমিন বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ রেখে কাঁদতে থাকে। মা বারান্দায় অস্থির হাঁটেন, বিড় বিড় করতে করতে দ্রুত সরাতে থাকেন তসবিহর গোটা।

— *গীতারে ছাড়বি কি না ক! না ছাড়লে তরে আমি ত্যাজ্য পুত্র করাম।* থেকে থেকে বাবার গর্জন।

ছোটদা বলেন নিরুত্তাপ কণ্ঠে — *ত্যাজ্য পুত্র করেন, আমি গীতারে ছাড়তাম না।*

বাবার চোখ বেরিয়ে আসতে থাকে কোটর থেকে, শার্ট ঘামে ভিজে লেপ্টে আছে শরীরে। কোমরে দু'হাত রেখে হাঁপাতে থাকেন, রক্তচাপ বাড়ছে বাবার।

— *তুই বাড়ি থেইকা কুথাও যাইতে পারবি না। কুথাও না। কলেজে পড়বি। পরীক্ষা দিবি।*

ছোটদা চড়া গলায় বলেন – *আমি এই বাড়িতে আইতে চাই নাই। মিছা কথা কইয়া আমারে আপনেরা নিয়া আইছেন। আমি গীতারে বিয়া করছি। আমারে ছাইড়া দেন। আমি গীতার কাছে যাইয়াম। আপনাগোর কাছে আমি কিচ্ছু চাই না। আমারে ছাইড়া দেন।*

– *গীতারে ছাড়। নাইলে তর মরন আমার হাতে। আমি তরে চাবকাইয়া একেবারে মাইরা ফালাব।* বাবার দু'চোখ থেকে আগুন ঝরে।

ছোটদাকে বাবা দু'ঘন্টা সময় দিয়েছেন ভাবার, ওই দুঘন্টা সময় জুড়ে ছোটদা দেয়ালে হেলান দিয়ে চোয়াল শক্ত করে বসে থেকেছেন। আর দফায় দফায় গিয়ে নানি, রুনু খালা, মা বলেছেন

– *বাবারে তুমি ভাল ছেলে। তুমার বাবা যা কয় মাইনা লও। এই বয়সে ছেলেরা অনেক ভুল করে, তুমার বাবা তুমারে মাপ কইরা দিব যদি বাড়িত ফিইরা আইসা লেখাপড়া কর, পরীক্ষা দেও। তুমি ডাক্তারি পইড়া বড় ডাক্তার হইবা। হ বিয়া করছ করছ। মেয়েও তার বাবার বাড়ি ফিইরা যাক। লেখাপড়া শেষ কর দুইজনেই। পরে তুমার বাবা বড় অনুষ্ঠান কইরা মানুষরে জানাইয়া এই মেয়েরেই ঘরে তুলব তুমার বউ কইরা। তুমি ছাত্র মানুষ, এই যে বিয়া কইরা বাড়ি ছাইড়া গেলা গা, খাইবা কি, বউরে খাওয়াইবা কি? যেটুক লেহাপড়া করছ এটুক দিয়া ত কুনো চাকরিই পাওয়া যাইত না। তুমি কি কুলিগিরি করবার চাও? তুমি কি রিক্সা চালাইবা? তুমার বাবা বড় ডাক্তার, শহরে তারে এক নামে সবাই চিনে। বাপের কথা মাইনা লও। ত্যাজ্য পুত্র করলে তুমি বাপের সম্পত্তির কানাকড়িও পাইবা না। বাবা, তুমার ত বুদ্ধি আছে, মেয়েরে গিয়া কও তার বাড়িত ফিইরা যাইতে। তুমার বাপ কথা দিছে বিয়া করার সময় অইলে যারেই তুমি বিয়া করতে চাও, তুমার বাপ তারে দিয়াই বিয়া করাইব।*

ছোটদার চোয়াল শক্তই থাকে। তাঁর একটিই কথা, শেকল খুলে দেওয়া হোক। শক্ত চোয়ালকে বাবা পরোয়া করেন না, গরু পিটিয়ে মানুষ করার খ্যাতি আছে তাঁর। জীবন নিয়ে জুয়ো খেলছে ছেলে, এ তিনি বাবা হয়ে সহ্য করতে পারেন না। চোখের সামনে ছেলে তাঁর আগুনে ঝাপ দিচ্ছে, কেন তিনি তা হতে দেবেন! এ তাঁর নিজের ছেলে, এ ছেলের শরীরে তাঁর রক্ত, ছেলের মুখে তাঁর মুখের আদল। ছেলেকে মানুষ করতে তিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করেছেন, খাইয়ে পরিয়ে বড় করেছেন, ছেলে তাঁর বংশের বাতি, ছেলে তাঁর, ছেলেকে তিনি যে করেই হোক ফেরাবেনই। দু'ঘন্টা পর বাবা আসেন বৈঠক ঘরে শক্ত শেকলে বাঁধা চোয়াল শক্ত ছেলের সামনে। হাতে তাঁর চাবুক।

– *কি তর সিদ্ধান্ত কি? আমার কথা মত চলবি কি চলবি না।* বাবা না নরম না গরম কণ্ঠে বলেন।

ছোটদার চোয়াল আরও শক্ত হয়। বলেন – আমারে ছাইড়া দেন।

– *হ তরে ত ছাড়বই। আমার কথা ছাড়া কুথাও এক পাও লড়বি না। গীতার কাছে যাওয়া তর চলবে না।*

দাঁতে দাঁত চেপে ছোটদা বলেন – *আমার কথা একটাই, এর কুনো নড়চড় নাই। আমি এই বাড়িতে থাকতাম না। আমি গীতার কাছে যাইয়ামই।*

– *গীতারে খাওয়াইবি কি, নিজে খাইবি কি?* চাবুক নাড়তে নাড়তে বলেন বাবা।

— *সেইডা কারও চিন্তা করার দরকার নাই।* চোয়াল তখনও শক্ত ছোটদার, দাঁতে দাঁত।

ছোটদার জায়গায় আমি হলে, সব শর্ত সম্ভবত মেনে নিতাম। বাঘের থাবায় এসে বাঘের সঙ্গে রাগ দেখানো বোকামো ছাড়া আর কী!

চোয়াল এবার শক্ত হয় বাবার। চোখ হয় করমচার মত লাল।

চাবুক চালান ছোটদার ওপর, ক্ষুধার্ত বাঘের মুখে এতদিনে আস্ত হরিণ। চাবুক যেন আমার পিঠে পড়ছে। আমারই সারা গা থেকে রক্ত ঝরছে। চামড়া কেটে মাংস বেরিয়ে গেছে পিঠের, মাংস কেটে হাড়। চোখ বুজে থাকি। চোখ বুজে অপেক্ষা করি চাবুক থামার। চাবুক থামে না। বৈঠক ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসেন মা, নানি, বড় মামা, রুনু খালা। কেউ বারান্দার থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনে তাকিয়ে থাকেন জানেন না কিছু দেখছেন কিনা সামনে, কেউ ধীরে হাঁটতে থাকে, জানেন না হাঁটছেন কি না, কেউ নিজের চুল খামচে ধরে থাকেন, জানেন না তাঁর চুলে তিনি হাত দিয়েছেন কি না। একেকজন যেন মৃত মানুষ, কবর থেকে উঠে এসে হাঁটছেন গন্তব্যহীন, তাঁরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না, সামনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, অন্ধকারে শুয়ে আছে অরণ্য আর অরণ্য থেকে একটি কেবল শব্দ আসছে, সে চাবুকের।

মা দৌড়ে যান বৈঠক ঘরে, গিয়ে চাবুকের আর *মা মা* চিৎকারের তলে যেন না হারায় তাঁর নিজের শব্দ, চিৎকার করে বলেন — *ছেলেটা ত মইরা যাইব। মাইরা ফেলতে চাও নাকি! আমার ছেলেরে তুমি মাইরা ফেলতে চাও!*

চাবুকে ছোটদাকে রক্তাক্ত করতে করতে বাবা বলেন — *এরে আমি মাইরাই ফেলব আজ। এরম ছেলের বাইচা থাইকা কুনো দরকার নাই।*

—*ছাইড়া দেও যাকগা যেহানে যাইতে চায়।* মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলেন, *এরে মাইরা কুনো লাভ নাই। এর রগ ছুডোবেলা থেইকা ত্যাড়া । আইজকা বাপ মা ভাই বোনের চেয়ে তার কাছে বড় হইয়া গেছে এক মালাউনের ছেড়ি। যাক, ও সেহানেই যাক। ওরে ছাইড়া দেও।*

ছোটদাকে ছাড়া হয় না। বন্দি করা হয় ওঁর নিজের ঘরে। ঘরের দরজায় নতুন তালা পড়ে, তালার চাবি বাবার বুক পকেটে। বাড়িতে ঘোষণা করে দেন বাবা, ছোটদাকে কোনওরকম খাবার দেওয়া চলবে না। পায়খানা পেশাব তিনি ওঘরেই করবেন, যতদিনে না তাঁর সুমতি হয়। আটকা পড়ে ছোটদা দরজা ভাঙার চেষ্টা করেন, জানলা ভাঙার। কোনওটিই ভাঙে না। ভাঙবে কেন, লোহা গলিয়ে কাঠ বানানো হয় যদি! দৈর্ঘে নফুট, প্রস্থে পাঁচ।

সারারাত গোঙরান তিনি। অনেকগুলো প্রাণী প্রাচীন কোনও প্রেত পুরীর মত বাড়িটির বালিশে মাথা রেখে গোপনে জেগে থাকে। আমিও জেগে থাকি। অনেক রাতে, সে কত জানি না, ইয়াসমিন ভাঙা গলায় বলে — *বুবু, আমার ঘুম আয়ে না।* আমি পাশ ফিরে বলি — *আমারও না।*

দীর্ঘশ্বাস ছড়াতে ছড়াতে ঘরে কুয়াশা-মত জমে, চোখে ঝাপসা লাগে সব। ঝাপসা হয়ে আসে দরজা জানালা বারান্দার আলো পড়া ঘরের আসবাব, সব। অন্ধকার আমার চুলে এসে বসে, চোখে, চিবুকে।

ছোটদা চারদিন উপোস থাকার পর মা জানালার লোহার শিকের ফাঁক গলে লুকিয়ে খাবার চালান করেন। ছোটদাকে খাইয়ে চারদিন পর নিজে তিনি খাবার মুখে তোলেন। বাবা ঘরে বসে কান পেতে থাকেন বন্ধ ঘর থেকে কোনও সমর্পনের শব্দ আসে কি না, কষ্ট পেতে পেতে, ক্ষিধের বন্দিত্বের। শব্দ আসে না। বাড়ির চুলোয় যেন আগুন ধরানো না হয়, বাবার কড়া হুকুম।

কি করে বাঁচবে তবে বাড়ির বাকি মানুষ!

মুড়ি চিবিয়ে পানি গিলবে, ব্যস।

আর ও ঘরে কেউ কোনও খাবার পাচার চেষ্টা করলে তাঁকেও চাবকানো হবে। তবু বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে কিছু না কিছু জানলা গলে ও ঘরে যায়ই। আমার স্পষ্ট ধারণা হয় বাবা টের পান যে ছোটদাকে খাবার দেওয়া হচ্ছে এবং তিনি ঘটনাটি না জানার ভান করছেন। বাবা তাঁর ছুটি আবার বাড়িয়ে বাড়িতে বসে থাকেন আর অপেক্ষা করেন ছোটদার আত্মসমর্পনের। এদিকে শুকিয়ে ছোটদার হাড় বেরিয়ে আসে বুকের, গলার, গালের। আস্ত একটি কঙ্কাল দাঁড়িয়ে গোঙরায় জানালার শিক ধরে।

বাঘে বাঘে লড়াই চলছে, আমরা অসহায় দর্শক মাত্র। লড়াই শেষ হয় পনেরোদিন পার হলে ’পর।

লড়াইয়ে হেরে যান বাবা। ছোটদাকে শেষ অবদি ছেড়ে দিতে হয়।

ছোটদা চলে যাওয়ার পর বাবা আমাদের দু’বোনকে বুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন। এত শক্ত করে যে মনে হয় বুকের হাড় সব ঢুকে যাবে মাংসের ভেতর। জড়িয়ে বাবা বলেন, *তুমরা আমারে কথা দেও পড়ালেখা কইরা মানুষ হবা তুমরা, কও!*

আমরা মাথা নাড়ি *হব।*

– *দুইটা মেয়েই এখন আমার স্বপ্ন। কও, তুমরা কেও তুমরার ভাইয়ের মত হইবা না। কও!* বাবা বলেন।

আমরা মাথা নাড়ি *হব না।*

– *ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য আমি সব করছিলাম। আমার কত স্বপ্ন ছিল কামালরে নিয়া। ও কী অসভব ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল, মেট্রিকে স্টার পাওয়া ছাত্র। ও আমার কত গর্ব ছিল। আমার সব গর্ব, সব স্বপ্ন এখন শ্যাষ। তুমরা আমার শ্যাষ ভরসা। তুমাদের মুখের দিকে চাইয়া এখন আমার বাঁচতে হইব। কও আমারে বাঁচতে দিবা! লেখাপড়া করবা, কও!* বলতে বলতে বাবার গলা বুজে আসে।

আমরা মাথা নেড়ে বলি *করব।*

– *আমি আমার ছেলেরে মারতে চাই নাই। আমার কি কম কষ্ট হইছে ছেলেরে মারতে! না খাওয়াইয়া রাখতে! শেষ চেষ্টা করছি ছেলের মত যেন পাল্টায়। আদর কইরা বুঝাইছি, শুনে নাই। মাইরা কইছি, তাও শুনে নাই। তুমরা শুনবা আমার কথা, কও!*

আমরা মাথা নেড়ে বলি *শুনব।*

বাবার চোখের পানি আমাদের জামা ভিজিয়ে ফেলে। বাবাকে এই প্রথম আমরা কাঁদতে দেখি।

কিন্তু আমরা মাথা নেড়ে কথা দিয়ে দিলাম আর বাবাও তা মেনে নিয়ে মনে সুখ পাবেন, বাবা আমার এমন ধাঁচের নয়। তিনি মা'কে বলেন — *পরিবেশ নষ্ট হইয়া গেছে বাড়ির। এই এত বড় বাড়ি আমি কিনছিলাম, আমার ছেলেমেয়েদের জন্য,যেন তারা একটা ভাল পরিবেশে লেখাপড়া করতে পারে। সবার জন্য আলাদা ঘর, ক্যাচর ম্যাচর নাই, গণ্ডগোল নাই। পাড়ার কারও সাথে মিশতে দেই নাই ছেলেমেয়েদের। নিরিবিলি থাইকা যেন লেখাপড়ায় মন দেয়। হইল না।* বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরীরখানা বিছানায় এলিয়ে বলেন — *এই বাড়ি দিয়া আমি এখন করব কি! আমি বাড়ি বেইচা দিব। আমার চোখ ফাঁকি দিয়া নুমানে বন্ধু বান্ধব লইয়া আড্ডা দিয়া পরীক্ষায় খারাপ করছে, কামালে চইলা গেল এক ছেড়ির লাইগা নিজের জীবনটা নষ্ট করতে। এই বাড়িতে থাকলে মেয়েদুইটাও মানুষ হইব না।*

মা নীরবে দেখেন সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যাওয়া মানুষের কাতরানো। নামাজ শেষে মা প্রতিদিন প্রার্থনা করেছেন ছেলের মন যেন ফেরে *বিধর্মী* মেয়ে থেকে। ছেলে যেন তওবা করে নামাজ শুরু করে। ছেলে যেন ঈমান আনে। মা'র প্রার্থনায় কাজ হয়নি। ছোটদা চলে যাওয়ার সময় একবারও পেছন ফেরেননি।

ছোটদা চলে যাওয়ার দু'দিনের মাথায় বাবা দুটো সুটকেসে বইখাতা কাপড় চোপড় ভরে আমাকে রেখে আসেন *মডেল ইস্কুলের ছাত্রীনিবাসে*, আর ইয়াসমিনেকে মির্জাপুরের *ভারতেশ্বরী হোমসএ।* রুখে দাঁড়ানোর সাহস আমাদের কারও ছিল না। কালো ফটকের সামনে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিলেন মা। টোকা দিলে বুড়ো গোলাপের পাপড়ির মত ঝরে পড়ত পাথর, জানি।

তের বছরে তখনও আমি পা দিইনি। মা'কে ছেড়ে কখনও কোথাও থাকার অভ্যেস নেই আমার। মা চুল বেঁধে দেন, মুখে তুলে খাইয়ে দেন, জ্বর হলে মাথার কাছে বসে থেকে রাত জেগে জলপট্টি দেন কপালে, গাছের বড় পেয়ারা, বড় আম, বড় ডাব, বড় আতা, বড় মেয়ের জন্য তোলা থাকে। ফুল তোলা ঘটি হাতা জামা বানিয়ে দেন নিজে হাতে। রাতে ঘুম না আসলে পিঠে তাল দিতে দিতে গান *ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ি এসো, খাট নাই পালঙ্ক নাই, রাজুর চোখে বসো।* মা আমাকে মাঝে মধ্যে আদর করে *রাজু* বলে ডাকেন। সেই মা'কে ছেড়ে, নিজের বিছানা বালিশ ছেড়ে, এক্কা দোক্কার উঠোন আর গোল্লাছুটের মাঠ ছেড়ে এক তক্তপোশে আমাকে বসে থাকতে হয়, যেহেতু এখানে আমাকে ফেলে রেখে গেছেন বাবা। ছাত্রীনিবাসের মেয়েরা আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলে

— *তুমি হোস্টেলে এসছো কেন? তোমাদের বাড়ি তো এ শহরেই!*

কোনও উত্তর নেই ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকা ছাড়া। যেন চিড়িয়াখানায় আজব এক প্রাণী এসেছে, তার পায়ে শিং, পেটে শিং দেখতে এসে মেয়েরা ঠোঁট চেপে হাসে। আমার কাউকে বলতে ইচ্ছে করে না আমার ছোটদা, ঈশ্বরগঞ্জে, ইয়াসমিন যে বাড়িতে

জন্মেছিল, সে বাড়ির দেয়ালে পিঁপড়ের পেছনে পিঁপড়ে হাঁটত কালো আর লাল, লাল গুলোকে আঙুলে টিপে মারতেন আর বলতেন – *লাল পিঁপড়া হিন্দু।*

আমি একটি কালো পিঁপড়ে মেরেছিলাম বলে সে কি রাগ ছোটদার! পিঠে দুমাদুম কিলিয়ে বলেছিলেন – *কালা পিঁপড়া মারছ ক্যা? কালা পিঁপড়া ত মুসলমান। লালগুলারে বাইছা বাইছা মারবি।*

হ্যাঁ সেই ছোটদাই, হিন্দু পিঁপড়ে মারা ছোটদা এক হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে বাড়ি ছাড়লেন। লেখাপড়া ছাড়লেন। বাবা মা ভাই বোন ছাড়লেন। ছত্রখান হয়ে গেল সংসার।

দিন সাত পর মা এলেন হোস্টেলে। হোস্টেলের সুপারের কাছে দরখাস্ত করলেন আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে। মা'র দরখাস্ত মঞ্জুর হয়নি, যেহেতু আমার অভিভাবক হিসেবে খাতায় নাম আছে কেবল বাবার। মা কাঁদতে কাঁদতে বিদেয় হলেন। ইস্কুলের প্রিন্সিপাল ওবায়দা সাদ থাকেন ওপর তলায়, নিচ তলায় হাতে গোনা কজন মেয়ে নিয়ে নামকাওয়াস্তে ছাত্রীনিবাস সাজানো হয়েছে।

প্রায় বিকেলেই বাবা আসেন আমাকে দেখতে, বিস্কুট, চানাচুর, মালাইকারি, মন্ডা নিয়ে। ওগুলো হাতে দিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করেন – *লেখাপড়া কেমন করতাছ মা?*

চোখ মাটিতে। মাথা নেড়ে বলি *ভাল।*

বাবা মোলায়েম স্বরে বলেন – *হোস্টেলে ত আরও মেয়েরা থাকে, তোমার বয়সী মেয়েরা, থাকে না?*

মাথা নেড়ে বলি *থাকে।*

– *এইখানে থাইকা ক্লাস করবা, আর ছুটির পরে হোস্টেলে ফিইরা গোসল কইরা খাইয়া দাইয়া পড়তে বসবা। আর ত কোনও কাজ নাই। হোস্টেলে তুমারে দিছি তুমার ভালর জন্য। এহন না বুঝলেও তুমি যহন বড় হইবা, বুঝবা। বাবা সবসময় ছেলেমেয়ের ভাল চায় মা। চায় না?*

মাথা নেড়ে বলি *হ চায়।*

চোখ ফেটে জল আসে আমার। চোখের জল আড়াল করতে আকাশের তীব্র লাল আলোর দিকে তাকিয়ে থাকি, যেন বাবা ভাবেন সূর্যের দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকালে জ্বালা করে চোখ জল কিছু আসে, এ কান্না নয়।

বাড়ি ফেরার জন্য কতটা অস্থির হয়ে আছি, বাবাকে বুঝতে দিই না। বাবা ছাড়া আর কোনও অতিথি আসা নিষেধ আমার কাছে। এমনকি মা এলেও মা'র সঙ্গে দেখা করা যাবে না। ইচ্ছে করে দৌড়ে পালাই। কিন্তু মোচঅলা তাগড়া দারোয়ান বসে থাকে গেটে, গেট পার হয়ে কারও বাইরে যাওয়ার সাধ্য নেই। ডাক্তার রেবেকা চলে গেছেন মেডিকেল কলেজের *টিচার্স কোয়ার্টারে,* রুনিকেও তাই চলে যেতে হয়েছে। ওকে পেলে হয়ত যন্ত্রণা কিছু উপসম হত। আসলে হত কী! আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না।

বিকেলে ইস্কুল ছুটির পর খেয়ে ঘুমিয়ে জিরিয়ে কিছু মেয়ে নামে ব্যাডমিন্টন খেলতে, কিছু মেয়ে আড্ডায় বসে মাস্টারদের কার স্বামী আছে কার স্ত্রী, কার তালাক হয়েছে, কে একা থাকে, কার সঙ্গে কার প্রেম চলছে এসব। আমি আধেক বুঝি, আধেক বুঝি না। আমি ঠিক বুঝে পাই না ওরা কি করে মাস্টারদের ঘরের খবর, মনের খবর রাখে। আমি

পারি না। ব্যাডমিন্টনের দর্শক আর আড্ডার শ্রোতা হয়ে আমার সময় কাটে। সন্ধেবেলা বই সামনে নিয়ে বসে থাকতে হয়, *সুপার* ঘুরে ঘুরে দেখেন মেয়েরা পড়ছে কি না। বইয়ের পাতায় ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে আমার। অক্ষরগুলো ঝাপসা হতে থাকে, প্রতিরাতে। প্রতিরাতে আমাকে বিছানায় শুতে হয় একা, কোনও *ঘুম পাড়ানি মাসি বা পিসি* এসে বসে না আমার চোখে।

কী দোষ করেছিলাম, যে আমাকে ঘরবাড়ি ফেলে নির্বাসনে জীবন কাটাতে হচ্ছে! প্রেম করলেন ছোটদা, প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে আমাকে। আমার কোনও দ্বিধা হয় না ভাবতে যে বাবা অন্যায় করছেন।

প্রেম দাদাকেও করতে দেখেছি, নীরবে। *অবকাশে* আসার তিনদিনের মাথায় পাড়ার *অনিতা* নামের এক মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে দীঘল ঘন চুলের এক উজ্জ্বল মেয়েকে দেখলেন ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যস প্রেমে পড়ে গেলেন। অনিতারা মাছ ছয় পর চলে যায় কলকাতা। দাদা চোখের জল ফেলতে ফেলতে কবিতা লেখা ধরলেন। শীলাকে দেখার পর কবিতা লেখায় অবশ্য ভাঁটা পড়ে। ফরহাদ নামে দু'জন বন্ধু ছিল দাদার। একজনকে ডাকা হত *মুড়া ফরহাদ*, আরেকজনকে *চিকন ফরহাদ।* চিকন ফরহাদের বোনই হচ্ছে শীলা। লম্বা মেয়ে, পানপাতার মত মুখ। দাদা বলতেন শীলা দেখতে অবিকল অলিভিয়ার মত, অলিভিয়া ছিল ফিল্মের নায়িকা। সিনেমা পত্রিকা থেকে অলিভিয়ার ছবি কেটে কেটে দাদা ঘর ভরে ফেললেন। বইয়ের ভেতর, খাতার ভেতর, টেবিলক্লথের নিচে, বালিশের নিচে, তোষকের তলায় কেবল অলিভিয়া। আমি আর ইয়াসমিন কোথাও অলিভিয়ার কোনও ছবি দেখলে এনে দাদার হাতে দিতাম। ওসব ছবির দিকে দাদাকে দেখেছি ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকতে, তাকিয়ে থেকে বলতে *শীলার থুতনিটা ঠিক এইরকম, নাকটা এক্কেবারে শীলার, চোখ দুইটা ত মনে হয় ওরগুলাই বসাইয়া দিছে। হাসলে শীলারও বাম গালে টোল পড়ে।*

পুরোনো খাতা ফেলে নতুন খাতা ভরে দাদা নতুন উদ্যমে কবিতা লিখতে শুরু করেন আবার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রেমের গান শোনেন একা একা। কলেজে যাওয়ার রিক্সাভাড়া আর টিফিনের পয়সা জমিয়ে বেহালা কেনেন, যামিনী রায়ের কাছে বেহালা বাজানো শিখে এসে শীলাকে ভেবে বেহালায় করুণ সুর তোলেন। শীলা তখনও প্রেমে পড়েনি দাদার, দাদাই একা। দাদার বেহালা শুনে মন গলবে না শীলার, গলবে কোনও এক দিন, কবিতায়। *বলদের* ডাগর চোখে চোখ রেখে *হরিণী* বলবে, *কবিতা লেখা শিখলেন কোত্থেইকা? ভালই লেখেন।*

বলদ লাজুক হাসবে।

হরিণী বলবে – *আপনে আমার দিকে এত তাকায়ে থাকেন কেন।*

বলদ লাজুক হাসবে।

হরিণী বলবে – *আপনে যে এত ঘন ঘন সামনের রাস্তা দিয়া হাঁটেন, আমার ভাই কিন্তু দেইখা বলে নোমান কাঁচিঝুলিতে এত আসে কেন!*

বলদ লাজুক হাসবে।

হরিণী বলবে – *আপনে আসেন তাতে কার কী, এই রাস্তা কি ফরহাদের কেনা! আপনে হাঁটেন, আপনের আরও বন্ধু ত কাঁচিঝুলিতে থাকে, তাদের বাসায় যান।*

বলদ লাজুক হাসবে।

হরিণী বলবে — *আপনে না আপনের দুই বোনের জামা বানাইতে দিবেন, কই নিয়া আসেন একদিন, আমি জামা ভালই শিলাই করতে জানি।*

বলদ মাথা নাড়বে।

হরিণী বলবে — *ইস কী গরম পড়ছে, ছাদে গিয়া বসলে একটু বাতাস লাগবে। আপনেরও নিশ্চয় গরম লাগতাছে?*

বলদ মাথা নাড়বে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানের *এম এ* ক্লাসের ছাত্র দাদা। তাঁর মন পড়ে থাকবে ময়মনসিংহ শহরের কাঁচিঝুলিতে। আর বিজ্ঞান ঝুলে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের অশ্বত্থ গাছে, বাঁদরের অথবা বাদুরের মত। দাদা ছুটির নামে ঘন ঘন বাড়ি ফিরবেন।

বিষন্ন হরিণীর সঙ্গে দেখা হবে কাঁচিঝুলির শিমুলতলায়।

হরিণী বলবে, *বাবা আমার বিয়ে ঠিক করতেছে।*

বলদ বলবে, *কার সাথে?*

হরিণী বলবে, *যার সাথেই হোক, তুমার সাথে না।*

বলদ বলবে, *ও।*

হরিণী বলবে, *বাবার অসুখ, ভাবতেছেন মরে টরে যাবেন, মেয়ের বিয়ে দিলে নিশ্চিন্তে মরবেন।*

বলদ বলবে, *কী অসুখ?*

হরিণী বলবে, *যে অসুখই হোক, বিয়ে দিবেন আমার।*

বলদ বলবে, *ও।*

হরিণী বলবে, *তুমার বাবা যদি প্রস্তাব নিয়া আসে আমার বাবার কাছে, বাবা মনে হয় না করবেন না।*

বলদ বলবে, *ও।*

হরিণী কাঁদবে।

বলদ বলবে, *কাঁদো কেন?*

হরিণী বলবে, *কাঁদি কেন, তুমি বোঝ না!*

বলদ মাথা নাড়বে, সে বোঝে না।

হরিণী বলবে, *তুমি না মনোবিজ্ঞান পড়? অথচ মনের কিছুই বোঝ না!*

বলদ বিব্রত, অপ্রতিভ।

দাদা বাড়িতে মা'কে প্রথম পাড়বেন কথাটি যে শীলা খুব লক্ষ্মী একটি মেয়ে, ওর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে শিগরি, ওকে লাল শাড়িতে খুব সুন্দর দেখাবে, ও চমৎকার রান্না করতে জানে, চমৎকার শেলাই জানে, শীলা তাঁর শ্বশুর শাশুড়িদের খুব যত্ন করবে, ওর ফুটফুটে সব বাচ্চা হবে।

মা বলবেন, *তর বন্ধুর একটা বইন সুন্দরী, সংসারি। ভাল খবর। তা আসল কথাটা কি, ক!*

আসল কথাটি বলতে দাদা সময় নেবেন। এক কাঠি দু'কাঠি এগোতে এগোতে একদিন বলবেন শীলাকে তিনি বিয়ে করতে চান। বাবার কানে কথাটি মা মিছরির গুঁড়োর

সঙ্গে মিশিয়ে ঢালবেন। মিছরির গুঁড়োর স্বাদও খুব তেতো লাগবে বাবার। এক কাঠি দু'কাঠি পেছোতে পেছোতে বাবা একদিন বলবেন ঠিক আছে মেয়েকে দেখতে চাই আমি।

বলদ বলবে, *চল, আমাদের বাড়িতে তোমার দাওয়াত। তোমারে বাবা দেখতে চাইছেন।*

হরিণী লাজুক হাসবে।

বলদ বলবে, *আমার যে কি খুশি লাগতাছে। তুমি আমার বউ হবা।*

হরিণী লাজুক হাসবে।

বলদ বলবে, *তুমারে দেখার পর বাবা বিয়ের প্রস্তাব নিয়া তুমাদের বাসায় আসবে।*

হরিণী লাজুক হাসবে।

বলদ বলবে, *তুমি চুড়ি পইও না আবার হাতে, কানের দুলও না। মুখে রঙ লাগাইও না। বাবা পছন্দ করে না। আর, কইবা মেট্রিকে ফাস্ট ডিভিশন পাইছ, স্টার আছে কইবা। থাক ধরা পইরা যাইতে পার, দরকার নাই। আই এ পড়, খুব পড়াশুনা করতাছ যাতে ফাস্ট ডিভিশন পাও আর বিয়ার পরও লেখাপড়া চালাইয়া যাইবা। এইম কি জিগাস করলে বলবা কলেজের টিচার হওয়া।*

হরিণী লাজুক হাসবে।

শীলা আসবে বাড়িতে। বৈঠক ঘরে শীলার সামনে বসে থাকবেন বাবা, দাদা বসে থাকবেন নিজের ঘরে, দাদার পা নড়তে থাকবে দেয়াল ঘড়ির পেন্ডুলামের মত, হাঁটুতে হাঁটুতে লেগে ঠক ঠক শব্দ হবে। বৈঠক ঘরে যেতে তাঁর লজ্জা হবে। মা দুধ শেমাই রান্না করে, ট্রেতে চা, বিস্কুট, মিষ্টি, শেমাই সাজিয়ে সোফার সামনের টেবিলে রাখবেন। খেতে খেতে শীলার সঙ্গে গল্প করবেন বাবা। বাবার ঠোঁটে হাসি ঝিলিক দেবে।

শীলার যাওয়ার সময় হলে নিজে তিনি রিক্সা ডেকে ওকে তুলে দেবেন। কালো ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে হাত নাড়বেন হেসে।

নতুন শাড়ি পরা মা, পান খেয়ে ঠোঁট লাল করা মা, খুশির দোলনায় দোলা মা দৌড়ে যাবেন বাবার সামনে। বলবেন, *দেখতে মধুবালার মত।*

বাবা বলবেন, *ঠিকই।*

মা বলবেন, *মেয়েটা খুব লক্ষ্মী।*

বাবা বলবেন, *তা ঠিক।*

মা বলবেন, *ছেলের বিয়ার বয়স হইছে। তাড়াতাড়িই বিয়াটা হইয়া যাওয়া ভাল।*

শার্ট পরা, প্যান্ট পরা, টাই পরা, জুতো পরা, চশমা চোখের, কোঁকড়া চুলের বাবা বলবেন, *এই মেয়ের সাথে আমার ছেলের বিয়া দিব না।*

হাকিম নড়বে তো হুকুম নড়বে না।

দু'মাস পর তেইশ বছরের ফারাক নিয়ে এক ভুঁড়িঅলা, মোচঅলা, পাঁচ ফুট দু'ইঞ্চি লোকের সঙ্গে শীলার বিয়ে হয়ে যাবে।

হরিণী আটকা পড়বে খাঁচায়।

ঝুনু খালা কেঁদেছিলেন দাদার মত নিরালায় বসে নিঃশব্দে নয়। পাড়া কাঁপিয়ে। নাওয়া খাওয়া ছেড়েছিলেন। বাড়ির কাচের বাসন কোসন ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভেঙেছিলেন। গলার

ওড়না পেচিয়ে কড়িকাঠে ফাঁসি নিতে গিয়েও নেওয়া হয়নি, আগেই দরজা ভেঙে হাশেম মামা ঢুকে নামিয়ে আনেন। ঝুনু খালাকে কবিরাজ দেখানো হয়, মাথায় মাথা ঠান্ডা হওয়ার তেল মাখা হয়, মৌলবি ডেকে এনে ফুঁ দেওয়ানো হয় মুখে।

ঝুনু খালা তবু সারেননি, শেষ পর্যন্ত তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় বড় মামার বাড়িতে, ঢাকায়।

রুনু ঝুনু পিঠাপিঠি বোন, দু'বোনের সখ্য পাড়ার লোকও জানে। চানাচুর অলাও বাড়ির সামনে গান ধরে *ও আমার রুনু ভাই, ঝুনু ভাই কই গেলারে, গরম চানাচুর যায় খাইবা নাকি রে। হেই চানাচুর গরম।* রুনু ঝুনু কাঁদেন একসঙ্গে, হাসেন একসঙ্গে। গান, নাচেন, বরই কুড়োন, শিউলি ফুল তোলেন, মালা গাঁথেন, সব এক সঙ্গে। ঝুনু তাঁর পেটের খবর রুনুকে বলেন, রুনু তাঁর পেটের খবর ঝুনুকে। দু'বোন পাশাপাশি শোন এক বিছানায়। লোকে বলে *আহা যেন যমজ বইন।* সেই রুনু হঠাৎ একদিন বাড়ি থেকে হাওয়া। হাওয়া তো হাওয়াই। নেই নেই, শহর জুড়ে নেই। খবর পাওয়া গেল, বাড়ি থেকে পালিয়ে তিনি বিয়ে করেছেন রাসুকে, আছেন এখন রাসুর গ্রামের বাড়িতে, বেগুন বাড়ি। শুনে ঝুনু পাড়া কাঁপিয়ে কাঁদেন। উঠোনের ধুলোয় গড়িয়ে কাঁদেন, বুক থাপড়ে কাঁদেন। কেন কাঁদেন! রাসু ছিলেন ঝুনুর গৃহশিক্ষক। রাসু রুনুর কেউ ছিলেন না। রাসুর সামনে বসে রাসুর চোখের ভাষা পড়েননি রুনু, বুকের ধুকপুক শব্দ শোনেনি। এক ঝুনু জানেন কি করে টেবিলের তলে ঝুনুর পায়ের ওপর এগিয়ে আসতো রাসুর পায়ের আঙুল। কি করে ঝুনুর আঙুল নিয়ে খেলত গোপন এক হাত। ঝুনু জানেন শিউলি ফুলের মালা তিনি কার জন্য গাঁথতেন। কার জন্য তিনি বিকেল হতেই আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতেন বারবার। চোখে কাজল পরতেন কার জন্য! সকলে জানত, ঝুনুকে পড়াতে মাস্টার আসেন, কেউ জানে না কয় ভাগ পড়া আর কয় ভাগ অপড়ায় সময় কাটে ছাত্রী আর শিক্ষকের। ছাত্রী পড়ানোর সময় কারও ঘরে ঢোকা মানা, কারও গন্ডগোল করা মানা, শিক্ষকের জন্য এক ফাঁকে চা বিস্কুট দিয়ে যেতেন রুনু, ওটুকুই ছিল কেবল পড়া বা অপড়ার মধ্যে সামান্য বিশৃঙ্খলা।

সেই ঝুনুর সঙ্গে যদি রাসুর বিয়ে না হয়ে রুনুর হয়, তবে অপমানে লজ্জায় ঝুনু মরতে চাইবেন না কেন!

পুরুষ হচ্ছে জানোয়ারের জাত, ঝুনু খালার ধারণা তাই।

পুরুষের কথায় মজছ কি মরছ, ঝুনু খালা ঘাটে বসে পুকুরের জলে পা ডুবিয়ে বলছিলেন, মৌলবির ফুঁ এর দু'দিন পর।

শুয়োরের চেয়ে অধম এরা। এরা যারে পায় তারে চাখে। এগোর কুনো নীতি নাই। তুমারে আইজ কইল ভালবাসে, পরদিন আরেকজনরে একই কথা কইব।

ঝুনু খালার পিঠ পেরিয়ে পাছায় নামা ঘন চুল, সে চুলে জট, কালি পড়া কাজল না পরা চোখ,.গায়ের কাঁচা হলুদ রঙ দেখায় মরা ঘাসের মত।

নানির চার মেয়ের মধ্যে ফজলি খালা একশতে আশি, ঝুনু খালা একশতে পঞ্চাশ, রুনু খালা তিরিশ, আর মা .. . .

দাদা ইস্কুলের মাস্টারের মত রূপের নম্বর এভাবে দিতেন,

— *আর মা কত?*

দাদা চেয়ারে বসে দু'পা নেড়ে নেড়ে, দাঁতে পেনসিল কামড়ে বলতেন, *মা হইল রসগোল্লা।*

— *বুঝলা গেঁতুর মা, তুমিও যেরম আমিও তেমন। তুমারে এক লোকে কষ্ট দিছে, আমারেও দিছে। উপরে যদি আল্লাহ থাকে, আল্লাহ এইটা সইব না। ওগোর বিচার আল্লাহই করব।* ঝুনুখালা, *পঞ্চাশ পাওয়া রূপসী, নতুন সন্যাসিনী* বলেন।

— *গেতুঁর মার সাথে এত কি ফুসুর ফুসুর আলাপ ঝুনুর!* জানালায় দাঁড়িয়ে দুজনের ঘনিষ্ঠ বসে থাকা দেখে নানি অসন্তুষ্ট স্বরে বলেন, — *ঝুনু ত আবার পেডো কথা রাখতে পারে না, কী না কী কয় আবার!*

গেঁতুর মা'র বুক কেঁপে দীর্ঘশ্বাস বেরোয় — *আল্লাহ আসলে বিচার করে না। আল্লাহ বড় একচোখ্যাপনা করে। গেতুঁর বাপ আমারে মাইরা পুড়াইয়া খেদাইয়া, বিয়া করছে আরেকটা। হে ত সুহেই আছে। সুহে নাই আমি, বাপ নাই যে বাপের কাছে যাই, ভাই আছে দুইডা, ভাইয়েরা আমারে উঠতে বইতে গাইল্লায়, কয় আমারই দুষে আমারে খেদাইছে গেঁতুর বাপ।*

গেঁতুর মা'র পোড়া হাত ভেসে থাকে ঝুনুখালা হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে বলেন — *এই দুনিয়ায় আমার বাঁচতে ইচ্ছা করে না। আবার ভাবি আমি মরতাম ক্যান একলা, ওই দুইটারে মাইরা নিজে মরবাম। আমি সুখে নাই, তরা সুখে থাকবি ক্যান!*

এঁদো গলি থেকে পায়ে পায়ে হেঁটে এসে অন্ধকার ঢুকে পড়ে নানির বাড়ির উঠোনে। পুকুরের জলে আধখানা চাঁদ কচুরিপানার কম্বল মুড়ে ঘুমোয়। গেঁতুর মা'র পোড়া হাতখানা ঘুমোয় ছেঁড়া আঁচলের তলে। ঝুনু খালার ইচ্ছে করে না কোথাও যেতে। ইচ্ছে করে পুকুর ঘাটে, বাঁকা খেজুর গাছের এই তলায় তিনি বসে থাকবেন সারারাত আর টুপ টুপ করে তাঁর জটা চুলে শিশির পড়বে। শিশির ভেজা ঘাস থেকে তিনি আর আঁচল ভরে ভোরবেলা শিউলি কুড়োবেন না। আর কারও জন্য মালা গাঁথার তাঁর দরকার নেই। আর কারও জন্য বিকেলে লাল ফিতেয় কলাবেণি করে চোখে কাজল পরে অপেক্ষা করার দরকার নেই।

ঝুনু খালার বড় খালি খালি লাগে। তিনি এক দৌড়ে ঘর থেকে এক ঝুড়ি কাগজ নিয়ে আসেন, রাসুর লেখা চিঠি, নেপথলিনের গন্ধ অলা চিঠি, টিনের ট্রাংকে কাপড় চোপড়ের ভেতর চিঠিগুলো রেখে ছিলেন তিনি, সযতনে। আধখানা চাঁদ যখন ঘুমোচ্ছে আর খেঁজুর গাছে বাদুরের মত ঝুলছে অন্ধকার, ঝুনু খালা আগুন ধরান চিঠিগুলোয়।

— *চল গেঁতুর মা, আগুন তাপাই। শীত পড়তাছে।*

আগুনে পোড়া চিঠির ছাই উড়ে এসে ঝুনুখালার জটা চুলে পড়ে।

গেঁতুর মার মুখখানা লাল হতে থাকে আগুনে, আগুন দেখলে তার ইচ্ছে করে ভাত ফুটোতে, হাঁড়ির কাছে মুখ নিয়ে *বলক পাড়া* ভাতের গন্ধ শুঁকতে ইচ্ছে করে খুব। গেঁতুর মার মাথার ওপর অন্ধকারের বাদুরখানা ঝপ করে পড়ে।

— *এক বাত কাপড়ের লাইগা,* গেঁতুর মা বলে, *বেডাইনের লাত্থি গুতা খাইয়া পইড়া থাহি। আমগো পেডো ক্ষিদা, পেডো ক্ষিদা থাকলে মন পক্কীর লাহান উইড়া যায়। মন দেওয়া নেওয়া করি নাই কুনোদিন। হেইতা বড়লুকেরেই মানায়। মন নাই, আমগোর খালি জ্বলাউরা পেট আছে। যে ভাত দেয়, হেরেই ভাতার কই।*

ঝুনুখালার ভাল লাগে না গেঁতুর মা'র ক্ষিধের গপ্প শুনতে। তাঁর কদিন ধরে ক্ষিদেই পায় না। মুখে ভাতের লোকমা তুললেই বমি-মত লাগে। বুকের মধ্যে মনে হয় বিরান এক চর পড়েছে। রাসুর সঙ্গে গাছের তলায়ও তিনি জীবন কাটাতে পারতেন, রাসুর চোখের দিকে তাকালে ঝুনুখালা ক্ষিধে তৃষ্ণা সব ভুলে যেতেন, রাসুর সঙ্গে জলে ডুবে মরলেও তাঁর সুখ হত।

শেষ চিঠিটি, আধেক পুড়ে আগুন নিবে যায়। ঝুনু খালা আধপোড়া চিঠি হাতে নিয়ে বসে থাকেন অন্ধকারে। তাঁর খুব পড়তে ইচ্ছে করে চিঠিটি। এটি সম্ভবত সেই চিঠি, তিনি ভাবেন, যে চিঠিতে রাসু লিখেছিলেন ঝুনুখালাকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসেন।

ঢাকা চলে যাওয়ার আগে আগে ঝুনু খালা, আমি আর ঝুনুখালাই কেবল জানি, জুবলিঘাটের হলুদ একটি দোতলা বাড়ির সামনে, বাড়ির গায়ে ডাক বাংলো লেখা, রিক্সা থেকে নেমেছিলেন, পেছন পেছন আমি। ডাক বাংলোর বারো নম্বর ঘরে যখন টোকা দিচ্ছিলেন, ঝুনুখালার নাকের ডগায় দেখেছিলাম ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল এক টিংটিঙে, চিবুক অবদি লম্বা মোচঅলা, দেখতে *গেছো ভূত* এর মত, নানির বাড়ির দু'বাড়ি পেছনের বাড়ির লোক, দু'একদিন দেখেছি, জাফর ইকবাল নাম। ঝুনুখালাকে ঘরটিতে ঢুকিয়ে দুয়োর এঁটেছিল সে লোক, আর আমি দাঁড়িয়েছিলাম বারান্দায়, ব্রহ্মপুত্রের দিকে তাকিয়ে, আমার বিকেল পার হয় ব্রহ্মপুত্রের ঢেউ ভাঙা ঝিলমিল জল দেখতে দেখতে আর সে জলের ওপর দেখতে দেখতে ভাটিয়ালি গান গেয়ে গেয়ে মাঝিদের নৌকো বাওয়া। পশ্চিমের আকাশ লাল করে ডিমের কুসুমের মত সূর্য যখন ডুবছিল ব্রহ্মপুত্রের জলে, আমি সম্মোহিতের মত, ওখানেই, যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিলেন ঝুনুখালা, ছিলাম।

সূর্য ডুবল আর ঝুনু খালা দুয়োর আঁটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার গালে হাতের তেলোয় আদর করে বললেন — *শোন, কেউ যদি জিগায় কই গেছিলি, বলবি ঝুনুখালার এক বান্ধবীর বাসায়।*

বাংলো থেকে বেরিয়ে রিক্সায় উঠতে উঠতে ঝুনু খালা আবার বলেন — *যদি জিগায় কী নাম সেই বান্ধবীটার, বাড়ি কোন জায়গায়?*

ঝুনুখালার মুখের দিকে ভাবলেশহীন তাকিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করি। তিনি বলেন

— *কইবি ফাতেমা, থাকে হইতাছে কালিবাড়ি। না না কালিবাড়ি না, কইবি ব্রাহ্মপল্লী। ঠিক আছে?*

ঠিক আছে কি ঠিক নেই কিছুই ঝুনুখালাকে আমি বলি না। সম্ভবত তিনি বুঝে নেন, তিনি বলুন আর না বলুন আমার মুখের কপাট সহজে যেহেতু খোলে না, খুলবে না।

চার মাস পর আমাকে হোস্টেল থেকে বাড়ি নিয়ে আসেন মা। সে এক কান্ড বটে। যে মা'র সঙ্গে আমার দেখা করাই মানা ছিল, সেই মা'র হাতে সঁপে দেওয়া হল *নিষিদ্ধ গন্দম।* মা প্রায়ই হোস্টেল সুপারের সঙ্গে দেখা করে কাঁদতেন, বলতেন *ওর বাবা একটা বিয়ে করবে, তাই মেয়েকে হোস্টেলে পাঠায়ে দিছে। সবই হচ্ছে ষড়যন্ত্র। বাড়ি বিক্রি কইরা দিয়া নতুন বউ নিয়া সে আলাদা বাড়িতে থাকবে। এখন মেয়েকে আমার কাছে দিয়া দেন, দুই ছেলের কেউই কাছে নাই, মেয়ে বাড়িতে থাকবে, দেখি কী কইরা তার বাপ বাড়ি বিক্রি করে, কী কইরা বিয়ে করে আরেকটা।*

সুপারের মন মা'র কান্নায় গলল। মেয়ে দিয়ে দিলেন মায়ের কাছে।

চার মাস পর বাড়ি ফেরে মেয়ে।

ইয়াসমিনকেও ফেরত আনা হয়েছে মির্জাপুর থেকে।

দু'মেয়েকে দু'পাশে নিয়ে বসে থাকেন মা। সন্ত্রস্ত।

বাবা বাড়ি ঢুকে আমাদের দেখে ভূত দেখার মত চমকে ওঠেন। বাবার চোখ লাল হতে থাকে। চোয়াল শক্ত হতে থাকে। দাঁতে লাগতে থাকে দাঁত। ভয়ে মিইয়ে থাকি আমি, ইয়াসমিন মা'র পিঠের পেছনে লুকোতে চেষ্টা করে মুখ।

মেয়েদেরে ত, মা মিনমিন করে বলেন *জন্ম আমি দিছি। এদের উপর আমার অধিকার নাই নাকি!*

কথাটি মা ছুঁড়ে দেন বাতাসে, যার গায়ে লাগে লাগুক।

বাবা টুঁ শব্দ করলেন না। বাড়িতে খাবার পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। নানার দোকান থেকে ঠোঙা করে খাবার এনে আমাদের খেতে দেন আর শব্দ ছুঁড়তে থাকেন প্রতিদিন বাতাসে – *বিয়া করার খায়েশ হইছে। মেয়েদুইটারে দূর কইরা বিয়া করব। এই শয়তানি আমি বাঁইচা থাকতে হইতে দিব না। বেডা পুইল্যা খেতা লইয়া শহরে আইছিল, আমার বাপে বেডারে টেকা পইসা দিয়া বাচাইছে।*

মা হাঁটতে হাঁটতে শব্দ ছোঁড়েন বাতাসে। বাতাসে, দেখে তাই মনে হয়, আসলে ছোঁড়েন বাবার উদ্দেশে। সামনে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে নয়, বাবা যে ঘরে বসে আছেন, তার পাশের ঘর আর বারান্দা থেকে উঁচুস্বরে, এমন উঁচুস্বরে যেন কান খাড়া না করেই বাবা শুনতে পান।

ইস্কুলে যাওয়ার রিক্সা ভাড়া দেওয়াও বন্ধ করে দিলেন বাবা। বন্ধ রইল ইস্কুলে যাওয়া। মা বলেন *দেখি কয়দিন লেখাপড়ার খরচ না দিয়া পারে!*

মা'র বিশ্বাস এ ব্যাপারে অভিমান বা রাগ দেখিয়ে বেশিদিন থাকা সম্ভব নয় বাবার।

তিনদিন ইস্কুলে না যাওয়া লক্ষ করে বাবা শেষ পর্যন্ত নিজেই তাঁর নীরবতা ভাঙেন। ভোরবেলা ঠান্ডা পানিতে গোসল করে কাপড় চোপড় পরে তৈরি হয়ে আমাকে ডেকে গলা কেশে, যেন গলার তলে কফ জমে আছে, বলেন – *কি লেখাপড়া করার আর দরকার নাই!*

আমি চুপ।

লেখাপড়া করার আমার দরকার আছে কি নেই, তা বাবাই সিদ্ধান্ত নেন। আমার সিদ্ধান্তের কোনও প্রায়োজন হয় না।

যদি দরকার না থাকে, বাবা বলেন চোখ কড়িকাঠে রেখে, *তাইলে সোজাসুজি বইলা দেও। আমারও আর চিন্তা করার দরকার নাই। তুমার ভাইয়েরা ত বইলা দিছে আমারে। বইলা দিছে তারা লেখাপড়া করবে না। মাস মাস টাকা পাঠাই নোমানরে, ও কয় এইবার নাকি পরীক্ষা দিব না, দিব পরের বার। আর তুমার আরেক ভাই, তার জীবন ত শেষই। তুমরাও ওই পথে যাইতে চাইলে কও, তাইলে আর টাকা পয়সা খরচা কইরা তুমাদেরে ইস্কুলে পড়ানির কুনো মানে নাই।*

আমি উদাস দৃষ্টি ছুঁড়ে দিই উঠোনের বড় হয়ে যাওয়া ঘাসে, শ্যাওলা পড়া কলতলায়, পেয়ারা গাছের ডালে বসে থাকা একটি পাতিকাকের লেজে। বাবার সামনে মুখ খুলে আমার অভ্যেস নেই। যত নির্বাক হই, তত মঙ্গল। যত নিশ্চল হই, তত বাবা নিশ্চিন্ত হন। এরকমই নিয়ম যে, বাবা যা খুশি বলে যাবেন, মাথা নিচু করে, চোখ নামিয়ে তা নিঃশব্দে শুনে যেতে হবে। ইচ্ছে করলে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করবেন অথবা চড় কষাবেন গালে, মাথা পেতে সবই গ্রহণ করতে হবে আমাকে। বাবা এই যে বললেন ছোটদার পথে যেতে চাইলে আমি যেন তাকে বলি, তিনি আমাকে যেতে দেবেন। আসলে এ নেহাতই কথার কথা। যদি সত্যিই বলি আমি ছোটদার মত হতে চাই, ইস্কুলে টিস্কুলে আর যাব না, তিনি কিছুতেই তা হতে দেবেন না, বরং পিটিয়ে পিঠের চামড়া তুলবেন আমার।

– *ইস্কুলে যাস না ক্যান!* বাবা ড্রাম পেটানো স্বরে বলেন। হঠাৎ এমন বিকট আওয়াজে আমার আপাদমস্তক কেঁপে ওঠে। চোখ নামিয়ে আনি পাতিকাকের লেজ থেকে। প্রশ্নটির উত্তর আসলেই বাবা জানতে চাইছেন, গর্জে উঠে বোঝান। উত্তরটি তিনি জানেন, তবু তাঁর জানা উত্তরটিই তাঁকে আবার নতুন করে জানাতে হবে আমাকে। আমি যে জানি আমার অন্যায়ের জন্য দায়ি তিনি, আমি নই, তা জানাবার জন্য তাঁকে বলি, যতটা স্বর তাঁর সামনে ওঠানো সম্ভব – *রিক্সাভাড়া নাই।*

– *রিক্সাভাড়া নাই ক্যান? মায়ের অস্টকাডি হইছস! তর মায়ে মুখে তুইলা খাওয়াইতাছে। রিক্সাভাড়া যোগাড় করতে পারে না!*

দুটো টাকা বাবা ছুঁড়ে দেন আমার মুখের ওপর, টাকা দুটো মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে। পড়ুক, আমি ভাবি, এ ভাবেই পড়ে থাক। ভাবিই কেবল, আমার ভাবনা থেতো করে দিয়ে বাবা ফুঁসতে থাকেন আমার নির্লিপ্তির দিকে চেয়ে, ঠিকই উবু হয়ে টাকা দুটো তুলি। বাবাকে ছোটদার কাছেই কেবল একবার হেরে যেতে দেখেছি। তিনি এবার হেরেছেন কি না জানি না, তবে নিঃশব্দে নতি স্বীকার করলেন, মেনে নিলেন আমাদের প্রত্যাবর্তন, অবশ্য বুঝতে দিলেন না যে তিনি মেনে নিয়েছেন। তিনি আর চ্যাংদোলা করে আমাদের হোস্টেলে ফেরত পাঠান না। পাঠান না ঠিকই কিন্তু বাড়িটিকে অন্ধকার কারাগার বানিয়ে ফেলেন। রাস্তা দেখা যায় যে জানালাগুলোয় দাঁড়ালে, সেগুলো পাকাপাকি বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। গরুগাড়ি ভরে ইট বালু সিমেন্ট কিনে রাজমিস্ত্রি ডেকে বাড়ির চারদিক ঘিরে যে দেয়াল, তা দ্বিগুণ উঁচু করে তুলে দেন জেলের দেয়ালের মত, বাইরের সঙ্গে ভেতরের কোনও যোগাযোগ রইল না। ছাদে ওঠা নিষেধ। ছাদে উঠলে ঘাড় ধাক্কা

দিয়ে নামান ছাদ থেকে। ফের কখনও উঠলে *পায়ের ঠেংরি* ভেঙে ফেলবেন বলেন। যে ছাদ আমাদের বৃষ্টিতে ভিজে গান গেয়ে নাচার, মিছিমিছির রান্নাবাড়ির, রেলিংএ হেলান দিয়ে আউট বই পড়ার, দাঁড়িয়ে পাড়ার মানুষদের নাড়ি নক্ষত্র দেখার, চমৎকার জায়গা ছিল, সে ছাদ হয়ে উঠল নিষিদ্ধ। আমার চলাচলের সীমানা আকস্মিক হ্রাস পাচ্ছে, বুঝি, কেন, ঠিক বুঝি না। ছাদ থেকে বাইরের জগতখানা আমার অল্প অল্প করে চেনা হয়ে উঠছিল। মিঠে হাওয়ায় ছাদে হাঁটতে হাঁটতে শব্দ এসে ভিড় করত মাথায়, গুঁড়ি গুঁড়ি ঝিরি ঝিরি শব্দ। বৃষ্টির মত। আমি সেই শব্দ দিয়ে মনে মনে মালা গাঁথতাম।

ছাদ নিষিদ্ধ হওয়ার পর ছাদের নেশা আমাকে আরও পেয়ে বসে। বাবা বাড়ি থেকে বেরোলেই দৌড়ে ছাদে উঠি। কালো ফটকে বাবা আসার শব্দ হলে ঝড়ো বাতাসের মত নিচে নেমে নিষ্পাপ শিশুর মত মুখ করে বসে থাকি পড়ার টেবিলে। সীমানা যত ক্ষুদ্র হয় আমার, বাঁধ ভাঙার প্রবল স্পৃহা তত আমাকে উন্মত্ত করে। ভেতরে এবং বাইরে দুটো আদল আমি টের পেতে থাকি আমার। একটি উৎসুক, আরেকটি নিস্পৃহ।

বাবা কেন ওসব করতেন, মাস কয় গেলে বুঝেছি যে বাবার ভয় ছিল আমার না আবার কারও সঙ্গে প্রেম হয়ে যায় আর লেখাপড়া ছেড়ে কোনও বখাটের হাত ধরে আমিও বাড়ি থেকে পালাই। ইস্কুল এবং বাড়ির বাঁধা গন্ডির ভেতরে আমার জীবন আটকা পড়ে রইল। ওই আটকা পড়া জীবনে রতন এসে খুশির স্রোতে আমাকে ভাসিয়েছিল ক'দিন। রতন আসত টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা গ্রাম থেকে, দাদার ঘরে ঘুমোত, বিকেলে বসত চোর পুলিশ খেলতে আমাদের নিয়ে। চোর পুলিশ খেলাটি কাগজের খেলা। ছোট ছোট কাগজে চোর, পুলিশ, ডাকাত লিখে ভাঁজ করে ছুঁড়ে দিত, যে কোনও একটি তুলতে হত। পুলিশ লেখা কাগজ তুললে আমাকে অনুমান করে বলতে হত বাকি দুজনের কে চোর অথবা কে ডাকাত। ভুল হলে ঘর ফাটিয়ে বলত *ডাব্বা।* রতন ডাব্বাই বলত গোল্লা পাওয়াকে। রতন বাবার এক ডাক্তার বন্ধুর ছেলে, তার জন্য বাড়িটির দ্বার বরাবরই অবারিত ছিল, থাকারই কথা, বাবা যখন অর্থকষ্টে ছিলেন, ছিলেন একসময়, আমার জন্মের আগে কখনও, ডাক্তার বন্ধুটি তাঁকে দু'হাত খুলে টাকা দিয়ে বাঁচিয়েছিলেন। আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড় হবে রতন। মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি নিয়ে চুল উড়িয়ে শার্ট উড়িয়ে সে দৌড়োত সারা বাড়ি, সে ছিল ঘরের লোকের মত অথবা না হলেও অন্তত ভাব করত। বাড়ি এসেই গামছা হাতে নিয়ে চলে যেত গোসলখানায়, গোসল সেরে ফর্সা চেহারাকে দ্বিগুণ ফর্সা বানিয়ে কায়দা করে চুল আঁচড়ে *কী খালা কি রানছেন, খেতে দেন* বলে রান্নাঘরে ঢুকে যেত। মা আবার রতনের মা বুলবুলকে বড় ভালবাসতেন, রতনকে খেতে বসিয়ে *বুলবুল কি এখনও আগের মত দেখতে!* জিজ্ঞেস করেন মা, প্রতিবারই করেন, রতন যখনই আসে। বুলবুল দেখতে অসম্ভব সুন্দরী ছিলেন, মা বলেন। মা'কে কারও সৌন্দর্য নিয়ে এত উচ্ছ্বসিত হতে আর দেখিনি। সেই রতন আমাদের নিয়ে চোর পুলিশ খেলে, লুডু খেলে, তাসের যাদু দেখিয়ে দেখিয়ে আমার ছাদে না উঠতে পারার কষ্টকে খানিকটা কমিয়েছিল। কিন্তু সেবার যাওয়ার দিন একটি ভাঁজ করা কাগজ টেবিলে রেখে মাথায় বরাবরের মত চাটি মেরে বলল — *ভাল থাকিস। গেলাম।*

রতন তো আর হাঁটে না, তার দুর্বার গতি তাকে উড়িয়ে নেয়। রতন হাওয়া হয়ে গেলে ভাঁজ করা কাগজটি খুলে দেখি *চিঠি।* লিখেছে, সে আমাকে ভীষণ ভালবাসে। লিখেছে

আমি যদি তাকে না ভালবাসি তবে তার জীবন একেবারেই বৃথা। এবার ৮০, Bদায় লিখে চিঠি শেষ করেছে। পড়ে আমার বুক দুরুদুরু কাঁপতে লাগল। জিভ গলা শুকিয়ে গেল ভয়ে। ভাঁজ করে হাতের মুঠোয় নিয়ে, হাতের ঘামে ভিজে যাওয়া কাগজ গোসলখানায় গিয়ে আবার খুলি। ভালবাসি শব্দটির দিকে হাভাতের মত তাকিয়ে থাকি। চিঠিটি আমাকে লেখা, ভাবলে গা শিউরে ওঠে। চিঠিটি যখন রতন দিয়েছে, কেউ কি দেখেছে আড়াল থেকে! কেউ দেখলে সব্বনাশ। চিঠিটি কারও হাতে কখনও পড়লে সব্বনাশ। আমার পায়ে পায়ে সব্বনাশ হাঁটে। আমার শ্বাসে শ্বাসে সব্বনাশ। চিঠিটি ছিঁড়ে ফেললে দুর্ভাবনা দূর হবে, কিন্তু ছিঁড়তে আমার ইচ্ছে করে না। থাকুক এটি। থাকুক ইতিহাস বইয়ের ভেতর, বালিশের তলায়, খুব গোপন জায়গায় চিঠিটি বেঁচে থাকুক। দোমড়ানো কাগজটিকে আগলে রাখি ঠিকই কিন্তু রতনের জন্য আমার কোনও ভালবাসা জন্মায় না, জন্মায় কেবল চিঠিটির জন্য।

চিঠিটি বাবা আবিষ্কার করেন অল্প কিছুদিন পরই। তিনি, আমি যখন ইস্কুলে, বাড়িতে আমার বইপত্র ঘেঁটে দেখেছেন লেখাপড়া কি রকম করছি আমি, বইয়ের কত পৃষ্ঠা অবদি পড়ার দাগ আছে, খাতায় কতদূর কি লেখা হয়েছে, অঙ্ক কষার নমুনাই বা কেমন, এসব। ঘাঁটতে গিয়ে চিঠিটি হাতে পড়ে তাঁর। আমাকে তিনি ভাল মন্দ কিছু বলেননি। কেবল টাঙ্গাইলে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর ডাক্তার বন্ধুকে, রতন যেন কোনওদিন তাঁর বাড়ির ধারেকাছে না আসে।

রতন না এলে আমার বয়েই গেল। মনে মনে বলি।

বাবার বন্ধুটি অপমানিত হয়েছেন বলে বন্ধুটির জন্য, যাঁকে কোনওদিন চোখে দেখিনি, মায়া হতে লাগল। নিজেকেও দেখলাম কুণ্ঠিত হতে, যেন সকল অপরাধ আমার। যেন রতন যে আমাকে চিঠি লিখেছে এর সব দায়ভার আমার। সব পাপ আমার।

আমাকে আগলে রাখার নানা গভীর গোপন ষড়যন্ত্রে বাবা যখন ব্যস্ত, তখনই একদিন বাবা চোখে মুখে বিষম উৎকণ্ঠা নিয়ে বলেন — *জিনিসপত্রের দাম বাইড়া গেছে, এখন থেইকা একবেলা ভাত, রাত্রে রুটি খাইতে হবে সবার।*

রুটি? ভাতের বদলে? বাবা এ আবার নতুন কি তামাশা শুরু করলেন!

মা গলায় ঝাঁজ মিশিয়ে বলেন — *বিয়া করছে বুধয়, বউ খাওয়ানি লাগতাছে। এইদিকে শাতাইয়া ওই দিকে খাওয়াইব।*

মা মনে হয় ভুল বোঝেন। রাস্তায় শুয়ে শুয়ে ভিখিরিদের হাঁটতে দেখে রিক্সাঅলাদের বলতে শুনি *শহরে বানের পানির লাহান মানুষ আসতাছে গেরাম উজাড় কইরা, ফসল নাই, খাওন নাই।* রিক্সার ভেতরে বসে অবাক তাকিয়ে থাকি উন্মূল উদ্বাস্তুদের দিকে। হাতে বাসন ওদের। শুকনো বাসন। দৌড়োচ্ছে গাঙিনার পাড় থেকে নতুন বাজারের দিকে। ভিখিরিদের চোখ বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে, বুকের হাড়গুলো যেন চামড়া ফুঁড়ে বেরোবে, পেট মিশে যাচ্ছে পিঠে, যেন কঙ্কালের কাফেলা যাচ্ছে, কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়ে কেউ ধুঁকছে নর্দমার সামনে, কেউ *ভাত ভাত* বলে চেঁচাচ্ছে বড় বড় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। আমাদের কালো ফটকের সামনে দাঁড়িয়েও ওরা একমুঠো ভাত চায়। পান্তা হোক, পচা হোক, একমুঠো ভাত।

দেখে, ইস্কুল ফেরা ভরপেট আমি দৌড়ে যাই ভিক্ষে আনতে, দু'মুঠ করে চালই তো। দেখি চালের ড্রামে তালা ঝুলছে। *বাবর তালা।* বড় শক্ত তালা।

মা ভাত দেও, ভিক্ষা চাইতাছে মানুষ, ওরা মনে হয় অনেকদিন খায় না। প্রচন্ড উৎকণ্ঠায় আমি নামাজে ডুবে থাকা মা'কে বলি।

মা মোনাজাত শেষ করে সালাম ফিরিয়ে হাতে চুমু খেয়ে জায়নামাজ গুটিয়ে শুকনো মুখে বলেন, *ভাত নাই।*

ভিখিরিদের মা কখনও ফেরাননি আগে। দু'মুঠো করে চাল দেওয়ার নিয়ম বরাবরই এ বাড়িতে ছিল। বাড়তি ভাত ফেলে দেওয়া হয় পাতিল পাতিল, গরমে ভাত পচে যায় বলে এক রাতেই। মাঝে মাঝে ভিখিরিদের পান্তা খাওয়ানো হত। এখন পান্তাও নেই।

দুপুরে থালার ভাত শেষ করে আঙুল চুষতে চুষতে বলেছিলাম – *মা আরেকটু ভাত দেও।*

যে আমাকে জোর করে ভাত খাওয়ানো হত, খেতে অরুচি হত, গল্প বলে বলে, থালের কিনারে মাছ মাখা ভাত নলা বানিয়ে মালার মত রেখে মা বলতেন, *এইটা হইল বাঘ, এইটা সিংহ, এইটা হাতি, এইটা ভালুক — এইতো ভালুক টারে গিলে ফেল দেখি মা আমার, ওয়াও। ভালুক ভয় পাচ্ছে তোমাকে দেকে। এইবার হাতিটাকে খাও।* গল্পের মজায় খেতাম। মা'র কত রকম কায়দা ছিল আমাকে খাওয়ানোর। মন দিয়ে পড়ছি হঠাৎ *হা কর ত হা কর খুব মজার জিনিস* বলে মুখে ঢকিয়ে দিতেন খাবার। পড়তে পড়তে হঠাৎ খেয়াল হলে যে আমাকে খাওয়াচ্ছেন অমনি *আর না, সর সর,* বলে মা'কে সরিয়ে দিয়েছি। মা আমাকে খাওয়াবেনই। আম, আনারস, তরমুজ কেটে থালে কাটা চামচ দিয়ে রেখে যান টেবিলে, যেন পড়তে পড়তে খাই। ভাত পাতে রেখে উঠে যাওয়া ছিল আমার চিরকালের স্বভাব। সেই আমি আঙুল চেটে ভাত খেয়ে বসে থাকি ১৯৭৪এ, মা বলেন – *ভাত নাই আর।*

আমরা কি গরিব হয়ে গেলাম হঠাৎ?

ভাত চাইলে ভাত দেওয়া হয় না, এ এক আজব ঘটনা, অন্তত এ বাড়িতে। ভিখিরিদের ভিক্ষে দেওয়া হয় না, এ ই বা কেন!

বাবা রুটি খান দু'বেলা। মাও। কাজের লোকের জন্যও রুটি। ভাত ফোটে কেবল দু'মেয়ের জন্য। ড্রামের চাল ফুরোচ্ছে।

বাবা কপালের দু'পাশের শিরা চেপে বলেন – *দেশে দুর্ভিক্ষ।*

রাস্তায় ভিক্ষুক বাড়তেই থাকে। ঘরে ঘরে গিয়ে ভাতের বদলে ফ্যান চায়।

একদিন আস্ত একটি জীবন্ত কঙ্কাল এসে দাঁড়াল দরজায়। বয়স বড়জোর সাত কী আট হবে ছেলেটির, দেখে আমি চোখ সরিয়ে নিয়েছিলাম। ছেলেটি কিছু চাইতে পারল না, ফ্যান কিংবা কিছু। গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরোচ্ছিল না ওর। আমি মা'কে ডেকে শিগরি কিছু খাবার দিতে বলি, যা হোক কিছু, আমার ভাগেরটুকু, আমি না হয় না খাব।

মা ছেলেটিকে ভাত খেতে দিলেন। হাড়ের হাতখানা তুলে ছেলেটি মুখে পুরছিল ভাত। আমরা, না খেতে পেয়ে প্রায় মরতে বসা ছেলেটির গিলতে কষ্ট হচ্ছিল ভাত, দেখছিলাম। অভাব দেখেছি মানুষের, কিন্তু ভাতের অভাবে কাউকে কঙ্কাল হতে দেখিনি। মনে হচ্ছিল

কিছু না খেতে খেতে ওর গলার ছিদ্র বুঝি বুজে এসেছে। এত ভাত তরকারি ফেলে দেওয়া হয়, বেড়াল কুকুর খায়, কাকের দল খায়। আর মানুষ মরছে না খেতে পেয়ে!

মা রাতে রুটি চিবোতে চিবোতে বললেন — *আমি ছুটু থাকতে একবার দুর্ভিক্ষ হইছিল, উড়োজাহাজ থেইকা ছাতু ফেলত, দৌড়াইয়া গিয়া ছাতু টুকাইয়া আইনা খাইতাম। ভাত পাই নাই।*

বাবাও তাঁর খোলস থেকে বেরিয়ে এসে বলেন — *ভাত খাইবা কি কইরা। চাল ছিল না ত। মানষের হাতে টাকা ছিল, কিন্তু বাজারে চাল নাই। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে না খাইতে পাইয়া। কলিকাতার রাস্তায় শুনছি লাশের উপর লাশ। কলাগাছের ভিতরে যে শাদা অংশটা থাকে, ওইটা খাইয়া বাইচা থাকছি। আমাদের গেরামের কত লোক নিজের মেয়েরে বেইচা দিছে, জামাই বউরে বেইচা দিছে, কেবল দুইটা ভাতের জন্য।*

— *কি জানি, এই দুর্ভিক্ষও পঞ্চাশের সেই মন্বন্তরের মত হয় কি না।* বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

ঘরের চাল শেষ হয়ে গেলে কী হবে! আর কি আমরা ভাত পাব না! না খেয়ে খেয়ে ইসরাইলের মত কঙ্কাল হতে হবে আমাদের! ভেবে পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে যায় আমার। এরকম হয়েছিল আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য দজ্জাল পাঠাচ্ছেন বলে যখন খবর ছড়াল পীর বাড়ির লোকেরা। ভয়ংকর দেখতে দজ্জাল বিশাল রামদা দিয়ে তাদের, যাদের বিশ্বাস নেই আল্লাহর ওপর, গলা কাটবে। চোখ বুজলেই তখন চোখের সামনে ভাসত দজ্জাল তার কুৎসিত দাঁত মেলে পাহাড়ের মত উলঙ্গ শরীরখানা নিয়ে দাঁড়িয়ে রামদায়ের পোচ দিচ্ছে গলায়, গা কেটে পাঁচ টুকরো করছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে বাড়ির উঠোন, আমি চিৎকার করছি *বাবা গো মা গো* বলে। আমি মরে যাচ্ছি আর হো হো করে হাসছে দজ্জাল। আমি তখন চোখ বুজে সমস্ত শক্তি খাটিয়ে শরীর খিঁচিয়ে ঈমান আনতে চাইতাম। ঈমান, মা বলেছেন, *আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়, মুহম্মদ আল্লাহর রসুল,* এ কথাটি কেবল বিশ্বাস করা। আমি ঈমান আনতে বাক্যটি বার বার আওড়াতাম। *বিশ্বাস* ব্যাপারটি তখন আমার কাছে খানিকটা রহস্যময়। মা যা বলেন তাই আমাকে বিশ্বাস করতে হয়। না দেখেও। না বুঝেও। জিন ভূত বিশ্বাস করার মত। অথবা *ফটিং টিং,* পায়ে কথা বলছে, তিনটে মাথা কাটা, যা আমি কখনও দেখিনি, কেবল শুনেছি, বিশ্বাস করা। ফটিং টিংএর ওপর ঈমান আনতে বললে আমাকে জপতে হত *ফটিং টিং ফটিং টিং ফটিং টিং,* যদি ফটিং টিংএর দজ্জাল পাঠিয়ে মানুষের গলা কাটার ক্ষমতা থাকত। মা বলেছিলেন *যা তর নানির ঘরে শুইতে যা। তর মামারা তরে কত আদর করে।* শরাফ মামা জোর করে আমাকে ন্যাংটো করেছিল, ব্যাপারটিকে *আদর* বলে আমার বিশ্বাস হয় নি। মা যা বলেন তা আমাকে বিশ্বাস করতে হয় বলেই সম্ভবত করা, *আল্লাহ রসুল, জিন ভূত।* আমাকে যদি অধিকার দেওয়া হত বিশ্বাসের, আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না যা আমাকে বিশ্বাস করতে বলা হচ্ছে তা করতাম। ইস্কুলে বিশ্বাস করতে বলা হচ্ছে বাতাসে গ্যাস আছে। আমাকে করতে হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় চোখে না দেখা জিনিসগুলো আসলে আমি চাপে পড়ে বিশ্বাস করছি। কেউ যদি ধমকে বলে একখানা ঘোড়া দেখ উড়ছে আকাশে। আমি সম্ভবত তাই দেখব। দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল দেখছি নিজের আসন্ন শরীরে।

মা বলেন – *এই যে তগোরে কত কই ভাত ফালাইছ না। ভাতের একটা দানা মাটিত ফেললে আল্লাহ বেজার হন। ভাতের দাম কি এহন দেখলা! ভাত না পাইয়া মানুষ মরতাছে।*

সোফার হাতলে কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে বসে থাকেন মা ––*না জানি আমার ছেলে দুইটা উপাস করতাছে।*

– *নোমানরে নিয়মিত টাকা পাঠাইতাছি, চিন্তা কইর না।* বাবা সান্ত্বনা দেন।

মা আসলে ভাবেন ছোটদার কথা। ছোটদাকে তো কেউ টাকা পাঠায় না। ছোটদা কোথায় আছেন, কেমন আছেন কেউ আমরা জানি না। মা তাঁর হারানো ছেলের জন্য ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। বাবা *অনেক রাত হইছে, যাও যাও ঘুমাইতে যাও* বাক্যটি ছুঁড়ে দিয়ে নিজে শোবার ঘরে চলে যান।

রাত পোহালেই ভিড় কালো ফটকে। মা ভাতের ফ্যান জমিয়ে রেখে ওদের বিলোন। বিকেলে ইসরাইল এসে দাঁড়ায় দরজায়, তাকে ভাত দেওয়া হয় খেতে।

মিছিল যায় *অন্ন চাই বস্ত্র চাই বাঁচার মত বাঁচার মত বাঁচতে চাই* বলে।

কমুনিস্ট পার্টির মিছিল গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ঢুকে লাল কাপড় মেলে ধরছে

– *চাল দেন, গরিবরা মরছে। ওদের বাঁচান।*

মিছিল আমাদের বাড়িতেও ঢোকে। মিছিলের লোকের মাথায় লাল কাপড় বাঁধা। আমাকে মিছিলের একজন বলে – *যাও বাড়ির বড় কাউকে ডাক দাও। চাল দিতে বল।* রোমকূপ দাঁড়িয়ে যায় আমার। আমি দৌড়ে গিয়ে মা'কে বলি – *মা চাল দেও। লোক আইছে। চাল দিতেই হইব।*

মা রুখে ওঠেন।– *চাল চাইলেই চাল দিতে হইব নাকি! তরা খাইবি কি!*

– *অনেক লোকে চাল দিছে, কাপড়ের মধ্যে অনেক চাল, দেইখা যাও। তুমারে ডাকতাছে।* হাত ধরে টানি মা'র।

মা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের বলেন – *কি চান?*

যুবকের দল থেকে একজন এগিয়ে এসে বলে – *চাল চাই মা চাল চাই। মানুষ মারা যাচ্ছে না খাইতে পাইয়া। তাই আমরা ছাত্ররা, চাল নিতাছি বাড়ি বাড়ি ঘুইরা, এইসব গরিবদের দেওয়া হবে খাইতে। চাল দেন। যেটুকু পারেন, সেটুকুই দেন।*

বাকি যুবকেরা সমস্বরে বলে ওঠে – *কেউ খাবে তো কেউ খাবে না, তা হবে না।*

উত্তেজনায় আমি কাঁপছি তখন। মা'কে খোঁচা দিয়ে বলি – *চাল দেও মা, তালা ভাইঙা চাল বার কর।*

– *তর বাবা মাইরা ফেলবে।* মা গলা চেপে বলেন।

– *মারুক মা, মারুক। তবু চাল দেও। চল তালা ভাঙি।* আমি বেপরোয়া।

এত লোক মাঠে জমা হয়েছে দেখে মা খানিকটা ঘাবড়ে যান। বলেন –*তর বাবারে একটা খবর দেওয়া গেলে ভাল অইত। এদেরে এহন আমি সামলাই কেমনে।*

কালো ফটক হাঁ করে খোলা। পাড়ার ছেলেরা ভিড় করেছে দেখতে ফটকের বাইরে। মা ইতস্তত করেন কোনও কিছুর উদ্যোগ নিতে। উত্তেজিত আমি উঠোন থেকে আধখানা

ইট এনে ড্রামে লাগানো তালার ওপর ধরাম করে মারি। তিন ধরাম, চার ধরাম। তালা ভাঙে। *বাবর তালা। বড় শক্ত তালা।*

অর্ধেক ড্রাম অবদি চাল। গামছা ভরে চাল তুলে দৌড়ে যাই মাঠে। মা হতবাক দাঁড়িয়ে আমার কান্ড দেখেন।

চাল নিয়ে গান গাইতে গাইতে ছেলের দল চলে যায়। মুগ্ধ চোখে মিছিলের দিকে তাকিয়ে থেকে অনুভব করি অসম্ভব এক অমল আনন্দ। ভেতর থেকে মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে থাকে এক উদ্ধত আমি, অনড় অটল আমি। বিষম সাহসী আমি। স্বপ্নবান আমি। এই আমাকে, আমি নিজেই আপাদমস্তক দেখি আর বিস্মিত হই। এ কি সত্যিকার আমি, নাকি হঠাৎ বিকেলে যুবকের দল দেখে বিহুল হওয়া উঠতি উৎসুক কিশোরী মাত্র!

মা ফ্যাকাসে মুখে খোলা ফটকের সিটকিনি বন্ধ করে আসেন ভেতর থেকে ।

তর বাবা, মা বলেন, *তরে আইজকা আর আস্ত রাখত না।*

আমি হেসে বলি — *বাবার মাইর ত প্রত্যেকদিনই প্রায় খাইতে হয়। এইটা কি নতুন কিছু!*

মা বলেছিলেন কমুনিস্টরা খারাপ। ওরা খারাপ হলে গরিবদের জন্য ওরা চাল যোগাড় করছে কেন! এ তো অন্যায় নয় গরিবকে মরণ থেকে বাঁচানো। ওরা আল্লাহ মানে না, কিন্তু ওরা তো কোনও পাপ করছে না বরং পীড়িত মানুষের ওরা শুশ্রুষা করছে। ইসরাইলের মত কত মানুষ যারা রাস্তায় ধুঁকছে ক্ষিধেয়, তাদের মুখে খাবার দিতে চাইছে। আমার ইচ্ছে করে ওদের দলে ভিড়ে আমিও গান গেয়ে চাল যোগাড় করি। আমার ইচ্ছে করে নিজে না খেয়ে থাকি, যতদিন না দূর্ভিক্ষ দূর হচ্ছে। কিন্তু আমার ইচ্ছেয় কিছু হবার নয়। চাইলেই সীমানা ডিঙোতে পারি না। আমাকে আপাতত অপেক্ষা করতে হয় বাবার চাবুক খাবার। ছোটদার জন্য কেনা চাবুকটি বাবার বিছানার তোষকের তলে এখনও রাখা।

বাবা বাড়ি ফিরে চালের ড্রামে চোখ ফেলেন, যা ফেলবেনই বলে আমার অনুমান ছিল। ভাঙা তালাটি ঝুলে থাকে ড্রামের গায়ে, বাবা যা হাতে নেবেন বলে অনুমান ছিল আমার। অনুমান ছিল ক্রুদ্ধ বাঘের মত বাবা সারা বাড়ি গর্জাবেন। বাবা তাই করেন। আমি শ্বাস বন্ধ করে বসে থাকি ঘরে। আশংকা করি বাবা তোষকের তল থেকে চাবুক খানা নিচ্ছেন হাতে, যেটি এক্ষুণি আমাকে রক্তাক্ত করবে। পিঠে অনুভব করতে থাকি যন্ত্রণা। ধনুকের মত বাঁকতে থাকে পিঠ। শিড়দাঁড়ায় তীব্র বাথা, যে ব্যথা আমার অচিরে হবে, তা আমি আগেই অনুভব করতে থাকি। বাবার হুংকারে বাড়ি কাঁপে। হিম হয়ে থাকে শরীর। কোটরে কোনও চোখ নয়, দুটো পাথর কেবল, সামনে এক ঘর অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই। পালকের মত উড়ে যাচ্ছি কোথাও আমি, কোথায়, জানি না। রাজবাড়ি ইস্কুলের আঙিনায় মীরাবাঈএর শাদা মূর্তির মত নগ্ন হয়ে যাচ্ছি। আমি নিজেই নিজেকে নগ্ন করছি। আমার কোনও আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, একা আমি। এই জগত সংসার আমার জন্য নয়। আমি *নির্বাণ* লাভ করছি।

মুহূর্তে নিথর হয়ে যায় সারা বাড়ি, যেন এ বাড়িতে কখনও কেউ ছিল না, থাকে না। যে যার গুহায় গিয়ে সম্ভবত লুকিয়েছে হুংকার শুনে। আমি অপেক্ষা করতে থাকি আমার ডাক পড়ার পুলসেরাতের পুল পার হতে, কতখানি পাপ আমি করেছি তা প্রমাণ হবে

আজ। আমার বিশ্বাস হতে থাকে আমি পাপ করিনি। এই প্রথম একটি *বিশ্বাস* আমি নিজে নির্মাণ করি। নিজের ওপর *ঈমান* আনতে থাকি ধনুকের মত বাঁকানো শরীরকে সিধে শক্ত করতে করতে। আওড়াতে থাকি যা বলব, *বইয়ে লেখা ক্ষুধার্তদের খাবার দাও। তাই যখন লোকেরা আইসা চাল চাইল, আমি দিলাম।*

মা, আমি স্পষ্ট শুনি, বলছেন – *চিল্লাও কেন, আস্তে কথা কইলেই ত হয়। ড্রামের তালা আমি ভাঙছি। মেয়েরা ক্ষিদায় কানতেছিল, তাই।*

– *ক্ষিদায় কানব ক্যান। দুপুরে ভাত রান্ধো নাই! খায় নাই!* বাবা বলেন।

মা রান্নাঘরের বারান্দা থেকে সরু গলায় বলেন – *ওই ভাতে ওদের হয় নাই। মাইপা চাল দিয়া গেছ দুই মেয়ের লাইগা খালি, আমার ভাত খাইতে ইচ্ছা হইছিল, খালি রুটি খাইয়া মানুষ পারে! তাই আমি খাইয়া নিছিলাম ওদের ভাগের থেইকা।*

– *কত বড় সাহস তুমার তালা ভাঙছ। আমারে খবর দিলা না ক্যা!*

বাবার গলার স্বর তখনও নামেনি।

–*কেমনে দিয়াম! বাড়িত কেউ আছে যে খবর পাঠানি যাইব!*

মা কণ্ঠে খানিকটা রাগ মিশিয়ে বলেন।

বাবার গর্জন থামে। আচমকা থামে।

নিথর বাড়িখানা যেন আড়মোড়া ভেঙে জাগে এখন। বেরিয়ে আসতে থাকে গুহাবাসিরা, আলোয়। থাল বাসনের শব্দ হয় রান্নাঘরে। মা'র পায়ের শব্দ বারান্দায়।

থপথপ। থপথপ।

বাবা চলে গেলে বাইরে, মা বেল গাছের তল ধরে হেঁটে কালো ফটকের দিকে হাঁটেন। বোরখার তলে মা'র ফুলে ওঠা পেট।

এরকম প্রায়ই হচ্ছে। বোরখার নিচে ফুলে ওঠা পেট আর বেল গাছের তলে মা'র হাওয়া হয়ে যাওয়া। মা'র পেছনে ছায়ার মত হেঁটে দেখি মা কালো ফটক নিঃশব্দে খুলে রিক্সা চড়ে মোড় নিচ্ছেন বাঁয়ে। পীর বাড়ির রাস্তা ডানে, নানিবাড়িও ডানে। তবে বাঁয়ে আবার কোন বাড়ি!

–*মা কই যাও তুমি! রিক্সা তুমারে নিয়া বাম দিকে যায়। বাম দিকে আবার কার বাড়ি!* মা বাড়ি ফিরলে চোখ সরু করে বলি।

মা ঠোঁটে বিরক্তির কাঁপন তুলে বলেন –*নিজের কাম কর। এত কথা কইস না।*

মা'র এই স্বভাব, প্রশ্ন পছন্দ না হলে রাগ করেন, সে যেমন তেমন রাগ নয়। একবার আমার গালে এমন ওজনদার চড় মেরেছিলেন *পীরের বাড়িত সেইদিন পুটলা ভইরা কি দিয়া আইছ?* জিজ্ঞেস করেছিলাম বলে, যে, মাথা ঘুরে আমি থুবড়ে পড়েছি জানালার লোহায়।

বাড়ির বাঁ রাস্তা ধরে কোন বাড়িতে যান মা তা সেদিন আমাকে বলেননি। ক'টা দিন গেলেই কিন্তু জিজ্ঞেস করেন, *যাইবি দেখতে আমি কই যাই!*

আমি লাফিয়ে উঠে বলি– *হ।*

মা আমাকে নিয়ে হেঁটে রওনা হন দেখাতে। হাঁটতে হাঁটতে গোলপুকুর পার পেরিয়ে মৃত্যুঞ্জয় ইস্কুলের সামনে এক গলি, সেই গলিতে এক বস্তি, সেই বস্তির এক *ছ'ফুট বাই*

ছ'ফুট বেড়ার ঘর, ঢুকি দেখি বসে আছে ছোটদা আর গীতা মিত্র। মা বোরখার তল থেকে ক'টি কৌটো বার করলেন। বড় কৌটোটিতে চাল।

আমি থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি দৃশ্য দেখে।

—*খবরদার এই কথা কুনো কাক পক্ষীও যেন না জানে।* মা চোখ রাঙিয়ে বলেন।

ঢোঁক গিলে বলি— *আমি কাউরে কইতাম না।*

—*আফরোজা, রান্ধো। ঘরে ডাইল আছে ত, না!* মা কৌটোগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলেন।

—*আফরোজা কার নাম!* জিজ্ঞেস করি।

—*ও মুসলমান হইছে ত। নাম আফরোজা।* মা বেশ উচ্ছ্বসিত গলায় বলেন।

ছোট্ট চৌকিতে আফরোজা বসে ছিল মাথায় ঘোমটা পরে। ছোটদা শুকনো মুখে তার পাশে। ঘরে ওই চৌকিটি ছাড়া আছে মাটির মেঝেতে একটি মাটির চুলো আর দু'তিনটে বাসন কোসন।

কোথায় সেই টেরি কাটা, শিস বাজানো বেলবটম যুবক! মুখ-শুকনো ছোটদাকে দেখে বিষম মায়া হয় আমার! এক জীর্ণ কুড়েঘরে দিন কাটাচ্ছেন! নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়, যে, তাঁকে যখন নির্যাতন সইতে হয়েছিল, হাত পা গুটিয়ে কেঁচোর মত বসেছিলাম। মুখখানাও সেলাই করে। আজকাল শেকলে বেঁধে মানুষ মানুষকে মারে! এক বাবাই পারেন এসব। ছোটদার জন্য কেউই কিছু করতে পারিনি কেবল আড়ালে চোখের জল ফেলা ছাড়া!

—*ছোটদা, তুমার অনেকগুলা চিঠি আইছে।*

চুলোয় আগুন ধরাতে ধরাতে ছোটদা বলেন —*হুম।*

— *কটন দা দেখি সেইদিন বাসার সামনে দিয়া যাইতাছে। জিগাস করল কামাল কই। আমি কিছু কই নাই।* গলার স্বর খানিকটা বাড়িয়ে এবার।

কোনও কথা না বলে ছোটদা চুলোয় পাতিল বসান। পাতিলে পানি ফোটে। অনভ্যস্ত হাতে চুলোয় খড়ি ঠেলেন তিনি। এরকম দৃশ্য সম্পূর্ণ নতুন আমার কাছে। ছোটদার, লক্ষ করি, কোনও আগ্রহ নেই গিটারের মাস্টার কটনদা বা তাঁর কাছে আসা চিঠিপত্তরের জন্য। তিনি, আমার ধারণা হয়, বদলে গেছেন এ ক'মাসে অনেক। মা'র কৌটোগুলো খুলে খুলে ঝুঁকে দেখছেন কী ওতে, চাল তেল, মশলা, রান্না করা মুরগির মাংস, দেখে দু'ঠোঁট চেপে আনন্দ আড়াল করে চুলোয় খড়ি ঠেলেন যেন খড়ি ঠেলার চেয়ে জরুরি কোনও কাজ জগতে আপাতত নেই। সম্ভবত খুব ক্ষিধে পেয়েছে ছোটদার। আগেও তো তাঁর ক্ষিধে পেত, তবু খাওয়ায় বড় অনিয়ম করতেন। সারা শহরে গুলতানি মেরে এসে বাড়া ভাত টেবিলে ফেলে আড্ডা পেটাতেন।

আমি অপলক তাকিয়ে থাকি ছোটদার লাজুক চোখের দিকে। কতদিন পর ছোটদাকে দেখছি। ভালবাসার জন্য অষ্টম এডওয়ার্ড সিংহাসন ছেড়েছিলেন, ছোটদা অনেকটা তাই, পুরু গদি স্বেচ্ছায় ছেড়ে ধুলোয় বিছানা পেতেছেন। ওঁদের ভালবাসার কুটিরখানাও, আমার বিশ্বাস জন্মে, ঐশ্বর্যে ঠাসা। জাগতিক কোনও বিষয়াদিতে না হোক, অন্য কিছুতে। সে অন্য কিছুর ঠিক ব্যাখ্যা হয় না, অনুভব করতে হয় কেবল। বিষয় বাসনা বিসর্জন দিতে যে কেউ পারে না। খুব কম লোকের পক্ষে সম্ভব বৈরাগ্য বরণ করা। ছোটদা ডলি

পালকে চিঠি লিখেছিলেন তিনি নাকি ওকে নিয়ে গাছের তলে জীবন কাটাতে পারবেন। একই কথা গীতা মিত্রকেও লিখেছিলেন বত্রিশ পৃষ্ঠার এক চিঠিতে। কুড়েঘরে জীবন কাটানো অনেকটা গাছের তলায় জীবন কাটানোর মতই। ছোটদা পারেনও ঝুঁকি নিতে! বিত্ত বৈভব তোয়াক্কা করেন না। সব বাঁধন ছুটে এখন মুক্ত এক মানুষ তিনি, কেউ তাঁকে এখন শাসন বা শোষণ কিছুই করছে না, বলে দিচ্ছে না কখন ঘরে ফিরতে হবে, কখন পড়তে বসতে হবে, কিছু। আমারও মুক্তি পেতে ইচ্ছে করে শেকল ভেঙে। অদৃশ্য এক শেকল অনুভব করি আমার সারা গায়ে। ছোটদাকে বাঁধা শেকলটির মত শেকল।

মা'র সঙ্গে গোপন যোগাযোগটি হওয়ার পর ছোটদা, দুপুরে বাবা যখন হাসপাতালে থাকেন, চুপচুপ করে বাড়িতে আসেন, পেছনে গীতা মিত্র ঘোমটা মাথায় পা টিপে টিপে। মা তাঁদের ঘরে ঢুকিয়ে, দরজার খিল এঁটে যেন কাক পক্ষি না দেখে, খেতে দেন, যাওয়ার সময় থলে ভরে চাল ডাল তেল নুন দিয়ে দেন সঙ্গে। আমরা দু'বোন কান খোলা রাখি বাবার আসার কোনও শব্দ হয় কিনা, হঠাৎ আসার। ছোটদা ঘরে ঘরে বেড়ালের মত হাঁটেন আর রেডিও, ঘড়ি, গান শোনার যন্ত্র নেড়ে চেড়ে বলেন *এইটা আমার দরকার* আর কি যেন খোঁজেন সারা ঘরে। তোষকের তলে, আলমারির ড্রয়ারে, বই রাখার তাকে। ছোটদাকে এমন দেখায় যেন তিনি নতুন এসেছেন এ বাড়িতে। অপার বিস্ময় চোখে জিনিসপত্র হাতড়ান। ছোটদাকে বাড়িতে হাঁটাচলা করতে দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়, ইচ্ছে হয় তিনি আগের মত এখানে থাকুন, আগের মত টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমোন, লালায় ভরে যাক বইয়ের পাতা, উঠোনের রোদে কাঠের পিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ধুন্দলের ছুবলায় গা মেজে গোসল করুন। আবার সেই আগের মত হাওয়ায় উড়িয়ে চুল, কাঁধে গিটার, শিস বাজাতে বাজাতে দরজার কড়া নাড়ুন রাতে, প্রতি রাতে।

ছোটদা তাঁর গিটার, জামা কাপড়, টিনের ট্রাংক ধীরে ধীরে সব সরাতে লাগলেন। দেখি একদিন রেডিও নেই ঘরে, আরেকদিন দেয়ালের ঘড়িটি নেই। লক্ষ করিনি, এমন ভাব করি। রেডিও যে টেবিলে ছিল, সেখানে খামোকা পুরোনো বই খাতা পত্রিকার স্তূপ করে রাখি, যেন কারও নজরে না পড়ে খালি টেবিল। দেয়ালে টাঙিয়ে রাখি রঙিন ক্যালেন্ডার। ইয়াসমিন ভাব করে তারও চোখে পড়ছে না বাড়ি থেকে কিছু কিছু জিনিস *নেই* হয়ে যাচ্ছে। মা সময় জিজ্ঞেস করেন এভাবে – *দেখ ত তর হাতঘড়িতে কয়টা বাজে!* ইচ্ছে করেই দেয়াল ঘড়িতে সময় দেখার অভ্যেসটি তিনি তুলে রাখেন কোথাও। তিনটে প্রাণী আমরা বাড়িতে অন্ধের অভিনয় করে যাই, কেউ কাউকে প্রশ্ন করি না কোনও আর মনে মনে আশা করি বাবা যেন খবর শুনতে রেডিও না খোঁজেন, আর সময় দেখতে চোখ না ফেলেন দেয়ালে। বাড়িতে ছিঁচকে চোর এসে এটা সেটা নিয়ে যেতে পারে, এরকম একটি আশংকা আমি প্রকাশ করব যে কোনও খোঁজাখুঁজির বেলায়, ভেবে রাখি। আমার ধারণা হয় মা এবং ইয়াসমিনের মনও এরকম কোনও উত্তর সাজাচ্ছে। ইস্কুল থেকে বিকেলে ফিরে যেদিন দেখি সোফার ঢাকনা দিয়ে ছোটদা বড় রেকর্ড প্লেয়ারটি জড়াচ্ছেন, আমি যেন দেখিনি তিনি কি করছেন, চোখ ফিরিয়ে নিয়ে গুন গুন করে অন্যমন যেন, ক্যালেন্ডারের তারিখ দেখতে থাকি। মা চকিতে ঘরে ঢুকে চাপা গলায় বলেন ছোটদাকে

—*এইটা নিস না, তর বাবা রাইগা আগুন হইয়া যাইব।*

—*এইটা ঠিকমত বাজে না। সারাই করতে হইব। মেকানিকের কাছে নিয়া যাই।*

ছোটদা পাথর ভাঙা গলায় বলেন।

অনুতাপ এবং মায়া দুটোই যদি গ্রাস করে থাকে তোমাকে, তবে তুমি অভিমান করতে পারো, ক্রুদ্ধ হতে পারো না, আমার এরকমই ধারণা হয়। আমি মা কিংবা ইয়াসমিন শেষ অবদি বাধা দিতে পারি না, ছোটদা রেকর্ড প্লেয়ারটি *মেইড ইন জার্মানি,* উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলেন, নুয়ে, ঝুঁকে।

দিন যায়, সারাই কিছুরই হয় না। জিনিসপত্র কিছু আর ফেরত আসে না বাড়িতে। না আসুক, এখন শখের জিনিস সরিয়ে যদি তাঁর তৃপ্তি হয়, না হয় হোক। আমাদেরও খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হোক।

একদিন অসময়ে বাবা বাড়ি আসেন, যে আশংকাটি আমি অনেকদিন করছিলাম। আমার সারা শরীর হিমে জমে থাকে। বাবার পায়ের শব্দ শুনে ওঁরা সেঁধিয়ে যায় হাতের কাছে একটি ঘরে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধের আওয়াজটি কানে বোম ফাটার মত লাগে। এই বুঝি বাবার কানে গেল কোনও অচেনা শব্দ। বাবা সেই শব্দের সুতো ধরে কতদূর যাবেন কে জানে। আমার জমে থাকা শরীরটি অবশ হতে থাকে। মা বন্ধ দরজার পাশে এমন ভঙিতে দাঁড়িয়ে কথা বলেন যে তিনিই নিতান্ত প্রয়োজনে দরজাটি ভেজিয়ে রেখেছেন, কেউ নেই ঘরে, কারও থাকার কথা নয়। মা'র কথাগুলো নিরর্থক, *যেমন হাত মুখ ধইয়া খাইতে বইলি না এহনও!* যদিও আমি ইস্কুল থেকে ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরে অনেক আগেই বসে আছি। *আমার মাগরেবের নামাজের সময় গেল গা।* যদিও তখনও বিকেল ফুরোয়নি। বাবা অসময়ে বাড়ি এসে অন্যদিন কে কি করছে তাই দেখেন , আমরা পড়াশুনা করছি কি না, ছাদে কারও পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কি না, জানলাদরজা সব সাঁটা আছে কি না, সব ঠিকঠাক দেখলে আমার পড়ার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে নানা মনীষীর বাণী আওড়ে চলে যান রোগি দেখতে। সেদিন যেন তিনি অযথাই লম্বা সময় কাটাচ্ছেন বাড়িতে। যেন খামোকা হাঁটছেন ঘরগুলোয়। এক একটি মুহূর্তকেও মনে হতে থাকে দীর্ঘ দীর্ঘ যুগ। ঘরগুলোয় জুতোর মচমচ শব্দ তুলে হেঁটে বন্ধ দরজাটির পাশে দাঁড়াতেই মা বলেন *কিছু খাইবা, খাবার দিব?* মা'র এ প্রশ্নটিরও কোনও মানে হয় না। এ সময় না দুপুরের খাবার সময়, না রাতের। বাবা কোনও উত্তর না দিয়ে দরজাটি ধাক্কা দেন। ভেতর থেকে বন্ধ, অথচ বাড়ির মানুষগুলো কেউ অনুপস্থিত নয়, তবে ভেতরে কে! প্রশ্নটি অবান্তর নয়। তবু প্রশ্নটি আমার মনে হতে থাকে নিতান্ত অনুচিত। যার ইচ্ছে সে ভেতরে, তা দিয়ে বাবার কি প্রয়োজন। ধরা যাক আমিই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে যাদুমন্ত্রে বাইরে এসেছি। যাদু তো এমন আছেই। *পিসি সরকার* তাই করতেন। *হুডিনিও* তাই। বন্ধ বাক্সে নিজেকে বন্দি করে রেখেই বাক্সটি যেমন ছিল তেমনই থাকে, তিনি আচমকা বাক্সের বাইরে।

বাবা দরজায় আবারও ধাক্কা দিয়ে হাঁক ছাড়েন, *ভেতরে কেডা?*

মা নিঃশব্দে সরে যান বাবার সামনে থেকে। কিছু আর তাঁর হাতে নেই পাহারা দেওয়ার। আমার ঠান্ডা শরীরটির হঠাৎ পেশাব পায়খানা চাপে। তরকারি পোড়া গন্ধ বেরোয় রান্নাঘর থেকে। ইয়াসমিন এমন ঝুঁকে থাকে বইয়ের ওপর, যেন পাথরের মূর্তি

কোনও, নড়ন চড়ন নেই। বন্ধ দরজা থেকে বাবার অদম্য উৎসাহের আগুন এক ফুৎকারে নিবিয়ে দেওয়ার কোনও সম্ভাবনা আমরা কেউ দেখি না। বাবা এমনই, কোনও কিছুর শেষ না দেখে তাঁর শান্তি হয় না। সন্দেহ যদি একবার উঁকি দেয়, তিনি এসপার ওসপার করে ছাড়েন সবকিছুর। নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে তিনি রহস্যের জট ছাড়ান। ভেতরে কে, বাবার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কেউ তৈরি নেই। ভেতরে কে প্রশ্নটি এর ওর দিকে, আবার বাতাসেও ছুঁড়তে থাকেন তিনি।

কী দরকার ছিল এত নিরীক্ষণের, কুকুর বেড়াল আর দুটো মেয়ে যে যার জায়গামত আছে, মেয়েরা পড়ার টেবিলে আর জন্তুদুটো বারান্দায়, ছাদে কেউ হাঁটছে না, দরজা জানালা সাঁটা আছে। মাও আছেন বাড়িতে, এমন নয় যে সংসার মাচায় তুলে চলে গেছেন পীরবাড়ি। যেমন চলে সংসার তেমনই, কোনও সুতো পড়ে নেই কোথাও সংশয়ের। তবু, অকারণেই বাবা হুংকার ছোড়েন *ভেতরে কে?*

আমি ঝুঁকে আছি একটি জ্যামিতির বইয়ে, যেন এক কঠিন জ্যামিতি বুঝতে আমার সমস্যা হচ্ছে খুব, আর কে কোথায় কিসের ভেতর এসব আমার জানার কথা নয়, আর আমার সময়ও নেই ওসবে ফিরে তাকানো, যেন হুংকারটি মোটেও আমার কানে যায়নি। জ্যামিতির সমস্যা মিমাংসায় আমি এতই ব্যস্ত যে কারও দিকে কোনও চোখ না ফেলে, কারও কোনও হুংকার কানে পৌঁছেনি এভাবে দ্রুত হেঁটে যাই গোসলখানার দিকে। যেন গোসলখানাটি এ মুহূর্তে আমার বিষম প্রয়োজন, মাথায় যেহেতু জ্যামিতির জটিলতা, চাঁদিতে জল ঢেলে তার জট খুলতে হবে। দরজা এঁটে আমি বড় একটি শ্বাস ফেলি। বাড়িতে কী ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, তা কল্পনা করার সাহস বা শক্তি আমি অনুভব করি, নেই আমার। যা কিছু ঘটে, চোখের আড়ালে ঘটুক। কিন্তু পালিয়ে বাঁচা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কেন! আমার দরজায়ও শাবলের কোপ পড়ে। *দরজা খোল, দরজা খোল!*

বেরিয়ে এলেই চিতার মত চেপে ধরেন বাবা, *ওই ঘরের ভেতরে কেডা?*

বাবার রুদ্রমূর্তি দেখে শ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকি দাগি আসামির মত। যেন অপরাধ আমার। যেন বন্ধ ঘরটির সব দায়িত্ব একা আমার। বাবা আমাকে মুঠোর ভেতর নিয়ে দাপান সারা বারান্দা, জবাব তাঁর চাই। তা নইলে ভয়ংকর কোনও কান্ড ঘটাবেন এক্ষুণি।

শেষ পর্যন্ত কালো মুখের, ফিনফিনে চুলের, ভোঁতা নাকের মা ত্রাতার ভূমিকায় নামেন। বাবার ছোবল থেকে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে হিমে ডুবে থাকা গলায় বলেন– *কামাল আইছে বউ নিয়া। বউ মুসলমান হইছে।*

–*কি? কি কইলা? কে আইছে?* বাবা প্রশ্ন করেন খনখনে গলায়।

–*কামাল। কামাল আইছে।* মা আবার বলেন।

–*কামাল কেডা? কোনও কামালরে আমি চিনি না।* বলতে বলতে বাবা ছুটে আসেন বন্ধ দরজার সামনে। সারা বাড়ি কাঁপিয়ে গর্জন তোলেন – *এক্ষুণি ওদেরে বাইর কর আমার বাসা থেইকা। এক্ষুণি। এক্ষুণি।*

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে তখনও। হাত পা আবার অবশ হতে শুরু করেছে।

বাবার তর্জনি তখনও কালো ফটকের দিকে উঁচু করে ধরা।

পেছনের দরজা খুলে ছোটদা বউএর হাত ধরে দৌড়োতে থাকেন কালো ফটকের দিকে।

ইস্কুল থেকে ফিরে জামা কাপড় বদল করতে গিয়ে দেখি শাদা পাজামা রক্তে লাল। কেন! কাটল কিছুতে! কোথায় কেটেছে! কাটার তো কথা নয়! ব্যথা তো লাগছে না! কী হল! ভয়ে বুক কাঁপছে তখন আমার। এত রক্ত বেরোচ্ছে, আমি আবার মরে যাচ্ছি না তো!

দৌড়ে, মা ফুলকপি তুলছিলেন সবজির বাগান থেকে, তাঁর কোলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে গলা ছেড়ে কাঁদি।

—*ও মাগো, আমার শরীর কাইটা গেছে। সমানে রক্ত বার হইতাছে।*

—*কই কাটছে! কই!* মা কোল থেকে আলতো হাতে আমাকে তোলেন।

আমি তলপেটের নিচে আঙুল নামাতে থাকি।

মা বলেন, মাথায় হাত বুলিয়ে— *কাইন্দ না।*

আমি গালে নামা চোখের জল মুছে বলি, *ডেটল তুলা নিয়া আসো তাড়াতাড়ি।*

মা হেসে বলেন — *কান্দার কিছু নাই। ঠিক হইয়া যাইব।*

রক্ত বেরোচ্ছে আমার গা থেকে, আর মা'র মুখে দুশ্চিন্তার লেশ নেই। তিনি দুটো ফুলকপি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমার ক্ষত খুঁজে তুলোয় ডেটল মেখে, যা সচরাচর করেন, ব্যান্ডেজ করলেন না। বরং ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি ঝুলিয়ে, ফুলকপির বালু ঝেড়ে বললে—*তুমি এখন বড় হইছ। বড় মেয়েদের এইগুলা হয়।*

—*এইগুলা হয় মানে? কোনগুলা?* মা'র চাপা হাসির দিকে ঘৃণা ছুঁড়ে বলি।

—*এই রক্ত যাওয়া। এরে স্রাব কয়। হায়েজ কয়। প্রত্যেক মাসেই এইরকম হয় মেয়েদের। আমারও হয়।* মা হেসে বলেন।

—*ইয়াসমিনেরও হয়!* উদ্বিগ্ন আমি, জিজ্ঞেস করি।

—*ওর এখনও হয় না। তুমার মত বড় হইলে ওরও হইব।*

হঠাৎ এক বিকেলে আমি, এভাবে, বড় হয়ে গেলাম। মা আমাকে বলেন — *তুমি এখন আর ছোট না। তুমি এখন ছোটদের মত খেলাধুলা করা, বাইরে যাওয়া এইসব করতে পারবা না। বড় মেয়েদের মত ঘরে থাকবা। দৌড়াইবা না, শান্ত হইয়া থাকবা। পুরুষলোকের সামনে যাইবা না।*

মা তাঁর পুরোনো একটি শাড়ি ছিঁড়ে টুকরো করে, টুকরোগুলো ভাঁজ করে আমার হাতে দিলেন, পাজামার একটি ফিতেও দিলেন। বললেন, গম্ভীর মুখে, চাপা হাসিটি নেমে গেছে ঠোঁট বেয়ে, *পেটে ফিতাটা শক্ত কইরা বাইন্ধা তারপরে এই ভাঁজ করা কাপড়টা ফিতার দুইদিকে গুইঞ্জা রাখবা। রক্ত ঝরব তিন দিন, চাইর পাঁচ দিনও ঝরতে পারে। ডরের কিচ্ছু নাই। সবারই হয় মা। এইটা খুব স্বাভাবিক। এই কাপড় রক্তে ভিইজা গেলে এইটা ধইয়া লাইড়া দিবা, আরেকটা পরবা। খুব গোপনে সব করবা, কেউ যেন না দেখে। এইগুলা শরমের জিনিস। কাউরে কইতে হয় না।*

আমার ভয় হতে থাকে। এ কেমন অদ্ভুত কান্ড যে রক্ত ঝরবে শরীর থেকে, তাও প্রতি মাসে! কেন ছেলেদের ঘটবে না ব্যপারটি। কেন মেয়েদের কেবল! কেনই বা আমার! আল্লাহতায়ালার মত প্রকৃতিও কি *একচোখা!* নিজেকে হঠাৎ মনে হয় আমি যেন এখন মা খালাদের মত বড় হয়ে গেছি, আমার আর পুতুল খেলার বয়স নেই। আমার আর খুনসুটি করার বয়স নেই, আমাকে এখন শাড়ি পরে রাঁধাবাড়া করতে হবে, মন্থরগতিতে চলতে হবে, নিচুগলায় কথা বলতে হবে। আমি এখন বড়। গোল্লাছুটের মাঠ থেকে, এক্কাদোক্কার ঘর থেকে কেউ যেন আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল। আমি আর আগের সেই আমি নই। আমি অন্য আমি, ভীষণ বিভৎস আমি। যেটুকু স্বাধীনতা অবিশিষ্ট ছিল, তাও উড়ে গেল নিমেষে তুলোর মত হাওয়ায়। আমি কি কোনও দুঃস্বপ্ন দেখছি! নাকি যা ঘটছে, মা যা বলছেন, সব সত্যি! যদি সবই দুঃস্বপ্ন হত, যদি ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখতাম যেমন ছিলাম, তেমনই আছি! আহা, তেমন হয় না কেন! মনে মনে প্রবল ইচ্ছে করি যেন এই রক্তপাত মিথ্যে হয়! যেন এ স্রেফ দুর্ঘটনা হয়, শরীরের ভেতরে কোনও গোপন ক্ষত থেকে রক্তপাত হয়, এটিই প্রথম আর এটিই যেন শেষ হয়। যেন শাড়ির টুকেরোগুলো মা'কে ফিরিয়ে দিয়ে বলতে পারি, সেরে গেছে।

গোসলখানার দেয়ালে মাথা ঠুকে কোনও যন্ত্রণার বোধ হয় না। শরীর একটি বাহন মাত্র, রক্তাক্ত একটি হৃদয় বহন করে চলেছি এতে। বুকের ভেতর কষ্টের নুড়িপাথর জমে জমে পাহাড় হতে থাকে। হাতে ধরা মা'র দেওয়া শাড়ির টুকরো। আমার নিয়তি ধরে আছি আমি হাতে। একচোখা কুৎসিত নিয়তি।

মা গোসলখানার দরজায় টোকা দিয়ে চাপা স্বরে বলেন *কী হইছে, দেরি কর ক্যান! যেমনে কইছি অমনে কইরা তাড়াতাড়ি বার হও।*

মা'কি আমাকে কাঁদতে দিতেও চান না সাধ মিটিয়ে! লজ্জায় মুখ ঢেকে কাঁদতে, অপমনে বিবর্ণ হতে! যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে আশংকায়! মা'র ওপর রাগ হয় আমার। বাড়ির সবার ওপরই, যেন সবার এক গোপন ষড়যন্ত্রের শিকার আমি। আমাকেই বেছে নেওয়া হয় আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে। গা থেকে দুর্গন্ধ বেরোয় আমারই। গায়ে পায়ে সর্বনাশ যদি কারও জড়িয়ে থাকে, সে আমারই। এই ছেঁড়াখোঁড়া আমার। কী করে এই গা রি রি করা ঘটনাটি আমি লুকিয়ে রাখব! কী করে আমি হাঁটব, দৌড়োব, যদি কেউ জেনে ফেলে আমার পাজামার তলে *ত্যানা* লুকিয়ে আছে, আর সেই ত্যানা চুপসে আছে রক্তে। নিজেকে বড় ঘেন্না লাগে। ঘেন্নায় থুথু ছুঁড়ি নিজের গায়ে। আমি এখন সার্কাসের ক্লাউন ছাড়া কিছু নই। আমি এখন আর আর সবার মত নই। অন্যরকম। বিশ্রিরকম। আমার ভেতর গোপন এক অসুখ আছে। যে অসুখ কখনও সারে না।

এ কে কি বড় হওয়া বলে! আমি লক্ষ করি আমি যেমন ছিলাম, তেমনই রয়ে গেছি। আমার তখনও দৌড়ে গোল্লাছুট খেলতে ভাল লাগে কিন্তু মা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন – *লাফ দিবি না, দৌড়াবি না, তুই এখন আর ছোট না।* মাঠে দাঁড়ালে মা খেঁকিয়ে ওঠেন, *ঘরের ভিতরে আয়, অন্য বাড়ির ছাদ থেইকা বেডারা তাকাইয়া রইছে।*

– *তাতে কি মা! কেউ তাকাইলে দোষ কি!* ম্লান স্বরে বলি।

– *তুই বড় হইয়া গেছস। অসুবিধা আছে।*

কি অসুবিধা? তা কখনও মা'র কাছে জানতে পারিনি। বাইরের পুরুষ ক্রমশ আমার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাকে আড়াল করার, আবৃত করার খেলায় মা বিষম মেতে ওঠেন। মামারা বন্ধু নিয়ে বেড়াতে এলে মা আমাকে ঠেলে পাঠান ভেতরের ঘরে। আমি যেন মামার বন্ধুদের চোখের সামনে না পড়ি। ক্রমশ *অস্পৃশ্য* হয়ে উঠতে থাকি।

মা'র আলমারিতে চাবি খুঁজতে গিয়ে হাত লেগেছিল কোরান শরিফের ওপর, মা ছুটে এলেন — *নাপাক শইলে কোরান শরিফ ধরবি না।*

—*নাপাক শরীর মানে?* তেতো গলায় বলি।

—*হায়েজ হইলে শইল নাপাক থাকে। তখন আল্লাহর কালাম ছোঁয়া নিষেধ। নামাজ রোজা করা নিষেধ।*

মা কুকুরকে বলেন নাপাক। তাহলে মেয়েরাও সময় সময় নাপাক হয়! অযু করলে সবাই *পাক* হতে পারে, ঋতুস্রাবের মেয়েরা ছাড়া। দুর্গন্ধ এক ডোবায় পড়েছি আমি, আমার চুলের ডগা থেকে পায়ের আঙুল অবদি নোংরা। ঘেন্নায় আমার বমি আসে। নিজের ওপর ঘেন্না। রক্তের ত্যানা ধুতে গিয়ে উগলে আসে পেটের নাড়ি। এর চেয়ে জ্বিনের বাতাস লাগলে বোধহয় ভাল ছিল, ভাবি। এই নোংরা, নষ্ট, নাপাক ব্যাপারটিকে পুষে রাখতে হয় মনের একটি কৌটোয়, কৌটাটিকে পুরে রাখতে হয় মাটির তলে, যে মাটিতে কারও পা পড়ে না।

আমার হাঁটতে ভয় হয়, দাঁড়াতে ভয় হয়। সারাক্ষণ আশংকা করি, এই বুঝি *ত্যানা* বেরিয়ে এল বাইরে। টুপ করে আলগোছে পড়ে গেল ঘরভর্তি মানুষের সামনে। এই বুঝি জেনে গেল সবাই। এই বুঝি মেঝে ভেসে গেল পচা রক্তে। এই বুঝি ঠা ঠা শব্দে হেসে উঠল মানুষ। এ আমার শরীর, এ শরীর আমাকেই অপমান করছে। আমাকেই দিনের আলোয় নর্দমায় চুবোচ্ছে।

দুপুরের কাঠ ফাটা রোদে দাঁড়িয়ে থেকেও পারি না জামা খুলে ফেলতে। বুকের মধ্যে বড় হচ্ছে কাজুবাদামের মত স্তন। শরীর থেকে কুলকুল করে স্রোত বইছে রক্তের। আমি বিমর্ষ শুয়ে থাকি বিছানায়।

তিনদিনের রক্তপাতে আমি যখন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, বিছানায় মৃতের মত শোয়া, বাবা দেখে, চোখ কপালে তুলে বুনো ষাঁড়ের মত তেড়ে আসেন,

—*কি ব্যাপার অবেলায় শুইয়া রইছস কেন! উঠলি এখনও! শিগরি পড়তে বস।*

শরীর টেনে তুলে পড়ার টেবিলে বসি। বাবা ধমকে বলেন — *এত আস্তে চলস ক্যান! শইলে জোর নাই। ভাত খাস না!*

মা আবারও সেই ত্রাতার ভূমিকায়। বাবাকে ডেকে নিয়ে যান অন্য ঘরে, অন্য ঘরটি ঠিক আমার ঘরের বাঁপাশের ঘরটি। ঘরটি থেকে দেয়াল ফুঁড়ে *হিস হিস ফিস ফিস* শব্দ আসে, শব্দের আগায় বাঁধা অদৃশ্য আগুন। আমার কান পুড়ে যেতে থাকে সে আগুনে। মেলে রাখা বইয়ের অক্ষরগুলো ঝাপসা হতে থাকে। আগুনে পুড়তে থাকে আমার বই খাতা, পেনসিল সব। সারা মুখে হলকা লাগে আগুনের।

বাবা অন্য ঘর থেকে এসে নিঃশব্দে আমার কাঁধে হাত নাকি চাবুক জানি না, রেখে বলেন, *বিশ্রাম নিতে চাইলে নেও। শুইয়া থাকো কিছুক্ষণ। পরে পড়তে বও। যাও, বিছানায় যাও। বিশ্রামেরও দরকার আছে শরীরের। নিশ্চয়ই আছে। এইজন্য কুম্ভকর্ণের*

মত সারাদিন ঘুমাইলে আর আইলসার মত শুইয়া থাকলে ত চলবে না। তুমার একটা আইলসা ভাই আছে না! নোমান। ওর আইলসামির জন্য ও লেখাপড়া করতে পারল না। দেখ না ছাইকলুজি পড়ে। কী ছাতা পড়ে আমার! পইড়া একেবারে রাজ্য শাসন করব!

আমাকে চেয়ার থেকে টেনে তুলে বিছানায় শুইয়ে দেন বাবা। শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে — *জান ত,* বাবা বলেন, *আমার এখন সন্তান বলতে দুইটা মেয়েই। তোমরাই আমার বুকের ধন। তোমরাই আমার ভরসা, আমার বাঁচার আশা। তোমাদেরে মানুষ কইরা যাইতে পারলেই আমার জীবনে শান্তি হইব। তুমরা যদি আমারে কষ্ট দেও, আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না। শরীরটা ক্লান্ত লাগলে একটু বিশ্রাম নিবা। আবার ভাল বোধ করলে উইঠা পড়তে বসবা। কয় না, শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবা, তাই সয়! তুমাদের খাওয়া পরা কোনকিছুরই অভাব আমি রাখি নাই। কেন! যেন ঠাইস্যা লেখাপড়া কইরা মানুষ হইতে পার। ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই একমাত্র তপস্যা। তারপরে ধর কর্মজীবন, তহন কর্ম করবা। আর কর্মজীবনের পরে আসে হইল অবসর জীবন, তহন অবসর নিবা, কর্ম থেইকা অবসর। সবকিছুরই একটা নিয়ম আছে। আছে না!*

বাবা তাঁর খসখসে আঙুলে আমার চুল আঁচড়ে ঘাড়ের পেছনে জড়ো করেন। *ব্যাকব্রাশের* বাবা চুল কপালে আসা সইতে পারেন না, নিজের যেমন নয়, অন্যেরও নয়। আগেও দেখেছি, তাঁর আদর মানে চুল পেছনে সরিয়ে দেওয়া। আহ! এত রুক্ষ কারও হাত হতে পারে! খসখসে আঙুলগুলো আমার পিঠে দৌড়োয়। আদর নয় তো এ যেন ঝামা ঘসে আমার চামড়া তুলছেন গায়ের।

ঋতুস্রাব হল আর ধুলোখেলা ছেড়ে গম্ভীর মুখে বসে থাকব ঘরে, এ আমার মনে ধরে না। বড় শখ ছিল বড় হতে, তত বড় হতে যে দরজার সিটকিনির নাগাল পাব। এখন একাই আমি পায়ের আঙুলে ভর রেখে সিটকিনি খুলতে পারি। কিন্তু এই রক্তপাত আমাকে এত *বড়* করে দেয়, এত *আড়াল* করে দেয় সবার, যে, আমার ভয় হতে থাকে। মা আমাকে এগারো বছর বয়সে জন্মের মত *হাফপ্যান্ট* ছাড়িয়ে দিয়ে নিজে হাতে পাজামা বানিয়ে দিয়েছেন পরার। বারো বছরে এলে বলেছেন ওড়না পড়তে, আমার ঠ্যাং বড় হচ্ছে, বুক বড় হচ্ছে সুতরাং বড় হওয়া জিনিসগুলো আড়াল করে রাখতে হবে। আমি যদি এসব না পরি, লোকে আমাকে *বেশরম বেলাজ* বলবে। সমাজে কেউ *বেশরম* মেয়েদের পছন্দ করে না। যাদের লাজ লজ্জা আছে, তাদের ভাল বিয়ে হয়। আমারও, মা'র আশা, ভাল বিয়ে হবে। বইয়ের পোকা মমতার বিয়ে হয়ে গেছে ক'দিন আগে। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, *তুমি কি চেন, যার সাথে তুমার বিয়ে হইতাছে?*

মমতা না বলেছে, চেনে না।

হাতি চড়ে সে লোক মমতার বিয়েতে এসেছিল। সারা শহর দেখেছে হাতিতে বসে বর যাচ্ছে বিয়ে করতে। যৌতুক নিয়েছে অঢেল, সাত ভরি সোনা, তিরিশ হাজার টাকা, রেডিও, হাতঘড়ি। হাতির পিঠে চড়িয়ে মমতাকে সে তার বাড়ি নিয়ে গেছে।

মমতা এখন থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকদের দেখাশুনা করবে। লেখাপড়ার পাট চুকেছে ওর। ওর বই পড়ার শখকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে হাতি চড়া লোকটি।

ঋতুস্রাবের ধকল না পোহাতেই গ্রামের এক হাবিলদার লোক বড় এক রুই মাছ নিয়ে আমাদের বাড়ি এসে বাবাকে বললেন তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে বাবার বড় কন্যার বিয়ে দিতে চান। শুনে, লোকটির হাতে মাছটি ফেরত দিয়ে কালো ফটক দেখিয়ে দিয়েছেন বাবা, আর একটি শব্দ উচ্চারণ না করে যেন লোকটি বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে।

মা অসন্তোষ স্বরে ঢেলে বাবাকে বলেছেন, *এমন করলে চলব! মেয়েরে কি বিয়া দিবা না! মেয়ে ত বড় হইছে। এই বয়সেই বিয়া হইয়া যাওয়া ভালা।*

মা'কে আর অগ্রসর হতে না দিয়ে বাবা বলেন–*আমার মেয়েরে কহন বিয়া দিতে হইব, সেইডা আমি বুঝাম। তুমার মাতব্বরি করতে হইব না। মেয়ে আমার লেখাপড়া করতাছে। ডাক্তার হইব। আমার মত এম বি বি এস ডাক্তার না। এফ আর সি এস ডাক্তার। ওর বিয়া নিয়া আর কুনো কথা যেন আমি শুনি না।*

কান পেতে বাবার কথাগুলো শুনে, বাবার ওপর আমার সব রাগ জল হয়ে যায়। বাবাকে ইচ্ছে করে নিজের হাতে এক গ্লাস লেবুর শরবত বানিয়ে দিই, বাবার নিশ্চয় তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু বাবা না ডাকলে তাঁর কাছে ভেড়ার, না চাইলে কিছু দেওয়ার অভ্যেস আমার নেই। আমি অভ্যেসের খোলস ফুঁড়ে বেরোতে পারি না।

মা, আমি লক্ষ করি, আমার বড় হওয়া বিষয়ে বিষম উচ্ছ্বসিত। বাজার থেকে একটি কালো বোরখা কিনে এনে আমাকে বললেন – *দেখ তো মা, এই বোরখাটা কিইনা আনলাম তুমার জন্য। পইরা দেখ তো লাগে কি না।*

অপমানে আমি লাল হয়ে উঠি। বলি – *কি কও! আমারে বোরখা পরতে কও!*

–*তাই তো। বড় হইছস না। বড় হইলে মেয়েদেরে বোরখা পরতে হয়।*

মা বোরখাটি হাতে নিয়ে তার দৈর্ঘপ্রস্থ মাপতে মাপতে বলেন।

–*না আমি বোরখা পরব না।* শক্ত গলায় বলি।

–*তুই মুসলমান না! মুসলমান মেয়েদেরে পর্দা করার কথা আল্লাহ তায়ালা নিজে বলছেন।* মা মোলায়েম কণ্ঠে বলেন।

–*তা বলুক গিয়া। আমি বোরখা কিছুতেই পরব না।* বলি।

–*ফজলির সবগুলা মেয়ে কী সুন্দর বোরখা পরে। কত ভাল মেয়ে ওরা। তুমিও ত ভাল মেয়ে। বোরখা পরলে মানষে কইব মেয়েটা কত লক্ষ্মী।*

পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন মা। পিঠে উষ্ণ স্পর্শ পড়লে আমি মোমের মত গলে যাই। কিন্তু আজ আমাাকে গললে চলবে না। আমাকে না বলা শিখতে হবে। মনে মনে আওড়াই শব্দটি – *না।*

–*না।*

–*কি পরবি না?* মা ক্ষেপে ওঠেন।

–*না ত কইলাম।* মা'র নাগাল থেকে ছিটকে সরে বলি।

মা যে হাতটি পিঠে বুলোচ্ছিলেন, সেটি দিয়েই থাপ্পড় কষে পিঠে বলেন–*তুই জাহান্নামে যাইবি। আমি তরে কইয়া দিলাম তুই জাহান্নামে যাইবি। তর মতি গতি আমার ভালা ঠেকতাছে না। নওমহলে এত নিয়া গেলাম, তারপরও তর চোখ খুলল না। দেখলি না চোখের সামনে, তর বয়সী, এমন কি তর ছোটরাও বোরখা পরে। কী সুন্দর লাগে*

ওদেরে। নামাজ রোজা করে। তুই যত বড় হইতাছস, নামাজ রোযা সব ছাড়তাছস। তর কপালে জাহান্নাম লেখা আছে।

মা থাপড়ে আমার পিঠ লাল করে দিন, বোরখা আমি পড়ব না। ঘাড় গুঁজে বসি এসে পড়ার টেবিলে। বই সামনে নিয়ে বসে থাকা কেবল, অক্ষরগুলো শকুনির ডানার তলে ঢাকা।

মা থপথপ করে হাঁটেন বারান্দায়। আমার ঘরটি ভেতর-বারান্দার লাগোয়া। যেন শুনতে পাই, মা বলেন —*আসলে ও হইছে একটা মিড়মিড়া শয়তান। দেখলে মনে হয় কিচ্ছু বুঝে না, মা বাপে যা কয়, তাই শোনে। আসলে না। এ আমার মুখে মুখে তর্ক করে। আর কেউ ত এমন করে না। এ এত সাহস পায় কোত্থেকা। বাপের মত মাইরা চামড়া তুলতাম যদি পিঠের, তাইলে সবই শুনত। সুজা আঙুলে ঘি উঠে না।*

বাঁকা আঙুলে ঘি ওঠানোর সময় মা আর মা থাকেন না, *ডাইনি* হয়ে যান। এত বিচ্ছিরি লাগে মা'কে দেখতে তখন। মনেই হয় না এই মা আমাকে মুখে তুলে আদর করে খাওয়াতেন, ছড়াগান শেখাতেন, এই মা রাত জেগে বসে থাকেন গায়ে জ্বর হলে। ধুলোর মত মিশে যেতে থাকি মাটিতে, আমার হাড়ে রক্তে মাংসে ক্রোধ জমা হতে থাকে হীরের কণার মত।

ইচ্ছে হয় বিষ খেয়ে মরে যাই। একেবারে মরে যাই। জগত বড় নিষ্ঠুর, এই জগতে মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভাল। পত্রিকায় পড়েছি এক মেয়ে হঠাৎ সেদিন ছেলে হয়ে গেছে। বড় ইচ্ছে করে আমার, হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখতে ছেলে হয়ে গেছি। কোনও বেঢপ মাংস পিন্ড নেই বুকে। ফিনফিনে শার্ট পরে যেমন ইচ্ছে ঘুরে বেড়াব। টৈ টৈ করে শহর ঘুরে, সিনেমা দেখে, বিড়ি ফুঁকে বাড়ি ফিরব রাতে। মাছের সবচেয়ে বড় টুকরোটি মা তুলে দেবেন পাতে, আমি ছেলে বলে, বংশের বাতি বলে। ছেলেদের সাত খুন মাপ মা'র কাছে। কেউ আমাকে বুকের ওপর ওড়না ঝুলোতে বলবে না, বোরখা পরতে বলবে না, আমার ছাদে ওঠা, জানালায় দাঁড়ানো, বাড়িতে বন্ধু নিয়ে আড্ডা দেওয়া, যখন খুশি বেরিয়ে যাওয়ায় কারও কিছু বলার থাকবে না।

কিন্তু কে আমাকে ছেলে করে দেবে! আমার নিজের সাধ্য নেই নিজেকে ছেলে করার। কার কাছে প্রার্থনা করব, এক আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করে মানুষ! আল্লাহ ছাড়া আরও কেউ যদি থাকত প্রার্থনা করার! হিন্দুদের তিনকোটি দেবতার কাছে করব! দেবতারা আমার কথা শুনবেন কেন, আমি তো হিন্দু নই। আর আল্লাহর কাছে অনেক চেয়ে দেখেছি, আল্লাহ মোটেও তা দিতে জানেন না। আল্লাহ ব্যাপারটি নেহাত ফালতু। কারও কাছে প্রার্থনা না করে আমার ইচ্ছের কথাটি নিজেকে বলি। *হয় মর না হয় ছেলে হয়ে যাও হঠাৎ,* বারবার বলি। বাবা বলেন, *ইচ্ছে করলেই নাকি সব হয়।* আমি তাই হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে *ইচ্ছে* করি। আমার ভেতর বাহির, আমার পাপ পুণ্য, সব ঢেলে ইচ্ছে করি।

ছেলে হয়ে ওঠার ইচ্ছে আমার সেদিন মরে গিয়েছিল, যেদিন ইচ্ছেয় আচ্ছন্ন আমি দেখলাম ফুলবাহারির মা এসেছে *অবকাশে।* হাড্ডিসার। *কামেলা* রোগে মরতে বসেছিল, পীরফকিরের দোয়ায় নাকি বেঁচেছে। কাহিলাকে কেউ আর কাজে রাখে না। এর ওর বাড়ি চাল ডাল ভিক্ষে করে সে চলে। ফুলবাহারির মা যখন পাকঘরের বারান্দায় ধপাস করে বসল, আর ওঠার সময় বারান্দার থামে ভর করে দাঁড়াল, এত ক্লান্ত যে জীবনের ভার আর সে বহন করতে পারছে না। আমার দেখে মনে হয় জীবন কাঁধে এসে বসে সময় সময়, একে পিঠে ঝুলিয়ে বহুদূর হাঁটতে শরীর মন সায় দেয় না।

সেই ফুলবাহারির মা, ঘসঘস ঘসসসস শব্দে মশলা বাটত নানিদের পাকঘরে। ঘসঘস ঘসসসস। ঘসঘস ঘসসসস। শব্দটি আমি যেন শুনি যখন পা টেনে টেনে বেলগাছের তল দিয়ে সে হেঁটে চলে যাচ্ছিল। কোথায় যাচ্ছিল কে জানে, তার পেছন পেছন দৌড়ে আমার দেখা হয়নি সে যাচ্ছে কোথায়, এ জগতের কোথায় তার যাওয়ার জায়গা। ঘসঘস শব্দটি আমাকে একটি ভাঙা চৌকাঠে এনে বসায়, যেখানে বসে চেয়ে থাকতাম শিলপাটার ওপর ঝুঁকে দুলে দুলে ফুলবাহারির মা'র মশলা বাটার দিকে। সাত সকালে এসে মশলা বাটতে বসত, দুপুরের আগে আগে বাটা শেষ হত। হলুদ, মরিচ, ধনে জিরা, পিঁয়াজ, রসুন, আদা সাতরকম মশলা তাকে পিষতে হত শিলপাটায়। বড় এক গামলায় করে নানার দোকানের কর্মচারি এসে নিয়ে যেত মশলা। বিকেলে আবার বাটতে বসত, সারা বিকেল বাটত। ইচ্ছে হত আমিও বাটি, ফুলবাহারির মা'র মত দুলে দুলে।

বলেওছি, *একটু খানি বাটতে দিবা মশলা আমারে?*

ফুলবাহারির মা মশলা বাটা থামিয়ে আমার দিকে ফক করে পান খাওয়া কালো দাঁত হাসল, বলল *আপনে মশলা বাটতে পারবাইন না আপা, এইডা খুব শক্ত কাম।*

ফুলবাহারির মা আমার মা'র বয়সী, আমাকে সে ডাকে *আপা* আর *আপনি* সম্বোধন করে, কারণ আমি মনিবের বাড়ির মেয়ে। আমাকে মশলা বাটা মানায় না, ছোটলোকেরা বাটে এসব। ছোটলোকের হাত ময়লা হয় *শক্ত* আর *নোংরা* কাজ করে। তিন বছর বয়স থেকেই আমি বুঝতে শিখেছি, কারা *ছোট* আর কারা *বড়।* ফুলবাহারির মা দেখতে বড় হলেও *ছোটলোক,* এদের কোলে উঠতে হয় না, এদের গা ধরতে হয় না, এদের হাতের রান্নাও খেতে হয় না। এদের চেয়ারে সোফায় বসার অধিকার নেই, হয় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, নেহাত বসতে হলে মাটিতে, শুলে মাটিতে শুতে হয়। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে এদের দৌড়ে আসা চাই সামনে, যে হুকুমই করা হোক, সবই মুখ বুজে পালন করতে হয় এদের। ছোটলোকদের তাই করার নিয়ম।

ফুলবাহারির মা'র পান খাওয়া কালো দাঁতের দিকে তাকিয়ে আমি একটি প্রশ্ন, প্রশ্নটি হঠাৎই উদয় হয়, করি –*তুমার নাম কি ফুলবাহারির মা?*

মশলা পেষার *ঘসঘসস* শব্দে আমার প্রশ্ন সম্ভবত থেতলে যায় বলে সে কোনও উত্তর দেয় না। চৌকাঠে বসে আমি আবারও, বিকেলে, যখন বাড়ির মানুষগুলো দুপুরের

খাওয়ার পর গা টান করে শুয়েছে, চোরা বেড়ালটি চুলোর পাড়ে ঘুমোচ্ছে, প্রশ্ন করি, এবার স্বর উঁচু করে, *তুমার নাম কি?*

পেষন থামিয়ে ফুলবাহারির মা তাকায় আমার দিকে, ঘামে ভেজা তার কপাল, নাক, চিবুক। *নাকের ডগায় ঘাম জমলে*, রুনু খালা বলেন *জামাইয়ে আদর করে।* ফুলবাহারির মা'র জামাই মরে ভূত হয়ে গেছে কত আগে, তাকে আদর করবে কে! এবার আর কালো দাঁত বেরোয় না হাসিতে। হাসিতে নিচের পুরু ঠোঁট উল্টে থাকে, আর দু'গালে যেন দুটো আস্ত সুপুরি।

আমার উৎসুক চোখে শান্ত চোখ রেখে ফুলবাহারির মা বলে *আমার কুনো নাম নাই বইন। মাইনষে ডাহে ফুলবাহারির মা।*

এবার আমি হেসে, চোখ নাচিয়ে, মেয়েমানুষটির বোকামো ধরে ফেলেছি ভঙিতে বলি *ফুলবাহারি জন্মানোর আগে তুমার নাম কি ছিল?* আঁচলে মুখের ঘাম মুছে ফুলবাহারির মা বলে–*আমার কুনো নাম আছিল না।*

–*তাইলে মাইনষে তুমারে কি কইয়া ডাকত? ধর তুমার মা বাপ কি ডাকত?*

ফুলবাহারির মা বড় একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে–*মা বাপ কি আর আছে? কবেই মইরা গেছে।*

–*তা বুঝলাম, কিন্তু যহন তুমার বাপ মা মরে নাই, তুমারে নাম দেয় নাই? ধর আমার একটা নাম আছে। নাসরিন।* ফুলবাহারির মা'কে আমি ইস্কুল মাস্টারের মত বোঝাই।

মশলা পিষতে পিষতে বলে সে – *না, আমার কুনো নাম আছিল না কুনোকালে। আমারে এই ছেড়িডা, ছেমড়িডা, বান্দরডা, কইয়া বেহেই ডাকত।*

আমি অবাক তাকিয়ে থাকি দুলতে থাকা শরীরের দিকে। যেন শিলপাটায় নয়, আমার মাথার ভেতর শব্দ হচ্ছে *ঘসঘস ঘসসসস।*

মা'কে, কলাগাছে কলা ধরার বা কড়ইএর ডাল ভেঙে পড়ার খবর যেমন দিই, তেমন করে এ খবরটিও দিই – *জান মা, ফুলবাহারির মা'র নিজের কুনো নাম নাই।*

মা শব্দ করলেন *হু।*

মা এতটুকু চমকান না শুনে মা'র বয়সী একজনের কোনও নাম নেই। এত নির্লিপ্তি মা'র, আমি বুঝি না, কেন।

–*মা, নাম ছাড়া আবার মানুষ হয় নাকি?* আমি বই থেকে চোখ সরিয়ে মনে জমে থাকা প্রশ্নটি করি।

–*এত প্যাঁচাল পারিস না ত। বই পড়। জোরে জোরে পড়।* মা খেঁকিয়ে ওঠেন।

বাধ্য মেয়ের মত দুলে দুলে পড়ি —

আপনারে বড় বলে বড় সে নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।

লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে।

সদা সত্য কথা বলিবে।

–*ফুলবাহারি, তুমার মার কুনো নাম নাই, জান?* পড়ার ফাঁকে ফুলবাহারিকে বলি চাপা স্বরে।

ফুলবাহারিও একটুও অবাক হয় না শুনে যে তার মা'র কোনও নাম নেই। যেন এটিই স্বাভাবিক। যেন এটি হওয়ারই কথা ছিল। সে, বরং বাঁকা চোখে তাকিয়ে আমার চোখে, অনুমান করতে চায় কোনও লুকোনো কারণ আছে কি না তার মা'র যে কোনও নাম নেই সে নিয়ে আমার আগ্রহের।

—*নাম নাই তো নাম নাই। নাম দিয়া কাম কি! গরিবের নাম থাকলেই কি না থাকলেই কি!* ফুলবাহারি চোয়াল শক্ত করে বলে।

মা প্রায়ই বলেন ফুলবাহারির নাকি তেজ খুব বেশি। কথা বলে *ব্যাডাগর লাহান, এক্কেরে ফাড়া বাঁশ।* তা ঠিক। ফুলবাহারির কথা আমাকে ভাবনায় ফেলে। তার মানে গরিবের কোনও নামের দরকার নেই! নাম দিয়ে কোনও কাজ নেই গরিবের! সম্ভবত ফুলবাহারি ঠিকই বলেছে। গরিবের ইস্কুলে যেতে হয় না, ইস্কুলের খাতায় নাম লেখানোর কোনও দরকার হয় না। গরিবের বাড়ি ঘর নেই, দলিলপত্রও তাই করতে হয় না, তাই নামেরও দরকার নেই। তাহলে নাম ছাড়াও বাঁচা যায়, অবশ্য গরিবেরাই বাঁচে কেবল। গরিবের কেবল নাম নয়, ওরা লেপ তোষক ছাড়াও বাঁচে, মাছ মাংস ছাড়াও, জুতো সেন্ডেল, জামা কাপড়, তেল সাবান, স্নো পাউডার ছাড়াও বাঁচে। ফুলবাহারির জন্য আমার খুব মায়া হতে থাকে, ওর নামহীন মা'র জন্যও। বালতির পানিতে ত্যানা ভিজিয়ে, চিপে, ফুলবাহারি উবু হয়ে মুছতে থাকে মেঝে। ওর কানে বিড়ি গোজা, কাজ কাম সেরে এই বিড়িটি ধরাবে সে। ফুলবাহারির বিড়ি খাওয়ায় বাড়ির কেউ আপত্তি করে না। ছোটলোকেরা বিড়ি তামাক খেতে পারে, কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েদের ওসব মুখে তোলা যাবে না। পুরুষ সে *বড়লোক* হোক, *ছোটলোক* হোক, যা ইচ্ছে করবে, যা ইচ্ছে খাবে, ফুঁকবে— বাধা নেই। ফুলবাহারির কালো লম্বা শরীরটি, বসন্তের দাগ-মুখ আর কানে গোঁজা বিড়িখানি আমার বড় চেনা। কাজের ফাঁকে মেঝেয় পাছা ঠেকিয়ে বিড়ি ধরায় ও, ফক ফক করে ধোঁয়া ছাড়ে। ফুলবাহারিকে তখনই, আমি লক্ষ করেছি সবচেয়ে খুশি খুশি দেখায়।

—*তুমি স্বরে অ স্বরে আ ক খ পড়তে জান না!* আমি ওর উবু হওয়া শরীরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি।

ফুলবাহারি মেঝে মুছতে মুছতে মাথা নেড়ে বলে— *না।*

কাগজে ঘসঘস করে স্বরে *অ* লিখে ফুলবাহারিকে বলি— *এইটা হইল স্বরে অ। কও স্বরে অ।*

ফুলবাহারি বলে — *স্বরে অ।*

মেঝে মোছা থামিয়ে, কৌতূহল চোখে।

— *আর এই যে দেখ, এইটা তুমার নাম, ফুলবাহারি।* নামটিও কাগজে লিখে মেলে ধরি ওর সামনে।

লেখাটির দিকে ও অবাক হয়ে তাকায় যেন এটি দূরের কোনও দেশের ছবি,, চিনতে পারছে না। ফুলবাহারি কাজে ফাঁকি দিচ্ছে, মা তাই বলবেন। মা ঘরে নেই বলেই ফুলবাহারি কাজ থামিয়ে মেঝেয় পাছা পেতে বসতে পারল, বসে বলতে পারল— *এইটা বুঝি আমার নাম খালা?*

তেজি মেয়ের মুখে তখন কচি খুকির হাসি।

ইচ্ছে করে ফুলবাহারিকে *স্বরে অ স্বরে আ* শেখাই, *কখগঘ* শেখাই, ফুলবাহারি নিজের নাম লিখতে পারবে নিজে।

—*আইচ্ছা ফুলবাহারি, তুমি আমারে খালা কইয়া ডাক ক্যান? আমি ত তুমার অনেক ছোট।*

আমার প্রশ্ন শুনে বোকা-চোখে তাকায় আমার দিকে ফুলবাহারি। বলে

—*ওরে বাবা, আপনেরে খালা কমু না ত কি! আপনেরা বড়লুক। বয়সে ছোট হইলান,তাতে কি! বড়লুক হইলে, এমন কি কুলের আবুরেও কুনোদিন নাম ধইরা ডাকতে নাই। আমরা গরিব, আমরা এই কপাল লইয়াই জন্মাইছি।*

আমি হেসে নিজের কপালে হাত রেখে বলি—*তুমার কপাল যেইরম দেখতে, আমার কপালও। গরিবের কপাল কি ব্যাকা হয়?*

ফুলবাহারি হেসে ফেলে, কচি খুকির হাসি ওর মুখে, বলে— *এইডা কি আর এই কপাল! কপাল বলতে বুঝাইছি, ভাইগ্য।*

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বালতির পানিতে ত্যানা ভিজিয়ে ঘরের বাকিটুকু চৌকাঠ সহ মুছে নিতে নিতে ফুলবাহারি আবার বলে—*বাপ মরার পর কপাল আমগোর আরও পুড়ল। মাইনষের বাড়িত বান্দিগিরি কইরা খাইতে অয় অহন। লেহাপড়া কি আমগোর কপালে আছে!*

জিজ্ঞেস করি — *তুমার বাপ নাই!কবে মরছে! কেমনে?*

ফুলবাহারি চোখ না তুলে বলে—*বাতাস লাইগা মরছে।*

—*বাতাস? বাতাস লাগলে মাইনষে মরে নাকি?* বকের মত গলা লম্বা হয়ে ওঠে বিস্ময়ে।

—*জিনের বাতাস খালা। বাপে হাতপাও লুলা অইয়া বিছনাত পড়ল। পড়ল ত পড়লই। আর উঠল না।* চৌকাঠ মুছে বড় একটি শ্বাস ছেড়ে বলে ফুলবাহারি। ওর পরনের মোটা বাইনের শাড়িটি হাঁটুর কাছে ছেঁড়া। ফুলবাহারির এটি ছাড়া আর একটি সবুজ রঙের শাড়ি আছে। ওটি আরও ছেঁড়া। ওর জন্য আমার আবারও বড় মায়া হতে থাকে।

ফুলবাহারি ঘর মুছে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। ওর প্রস্থানের দিকে নিষ্প্রাণ তাকিয়ে থাকি। ভেতরে তোলপাড় করে জিনের বাতাস লেগে মানুষ মরার খবর।

মা'কে জিজ্ঞেস করে পরে উত্তর পেয়েছি, *জিনের বাতাস লাগলে হাত পা অবশ হইয়া যায়, কথাডা সত্য।*

জিন ভূত ব্যাপারগুলো কেমন যেন অদ্ভুত ব্যাপার! কেবল শরাফ মামাই ভূত দেখে বাড়ি ফেরেন, আমার কখনও দেখা হয়নি। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় পেত্নির বিজলি দেখতে, সেও দেখা হয়নি, সারাদিন জানালার ফুটো দিয়ে বাইরে বাঁশঝাড়ের অন্ধকারে তাকিয়ে থেকেও।

সেদিনের পর সপ্তাহ পার হয়নি, জিনের বাতাস লাগল গেঁতুর ওপর। গেঁতুর ডান পাখানা হঠাৎ অবশ হয়ে গেল। গেঁতুর মা ছেলের শোকে পাগল, নানির বাড়ি এসে সে গেঁতুর জন্য *বিলাপ পেড়ে কাঁদে*, দেখতে যাওয়ার তার অনুমতি মেলে না। গিয়েওছিল বাড়ির উঠোন অবদি, ঝাঁটা মেরে তাড়িয়েছে গেতুঁর বাবা। *বাইন তালাকের* পর গেঁতুর

মা'র আর অধিকার নেই গেঁতুর ছায়া মাড়ানো, পেটের ছেলে, তা হোক। গেতুঁর মা'র বিলাপ নানির বাড়ির লোকেরা কেউ খাটে বসে, কেউ দরজায়, আমগাছতলায়, কলতলায় দাঁড়িয়ে দেখেন, ঝুনু খালা আহা আহা করে বেণি দুলিয়ে চলে যান ঘরের ভেতর। নানি পান সাজতে থাকেন নিশ্চুপ। হঠাৎ বিষম এক হুংকার ছুঁড়ে গেঁতুর মা'কে দূরে সরতে বলেন টুটু মামা। মেয়েমানুষের *কান্নাকাটি* তাঁর নাকি অসহ্য লাগে। মুখে আঁচল পুরে কান্না থামিয়ে চলে যেতে হয় গেঁতুর মাকে, আমাকে কেউ লক্ষ করে না যে আমিও যাচ্ছি তার পেছন পেছন। বাঁশঝাড়ের তলে আমার ভয় পাওয়ার কথা, পাই না। জিনের বাতাস লেগে আমারও যে হাত পা অবশ হয়ে যেতে পারে, ভুলে যাই। আমি *বেখেয়ালি বেহিশেবি বেত্তমিজ বেয়াদ্দপ* মেয়ে। গেঁতুর মা রেললাইনের দিকে হাঁটে, ছায়ার মত আমিও। লাইনের ওপর বসে গেঁতুর মা কাঁদে, আমি পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়তে থাকি লোহার পাতে। ঠং ঠং, ঠং ঠং। গেঁতুর মা কান্না থামিয়ে দেখেন পেছনে দাঁড়িয়ে আছি আমি, আমার না আঁচড়ানো চুল, ধুলো মাখা পা, না মাজা দাঁত। বলি–*কাইন্দ না গেঁতুর মা। সইরা বও, রেলগাড়ি আইয়া পড়ব। গেঁতু দেইখ্যো ওর বাপেরে বটি দিয়া কুপাইয়া মাইরা তুমার কাছে চইলা আইব একদিন।*

বটি দিয়ে কুপিয়ে, মা বলেছিলেন ফুলবাহারিকে মারবেন, যেদিন শিংমাছের তরকারি চুলোয় রেখে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ওদিকে তরকারি পুড়ে ছাই; আর বাবার বুক পকেট থেকে গোপন চিঠিটি পাওয়ার পর মা রাজিয়া বেগমকেও চেয়েছিলেন। বটি দিয়ে কুপিয়ে মা ফুলবাহারিকে মেরে ফেলছেন বা রাজিয়া বেগমকে, ভেবে, যদিও রাজিয়া বেগম মানুষটিকে দেখিনি কখনও, মনে হত দেখতে বোধহয় ঝুনু খালার মত, মায়া হত। গেঁতু হাতে বটি নিয়ে গেঁতুর বাবাকে মেরে ফেলছে দৃশ্যটি আমি খুব সহজে কল্পনা করতে পারি। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গেঁতুদের বাড়ির উঠোন ভাবতে আমার গা কাঁপে না, বাঁশঝাড়ের তল দিয়ে সন্ধেয় আসার মত গেঁতুর মার পেছন পেছন, যেমন গা কাঁপেনি।

গেঁতু মরে যাওয়ার দিন পাঁচেক পর আবার জিনের বাতাস লাগল ঠান্ডার বাপের ওপর। জিলিপির দোকান বন্ধ করে ঠান্ডার বাপ পড়ে রইলেন বিছানায়। কাশির সঙ্গে বেরোতে লাগল দলা দলা রক্ত। মৌলবি এসে মাঝে সাঝে ফুঁ দিয়ে যায়, শর্ষিনার পীরের কাছ থেকে পড়া পানি এনে খাওয়ানো হল ঠান্ডার বাপকে। রক্ত ঝরা থামেনি তবুও। জিনের বাতাস লাগলে লোক বাঁচে না, তাই বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়ে ঠান্ডা হয়ে বসে রইল ঠান্ডার বাপের আত্মীয়রা। খবর পেয়ে বাবা একদিন নিজে বস্তিতে গিয়ে হাজির, *কি ব্যাপার দেখি কী হইছে* বলে ঠান্ডার বাপের নাড়ি টিপে, চোখের পাতা টেনে নামিয়ে, জিভ বের করতে বলে কী সব দেখলেন, এরপর ঠান্ডাকে বললেন দোকান থেকে যক্ষার ওষুধ কিনে আনতে। ওষুধ খেয়ে সেরে গেলেন ঠান্ডার বাপ। এ কী কান্ড, জিনের বাতাস লাগা লোক দেখি দিব্যি তাজা। সপ্তাহও পেরোল না, ঠান্ডার বাপ আবার জিলিপির দোকান খুলে বিক্রিবাটা শুরু করলেন। চোখের সামনে এই ব্যাপারটি ঘটে যাওয়ার পর আমার জিনের বাতাসকে মোটেও মারাত্মক কিছু বলে মনে হল না। বাবাকেও দেখি ঠান্ডার বাপ বেঁচে উঠল বলে মোটে অবাক হলেন না, যেন তাঁর বাঁচারই কথা ছিল। বাবা, আমার বিশ্বাস হয়, চাইলে গেঁতুকেও বাঁচাতে পারতেন।

সম্পর্কে ফুলবাহারির লতায় পাতায় মামা হন ঠান্ডার বাপ। অবশ্য ফুলবাহারি বা তার মা সম্পর্কের দাবি করলে ঠান্ডার বাপ স্বীকার করেন না যে তিনি আদৌ এদের আত্মীয়। ফুলবাহারি নিজে বিড়ি খেতে খেতে আমাকে বলল একদিন —*দুহান আছে তার, পইসা অইছে। অহন আর স্বীকার যায় না আমরা যে হের আত্মীয়, মাইনষের বাড়িত বান্দিগিরি করি যে, হেইলিগা। গরিবের মধ্যেও উচা নিচা আছে।*

ঠান্ডার মা পাড়ায় বলে বেড়িয়েছে যে শর্ষিনার পীরের পড়া পানি খেয়ে জ্বিনের বাতাস ছেড়েছে তার খসমের। অবশ্য ফুলবাহারির বিশ্বাস—*নানার ওষুধেই বালা হইছে মামু। মাইনষে কয়, বাতাস লাগলে নাহি বাচে না। কই বাচল ত।*

ফুলবাহারি মানুষের কথায় তেমন আস্থা রাখে না। কালো ঘাড় সে টান টান করে রাখে যখন কথা বলে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে হাশেম মামা জন্মানোর পর নানির দুটো ছেলে পর পর জন্ম নিয়ে জ্বিনের বাতাস লেগে মরেছিল, মা সে কথা স্মরণ করেন ঠান্ডার বাপের বাতাস লাগার পর। ছেলে পাতলা পায়খানা করছে, বুকের দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, কবিরাজ এসে ফুঁ দিয়ে গেল, বলল সাহাবউদ্দিনের বাড়ির জামগাছটিতে যে জিন বসে থাকে, সেই জিনেরই বাতাস লেগেছে ছেলের গায়ে। নানিকে বলা হল চামড়া আর লোহা সঙ্গে রাখতে। চামড়া বা লোহা দেখলে জিন ভেড়ে না। নানি এক টুকরো চামড়া, ভাঙা এক লোহা হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরোন, রান্নাঘরে, পেশাবখানায় যেখানেই যান। জিন যদি আবার নানির কাঁধে চড়ে ছেলের সামনে হাজির হয়, তাই ঘরের ভেতরে ঢুকেও নানিকে ডিঙোতে হত আগুন, মুড়া ঝারু দিয়ে গা ঝেড়ে নিতেন নিজের, যেন শরীরের আনাচ কানাচে লুকিয়ে থাকা দুষ্ট জিন বিদেয় হয়। এত করেও অবশ্য ছেলেদুটো বাঁচেনি। ছেলে জন্ম দেওয়ার পর মা'র জন্যও একইরকম আয়োজন করেছিলেন নানি, ঘরে আগুন জ্বেলে রাখতেন, মা পেশাব পায়খানা করতে ঘরের বাইরে গেলে মুড়া ঝাড়ু নিয়ে বসে থাকতেন ঘরে, ফিরে এলে মা'কে আগুন টপকে আসতে বলতেন, এলে হাতের ঝাড়ু দিয়ে গা ঝেড়ে দিতেন। একই আয়োজন জ্বিনের বাতাস থেকে সন্তান বাঁচানোর।

আমি জন্ম নিলে মা'র আগুন টপকে ঘরে ঢোকা দেখে বাবা বলেছিলেন *এইগুলা আবার কি কর?*

করতে হয়, মা বলেন *বাচ্চার বাতাস লাগলে দুধ খাওয়া ছাইড়া দিব, আমাশা হইয়া মরব।*

মা'র চার ছেলেমেয়ে আমরা দিব্যি বেঁচে আছি। কেউ আমরা দুধ ছাড়িনি, আমাশা হলেও, মরিনি। কারও গায়ে জিনের বাতাস লাগেনি। মা অবশ্য *আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়া জায়ালাজ জুলুমাতে ওয়াননূর, ছুম্মাল্লাযীনা কাফারু বিরাব্বিহিম ইয়াদিলুন* বলে বলে তাবৎ রোগ থেকে নিজেকে এবং ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়েছেন বলে অনেককে বলেন, বাবাকেও। বাবা শুনেও শোনেননি ভাব করেন।

ঠান্ডার বাপের রোগ সারার পর বস্তি থেকে বাতাস লাগার খবর কমে এল, আর মাঝে মাঝে যে সব বাতাস লাগা দু'চারজনকে দেখেন বাবা, সারিয়ে ফেলেন ওষুধে, কারু কারুকে আবার হাসপাতালে পাঠান। সুস্থ হয়ে ফিরে আসে ওরাও।

ফুলবাহারি এ বাড়ির কাজ ছেড়ে দেবার পর জ্বরে ধরল তাকে। এবার আর জিনের বাতাস কেউ বলল না। *এতদিনে আল্লায় একটা কামের কাম করছে। লাজ শরম একদম আছিল না বেটির। ধপধপাইয়া হাঁটত। জ্বরে ভুইগা যেন এই বেটি মরে আল্লাহ।* মসজিদের ইমাম সেরে যাওয়া ঠান্ডার বাপের বাহুতে তাবিজ লাগিয়ে দিয়ে বলে গেলেন।

জ্বর হয়েছে খবর পেয়ে ফুলবাহারিকে দেখতে যাব বললে মা আমাকে কানের লতি টেনে বললেন *ঠ্যাং লম্বা হইয়া গেছে, টই টই কইরা খালি ঘুরাঘুরির তাল!*

আমার আর দেখতে যাওয়া হয়নি ফুলবাহারির জ্বর। জ্বর সারলে শুনি ফুলবাহারির বিয়ে হয়ে গেছে বস্তিরই এক ফোকলা দাঁতের বুড়ো, বয়স সত্তর মত, ঘরে তিনটে বউ আছে, তার সঙ্গে। ফুলবাহারির বিয়ের জন্য তার মা টাকা চাইতে এল নানির বাড়ি। নানি তাকে, দেখলাম, আঁচলের খুঁট খুলে পাঁচ টাকা বার করে দিলেন। আরও দুটো তিনটে বাড়ি থেকে টাকা যোগাড় করে ফুলবাহারির জন্য একটা লাল শাড়ি কেনা হল। বুড়োকে দেওয়া হল দু'শ টাকা *যৌতুক।* ফুলবাহারিকে আমার মনে হল, হঠাৎ যেন বড় দূরে সরে গেছে। তাকে আর আমাদের রান্নাঘরের বারান্দায় অলস বিকেলে বিড়ি ফুঁকতে দেখব না, তার সঙ্গে আমার গল্পও আর হবে না আগের মত। ফুলবাহারি এখন আর কারও বাড়িতে *বান্দিগিরি* করবে না। সে তার স্বামীর জন্য রাঁধবে বাড়বে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে কলসি কাঁখে পুকুরে যাবে পানি আনতে। ফুলবাহারিকে এমন রূপে, আমার মনে হয় না, ঠিক মানায়। ওর *ধপধপাইয়া* হাঁটাটিই ছিল সুন্দর। রাস্তার ছোকরারা ওর পেছন পেছন নেচে নেচে *চুতমারানির বেডি* বলেছিল যেদিন, আমার চোখের সামনে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফুলবাহারি চড় কষিয়েছিল এক ছোকরার গালে। আমি মুগ্ধ দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, হাতে ধরা গ্যাস বেলুনটি কখন উড়ে গিয়েছিল আকাশে, টের পাইনি।

বেল গাছ তলা ধরে যেতে যেতে গোধূলির ধূলির মত আবছা আঁধারে মিশে যেতে যেতে ফুলবাহারির মা বলে—*ফুলবাহারিডারে মাইরা ফেলছে হের জামাই, গলা টিইপা। কান্দি না। কাইন্দা কী লাভ। কানলে কি আমার ফুলবাহারি ফিইরা আইব! আল্লায়ই বিচার করব।*

বেদেনির ঝুড়ি থেকে বের হয়ে এক বিশাল অজগর তার বিশাল হাঁ মুখে আমাকে গিলে ফেলে যেন। এক বোবা বিকট কষ্ট আমাকে আমি শতটুকরোয় ছিঁড়তে থাকে, আমার নিজের গুঁড়ো গুঁড়ো কষ্টকে থেতলে ফেলে বুকের *পাটায়।* ভেতরে শব্দ শুনি ঘসঘসসস ঘসসসস।

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

বড় মামা বলেছিলেন উঠোন ভরা জ্যোৎস্নার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে। পূর্ণিমার চাঁদকে *রুটি* বলাতে কানামামু জলচৌকিতে বসা কানামামু সোহরাব রুস্তমের গল্প থামিয়ে বড়মামার কথায় থেমে, হেসে – *কে খাইতে চায় রুটি, কার পেটে এত ক্ষিদা!* জিজ্ঞেস করেন।

–হাজার হাজার গরিব মরে না খাইয়া।

বড়মামা খড়ম পায়ে খট খট হেঁটে উঠোনে, বলেন।

কেউ যেন শুনতে না পায় বলেছিলাম

–পেড়ে দাও চাঁদরুটি, কিছু খাবো,

বাকিটুকু বস্তিতে বিলাবো।

কানা মামুর কান খাড়া। বললেন – *সবাই কবি হইয়া গেলি নাকি! কে কইল বস্তিতে বিলানোর কথা! কে!*

আমি শব্দ না করে মুখ ঢেকেছিলাম হাতে।

নিজে নিজে ছড়া বানানো আমার *বদঅভ্যেসগুলোর* মধ্যে একটি। মা পড়াতেন *তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে,* আমি বলতাম *বটগাছ পাঁচ পায়ে দাঁড়িয়ে, সাত হাত বাড়িয়ে!*

ইস্কুলে ছড়া বলতে বললে আসল ছড়া ভুলে *তামাশার ছড়া* মাথায় ঘুরঘুর করত।

মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি দাঁড়াও না একবার ভাই।

নানিবাড়ির উঠোনে সন্ধেবেলা শীতল পাটির ওপর হারিকেনের আলোয় বই মেলে শব্দ করে ছড়া পড়তে পড়তে কানামামুকে হেঁটে আসতে দেখে মৌমাছির বদলে বলেছিলাম

কানামামু কানামামু কোথা যান হাঁটি হাঁটি দাঁড়ান না একবার ভাই।

কিচ্ছা শুনাতে হবে, পুলাপান খুঁজিতেছি, দাঁড়াবার সময় ত নাই।

মা ঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলেছিলেন – এইসব কি হইতাছে? বড় বদঅভ্যাস তর। ছড়া লইয়া তামাশা করস।

নববর্ষে ইস্কুলের মেয়েদের নাম দেয় *ফাজিল* মেয়েরা। ভোরবেলা নাম টাঙানো থাকে দেয়ালে। কে লিখেছে, কে টাঙিয়েছে, কেউ জানে না। সকলে ভিড় করে নাম পড়ে। আমার নাম এক দেয়ালে *ফাডা বাঙ্গি,* আরেক দেয়ালে–*ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না।*

দিলরুবা, ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির নাম দেওয়া হয়েছে –*খানকি।*

আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম *তোমার নাম দিয়েছে খানকি, খানকি মানে কি?*

ওর চোখে মুহূর্তে জল চলে আসে। কোনও উত্তর দেয় না ও। ওকে দেখে এমন মায়া হয় আমার, আমি ওর পাশে এসে বসে নরম একটি হাত রাখি ওর পিঠে। শব্দটি আমি মা'র মুখে, যখন গাল দেন কাজের মেয়েদের, শুনেছি, কিন্তু অর্থ জানি না এর। দিলরুবার

জন্য মায়া হওয়ার পর, ওর কাছে এসে বসার পর, একটু একটু করে অন্ধকার কাটতে কাটতে যেমন ভোর হয়, তেমন দিলরুবার আলোয় অল্প অল্প করে আমি পদ্ম ফুলের মত ফুটি। দিলরুবা আমার বন্ধু হয়ে ওঠে নতুন বছরের মন খারাপ করা দুপুরে। বন্ধু হওয়ার পর ও লতার গল্প, পাতার গল্প, টোনার গল্প, টুনির গল্প আমাকে করে। গল্প শুনতে শুনতে আমি লতাপাতাদের ঘর টোনাটুনির জীবন মনের ভেতর সাজিয়ে নিই, পরে ওর বাড়ি গিয়ে লতা পাতা টোনা টুনিকে দেখি, মামুলি কিছু কথাও হয়। কিন্তু সত্যিকার ওরা আর গল্পের ওরা ভিন্ন মনে হয় আমার কাছে। সত্যিকার ওদের চেয়ে গল্পের ওদের আমার আপন মনে হয় বেশি। লতার সঙ্গে দেখা হলে ওর অসুখ সেরেছে কি না জিজ্ঞেস না করে দিলরুবাকে জিজ্ঞেস করতাম, লতার তারপর কি হল! দিলরুবা বলে *লতার তারপর অসুখ সারেনি, বৈদ্য এল, কবিরাজ এল, ডাকতার এল, লতা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে লাগল, শুকোতে শুকোতে চিকন একটি সুতো হতে লাগল, সুতোটি ঝুলতে লাগল ঘরে, সুতোটিকে কেউ বলল জলে ভাসিয়ে দাও, কেউ বলল বুকে জড়িয়ে রাখো। তারপর একজন বুকে জড়ালো লতাকে, চুমু খেল, লতা চোখ মেলল, হাসল, লতাকে দেখে মনে হল লতা বাঁচবে এবার।* দিলরুবা যখন গল্প বলে, ও ঠিক এই জগতে দাঁড়িয়ে বলে না। ওর চোখে আমি তাকিয়ে দেখেছি, ও যখন আমার দিকে তাকায়, আমাকে দেখে না, দেখে অন্য কিছু।

লতার অসুখ নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা যাওয়ার পর, দিলরুবা এক খাতা কবিতা আমাকে দেখালো, ওর লেখা। পড়তে পড়তে ঘাস নামে একটি কবিতায় আমি থমকালাম।

ঘাস,
তুমি আমাকে নেবে? ঘাসফুল, নেবে? খেলায়?
আমি দিন ফুরিয়েছি ঘুরে ঘুরে মেলায়,
আমার যা কিছু আছে নাও,
তবু একবার স্পর্শ কর আমাকে, ছুঁয়ে দাও।
এসেছি তোমার কাছে বড় অবেলায়।
তুমি যদি ছুঁড়ে ফেলো হেলায়,
ভাসিয়ে দাও নিরুদ্দেশে ভেলায়।
আমি ফিরে তোমার কাছেই যাব
শতবার নিজেকে হারাব।

—আমারে কবিতা লেখা শিখাবা, দিলরুবা?

ঘাস কবিতাটির ওপর ঝুঁকে বলি আমি।

দিলরুবার নিখুঁত মুখখানায় চিকন গোলাপি ঠোঁট, এক ঝাঁক কোঁকড়া চুল মাথায়, চুল পেছনে খোঁপার মত বাঁধা, বেরিয়ে আসে কিছু অবাধ্য চুল কপালে, ঘাড়ে, চিবুকে। ওকে কোথায় যেন দেখেছি এর আগে। ওর অবাধ্য চুলগুলো দেখেছি আগে কোথাও। এর আগে, মনে হয় এই যে আমি কবিতা শিখতে চাইছি, আর ও আমাকে বলছে না যে ও আমাকে শেখাবে, যেন দৃশ্যটির ভেতরে কখনও ছিলাম আমি, বড় চেনা একটি ছবি। আমি যেন এরকম একা এক মেয়ের পাশে বসেছিলাম কোথাও কবে। মেয়েটি দেখতে

ঠিক এরকমই ছিল, আমাদের সামনে ছিল খোলা কবিতার খাতা, সামনে ছিল খোলা জানালা, জানালার ওপারে ছিল ধু ধু মাঠ, আকাশ এসে গড়াচ্ছে সে মাঠে।

আমার চেয়েও দিলরুবা কম কথার মেয়ে। আমার চেয়েও দু'কাঠি লাজুক। ইস্কুলের মাঠে যখন হৈ চৈএ মাতে মেয়েরা, ও দিব্যি জানালায় বসে তাকিয়ে থাকে দূরের আকাশে।

—কবিতা লেখা কাউকে শিখানো যায় না। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে, দেখবে কান্না আসবে। তুমি যদি অনেক কাঁদতে পারো, লিখতে পারবা। দিলরুবা উষ্ণ গলায় বলে আমাকে।

দিলরুবা ক্লাসে মন দেয় না বলে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ওকে সারা ক্লাস। ক্লাস থেকে বেরও হয়ে যেতে হয় কখনও কখনও। ও ক্লাসের বাইরে দরজার কাছে দিব্যি এক পায়ে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে। আকাশের সঙ্গে অদ্ভুত এক ভালবাসা ওর। ওকে দেখলে আমার ঘোর লাগে। ঘোরের মধ্যে আমি ওর পাশে পাশে হাঁটি, কথা বলি, কাঁধে হাত রাখি।

আকাশে তাকিয়ে দিলরুবার মত আমার কান্নাও আসে না, কবিতা লেখাও হয় না। বরং দিলরুবার মুখটি মনে করে, একদিন হঠাৎ লিখি ইস্কুলের মাঠে ছেঁড়া একটি ঠোঙা পেয়ে, ওতে।

আমি তোমায় খেলায় নেব দিলরুবা,
গোল্লাছুট খেলতে জান?
গোল্লা থেকে এক বিকেলে হঠাৎ করে ছুটে
হারিয়ে যাব দূরে কোথাও, অনেক দূরে।
সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপার যাব, যাবে?

ঠোঙার লেখাটি পড়ে দিলরুবা মিষ্টি হাসে। এমন মিষ্টি হাসি আমি দেখিনি আগে। সম্ভবত রুনির ছিল এমন হাসি, অথবা এমন নয়, খানিকটা অন্যরকম। এমন হাসি যার, তার কথা বলার দরকার হয় না, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ঠিকই লিখেছিলেন। রুনির সামনে আমি ছিলাম লজ্জাবতী লতা। দিলরুবার সামনে নই। দিলরুবাকে নিয়ে আমার অন্যরকম এক জগত তৈরি হয়। শব্দ নিয়ে খেলার জগত। দিলরুবা লেখে ওর কবিতার খাতায়

যেদিকেই যেতে বল যাব,
নিজেকে হারাব।
কাছে এসো,
একটিই শর্ত শুধু, ভালবেসো।

আমি তো ওই জানি শুধু, ভালবাসতে। আমাদের ভালবাসা গভীর হতে থাকে, গভীর। দু'জন আমরা হারিয়ে যাই যেদিকে দুচোখ যায়, সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপারে। সে কেবল মনে মনেই। দিলরুবার বা আমার কারও সত্যিকার হারানো হয় না সমাজ সংসার থেকে। দিলরুবা যে তার কবিতার মত, কবিতা তার শান্ত একটি পুকুরের মত, কোনও এক অরণ্যে একটি নিরালা নিভৃত পুকুর, আকাশের রঙের মত রঙ সে জলের, হঠাৎ হঠাৎ

একটি দু'টি পাতা পড়ে টুপ করে সে জলে, যেন ভেলা, দিলরুবার জলে ভাসার ভেলা, একান্ত ওরই। সেই দিলরুবা একদিন আমাকে চমকে দিয়ে বলে, তার বিয়ে হয়ে যাবে শিগরি, তার বাবা বিয়ে ঠিক করেছে।

—*না!* দিলরুবার ম্লান মুখ আর ধূসর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বলি —*তুই না করে দে। বল যে বিয়ে করবি না।*

দিলরুবা আবারও ম্লান হাসে। গা পুড়ে যাওয়া জ্বরে পড়লে মানুষ এমন হাসে। পরদিন থেকে দিলরুবা আর আসে না ইস্কুলে। আমি এত একা হয়ে যাই। এত একা, যে, ক্লাসঘরে জানালার কাছে ওর না থাকা জুড়ে বসে থাকি, ছুটির পরও, অনেকক্ষণ। আকাশে তাকিয়ে ওকে খুঁজি। ও কি আকাশে চলে গেল অভিমান করে, কে জানে! এই প্রথম আকাশে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার কান্না আসে।

বিয়ে হয়ে যাওয়ার দু'দিন আগে দিলরুবা এসেছিল *অবকাশে।* এসেছিল সত্যিকার হারিয়ে যেতে, সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপারে কোথাও! কোনও নিভৃত অরণ্যে। স্বপ্নলোকে। এই নিষ্ঠুর জগত সংসার থেকে অনেক দূরে, যেখানে পাখা মেলে দুঃখবতী মেয়েরা উড়ে উড়ে মেঘবালিকাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। কালো ফটক খুলে ও ঢুকেছিল। জানালায় দাঁড়িয়ে ওর নিখুঁত মুখটি আমি অপলক দেখছিলাম, দেখছিলাম স্বপ্নের বাগান ধরে ওর হেঁটে আসা, যেন ও হাঁটছে না, দুলছে। দিলরুবাকে জানালায় দাঁড়িয়েই আমি দেখলাম ফেরত যেতে। আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়নি। দরজা থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছেন বাবা। তাড়িয়ে দিয়েছেন কারণ তিনি কোনও যুক্তি খুঁজে পাননি একটি কিশোরীর লেখাপড়া ফেলে বিকেলবেলা কারও বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার। তাই ওর নাম ধাম জিজ্ঞেস করে, বাড়ি কোথায়, কেন এসেছ, কী কারণ ইত্যাদির উত্তর নিয়ে রক্তাভ চোখ আর বা হাতের তর্জনি তুলেছেন কালো ফটকের দিকে।

এক্ষুনি বেরোও, গপ্প মারতে আসছ! বাজে মেয়ে কোথাকার!

বাজে মেয়ে বেরিয়ে গেছে। *খানকি মেয়ে* বেরিয়ে গেছে। আর কখনও ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে না, আমি তখন জানিনি। কোনও এক বেশি বয়সের অচেনা এক লোকের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে যাবে। কবিতার খাতা পুড়িয়ে দিয়ে, লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে মশলাবাটার, পিঁয়াজ কাটার, রেঁধে বেড়ে কাউকে খাওয়ানোর আর বছর বছর পোয়াতি হওয়ার জীবনে ওকে ঢুকতে হবে, সত্যিই, আমি তখনও জানিনি।

আর আমি, দিলরুবার হয়ে আকাশ দেখতে থাকব, আমার কান্না আসতে থাকবে, আর আমি কবিতা লিখতে থাকব। আমি ঘৃণা করতে থাকব সমাজ সংসার। ঘৃণা করতে থাকব আমার এই অদৃশ্য বন্দিত্ব। আমি অনুভব করতে থাকব আমার হাত পায়ের শেকল। অনুভব করতে থাকব আমার ডানা দুটো কাটা, একটি শক্ত খাঁচার ভেতরে বসে আছি অনন্তকাল ধরে।

অথবা একটি খাঁচা আমার ভেতরে বসে আছে ঘাপটি মেরে, আমাকেই দলামোচা করে পোরে ভেতরে, যখন উড়াল দিতে চাই।

মুবাশ্বেরা, বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে, বাড়ির মানুষদের তাজ্জব করে দিয়ে মরে গেল, বৃহস্পতিবার রাতে। মুবাশ্বেরাকে আমি দেখেছি আমাদের বাড়ি ও বেড়াতে এলে অথবা পীর বাড়িতে আমি গেলে। ওর সঙ্গে মিছিমিছির চুলোপাতিও আমার খেলা হয়েছে আমাদের উঠোনে, ছাদে। আর ওর বাড়িতে চুলোপাতি খেলার নিয়ম যেহেতু নেই, ও খেলেছে *কারবালা যুদ্ধ,* মুবাশ্বেরা *হাসান,* মহাম্মদ *হোসেন।* এয়াজিদ আর মাবিয়াকে ওরা ঘুসি ছুঁড়ত, লাথি মারত, শূন্যে। কারণ কেউই এয়াজিদ বা মাবিয়া হতে চাইত না। আমি ছিলাম ওদের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার একমাত্র দর্শক।

ফজলিখালার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার সখ্য হয়নি কোনওদিন, খুব দূরের মনে হত ওদের। ওরা, আমরা যে স্বরে ও সুরে কথা বলি, বলে না, বলে অবাঙালির মত, উর্দু টানে। ওরা, পাঁচ বছর বয়সেই নামাজ রোজা শুরু করে, ন বা দশে পৌঁছে বোরখা পরে। ওরা ইস্কুলে যায় না, মাঠে দৌড়োয় না, বাড়ির বাইরে বেরোয় না একা, কারণ ওদের মুরব্বিরা বলে দিয়েছ ওসব করলে আল্লাহ নারাজ হবেন।

মুবাশ্বেরার যখন পনেরোর মত বয়স, আবু বকরের ইস্পাতের কারখানাটি তখন পীর বাড়ির সম্পত্তি। আবু বকর আল্লাহকে সাক্ষী রেখে কারখানাটি লিখে দিয়েছেন পীর আমিরুল্লাহর নামে। পিঁপড়ের মত লোক ভিড় করে পীরের মজলিশে, পীর নিজে পছন্দ করে, খাঁটি *আল্লাহভক্ত* লোক বেছে কারখানার চাকরিতে ঢোকান। টুটু আর শরাফমামা তখন লেখাপড়া আস্তাকুড়ে থুয়ে পীরবাড়িতে ঢুকেছেন। ফজলিখালা নিজের ভাইদের দুনিয়াদারি ছাড়িয়ে *আল্লাহর পথে* আনতে পেরে খুশিতে আটখানা। প্যান্ট শার্ট ছেড়ে টুটু আর শরাফ মামা পাজামা পাঞ্জাবি পরেন, মাথায় গোল টুপি পরেন, দাড়িমোচ চাছেন না। দুনিয়াদারির ছিঁটেফোঁটা শেকড় যা আছে উপড়ে ফেলতে ছোট ছোট ঘরগুলোয় বসে হুমায়রা, সুফায়রা, মুবাশ্বেরা ওঁদের নছিহত করে। হেদায়েতের মালিক আল্লাহ। হঠাৎ একটি নছিহতের ঘরে ঢুকে আমাকে টুটু মামার ধমক খেয়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। টুটু মামা শুয়েছিলেন, আর হুমায়রা পাশে বসে তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে নছিহত করছিলেন। নছিহত করতে হয় অমন একলা ঘরে, বুকে হাত বুলিয়ে, ঘর অন্ধকার করে। মা অমনই বলেছিলেন। শরাফ মামাকে নছিহতের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল মুবাশ্বেরা। এ তো আর পর পুরুষকে নছিহত করা নয়, নিজের মামাকে করা। ওই নছিহত করার কালেই মুবাশ্বেরাকে জিনে ধরল। এই জিন আবার অন্যরকম, গাছের তলায় বসে একা একা কাঁদে। কেন কাঁদে, কাউকে বলে না কিছু। খেতে রুচি নেই, বমি বমি লাগে, নামাজ রোজায় রুচি নেই, কেবল গাছের তল খোঁজে। নছিহতে ভাঁটা পড়ে। সেই খলবলে মেয়ে, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা মেয়ে মুবাশ্বেরা বিছানা নিল। জিন তাড়ানোর ব্যবস্থা করার আগেই তার গা পুড়ে যাওয়া জ্বর। পানি পড়া খাওয়ানো হয়, নানা রকম সুরা পড়ে ফুঁ দেওয়া হয় গায়ে, জ্বর তবু সারে না। ফজলিখালা মুবাশ্বেরার মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকেন। কপালে জলপট্টি দেন, জলপট্টি থেকে ধোঁয়া বেরোতে থাকে গায়ের আগুনের। মুবাশ্বেরার শ্বাস কষ্ট হতে শুরু হয়।

ফজলিখালা বলেন – *আর পারি না। এবার ডাক্তার ডাক।*

–*ডাক্তার!*

–*পানিপড়ায় জ্বর সারছে না, ডাক্তারের ওষুধে সারবে?*

মূসা, ফজলিখালার মেদেনিপুরি স্বামী বলেন।

–*না সারুক, চেষ্টা করতে তো দোষ নেই! আল্লাহুসশাফি, ভাল করার মালিক আল্লাহ, ওষুধ উছিলা মাত্র।*

ডাক পড়লে *ডাক্তার রজব আলী* তাঁর ডাক্তারি ব্যাগখানা হাতে নিয়ে রোগীর রোগ ভাল করতে যান পীরবাড়িতে, রাত তখন সাড়ে বারো।

রোগী শুয়ে আছে শাদা বিছানায়। সাত দিনের জ্বরে ভোগা শীর্ণ রোগী। জিভ শাদা, চোখ শাদা, নখ শাদা। ফ্যাকাসে। বিবর্ণ।

ডাক্তার নাড়ি টেপেন, রক্তচাপ মাপেন, হৃদপিণ্ডের শব্দ শোনেন। ডাক্তার ঘর খালি করতে বলেন দশ মিনিটের জন্য, দশ মিনিট পর ফিরে আসতে বলেন ঘরের লোকদের, ঘরে। ডাক্তার ইনজেকশন দেন রোগীকে। ডাক্তারের কপালে বাড়তে থাকে ভাঁজ। ভাঁজ নিয়েই ডাক্তার বলেন – *দেখ, কি হয়।*

ডাক্তার কোনও পারিশ্রমিক নেন না, তিনি আত্মীয়ের বাড়ির রোগী দেখলে রোগী মাগনাই দেখেন।

মুবাশ্বেরা সকালে ঠান্ডা হয়ে পড়ে ছিল বিছানায়, মরে। ফজলিখালা ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। কেউ মরলে এ বাড়িতে চিৎকার করে কাঁদতে নেই। কারণ *মরণ লেখা ছিল কপালে, মরেছে।* আর মরে যাওয়া মানে আল্লাহর কাছে ফেরত যাওয়া। আল্লাহর কাছে যে গেছে, তার জন্য হাহাকার করলে আল্লাহ নারাজ হবেন। বরং তাকে হাসি মুখে বিদায় দাও। ফজলিখালা চিৎকার করে কাঁদতে যখনই শুরু করেছেন, জোহরা, হুজুরের বড় মেয়ে, লাফিয়ে এসে তাঁর মুখ চেপে ধরলেন

–*ছি ছি এইসব কি কর, তোমার মেয়ে আল্লাহর কাছে গেছে। তার জন্য দোয়া কর, ভাবী। দেখ, দেখ ওর মুখখানায় কী নূর, ও বেহেসতে যাবে। আল্লাহর জিনিস আল্লাহ নিয়ে গেছেন। কাঁদলে গুনাহ হবে। চোখের পানি যদি ফেলতে চাও, ফেল, কোনও শব্দ যেন বের না হয়।*

কেউ মারা গেলে হাহাকার করা *কবিরা গুনাহর* সামিল। ফজলিখালাকে নিয়ম মেনে নিতে হয়। তিনি মুখে ওড়না ঠেলে শব্দের টুঁটি টিপে ধরেন।

মা বিকেলে বাড়ি ফিরে চোখের পানি ফেলছিলেন মুবাশ্বেরার জন্য। বাবা বাড়ি ফিরলে বললেন – *মুবাশ্বেরা মারা গেছে।*

–*আরও আগে চিকিৎসা করলে বাঁচতে পারত। আমি যখন দেখলাম, তখন আর সময় নাই।* বাবা বলেন।

মা বাঁ হাতে চোখের পানি নাকের পানি মুছে নিয়ে শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন – *হায়াত না থাকলে বাঁচবে কেমনে? আল্লায় এর বেশি হায়াত দেন নাই। ও নিশ্চই বেহেসতে যাইব। মরার আগে ও আল্লাহ আল্লাহ বইলা ককাইতাছিল।*

বাবা জুতো খুলে খাটের নিচে রাখেন। মুজো খুলে জুতোর পেটের মধ্যে। কপালে ভাঁজ। শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে – *ওর ত বাচ্চা পেটে আছিল।*

–*কার পেটে?*

বাঁ পাশের ঘরের দিকে আমার পাতা কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে।

–*কার পেটে আবার, তুমার বইনের মেয়ে, কী নাম ওর, মুবা, মুবাশ্বেরার!*

বাবা ঘামে ভেজা শার্টটি হ্যাঙারে ঝুলোতে ঝুলোতে বলেন।

–*ওর বিয়া হয় নাই, বাচ্চা পেটে থাকব কেন? এই পবিত্র মেয়েটা সম্পর্কে এই বাজেকথাগুলা কিভাবে মুখে আনো? জিব্বা তুমার খইসা পড়ব কইলাম।* মা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন।

প্যান্টের ওপরে লুঙ্গি পরে লুঙ্গির একটি কোণা দাঁতে কামড়ে, ভেতরে হাত ঢুকিয়ে লুঙ্গির তল থেকে প্যান্ট খুলে আলনায় মেলে, দাঁত থেকে কোণা ছাড়িয়ে পেটের ওপর লুঙ্গির গিঁট দেন।

মা হাঁটেন সামনে পাঁচ পা, ঘুরে আবার পাঁচ পা। দরজার ফাঁক দিয়ে পা গুলো দেখতে পাচ্ছি দুজনের। মা সামনে পেছনে করে করে বাবার খালি পায়ের দিকে এগোলেন। মা'রও খালি পা, কালো পা, কোমল, বুড়ো আঙুলে অসুখ হয়ে নখ ওঠা, বাবার পা ফর্সা, মোজায় ঢাকা থেকে ফ্যাকাসে। চার পা কাছাকাছি। বাবার পায়ের আঙুলগুলো জোট বাঁধা, পা দুটো ঝুলে থাকে খাটের কিনারে, নখ ওঠা টলমল পা যায় জোট বাঁধা আঙুলের পা দুটোর পেছনে। ফিরে আসে আবার।

–*বাচ্চা নষ্ট করছিল বোধয় শিকড় টিকড় দিয়া। ইনফেকশন হইয়া গেছিল, সেপটিসেমিয়া।* বাবার ঠান্ডা গলার স্বর শুনি।

–*না, মিছা কথা। জিভ খইসা পড়ব তুমার। আল্লায় বিচার করব এইসব বদনামের।*

মা'র গলায় আগুন। ধরাস করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হয়।

ও ঘর থেকে শব্দগুলো শিলপাটায় গুঁড়ো হয়ে এ ঘরে আসে, আমি গুঁড়ো জোড়া দিয়ে পারি না একটি অক্ষরও দাঁড় করতে।

মরে যাওয়াটা আমার মনে হতে থাকে খুব সহজ একটি ঘটনা। এই আজ শ্বাস নিচ্ছি ফেলছি, কাল হয়ত ঠান্ডা হয়ে পড়ে থাকব শাদা বিছানায়। আজ হাত পা নড়ছে, কাল নড়বে না। আজ স্বপ্ন দেখছি, কাল দেখব না। মরে গেলেই সব ফুরুৎ। মা বলেন *রুহু* উড়ে যায় আল্লাহর কাছে, দেহটা পড়ে থাকে দুনিয়ায়। রুহুটাই সব। রুহু কি করে ওড়ে, শাদা কবুতরের মত? মা বলেছেন রুহু অদৃশ্য, দেখা যায় না। অদৃশ্য কত কি যে আছে দুনিয়ায়।

মুবাশ্বেরা মরে যাওয়ার পর শরাফ মামা *আল্লাহর পথ* থেকে সরে এলেন, তাঁকে নছিহতের কেউ নেই বলে আর। তিনি আবার প্যান্ট শার্ট পরে দুনিয়াদারিতে নামলেন। ঘরের ট্রাংকে তিনি কিছুদিন স্মৃতি তুলে রেখেছিলেন রক্তের দাগ পড়া ত্যানাতুনোর।

দাদা ফিরে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বিদেশি এক ওষুধ কোম্পানির চাকরি নিয়ে ময়মনসিংহে।

দাদা বলেন, *চাকরি নিছি মার লাইগা। মারে এই সংসারে কেউ দেখার নাই। কেউ মারে একটা পয়সা দেয় না। মা যেন আর কষ্ট না করে।*

চাকরির প্রথম বেতন দিয়ে দাদা মা'র জন্য শাড়ি কিনে আনলেন চারটে। মা'র জন্য সোনার বালা গড়তে দিলেন।

শাড়ির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে হু হু করে কাঁদলেন মা। শাড়ি পরা ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দাদার আনা শাড়ি তিনি পরলেন, ফোঁপাতে ফোঁপাতে কুঁচি কাটলেন শাড়ির। মা'কে দেখতে অদ্ভুত সুন্দর লাগে। দাদাকে বুকে জড়িয়ে মা চোখের জলে ভেসে বললেন – *আমার লাইগা আর কিছু কিননের দরকার নাই বাবা। আমার কিছু না হইলেই চলব। তুমি টাকা পয়সা জমাও। তুমার ভবিষ্যতে কাজে লাগব।*

ন্যূব্জ, নত মা এখন শিরদাঁড়া টান টান করে হাঁটেন। তাঁর পেটের ছেলে টাকা পয়সা কামাচ্ছে, তাঁর আর কোনও *মাগীখোর* লোকের কাছে হাত পাতার দরকার নেই। মা'কে এত উচ্ছ্বল, এত প্রাণবান আর কখনও হতে দেখিনি। কাফেরের সঙ্গে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখলে পাপ হয়, ফজলিখালা তাই নিজে মা'কে নিয়ে কাচারিতে গিয়েছিলেন বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাতে। মা তালাকনামার কাগজে সই করেছিলেন কাচারিতে বসে। বাবার হাতে কাগজ এলে তিনি *ধুত্তুরি* বলে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন সে কাগজ। কাফেরের সঙ্গে এক ছাদের তলে বাস করতে মা'র গা জ্বলে, যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবেন বলে বলেও মা'র কখনও কোথাও চলে যাওয়া হয়নি এ বাড়ি ছেড়ে। মা কোথাও যান নি কখনও, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলে, নাকি থেকে গেছেন বাড়িটির জন্য, নিজে হাতে লাগানো গাছপালাগুলোর জন্য, আর বাড়ির মানুষগুলোর জন্য এক অদ্ভুত মায়ায় – সে আমার বোঝা হয়নি।

– *ইউনিভার্সিটি থেইকা গ্রাজুয়েট হইয়া ফিরছে আমার পুত্রধন। আমার আনন্দ আর ধরে না।*

বাবা দাঁত কটমট করে বলছেন দাদা ঢাকা থেকে ফেরার পর থেকেই। গ্রাজুয়েট ছেলেকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন মাস্টার ডিগ্রি হাতে নিয়ে ফিরতে, আর দাদা বুক পকেটে আনন্দমোহনের *বি এসসি* পাশের কাগজ নিয়েই বছর দুই পর ফিরলেন। বাবা বলেন *এর চেয়ে মইরা যাওয়া ভাল।*

দাদা মাছের মত চোখ করে বসে থেকে বাবার টিপ্পনি শোনেন।

দাদা বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে গুছিয়ে বসলেন। ছোটদার খাটটি ঘর থেকে সরিয়ে বাইরে বারান্দায় খাড়া করে রাখলেন।

খাটটি সরানোয়,. আশ্চর্য, বাবা বিষম রাগ করলেন। তিনি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলেন, বললেন — *এই খাট যেইখানে ছিল, সেইখানে নিয়া রাখ। যার খাট সে ফিইরা আইলে থাকব কই! যেমন বিছানা পাতা ছিল, তেমন কইরা রাখ।*

মা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বলেন — *কামাল কি আর ফিইরা আইব! শুনছি, শহর ছাইড়া চইলা গেছে। ইসলামপুর না কই যেন থাকে। কি খায় কেমনে থাকে কেডা জানে!*

বাবা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন শুনে।

— *কী খায় না খায় তা জাইনা আমার কী! না খাইয়া মইরা যাক। ভুগুক। আমার কী! তুমি হইলা নষ্টের গোড়া। তুমি কথা কইও না। তুমার আসকারা পাইয়া ছেলেমেয়েগুলা নষ্ট হইছে।*

মা শিরদাঁড়া টান টান করে হেঁটে এসে চিবুক উঁচিয়ে বলেন — *কথা কইতাম না ক্যা! আমারে আর কতদিন বোবা বানাইয়া রাখবা! আমি কি কারও খাই না পরি! আমার ছেলেই এহন আমারে টাকা পয়সা দেয়, কাপড় চোপড় দেয়, তেল সাবান দেয়। আমার আর ঠেকা নাই কুনো বেডার। ছেড়াডারে কী পাষন্ডের মত মাইরা বাড়ি থেইকা ভাগাইছে। এহন খাট সাজাইয়া রাইখা কি লাভ। লাভ কী!*

লাভ, বাবা বলেন, বাবা বুঝবেন, মা'র বোঝার কোনও প্রয়োজন নেই।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই কিনে এনে ভারি গলায় দাদা নিজে পড়ছেন, আমাকে পড়তে বলছেন। কবিতা পড়তে থাকি একটির পর একটি, দাদা উচ্চারণ শুধরে দেন, কোথায় আবেগ কতখানি দরকার, কোথায় জোর, কোথায় না, কোথায় ধীরে, কোথায় দ্রুত বলে দেন। দাদা বলেন —*হৃদয় না ঢাইলা পড়তে পারলে কবিতা পড়বি না।*

দাদা আবৃত্তি সন্ধ্যার আয়োজন করেন দু'জনের। আমরা দু'জনই শ্রোতা, দু'জনই আবৃত্তিকার। দাদা বিচারক। আমার এক নতুন জীবন শুরু হয় দাদার চৌহদ্দিতে। ওষুধ কোম্পানীর একটি লাল নোটবুক আমাকে দেন, প্রতিদিন দুটো তিনটে করে কবিতা লিখে দাদাকে দেখাতে থাকি। কোনওটিকে *ভাল* বলেন, কোনওটিকে *খুব ভাল,* কোনওটি সম্পর্কে বলেন — *এইডা গু হইছে, কবিতা হয় নাই।*

কবিতার খাতাটি ইস্কুলের মেয়েদের হাতে হাতে ঘুরতে থাকে। একজনের পড়া শেষ হলে আরেকজন বাড়ি নিয়ে যায়। খাতাটি আমার হাতে ফিরতে ফিরতে মাস শেষ হয়ে যায়। কাড়াকাড়ি পড়ে যায় মেয়েদের মধ্যে। দাদা *মুক্ত বিহঙ্গ* নামে আমার একটি কবিতা পড়ে বলেন — *ইস, পাতা পত্রিকাডা থাকলে, তর এই কবিতাডা আমি ছাপাইতাম।*

কেবল কবিতা নয়, গল্পেরও আসর বসান দাদা। দাদা একটি পড়েন, আমি একটি। কোনও কোনও লাইন আহা আহা বলে দু'তিনবার পড়েন, শিখে আমিও তা করি। বাবা বাড়ি ফেরা অবদি আসর রীতিমত গতিময় থাকে।

কখনও গানের আসরও বসে। আমাকে গাইতে বললে হেঁড়ে গলায় দু'লাইন গেয়ে ছেড়ে দিই। দাদা গাইতে বসে সুরহীন গলায় গরুর মত চেঁচান। গানের আসরে ইয়াসমিনকে নেওয়া হয়, তার গলায় বেশ সুর ওঠে বলে। ইয়াসমিনকে, দাদা বলেন একটি হারমোনিয়াম কিনে দেবেন।

গান শোনার একটি যন্ত্র কিনেছেন দাদা। কোনও কোনও বিকেল কেবল গান শুনেই কাটিয়ে দেন। *মুছে যাওয়া দিনগুলি আমারে যে পিছু ডাকে,* গানটি শুনতে শুনতে, একদিন আবিষ্কার করি দাদা কাঁদছেন, আমাকে লক্ষ করেননি তিনি আমি যে নিঃশব্দে ঢুকেছি ঘরে।

—দাদা, তুমি কানতেছিলা! জিজ্ঞেস করি।

দাদা জল মুছে ফেলে বলেন — *না, না, কানতাম ক্যান! কান্দি না। এমনি।*

দাদা আসলে কাঁদছিলেন। দাদা কি শীলার জন্য কাঁদছিলেন!

ঘটনাটি আমি মনে মনে রাখি। মনে মনে রাখি দাদার একটি গোপন কষ্ট আছে। দাদা নিরালায় বসে খুব আপন কারও জন্য, মুছে যাওয়া কোনও দিনের জন্য কাঁদেন।

দাদার পাশে জানালায় এসে বসি। বাগানে লিলি ফুল ফুটে চমৎকার গন্ধ ছড়াচ্ছে। বাইরে দুলাল যাচ্ছে মাউথ অর্গান বাজিয়ে। এত দ্রুত হাঁটে সে, দেখে মনে হয় দৌড়োচ্ছে, সকাল, দুপুর, বিকেল, মধ্যরাত, মাউথ অর্গানের শব্দ শুনে যে কেউ বলে দিতে পারে, এ দুলাল। ও কারও সঙ্গে কথা বলে না, কারও জন্য পথে দাঁড়ায় না। ও কেবল দৌড়ে যেতে থাকে, যেন কোথাও ওর খুব জরুরি কোনও কাজ। আসলে ওর কোনও কাজ নেই। লোকে বলে, দুলাল পাগল।

দুলাল কি আসলেই পাগল? দাদাকে জিজ্ঞেস করি।

দাদা বলেন — *আমার মনে হয় না।*

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাদা উঠে দাঁড়ান, মেঘ কেটে সূর্য ওঠার মত হাসি দাদার মুখে, বলেন — *যা, দাবার গুটি সাজা। দেখি আইজকা কেডা জিতে।*

আমার মন ভাল হয়ে যায় দেখে যে দাদা হাসছেন। গুটি সাজিয়ে বসে যাই। দাদার কাছ থেকে খেলা শিখে অবদি দাদাকেই হারাচ্ছি খেলায়। আমার চোখ ফাঁকি দিয়ে তিনি দেদার গুটি চুরি করেন। খেলতে গিয়ে বলে নিই, *চুরি করা চলবে না।*

অথচ চুরি করতে যেয়ে দু'বার ধরা পড়েন দাদা। ঘন্টা খানেকের মধ্যে তাঁর রাজাকে কিস্তি দিলে ব্যস, দাবার ছক উল্টে ফেলেন ইচ্ছে করে, আমি গলা ছেড়ে চেঁচাতে থাকি, *তুমি হারছ, তুমি হারছ।*

দাদা একেবারে যেন কিছুই জানেন না, অবোধ শিশুর মত বলেন, *কী আমি হারছি। কই! দেখা কই হারছি! তুই না হারলি!*

মুখখানা দিব্যি নিষ্পাপ বানিয়ে তিনি অস্বীকার করেন তাঁর পরাজয়ের কাহিনী। আমি *ভুল চাল* দিয়েছিলাম বলে তিনি সহ্য করতে পারেননি, তাই ছক উল্টেছেন এই তাঁর বক্তব্য। আমি জিতেছি, আমি ভাল খেলি, তিনি কোনওদিন মানেন না।

ইস্কুলে ভাল ছাত্রী হিশেবে আমার নাম হয়। প্রথম তিনজনের মধ্যে আমি আছিই। বাবা তবু স্বীকার করেন না আমি ভাল ছাত্রী। তাঁর বদ্ধ ধারণা, আমি ফাঁকি দিচ্ছি লেখাপড়ায়, তা না হলে আমি প্রথম হই না কেন। মেজাজ খিঁচড়ে থাকে।

মা' দেখি দাদার মনতুষ্টিতে বিষম ব্যস্ত। দাদা গরুর শুটকির ঝুরঝুরি খেতে চান, মা রাঁধেন। দাদা ঝাল পিঠা খেতে চান, মা আয়োজন করেন। আকাশ মেঘ করলেই বা দুফোঁটা বৃষ্টি ঝরলেই দাদা বলেন — *মা ভুনা খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজেন।*

মা দিব্যি লেগে যান চাল ডাল মেশাতে।

মা'র পীরবাড়ি যাওয়া বাদ পড়তে থাকে।

টাকা পয়সা অলা দাদা হয়ে উঠতে থাকেন বাড়ির গণ্যমান্য একজন। তিনি চিত্ররূপা স্টুডিওতে আমাদের নিয়ে গিয়ে *গ্রুপছবি* তুলে আনেন। নিজে নানা ভঙ্গিতে ছবি তুলে এলবামে সাঁটতে থাকেন। কিছু ছবি বড় করে কাঠের ফ্রেমে বাঁধাতে বাঁধাতে বলেন –*কী, দেখলি কেরম নায়কের মত লাগে আমারে!*

আমি স্বীকার করি দাদাকে দেখতে ছবির নায়কের মত লাগে। দাদা আসলেই খেয়াল করে দেখেছি, সুন্দর।

আমার আঁকা দুটো ছবিও, রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের, বাঁধিয়ে ঝুলেয়ে রাখেন ঘরে, যে ই আসে বাড়িতে, ছবি দুটো দেখিয়ে বলেন – *আমার বোনের আঁকা।*

ছবি আঁকার রং তুলি কিনে দিয়ে দাদা আমাকে বলেন আরও ছবি আঁকতে। আঁকতে আঁকতে ভাবি বড় হয়ে আমি ছবি আঁকার ইস্কুলে ভর্তি হব। পিটিআই ইস্কুলে গান গাওয়া মাস্টার বলেছিলেন, আমি খুব বড় শিল্পী হব। যে ছবিই আঁকি না কেন, দেখে মুগ্ধ দাদা বলেন – *ছুটোবেলায় তরে ছবি আঁকা শিখাইছিলাম বইলা! নাইলে কি আর এত ভাল আঁকতে পারতি!*

দাদাকে গোপন ইচ্ছের কথা বলি যে একদিন ছবি আঁকার ইস্কুলে লেখাপড়া করে আমি আরও ভাল ছবি আঁকব।

দাদা ঠোঁট উল্টে বলেন – *বাবা শুনলে তরে মাইরাই ফালব। কিছুতেই তরে শিল্পী হইতে দিব না। কইব শিল্পীগোর ভাত নাই।*

দাদা কেবল মা'কেই নয়, আমাদেরও জামা জুতো কিনে দেন, সিনেমা দেখাতে নেন। সিনেমার নেশায় পায় আমাকে। আবদার করে করে অতিষ্ঠ করে ফেলি তাঁকে। মাঝে মাঝে বলেন – *ঠিক আছে, দরখাস্ত লেখ আমার কাছে। ভাইবা দেখতে হইব মঞ্জুর করা যায় কি না।*

দরখাস্ত লিখি, *ডিয়ার স্যার* সম্বোধন করে। ইতিতে লিখি *ইয়োর ওবেডিয়েন্ট সারভেন্ট।* বই দেখে টুকি আসলে। *টাকা চাহিয়া ম্যানেজারের কাছে ইংরেজিতে একটি দরখাস্ত লেখ* যে পৃষ্ঠায় আছে, সেটি বার করে, *টাকা চাই*এর বদলে *সিনেমা দেখতে চাই* বসিয়ে।

দরখাস্ত পাওয়ার পরও দাদা কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোন না। আমি অস্থির হতে থাকি বিষম। তিনি বলেন – *ধৈর্যশক্তি নাই তর। ধৈর্যশক্তি না থাকা আমার একদম পছন্দ না। একবার আমার এক বন্ধুরে লইয়া সিনেমা দেখতে গেছি। ইকবাল নাম। আমরা ডাকতাম শাদা হাত্তি কইয়া। ইয়া শাদা আর ইয়া মুডা আছিল। হলে গিয়া দেখি সিনেমার টিকিট নাই। হে কয় দেখবামই ছবি যেমনেই হোক। ব্ল্যাকে টিকিট কাইটাও দেখবাম। ব্ল্যাকে টিকিট তিন ডবল দাম। কইলাম চল কাইলকা দেখি। সে কয় ওইদিনই দেখব সে। ওই ম্যাটিনি শো। আমি ঘুরাইয়া একখান চড় মারলাম। ওই চড় খাওনের পর আমার সামনে সে আর অস্থিরতা দেহায় না কোনও কিছু লইয়া। তুই হইলি ইকবালের মত, তরও ধৈর্যশক্তি নাই।*

দাদাকে ভালবাসি, ঈর্ষাও করি। দাদা যেখানে খুশি যেতে পারেন, যা ইচ্ছে করতে পারেন। *মোটর সাইকেল* কিনে ওতে করে সারা শহর ঘুরে বেড়ান। নানান শহরে যান, টাঙ্গাইল, জামালপুর, নেত্রকোণা। আমার বড় ইচ্ছে করে যেতে। বড় ইচ্ছে করে সীমানার বাইরে পা বাড়াতে। দাদা বলেছেন *তরে একদিন জয়রামকুরায় পাহাড় দেখাতে নিয়া যাইয়াম, গারো পাহাড়।*

অপেক্ষায় অস্থির হতে থাকি। দাদা দিন পেছোতে থাকেন, এ মাসে না পরের মাসে করে করে। আমি তবু আশায় আশায় বাঁচি, একদিন খুব ভোরবেলা কারও জাগার আগে, পাহাড় দেখতে যাব, দূরে — অনেক দূরে, নির্জনতার পিঠে মাথা রেখে টিপটিপ টিপটিপ শিশিরের ঝরে পড়া দেখব।

দাদার ফিরে আসার ক'মাস পর বাবা ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে বদলি হন। বদলির খবর এলেই বাবার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে থাকে। তিনি দাদার ওপর বাড়িঘর দেখাশোনার ভার দিয়ে চলে যান মিটফোর্ডে। দু'দিন পর পর গভীর রাতে ট্রেনে করে ঢাকা থেকে চলে আসেন, রাতটুকু কাটিয়ে আবার খুব ভোরবেলা রওনা হয়ে যান ঢাকায়। মিটফোর্ডে তিনি *জুরিসপ্রুডেন্স বিভাগে* অধ্যাপকের পদ পেয়েছেন। ছাত্র পড়ান। মর্গের লাশ কাটেন। বাবার বদলি হওয়ায় বাড়িতে সবচেয়ে বেশি যে খুশি হয়, সে আমি। আমার তখন পাখনা মেলার বয়স।

এক বিকেলে বড় শখ হয় ব্রহ্মপুত্রের তীরে পা ভিজিয়ে হাঁটতে। বাড়ি থেকে এত কাছে ব্রহ্মপুত্র অথচ এটি দেখতে যাওয়ার অনুমতি জোটে না। যখন ছোট ছিলাম, বলা হত, এত ছোট আমি, আমার একা একা দূরে যাওয়া ঠিক না, ছেলেধরারা বস্তায় ভরে আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। ফটিং টিং দাঁড়িয়ে আছে নদীর পাড়ে, পায়ে কথা কয়, হাউমাউখাউ বলে খাবে আমাকে। আর যেই না বড় হয়েছি, শুনতে হচ্ছে, বড় মেয়েদের রাস্তায় বেরোনো ঠিক না। চুপচুপ করে বাড়িতে কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়ি বাইরে, সঙ্গে ইয়াসমিনকে নিই। মা ঘুমোচ্ছেন, দাদা বাইরে, বাবা ঢাকায়, আর আমাদের পায় কে। আমার ফটিং টিঙের ভয় নেই। যাব না কেন? যাব। সেই কত কাল থেকে বিন্দু বিন্দু করে জমিয়ে পুরো এক নদীর সমান দীর্ঘ করেছি স্বপ্ন, আমার মত করে ব্রহ্মপুত্রের তীরে হাঁটার, তার জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকার স্বপ্ন।

ব্রহ্মপুত্রের তীরে হাঁটছি, আমার চুল উড়ছে, জামার ঝুল উড়ছে, কানে সাঁ সাঁ শব্দ পাচ্ছি বাতাসের। বিকেলের মিঠে রোদে বালু চিকচিক করছে। এমন সময়, এমন সময়ই, আমার প্রচন্ড আনন্দের বুকে বিষের তীর বেঁধাল এক যুবক। উল্টো দিক থেকে আসছিল, আমি দোষ করিনি কিছু, বাড়া ভাতে ছাই দিই নি তার, আমার দু'স্তনে আর পাছায় আমি কিছু বুঝে ওঠার আগে বিষম জোরে টিপে দিয়ে চলে গেল হাসতে হাসতে, যুবকের সঙ্গী আরও কিছু যুবক হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল দূরে দাঁড়িয়ে। আমার শরীর, যেন এ আমার নয়, ওদের মজা করার জিনিস। ব্রহ্মপুত্র সবার নদী, আমারও। আমার অধিকার আছে এ নদীর পাড়ে আসার। কিন্তু কি অধিকারে আমাকে ওরা অপমান করে! দু'হাত আমি মুঠোবন্দি করি। ইচ্ছে হয় সবকটিকে চাবকাই। চাবকে পিঠের ছাল তুলে ফেলি। পারি না। এগোতে পারি না দু'কদম।

ইয়াসমিন কাঁপা গলায় বলে, *বুবু চল বাসাত যাইগা। আমার ডর করতাছে।*

ব্রহ্মপুত্রের তীর থেকে প্রচন্ড ক্রোধ নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখি মা'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বসে কথা বলছেন আমান কাকা।

— *কি খবর কেমন আছো মা?* আমান কাকা জিজ্ঞেস করেন।

আমি শ্যেন দৃষ্টি ফেলে লোকটির দিকে, একটি শব্দ উচ্চারণ না করে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করি। প্রাণ খুলে কাঁদি আমি, আমার সকল অক্ষমতার জন্য কাঁদি। কাউকে বুঝতে দিই না যে আমি কাঁদছি। কাউকে বুঝতে দিই না যে যন্ত্রণার গভীর গহন জল আমাকে পাকে ফেলে নিয়ে যাচ্ছে আরও অতলে।

মা'কে জিজ্ঞেস করেছিলাম — *আমান কাকা কেন আইছিল?*

মা মধুর হেসে বলেছেন — *ও আল্লাহর পথে আইব। ওরে নছিহত করতাছি।*

আমি বলি— *বেশি নছিহত করতে যাইও না। নছিহত করতে গিয়া মুবাশ্বেরা মরল, দেখলা না!*

আমার স্বর এত ক্ষীণ ছিল, মা শুনতে পাননি। অথবা মা বুঁদ ছিলেন কিছুতে যে শোনার চেষ্টা করেননি।

আমান কাকা প্রতিদিন সন্ধেয় বাড়ি এসে মা'র ঘরে ঢুকে ফিসফিস কথা বলেন। মা দরজা ভেজিয়ে রাখেন সে সময়। একদিন ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকেছি, আমান কাকা লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলেন, মশারির নিচে মা।

—*মা এই অন্ধকারে বইসা কি কর!* আমি জিজ্ঞেস করি।

মা বলেন — *না, আমানের ত ওর বউএর সাথে গন্ডগোল হইছে। ওর মনডা খারাপ। তাই আমার কাছে আইসা দুঃখের কথা কইয়া একটু শান্তি পায়। ওরে বুঝাইতাছি, আল্লাহর পথে আইতে।*

—*আমার ক্ষিদা লাগছে। ভাত দেও।*

খামোকাই বলি। ক্ষিধে পেলে মণিই আমাকে ভাত দিয়ে যায়।

মা বলেন, বিরক্ত হয়ে — *আমার মাথা বেদনা করতাছে। একটু শুইছি। তগোর জ্বালায় কি একটু শুইয়াও শান্তি পাইতাম না!*

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসি। বারান্দার বাতাসে এসে শ্বাস নিই ফুসফুস ভরে। আমার শ্বাস কষ্ট হয়, আমান কাকার সঙ্গে মা'কে গা লেগে বসে থাকতে দেখে। যে লোক সাত বছর বয়সী আমাকে ন্যাংটো করেছিল, সে লোক অন্ধকারে মা'কেও ন্যাংটো করছে বলে আমার আশংকা হয়।

দাদারও চোখ এড়ায় না আমান কাকার অসময়ে বাড়ি ঢোকা, কেমন কেমন চোখে ইতিউতি তাকানো।

মা'র কাঠের আলমারির এক তাকে কেবল বই, বাকি তাকগুলোয় কাপড় চোপড়, ভাঁজহীন, ঠাসা। বইয়ের তাকটিতে হাদিসের বই, *মকসুদুল মোমেনিন, নেয়ামুল কোরআন,* পীর আমিরুল্লাহর লেখা কবিতার বই *মিনার, তাজকেরাতুল আওলিয়া,* আর *হু এম আই* বলে একটি ইংরেজি বইও। আমিরুল্লাহ আবার ইংরেজিও জানেন। মা অনেকদিন আমাকে বলেছেন *হুজুর খুব জ্ঞানী, ফটফট কইরা ইংরেজি কন।* যখন বলেন মা, চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

তিনি নিশ্চয় *দুনিয়াদারির লেখাপড়া* করেছেন! এরকম একটি প্রশ্ন আমি করতে চেয়েছি মা'কে। আবার বেয়াদবি হবে বলে পেটের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলেছি আস্ত বাক্য। আল্লাহ রসুল নিয়ে মা আসলে কোনও যুক্তিতে যেতে চান না। পীর আমিরুল্লাহ নিয়েও নয়। যা বলবেন, তা আমি হ্যাঁ হুঁ করে শুনে গেলে মা বেজায় খুশি। মা'র যেহেতু সন্তান আমি, মা'কে খুশি করার দায়িত্ব আমার, এ রকমই জ্ঞান আমাকে দেওয়া হয়েছে। মা'কে খুশি রাখলে চড় চাপড় কিল ঘুসি থেকে বাঁচা যায়, বরং খেতে বসলে মা খাতির করে মাছ মাংসের টুকরো পাতে তুলে দেন। মা'র আদর পাওয়ার লোভের চেয়ে কিল চড় না খাওয়ার ইচ্ছেতেই ঠোঁট সেলাই করে রাখি অদৃশ্য সুতোয়। কোরান হাদিস যারা না মানে, মা স্পষ্ট বলেন, তারা মুসলমান নয়। তারা দোযখের আগুনে পুড়বে। খাতির নেই। ব্যস, সহজ হিশেব। আল্লাহর হিশেব বরাবরই বড় সহজ। নামাজ নেই রোজা নেই, তো দোযখের আগুন। বোরখা পরা নেই, দোযখের আগুন। বেগানা পুরুষের সঙ্গে মেশা, দোযখের আগুন। পেশাব করে পানি না নিলে দোযখের আগুন। জোরে হাসলে দোযখের আগুন। জোরে কাঁদলেও দোযখের আগুন। কেবল আগুন। মা'কে বলতে ইচ্ছে করে আগুনে কেন লোকের এত ভয়! আজকাল আগুন কোনও ব্যাপার হল! শীতের দেশে তো ঘরে ঘরে আগুন জ্বেলে রাখে। আগুন নিয়ে সার্কাসের লোকেরা চমৎকার খেলা খেলে। আগুনে পুড়লে চিকিৎসা আছে, সেরে যায়। আর আল্লাহই বা মানুষকে আগুনের ভয় এত দেখান কেন! আরও কত কত ভয়ংকর পদ্ধতি আছে কষ্ট দেবার, সে পথ আল্লাহ একেবারেই মাড়াননি। বদ লোকেরা শরীরে কষ্ট দিতে ভালবাসে আর চতুর লোকেরা মনে কষ্ট দেয়। শরীরের কষ্টের চেয়ে মনের কষ্টে মানুষ ভোগে বেশি। আল্লাহকে চতুর না মনে হয়ে বরং মনে হয় বড় *বদ।* গেতুঁর মার স্বামীর মত। সময় সময় বাবার মত, বাবা চান তিনি যা বলেন তাই যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করি। না পালন করলে শরীরে কষ্ট দেন আচ্ছামত পিটিয়ে। বাবার সঙ্গে আল্লাহর তফাৎ হল বাবা চান দুনিয়াদারির লেখাপড়া করে মানুষ বানাতে, আর আল্লাহর ইচ্ছে হাদিস কোরান পড়ানো। বাবার সঙ্গে আমি যেমন দূরত্ব অনুভব করি, আল্লাহর সঙ্গেও। বাবা এ বাড়িতে অনুপস্থিত থাকলে আমি খুশি হই, আবার আল্লাহর যেহেতু আকার নেই, *বেচারা,* আমি অপ্রস্তুত হই তাঁর প্রসঙ্গ এলেও। আসলে দু'জনের অনুপস্থিতিই আমার কাম্য। দু'জনই আমাকে দু'রকম দু'টি দিকে এমন ঠেলে দেন যে আমার নিজের কোনও অস্তিত্ব থাকে না, থাকে কেবল দ্বিখন্ডিত মর্গের লাশ। আমার ওপর খুশি হলে বাবা আমার জন্য খাঁচা ভরে মিষ্টি কিনে আনেন, বড় বড় রুই

কাতলা কিনে এনে বড় পেটিগুলো খেতে বলেন। আল্লাহও তো যাকে খাওয়াবেন, তাকে নাকি একেবারে ঠেসে। *পাখির মাংস, আঙুর, মদ,* কত কিছু। সুন্দরী গোলাপী শরীরের মেয়েরা পুরুষের পাত্রে মদ ঢেলে দেবে। নানা বিষম খুশি যে বেহেসতের খাবার খেয়ে সুগন্ধি ঢেকুর উঠবে। আমার আবার কারও ঢেকুর তোলা দেখতে বিচ্ছিরি লাগে। সে সুগন্ধি হোক কি দুর্গন্ধি হোক। এরকম কি হবে যে কোনও ঢেকুর তোলা লোকের সামনে নাক পেতে রইল আরেকজন ঢেকুরের সুগন্ধ নিতে। ধরা যাক সুগন্ধ ঢেকুর শোঁকা চরিত্রে গেঁতুর বাবা আর ঢেকুর ছাড়া চরিত্রে নানা। হাদিসের বইটি ডানে নিয়ে আমি চরিত্রদুটোকে আমার বাঁ পাশে বসাই। তারা ঢেকুর ছাড়ে আর ঢেকুর শোঁকে। আমি উইপোকায়, অক্ষরে, ঢেকুর ছাড়া-শোঁকায়। আমি আছি, অথচ নেই। ঢেকুর ছাড়া-শোঁকা নেই, অথচ আছে। উইপোকা আর অক্ষর থেকে যায় আমার সঙ্গেও, ঢেকুরের সঙ্গেও। তাদের বিলীন করতে মনে মনেও, আমার ইচ্ছে নেই। হাদিসের বইটির ভেতর উইপোকা বাসা বেঁধেছে। বাড়িটি স্যাঁতসেঁতে, কিছুদিন বইয়ের পাতা না ওল্টালেই উই ধরে। উইএর পেট মোটা শরীর দেখে গা রি রি করে আমার। বইটির ওপর বাবার একটি পুরোনো জুতো ঠেসে কিছু উই থেতলে ফেলি। এক চোখ উইএর থেতলে যাওয়া শরীরে, আরেক চোখ বইয়ের অক্ষরে। অক্ষর গুলো থরে থরে সাজানো আছে এরকম —

দুনিয়ায় সবকিছু ভোগের সামগ্রী আর দুনিয়ার সর্বোত্তম সামগ্রী হচ্ছে নেক চরিত্রের স্ত্রী।

মেঝেয় আধ শোয়া হয়ে আমার এক হাতে জুতো, আরেক হাতে হাদিসের বই, উইএর পাছার তলে পবিত্র হাদিসের বাণী

যদি আমি কাহাকেও সেজদা করিতে হুকুম করিতাম, তবে নিশ্চয় সকল নারীকে হুকুম করিতাম তাহারা যেন তাহাদের স্বামীকে সেজদা করে।

যখন কোনও স্ত্রী তাহার স্বামীকে বলিবে যে তোমার কোনও কার্যই আমার পছন্দ হইতেছে না, তখনই তাহার সত্তর বছরের এবাদত বরবাদ হইয়া যাইবে। যদিও সে দিবসে রোজা রাখিয়া, ও রাত্রে নামাজ পড়িয়া সত্তর বছরের পুণ্য কামাই করিয়া ছিল।

স্বামী স্ত্রীকে চারটি কারণে প্রহার করিতে পারে, স্ত্রীকে সাজসজ্জা করিয়া তাহার নিকট আসিতে বলার পর স্ত্রী তাহা অমান্য করিলে, সঙ্গমের উদ্দেশ্যে স্বামীর আহবান পাওয়ার পর প্রত্যাখ্যান করিলে, স্ত্রী ফরজ গোসল ও নামাজ পরিত্যাগ করিলে, স্বামীর বিনা অনুমতিতে কাহারো বাড়ি বেড়াইতে গেলে।

যে সমস্ত স্ত্রীলোক স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে হিংসা না করিয়া ছবর করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আল্লাহ শহীদের তুল্য সওয়াব দান করিবেন।

পোকাগুলো বই ছেড়ে আমার গায়ের দিকে হাঁটতে থাকে। আমাকেই বুঝি এখন খেতে চায় এরা! বাড়িটি ভরে গেল ঘুণপোকায়! উইপোকায়। রাতে কুট কুট করে ঘুণপোকা কাঠ খায়, আর নিঃশব্দে উই খায় বইয়ের পাতা। মহানবী হযরত মহাম্মদের বাণীগুলোও দিব্যি খেয়ে ফেলতে থাকে। উই কি মুসলমান! উইএর নিশ্চয় ধর্ম থাকে না। এরা *শরদিন্দু অমনিবাসও* খায়, *হাদিস কোরানও* খায়।

দিলরুবা ইস্কুল ছেড়ে দেওয়ার পর আমার সঙ্গী হয়েছিল বই। লাইব্রেরির বইগুলো দ্রুত শেষ হতে থাকে। বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, রবীন্দ্রনাথ যা পাই ছাদে বসে,

ছাদের সিঁড়িতে, পড়ার টেবিলে, বিছানায় শুয়ে, পড়ি। বাবা বাড়ি এলেই *অপাঠ্য* লুকিয়ে পাঠ্য বই ধরি, মূলত মেলে বসে থাকি। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেলে, চুপি চুপি বাতি জ্বেলে মশারির নিচে শুয়ে *অপাঠ্য* পড়ি। পাশে শুয়ে বেঘোরে ঘুমোয় ইয়াসমিন। মা মাঝে মাঝে বলেন – *সারাদিন কি এত ছাইপাশ পড়স! মুবাশ্বেরা মইরা গেল। একটু আল্লাহর নাম ল এহন। সবারই ত মরতে হইব।* মা'র কথার আমি কোনও উত্তর করি না। মা'র আদেশ উপদেশ আমার মাথার ওপর জৈষ্ঠ্যের সূর্য হয়ে বসে থাকে যেন আমাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

কোরান হাদিসের কথা না মানলে আখেরাতে আর রক্ষে নেই এরকম হুমকি আমাকে অনেক শুনতে হয়েছে। তবে এ যাবৎ হাদিস কাকে বলে আমার ঠিক জানা ছিল না। এখন জানার পর আর ইচ্ছে নেই তলিয়ে জানার। গুয়ের চারিতে জানি গু-ই থাকে, ওতে ঝাঁপ দিয়ে মণি মুক্তো খুঁজে পাওয়ার কোনও কারণ নেই। উইএ খাওয়া বইটিকে দু'হাতে বন্ধ করে রাখি। বইটি থেকে বেরোতে থাকে ঢেকুর, যেন এও গিলেছে *বেহেসতের খানা।* মা'র পায়ের শব্দে আমি তড়িতে বইটি তুলে তাকে রেখে দিই যেমন ছিল। উইপোকা নিঃশব্দে হাদিসের বই খাচ্ছে, মা জানেন না। মা ব্যস্ত আমান কাকাকে নছিহত করতে। প্রতিরাতে, মা'র অন্ধকার ঘর থেকে ফিসফিস খিলখিল শব্দ শুনি নছিহতের। মা'কে উইপোকার খবর কিছু বলি না। ওদের ক্ষিধে লেগেছে, খাক। আমার কি দায় পড়েছে পোকা মারতে যাওয়ার!

মুবাশ্বেরা মরে গেছে বলে আমি বুঝি না আমাকে কেন আল্লাহর নাম নিতে হবে। আল্লাহর নাম আমার নিতে ইচ্ছে করে না। আমার মনে হয় আল্লাহ ফাল্লাহ সব বানানো জিনিস। কোরান এক অশিক্ষিত লোভী কামুক পুরুষের লেখা, শরাফ মামার মত কোনও লোকের। অথবা ব্রহ্মপুত্রের তীরে যে লোকটি আমার বুক পাছা চেপে ধরেছিল, সে লোকের মত। হাদিস যদি মহাম্মদের বাণী হয়, তবে মহাম্মদ লোকটি নিশ্চয় গেঁতুর মা'র স্বামীর মত, কুৎসিত, কদাকার, নিষ্ঠুর। আল্লাহ আর মহাম্মদে আমি কোনও তফাৎ দেখতে পাই না।

বইটি তাকে তুলে রাখি ঠিকই, কিন্তু মনে আমার রয়ে যায় লক্ষ উই। ভেতরে নিঃশব্দে আমার *অক্ষর শব্দ বাক্য* জানি না কী কী সব আরও খেয়ে যায়।

বিকেলে গেতুঁর মা আসে। গেঁতুর মা'কে দেখে আমি প্রথম চিনতে পারিনি যদিও ভাঙা গলায় আগের মতই কথা বলে যাচ্ছিল। মা বসে ছিলেন বারান্দার চেয়ারে, হাতে তসবিহর গোটা নড়ছিল, গেঁতুর মা'র কথাও মা শুনছিলেন মন দিয়ে। তসবিহ নড়াতে হলে চাই মন দিয়ে দরুদ পড়া। দুটো কি করে একই সঙ্গে পারেন মা! মা'র সম্ভবত দুটো মন। একটি মন আল্লায়, আরেকটি মন জগতে। মা'র জগতটি আবার বেশ ছোট। দিনে দু'বার সে জগতে ভ্রমণ সারা যায়। গেঁতুর মা হঠাৎ কথা থামিয়ে কাপড় সরাতে শুরু করল। মা'র আঙুল তখন নীল তসবিহর গোটা আগের চেয়ে আরও দ্রুত সরাচ্ছে। তসবিহর গোটা সরে, গেঁতুর মা'র কাপড় সরে। তালে তালে। কাপড় সরিয়ে উরু, পা, পায়ের পাতা উন্মুক্ত করল সে, পোড়া। মা *আহা আহা* করে উঠলেন। গেঁতুর বাবা নয়, এবারের কান্ডটি করেছেন আরেক লোক, সফর আলি। সফর আলির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল

বছর দুই হল গেঁতুর মার। সে লোকই চেলা কাঠে আগুন লাগিয়ে পুড়েছে তাকে। কেন? যেহেতু স্বামী সে, স্বামী মাত্রই অধিকার রাখে স্ত্রীকে যা ইচ্ছে তাই করার। আমি এরকম একটি উত্তর দাঁড় করাই মনে মনে। কিন্তু মা এবং গেঁতুর মা'র জবাব ছিল সফর আলি লোকটি একটি ইতর, বদমাশ।

বলতে ইচ্ছে করে মা'কে, সফর আলি কোরান হাদিস মেনে চলে তাই বউ মেরেছে। ঠোঁটের মধ্যে অক্ষরগুলো নাড়াচাড়া করি। শেষ অবদি গিলে ফেলি। অক্ষরগুলো কি সবই উইএ খাচ্ছে! কে জানে!

গেঁতুর মা এ বাড়িতে ঝি-গিরি করতে এসেছে। পোড়া শরীর নিয়ে তার আর বিয়ে হওয়ারও জো নেই। কোনও পুরুষ তাকে আর ভাত কাপড় দেওয়ার জন্য বসে নেই। মা বলেন, তসবিহর গোটা তখন ধীরে ধীরে পার হয়, *আমার তো বান্ধা কামের ছেড়ি একটা আছে। আমার আর লাগব না।*

মা'র পা দুটো নড়ে। কিসের তালে কে জানে। অন্তরে তাঁর কোনও গোপন সঙ্গীত বাজে সম্ভবত। ময়ুর নাচের তাল। মা পেখম গুটিয়ে রাখেন দিনে, রাতে মেলেন। মা'র দু'পায়ের ফাকে চোখ রেখে আমি গেঁতুর মা'র সন্ধে নামা মুখখানা দেখি ঘরের চৌকাঠে বসে। আবছা অন্ধকারে মা'র হাতের তসবিহর নীল গোটাগুলো জ্বলতে থাকে বেড়ালের চোখের মত।

গেঁতুর মা'কে মা কাজ দিচ্ছেন না, কিন্তু বললেন *খালি মুখে যাইও না। ডাইল ভাত কিছু খাইয়া যাইও।*

আমি ফোঁস করে বলি, চৌকাঠে বসেই, পোড়া শরীর থেকে চোখ সরিয়ে – *গেঁতুর মারে কামে রাখলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত!*

মা নিরুত্তাপ স্বরে বলেন – *মহাভারত ত অশুদ্ধই।*

গেঁতুর মা বসে থাকে বারান্দায় কাটা গাছের গুঁড়ির মত। গাছের গুঁড়ির মাথার ওপর একশ মশা চরকির মত ঘুরছে, হাতে পায়ে কালো হয়ে মশারা লঙ্গরখানার খাবার খেতে বসেছে। পোড়া ত্বক থেকে সম্ভবত অনভূতিটুকুও উবে গেছে। কেবল পেটের ক্ষিধেটুকু রয়ে গেছে পেটেই। গরিবের এই হয়, সব যায়, সংসার সমাজ স্বজন সম্পদ, কেবল ক্ষিধে যায় না। আমি যদি গেঁতুর মা হতাম, নিজেকে তার জায়গায় বসিয়ে দেখি, দুটো ডাল ভাতের জন্য আমি অপেক্ষা না করে উঠে যাচ্ছি, পেছন ফিরছি না। হেঁটে যাচ্ছি বেল গাছের তল দিয়ে কালো ফটকের বাইরে। হাঁটছি, বাতাসের আগে আগে, পাগলা দুলালের মত হাঁটছি, কোথাও কারও দিকে না ফিরে। দুলাল মাউথ অর্গান বাজিয়ে হাঁটে, আমার মাউথ অর্গান নেই, আমার বুকের ভেতর বহুকাল থেকে জমা আর্তনাদ আছে, আর কোনও বাজনার দরকার নেই আমার। ভেতর থেকে হলকা বেরোচ্ছে আগুনের, এ আগুন আমাকে আর পোড়াচ্ছে না, মন পুড়ে সেই কবেই ছাই হয়ে গেছে, শরীরে আর কোনও বাকি ত্বক নেই আমার না পোড়া – এ আগুন আমার পোড়া ত্বক থেকে ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছে। আমি যখন সফর আলীর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছব, আমাকে দেখে সে চমকাবে, চুলো থেকে খড়ি হাতে নিয়ে তেড়ে আসবে, আমাকে স্পর্শ করার আগেই তার গায়ে আগুন ধরবে, ফুঁসে ওঠা ফুঁড়ে ওঠা আগুন, অন্ধ উদ্বাহু আগুন। আগুন ধেই ধেই

নাচবে সফর আলীর শরীরে, তার হাতের জ্বলন্ত খড়িতে। তার খাঁক হওয়া অবদি আমি দাঁড়িয়ে থাকব। আমার ক্ষিধে মিটবে।

যে আগুন এতকাল ওরা আমার ভেতর পুরেছে, সেই আগুনই চতুর্গুণ ফুঁসে উঠছে আমার ভেতরে। আমি বাতাসের আগে আগে আবার পাগলা দুলালের মত হাঁটছি। আগুনই আমাকে সফর আলীর বাড়ি থেকে আলো হয়ে পথ দেখিয়ে নেবে গেঁতুর বাবার উঠোনে, সে উঠোনের বাতাসে আমি আমার কাতরানোর শব্দ পাব। সেই কাতরানো, এক উঠোন মানুষের সামনে, তালাক হয়ে যাওয়া আমার কাতরানো।

এটুকু ভেবে, আমি শ্বাস নিই। গেঁতুর মা গাছের গুঁড়ির মত বসে আছে বারান্দায়। মশা চরকির মত ঘুরছে তার মাথার ওপর। তার কুঁকড়ে থাকা শরীরটির দিকে চেয়ে আমি আর তার জায়গায় নিজেকে না বসিয়ে নিজের জায়গায়, চৌকাঠে, নিজেকে এভাবেই বসিয়ে রেখে গেঁতুর বাবার কুতকুত খেলার বয়সী বউ হই নিজে, গেঁতুর বাবার দায়ের কোপ আমাকে ফালি ফালি করে কাটে। রক্তাক্ত আমি উঠোন পড়ে কাতরাচ্ছি আর উঠোনে জড়ো হওয়া মানুষ আমাকে নিঃশব্দে দেখছে হাতে কনুইয়ের ভর রেখে, মাথার পেছনে হাত রেখে, দেখছে বায়োস্কোপের শেষ দৃশ্য। আমি তাবৎ দর্শককে চমকে দিয়ে গেঁতুর বাবার হাত থেকে দা ছিনিয়ে নিয়ে চামড়া কাটছি তার গায়ের, কেটে লবণ ছিটিয়ে দিচ্ছি। উঠোনের লোকেরা পাড়া কাঁপিয়ে চেঁচাচ্ছে, বলছে আমি পাগল, বদ্ধ পাগল।

হা পাগল!

মণির গায়ের চামড়া ছিলে মা লবণ মাখবেন বলেছিলেন ও চিংড়ি মাছের মাথা থেকে গু ফেলেনি বলে। আমান কাকা চিংড়ির মালাইকারি খেতে চেয়েছিলেন, খেতে গিয়ে তাঁর বমি হয়ে যায়। মা ক্ষেপে একেবারে ভূত হয়ে যান মণির ওপর। মণি সত্যি সত্যি ভাবছিল ওর চামড়া ছিলে লবণ মাখা হবে। আমিও। মণিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম *চামড়া ছিইলা লবণ মাখলে কি হয়রে মণি?*

—*যন্ত্রণা হয় খুব।* মণি বলেছিল, আতংকে নীল হয়ে ছিল ওর সারা মুখ।

ওর চোখের পানি মুছে দিতে দিতে, ক'টি নিশুত রাতে ওর সঙ্গে শরীর শরীর খেলা খেলেছিলাম, মনে পড়ে। আলগোছে সরিয়ে নিই হাত। মনে মনে বলি, *মণি তুই ভুলে যা ওইসব দিনের কথা, এ বাড়ি থেকে চলে গিয়ে তোর স্বপ্নের একটা ঘর তোল, তোর মা'কে আর চিনিকে নিয়ে সুখে থাক, কোনও ভরা শস্যের মাঠের কাছে থাক। যদি নদী থাকে ধারে কাছে, জলের মধ্যে কি করে সূর্য ডোবে দেখিস, আকাশে যে কি চমৎকার রং ফোটে তখন মণি! দেখিস তোর মন ভাল হবে।*

মণির গায়ের চামড়া শেষঅবদি তোলেননি মা, লবণও মাখেননি। তবে কাউকে কাউকে এভাবে আমি মনে মনে যন্ত্রণা দিই। শরাফ মামাকে, আমান কাকাকে। আজ ইচ্ছে করছে গেঁতুর বাবাকে। কেবল ইচ্ছেই সার, মাঝে মাঝে ভাবি, কতটা আর পারি আসলে আমি! লিকলিকে এক মেয়ে, ঝড়ো হাওয়ায় হেলে পড়ি, আমার কি সাধ্য আছে রুখে দাঁড়াতে! মাঝে মাঝে এও ভাবি, না থাক, ইচ্ছেটুকু আছে তো!

ক.

পাড়ার খালি পড়ে থাকা বাড়িগুলোয় হিন্দুরা ফিরে আসছে। কলকাতার শরণার্থী শিবির থেকে ফিরে আসছে নিজের দেশে, ফেলে যাওয়া ঘরে। জিনিসপত্র লুট হয়ে গেছে সব। খাঁ খাঁ করা উঠোনে রাস্তার নেড়িকুকুরগুলো শুয়ে ছিল। এখন মানুষে কলকল করছে। ছাদের রেলিংএ থুতনি রেখে ওদের ফিরে আসা দেখি। শুকনো ব্রহ্মপুত্রে যেন জোয়ার এসেছে। মরা বাগান ফুলে রঙিন হয়ে আছে। হারানো জিনিসের জন্য ওদের কাউকে শোক করতে দেখি না। নিজের ভিটেটুকু পেয়েই ওরা খুশি। এর মধ্যেই কীর্তন গাইতে শুরু করেছে কোনও কোনও বাড়ি। মেয়েরা সন্ধের বাতি নিয়ে উলু দিচ্ছে ঘরে ঘরে। আস্ত একটি শ্মশান আজ গা ঝেড়ে জাগল।

ওরা চলে আসার দিন সাতেক পর আমাদের কালো ফটক খুলে কাঁধে বন্দুক নিয়ে একদল মুক্তিযোদ্ধা আসে, পেছনে পনোরো ষোলজন মুখ চেনা পাড়ার লোক। অতিথিদের আমন্ত্রণ জানাই বাড়ির ভেতর হেসে, ওদের কিন্তু কারও মুখে হাসি নেই যেন জন্মের শত্তুরের বাড়ি ওরা বেড়াতে এসেছে। ওরা এ ঘরে ও ঘরে হাঁটে, আর বলে *কই লুটের মাল কই! যার যা মাল উঠাইয়া লও।*

পাড়ার মুখ চেনা লোকেরা এক এক করে আমাদের কাঁসার বাসন, পেতলের কলসি, চেয়ার টেবিল উঠিয়ে নিয়ে যায়। মা সেলাই মেশিনের ছিদ্রে তেল ঢালছিলেন, তেলের কৌটো হাতেই ধরা থাকে, মেশিনটি আলগোছে একজন কাঁধে উঠিয়ে নেয়। হতবাক দাঁড়িয়ে থাকি আমি, মাও।

বাড়ি লুট করে ওরা চলে যাওয়ার পর মা বলেন *যেমন কর্ম তেমন ফল। ঠিকই আছে।*

কথাটি বাবার উদ্দেশ্যে বলেন মা, আমি বুঝি। গ্রাম থেকে ফিরে আসার পর বাড়িতে নতুন কিছু জিনিস দেখে মা বলেছিলেন *এইগুলা কি কিনলা নাকি? কিনলা কিনলা পুরান জিনিস কিনলা ক্যান? পচা গলা গুড়ের ড্রাম দিয়া করবাটা কি!*

বাবা মোজা খুলে জুতোর ভেতর ঢুকিয়ে রাখছিলেন, কথা বলছিলেন না।

— *নাকি, হিন্দু বাড়ি থেইকা লইয়া আইলা!* মা নাক সিঁটকে বলেছিলেন।

বাবা তারও উত্তর দেননি।

গুড়ের ড্রামগুলো দেখে আমিও অবাক বনেছিলাম। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল বাবা অন্যের বাড়ি থেকে জিনিসগুলো না বলে নিয়ে এসেছেন। যে বাবা প্রদীপ নামের এক হিন্দু ছেলেকে যুদ্ধের সময় বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন, *আলম* নাম নিয়ে ছেলেটি যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও দিব্যি থেকে গেছে বাড়িতে, বাবা তাকে ওষুধের দোকানে রীতিমত ক্যাশে বসার কাজও দিয়েছেন আর সেই বাবা কি না হিন্দুদের ফেলে যাওয়া জিনিসে লোভ করেছিলেন! একাত্তরে এ বাড়িতে বড়দাদা, রিয়াজউদ্দিন আর ঈমান আলী ছিলেন। এরকমও হতে পারে ঘটনাটি ঘটিয়েছেন ওঁরাই।

বাবাকে যেহেতু প্রশ্ন করার বুকের পাটা নেই, বড়াদাদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম *হিন্দুদের জিনিস তুমরা লুট করছিলা নাকি!*

বড়দাদা বারান্দায় লোহার চেয়ারে বসে উঠোনের হাঁসমুরগির হাঁটাচলা দেখছিলেন। যেন হাঁসমুরগিই জগতে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রাণী, যেন হাঁসমুরগির বাইরে মানুষ এবং তাদের যে কোনও জিজ্ঞাসা নিতান্তই ছেঁদো। প্রশ্নটি তাঁর গা ঠেলে ঘোর ভাঙিয়ে আবার করলে তিনি উত্তর দেন

– *বিহারিরা রাস্তায় ফালাইয়া জিনিসপত্র পুড়াইয়া দিতাছিল, রাস্তা থেইকা টুকাইয়া কিছু জিনিস বাড়িতে আইনা রাখছিলাম।*

– *কেডা আনছিল? বাবা ? বাবা আনছিল কি না কও?* আমি চেপে ধরি বড়দাদাকে।

বড়দাদা হাঁস মুরগির দিকে গম ছুঁড়ে দিতে দিতে বলেন – *ওই আমরাই।*

ওই আমরাই। এরকম *ওই হোথা* উত্তর আমাকে স্বস্তি দেয় না।

বাড়ি লুট হওয়ার খবর পেয়ে বাবা বাড়ি এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন, কনুই ভেঙে দু'বাহুতে দুটো হাত রেখে। আমার ভাবতে ভাল লাগে বাবা অনুতাপ করছেন।

আমার দেখতে ইচ্ছে করে অনুতাপ করা বাবার মুখখানা। কেবল বাবার গর্জন শুনেছি, অহংকার দেখেছি। এত অহংকার, মানুষকে, আমার মনে হয় অমানুষ করে ফেলে সময় সময়।

দাদা ফিরে এলে খবর দিই – *লুটের মাল ফেরত নিছে মানুষেরা।*

ছোটদা ফিরে এলেও বলি।

বাড়ি থমথম করে। বাবা দাঁড়িয়েই থাকেন বারান্দায় হাতদুটো হাতে বেঁধে।

স্তব্ধতা ভেঙে কাচ-ভাঙা গলায় মা বলেন, বাবা যেন শুনতে পান এমন দূরত্বে দাঁড়িয়ে, –*কী দরকার আছিল পচা গুড়ের ড্রাম লুট করার! পাপের শাস্তি আল্লায়ই দেন। মাঝখান থেইকা আমার জিনিস গেল। আমার সেলাই মেশিনডা। নিজে টাকা জমাইয়া কিনছিলাম।*

দুঃসময় আসে যখন, ঝাঁক বেঁধেই আসে। বাড়িটি লুট হওয়ার পর ঠিক পরের দিনই দাদাকে রক্ষীবাহিনীরা রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে গেল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রক্ষীবাহিনী নামে একটি বাহিনী বানিয়ে তাদের হাতে সন্ত্রাস কমানোর দায়িত্ব দিয়েছেন শেখ মুজিব। তারা নানা জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে, ব্যস, রাস্তাঘাটে যাকেই সন্দেহ হচ্ছে, ধরে নিয়ে হাত পা বেঁধে পেটাচ্ছে। ভাজা মাছ উল্টে খেতে না জানা শাদাসিধে দাদাকেও। দাদাকে ছুটিয়ে আনতে গিয়ে ফেরত এলেন বাবা একা। পনেরোদিন একটানা পিটিয়ে সন্ত্রাসের কোনও হদিশ না পেয়ে ওরা ছেড়ে দিল দাদাকে। ঘাঁটি থেকে ফেরত এসে দাদা ভীষণ বিরোধী হয়ে উঠলেন শেখ মুজিবের। বলে বেড়ালেন – *পাকিস্তান আমলই ভাল ছিল। রাস্তাঘাটে নিরাপত্তা ছিল।*

যারা শেখ মুজিবকে পছন্দ করত, তারাও বলতে শুরু করেছে, *এ কেমন সরকার, রক্ষীবাহিনী দিয়া দেশের নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার করতাছে!*

খ.

এরকম কথা বছর কয়েক ধরে চলে। অসন্তোষ বাড়ে মানুষের। শেখ মুজিব *বাকশাল* নামে রাজনৈতিক দল তৈরি করে বাকি সব দল নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

— *এ কেমন সরকার যে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, মানুষ মরে না খাইয়া।* বাবা বলেন।

টুপি দাড়ি অলা লোকেরা গর্ত থেকে বেরিয়ে চেঁচাতে লাগল — *এইরম স্বাধীনতার কোনও মূল্য নাই। দেশটারে আবার পাকিস্তান বানাইতে হইব।*

বড় মামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন — *দেশের যে কী হবে বুঝতে পারতাছি না। পাকিস্তান আমলেও যা হয় নাই এই দেশে তাই করতাছে এই সরকার। শবে বরাত পালন করছে ঘটা কইরা বঙ্গবভনে। পাকিস্তান আমলেও শবে বরাত পালন করা হইত না। ইসলামি সম্মেলনে গেছে মুজিব। রাশিয়া কত সাহায্য করল যুদ্ধের সময়, এহন মুজিব সরকার ইসলামি বিশ্বের খাতায় বাংলাদেশের নাম লেখাইছে। ভারতের বিরুদ্ধেও কথা কয় সরকার। ভারতের আর্মি না আসলে দেশ স্বাধীন হইত নাকি!*

আমি রাজনীতির বেশি কিছু বুঝি না। যখন শেখ মুজিবের সাতই মার্চের ভাষণ বাজে রেডিও তে, এটুকুই বুঝি আমার ভাল লাগে। রোমকূপ দাঁড়িয়ে যায় উত্তেজনায়। *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম* যেন নিছক স্লোগান নয়, রক্তে তুফান তোলা কবিতা। ইস্কুলে গানের ক্লাসে গাই *জয় বাংলা বাংলার জয়।* এ তো নিছক গান নয়, অন্য কিছু। বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠার কিছু। পাড়ায় ক'দিন পর পরই প্যান্ডেল খাটিয়ে নাচ গানের অনুষ্ঠান হয়, ছুটে যাই মাইকে গানের আওয়াজ পেলেই। হারমোনিয়াম বাজিয়ে ছেলে মেয়েরা গান করে, নাচে। কী যে সুন্দর দেখায় ওদের! গানগুলো বুকের ভেতর কাঁপিয়ে দেয়। ক্ষুদিরামের গান শুনলেও এমন হত। ক্ষুদিরামের গল্প বলতেন কানা মামু, দেশ স্বাধীন করার জন্য এক ছেলে ইংরেজ বড়লাটকে বোমা মেরে ফাঁসিতে ঝুলেছিল। আমারও ক্ষুদিরামের মত হতে ইচ্ছে করে। অমন সাহসী, অমন বেপরোয়া।

হঠাৎ একদিন, সে সময় হঠাৎই, পুরো শহর থম থম করে। পাড়ার লোকেরা রাস্তায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে। যেন পৃথিবী ধ্বসে পড়ছে আর দু'মিনিট পর এ পাড়ার মাথায়। কারও কারও কানে রেডিও। মুখ শুকনো। চোখ গোল। কি হল কি হল। আবার কী! কান পেতে রেডিও শোনার দিন তো শেষ একাত্তরে, চারটে বছর কেবল পার হল, এর মধ্যে দুর্ভিক্ষ গেল, ভাঙা সেতু ভাঙা রাস্তা ঘাট সারাই হচ্ছে, কী হল তবে আবার! দেশ থমথম করলে লোকের অভ্যেস রেডিওতে *বিবিসি* শোনা। দেশের খবরে এ সময় কারও আস্থা থাকে না। লোকে যা করে, বাবাও তা করেন। আমাকে রেডিওর নব ঘোরাতে বলেন বিবিসির খবর ধরতে, বড় একটি দায়িত্ব পেয়ে খানিকটা গৌরব হয় আমার। আমাকে কখনও পড়ালেখা ছাড়া আর কিছু করার আদেশ বাবা দেন না। জগত সংসারের অন্য কিছুতে আমাকে ডাকা হয় না। নব ঘোরানোর কাজ সব দাদার কিংবা ছোটদার। আমার কেবল দূরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা। দাদা নেই বাড়িতে, চাকরির কারণে শেরপুর গেছেন দু'দিনের জন্য। ছোটদা তো নেইই। নেই বলে আমি আজ নতুন রেডিওর

নব ঘোরানোর দায়িত্ব পেয়েছি। বিবিসির কাছাকাছি এলে বাবা বলেন *থাম থাম।* শব্দ ভেসে আসে ঈথারে, ভাঙা শব্দ, অর্ধেক উড়ে যাওয়া শব্দ।

শেখ মুজিব নিহত।

কেবল তাই নয়, পরিবারের প্রায় সবাইকে কারা যেন গুলি করে মেরে রেখেছে তাঁর বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডির বাড়িতে। এ কি হল! এ ও কি সম্ভব! কপালের শিরা চেপে বসে থাকেন বাবা। ছোটদা বাড়ি থাকলে ঠোঁট ছোট করে বসে থাকতেন বারান্দায়। দাদা হয়ত বলতেন – *শেখ কামাল আর শেখ জামাল, মুজিবের দুই ছেলে, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মানুষেরে জ্বালাইয়া খাইছে। পকেটে পিস্তল নিয়া ঘুরত। বড় বাড় বাড়ছিল, মানুষ কত আর সহ্য করব।*

মা ঘর ময় হাঁটেন অস্থির, আর থেকে থেকে বলেন – *এই টা কি অমানুষের মত কাজ। ছেলে ছেলের বউ এতটুকু বাচ্চা ছেলে রাসেল সবাইরে মাইরা ফেলল! তারা কি দোষ করছিল? কী পাষন্ড গো বাবা। কী পাষন্ড!*

– এখন কি দেশটা আবার পাকিস্তান হইয়া যাইব?

প্রশ্নটি বাবার দিকে ছুঁড়ে দিই। কোনও উত্তর ফেরত আসে না। তিনি কপালের শিরা চেপে তখনও।

–মা, কও না কেন, দেশটা কি পাকিস্তান হইয়া যাইব নাকি!

যেন বাবা মা সব উত্তর হাতে বসে আছেন। তাই কি হয় কখনও! মা বলেন – *বংশ নির্বংশ কইরা ফেলাইছে রাইত দুপুরে। আল্লায় এদের বিচার করবেন।*

বাবা তখনও শিরা চেপে। এরমধ্যে সাত সকালে বাবার কাছে পাড়ার দু'জন লোক আসেন। মাখন লাল লাহিড়ী আর এম এ কাহহার, মুন্নির বাবা। বৈঠক ঘরে বসে সকালের চা খেতে খেতে তাঁরা দেশের ভবিষ্যত নিয়ে কঠিন কঠিন কথা বলেন। দরজার আড়াল থেকে শুনে আমি তার কতক বুঝি, কতক বুঝি না। বড়রা আমাকে তাঁদের আলোচনায় টানেন না আমি যথেষ্ট বড় হইনি বলে অথবা আমি মেয়ে বলে, কে জানে!

ঘরে টানানো তর্জনি তোলা শেখ মুজিবের ছবিটির দিকে তাকিয়ে আমার বড় মায়া হতে থাকে। মানুষটি কাল ছিল, আজ নেই – বিশ্বাস হতে চায় না। রেডিওতে আর *জয় বাংলা* গান বাজে না। আমার ভয় হতে থাকে। আমি দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকি। এই বুঝি আবার যুদ্ধ লাগল, এই বুঝি আমাদের মোষের গাড়ি করে আবার পালাতে হবে কোথাও! এই বুঝি শহরের রাস্তায় কামান চলবে, এই বুঝি গুলি করে যাকে ইচ্ছে তাকে মেরে ফেলা হবে। এই বুঝি আমার শরীরে টর্চ ফেলে দেখবে কেউ, *ঠান্ডা একটি সাপ ঢুকে যাবে আমার মাংসের ভেতর, হাড়ের ভেতর, রক্তে, মজ্জার ভেতর।*

সময় এক রাতেই পাল্টে গেছে, শেখ মুজিবের নাম নেওয়া বারণ। *জয় বাংলা* বলা বারণ। আমার শ্বাস কষ্ট হতে থাকে। বৈঠক ঘর থেকে বাবার থেকে থেকে *কী যে হইব ভবিষ্যত!* হামাগুড়ি দিয়ে আসতে থাকে ভেতর ঘরে।

কী যে হইব ভবিষ্যত বাবা পরদিনও বলেন, আবু আলী, দোকানের কর্মচারি, বাবার ডান হাত, দু'লাখ টাকা চুরি করে পালাল যেদিন ফার্মেসি থেকে।

মা বলেন *কৃপণের ধন পিঁপড়ায় খায়, বউ পুলাপানরে শাতাইয়া টাকা জমাইলে ওই টাকা আল্লাহ রাহে না। কুনো না কুনো ভাবে যায়ই। কত কইছি আমার মার বেবাক সহায়*

সম্পদ সব লুট হইয়া গেছে, লুট ত এই বাড়ি থেইকাই হইল। তুমি কিছু সাহায্য কর মারে। ফিইরা চাও নাই। এহন দেহ টাকা কেমনে যায়! আল্লার বিচার।

দেশ থমথম করে, তবু মাদারিনগর থেকে রিয়াজুদ্দিন আর ঈমান আলী আসতে থাকেন, ওঁরা টাকা নিয়ে যান খতি ভরে, জমি কিনবেন। মা ওঁদের পাকঘরে বসিয়ে গামলা ভরে ভাত দিতে থাকেন, থালের কিনারে অল্প ডাল, আর পোড়া শুকনো মরিচ। ওঁরা শুকেনো মরিচ ডলে ভাত খেতে থাকেন। মা ওঁদের ঘুমোতে দেন মেঝেয়, মশারি ছাড়া। মশার কামড়ে ফোলা মুখ ফুলে ওঠে ওঁদের।

বাবা রাতে ফিরে জিজ্ঞেস করেন – *ওদেরে খাওয়া দিছ?*

মা গলায় রসুন তেলের ঝাঁজ মিশিয়ে বলেন – *দিছি না? ঠাইস্যা খাইছে।*

আমি লেখাপড়া করতে থাকি। *পাঠ্যের* নিচে *অপাঠ্য।* বাবা স্বপ্ন দেখতে থাকেন। মেয়ে পড়ালেখা করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। আমি ছাদে উঠতে থাকি লুকিয়ে। পাড়ার কারও কারও চুলের ঢেউ, গালের টোল, চোখের হাসি, ঠোঁটের অভিমান দেখতে আমার ভাল লাগতে থাকে। সন্ধে হলে ছেলে দেখার পাট চুকিয়ে ছাদ থেকে নামি। ঘরে বসে কখন অমাবস্যা, কখন পূর্ণিমা আকাশ কালো বা আলো করে তার খবর রাখা সম্ভব হয় না। চাঁদের সঙ্গে বহুকাল আমার হাঁটা হয় না।

মা পীরবাড়িতে যেতে থাকেন। অন্ধকারে গা ঢেকে আমান কাকা আসতে থাকেন বাড়িতে। মা শরীর-মন ঢেলে নছিহত করে যেতে থাকেন। কাপড় চোপড় সুটকেসে গুছিয়ে খাটের তলায় রেখে দিয়েছেন মা। খুব শীঘ্র তিনি চলে যাবেন আল্লাহতায়ালার পাঠানো *বোররাখে* চড়ে, মক্কায়। প্রথম *ব্যাচে* নিজের নাম তোলার জন্য মা পীরের কাছে তদবীর করতে থাকেন। আমার আর মনে হতে থাকে না যে মা মরে গেলে আমিও মরে যাব।

বাবা ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে আবার বদলি হয়ে চলে এসেছেন ময়মনসিংহে। মেডিকেল কলেজে ছাত্র পড়ানোর চাকরি করতে থাকেন। গাধা পিটিয়ে মানুষ করার অধ্যাপক তিনি। বিকেলবেলা আরোগ্য বিতানের *ডাক্তার* লেখা ঘরটিতে বসে রোগী দেখতে থাকেন। রোগীদের ভিড় বাড়তে থাকে।

চাকলাদারের সঙ্গে তালাক হয়ে যাওয়ার পর রাজিয়া বেগম ঘন ঘন লোক পাঠাতে থাকেন বাবার কাছে।

ছোটদা কোথায় আছেন, মরে আছেন না বেঁচে, কেউ আমরা জানি না। বাবা ছোটদার বিছানা পেতেই রাখেন, হঠাৎ একদিন তিনি ফিরে আসবেন আশায়।

দাদা ঘরের আসবাবপত্র বানাতে থাকেন আর শহর ঘুরে পান পাতার মত মুখ এমন একটি সুন্দরী মেয়ে খুঁজতে থাকেন বিয়ে করবেন বলে।

আমি বড় হতে থাকি।